শ্রীরাজমালা

। দ্বিতীয় লহর ।

শ্রীরাজমালা

[ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত]

দ্বিতীয় লহর

সটীক ও সচিত্র

সেনাপতি রণচতুরনারায়ণ কথিত

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তক

সম্পাদিত

"প্রজা সুখে সুখী রাজা তদ্দুঃখে যশ্চ দুঃখিত।
ন কীর্ত্তিযুক্তো লোকেহস্মিন্ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে।।"
— বিষ্ণু সংহিতা।

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র

ত্রিপুরা সরকার

আগরতলা

শ্রীরাজমালা

[ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত]

দ্বিতীয় লহর

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী, ২০০৩

তৃতীয় সংস্করণ ঃ জুন, ২০২০

ISBN : ৯৭৮-৯৩-৮৬৭০৭-৬১-১

মূল্য ঃ ১২০০ (এক হাজার দুইশত টাকা)

কম্পিউটার সেটিং ঃ নিউ ক্যুইক প্রিন্ট, আগরতলা।

মূদ্রন ঃ কালিকা প্রেস প্রাঃ লিঃ, কলকাতা

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণের ভূমিকা

শ্রীরাজমালা বা রাজমালা ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন রাজবংশের এই ইতিকথা প্রথম লহর থেকে চতুর্থ লহর সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ রাজাদেশে নিবিষ্টচিত্তে সম্পাদনা করেন। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশনার জন্য রাজধানী আগরতলায় রাজমালা কার্যালয় ছিল এবং সেখান থেকে এই মহান গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। রাজ-আমলে এই মহাকাব্যিক রাজ-ইতিহাস জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করে। পার্বত্য ত্রিপুরাসহ চাকলা রোশনাবাদের রাজভক্ত জনসাধারণের প্রতিটি গৃহে এই গ্রন্থ শোভিত হত। রাজন্যবর্গের এই সুবৃহৎ বিস্ময়কর ইতিহাস শুধুমাত্র রাজাদের কীর্তিকাহিনী নয়, ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের ধারাবাহিক ইতিহাসের ফাঁকে ফাঁকে সমকালীন বৃহত্তর ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও বর্ণিত হয়েছে এই সুমহান আকরগ্রন্থে, যা চিরকালীন গবেষণার বিষয় হিসেবে দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়ে আছে অত্যন্ত মোহনীয়ভাবে। সেই হিসেবে এই গ্রন্থ অতীব মূল্যবান হিসেবে প্রতিভাত।

ত্রিপুরার রাজতন্ত্রের অবসানের পর প্রথমবার ২০০৩ ইংরাজীতে এই দুষ্প্রাপ্য সুপ্রাচীন জনপ্রিয় গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং এক সহস্র কপি ছাপানো হয়।

বর্ত্তমানে মুদ্রিত গ্রন্থ নিঃশেষিত হওয়ায় আবারও সুধী পাঠক সমাজের জন্য ত্রিপুরা সরকারের উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শ্রীরাজমালার লহর চতুষ্টয় পুনর্মুদ্রণের সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছেন। বর্তমান অংশটি শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত শ্রীরাজমালার দ্বিতীয় লহর। উক্ত লহরটির প্রকাশনা সাল ১৩৩৭ ত্রিপুরাবদ্ধ (1927-A.D.)।

আশা করি, শ্রীরাজমালার পুনর্মুদ্রিত দ্বিতীয় লহরখানি সকল অংশের মানুষের প্রত্যাশা পুরণ করতে সমর্থ হবে।

ইতি
ভবদয়ী

20.06.2020

আগরতলা
২০ জুন, ২০২০ইং

(ধনঞ্জয় দেববর্মা)
অধিকর্তা
উপজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার।

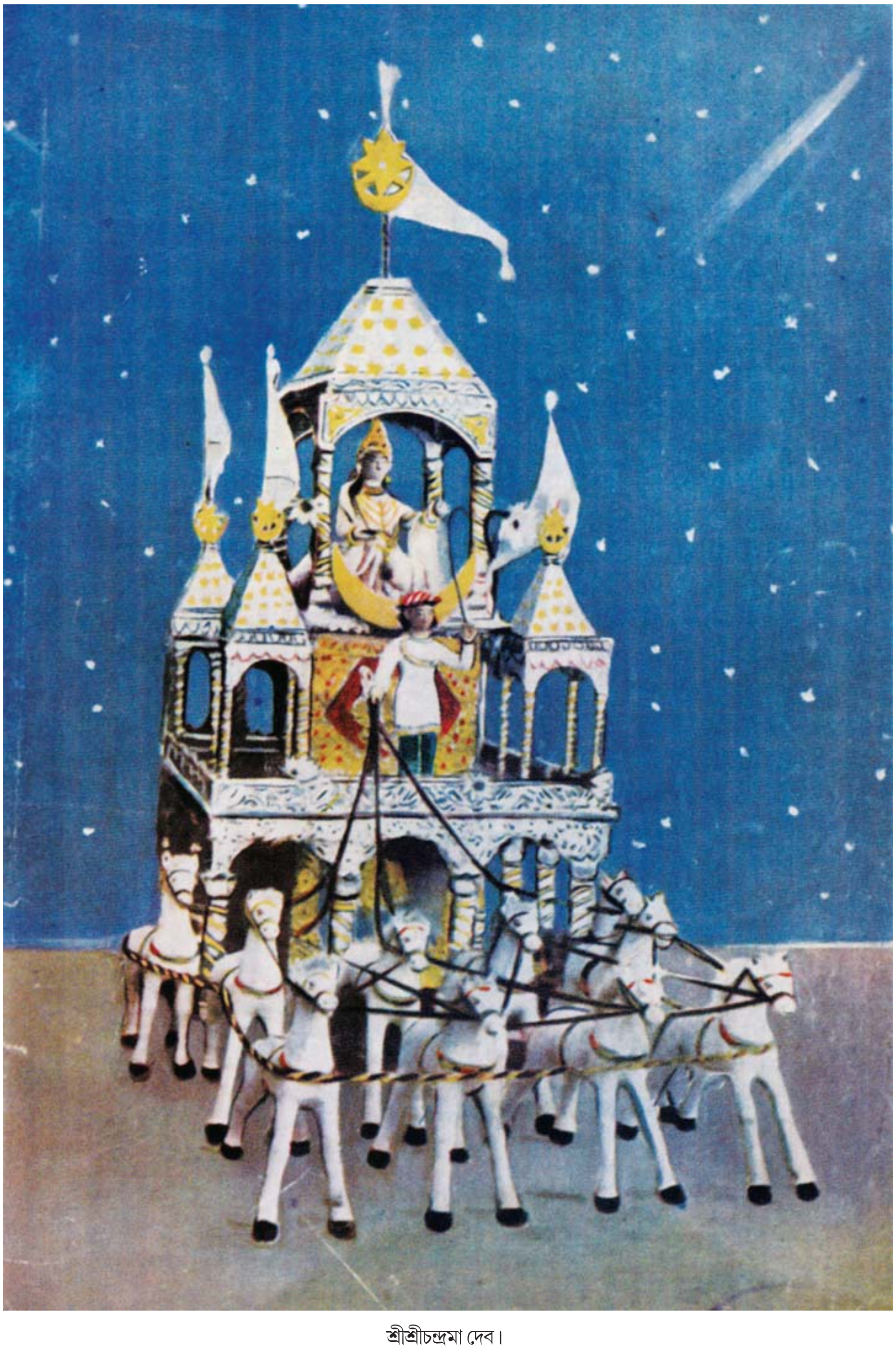

শ্রীশ্রীচন্দ্রমা দেব।
সামুদ্রং বৈশ্যমাত্রেয়ং হস্তমাত্রয়ং সিতাম্বরম্।
শ্বেতং দ্বিবাহুং বরদং দক্ষিণং সগদেতরম্।।
দশাশ্বং শ্বেত পদ্মস্থং বিচিন্ত্যোমাধিদৈবতম্।
জলপ্রত্যধিদৈবঞ্চ সূর্য্যাস্যমাহবয়েত্তথা।।

নিবেদন

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের অপার কৃপায় রাজমালার দ্বিতীয় লহর প্রকাশিত হইল। ইহার সম্পাদন কার্য্যে প্রথম লহরের প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকিলেও যোগ্যতার অভাববশতঃ নানাবিধ ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়া অনিবার্য্য। এই অক্ষমতার নিমিত্ত সুধী সমাজে বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

রাজমালার প্রথম লহর ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তীকালে রচিত হইয়াছিল। তৎপর কিঞ্চিন্ন্যূন দেড়শত বৎসরের মধ্যে মহারাজ ধন্যমাণিক্য ও বিজয়মাণিক্য প্রভৃতি যশস্বী এবং খ্যাতনামা রাজন্যবর্গ ত্রিপুর-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল রাজনীতি-কুশল, শৌর্য্যশালী এবং ধর্ম্মবীর ছিলেন, এমন নহে --- সাহিত্যের পুষ্টিবিধানকল্পেও বিস্তর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু রাজমালার প্রতি ইঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার কোনও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। ধর্ম্মমাণিক্যের পরবর্ত্তী ক্রমান্বয়ে নয় জন ভূপতি এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন বলিয়াই মনে হইতেছে। ইঁহাদের পরবর্ত্তী মহারাজ অমরমাণিক্য পুনর্ব্বার এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার অনুজ্ঞায়, রাজমালার দ্বিতীয় লহর গ্রথিত হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের আরব্ধ কার্য্যের উৎকর্ষ বিধানদ্বারা মহারাজ অমর সত্য সত্যই অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মমাণিক্যের প্রযত্নে রচিত অংশের পরবর্ত্তী ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার পথ প্রদর্শক না হইলে, অন্যান্য লহরগুলি পরপরভাবে রচিত হইবার আশা ছিল বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থভাগে সন্নিবিষ্ট বিবরণ আলোচনায় জানা যাইবে, ১৫৭৭ হইতে ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কোন এক সময়ে দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছিল, সুতরাং এই অংশ সার্দ্ধ ত্রিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে। ইহা একাধারে সাহিত্য এবং ইতিহাসরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য।

প্রথম লহরের সম্পাদন কার্য্যে অধিক পরিমাণে শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে, ইহা নিতান্তই অপরিহার্য্য। কারণ, রাজমালার প্রথমাংশ ত্রিপুর ইতিহাসের তথা ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের পক্ষে পৌরাণিক যুগ, ঐতিহাসিক যুগ যাহাকে বলা হয়, তৎসহ ইহার সম্বন্ধ বড় বেশী নাই। সুতরাং শাস্ত্রীয় প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ একান্ত প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় লহরের সময় হইতে মুসলমান-সংশ্রবে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তের সহিত ত্রিপুর-ইতিহাসের নৈকট্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। রাজমালার সম্পাদন কার্য্য যত অগ্রসর হইতেছে, ততই পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সহিত ইহার সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা অধিক দেখা যাইতেছে। এই কারণে, সম্পাদকের দায়িত্ব উত্তরোত্তর এত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, অনেক স্থলে মতবাদের জটিল-জাল ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই লহরের সম্পাদন কার্য্যে

পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ-সমূহের ইতিহাসের প্রতি এবং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মতের উপর লক্ষ্য রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু মূল গ্রন্থের অনুরোধে, কোন কোন ঐতিহ্য বিবরণ আংশিক আলোচনা করিতে হইয়াছে, পরবর্ত্তী লহরসমুহে তৎসমস্ত ক্রমশঃ পূর্ণত্ব লাভ করিবে বলিয়া আশা করি। তবে, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার অভাব নিবন্ধন এই গুরুতর কার্য্যে ভ্রম-প্রমাদ সঙ্ঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। বিশেষতঃ মত বিরোধ-স্থলে যে মত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত হইবার সম্ভাবনা অতি বিরল। বোধ হয় ইতিহাস চর্চ্চানিরত কোন ব্যক্তিই এরূপ মতবিরোধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশা করিতে পারেন না। এ স্থলে এইমাত্র নিবেদন করা যাইতেছে যে, মতভেদস্থলে যেটি যুক্তিযুক্ত মত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

প্রথম লহরের সম্পাদনোপলক্ষ্যে কোন কোন ঐতিহাসিকের মত খণ্ডন করিতে যাইয়া বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী মতবাদিগণের প্রতি অযথা গালিবর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ আমাকে অনুযোগ করিতেছেন। এই অনুযোগের ভিত্তি কোথায়, এখনও বুঝিতে পারি নাই। যাঁহারা ত্রিপুরার-ইতিবৃত্ত কিঞ্চিন্মাত্রও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বর্ত্তমানক্ষেত্রে আমার পথপ্রদর্শক, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি আমি সম্মানের ভাবই পোষণ করিয়া আসিতেছি। কাহাকেও গালি দেওয়া কিম্বা অবমাননা করা আমার উদ্দেশ্য নহে — তাহা করিবার প্রয়োজনও নাই। অনবধানতাবশতঃ তদ্রূপ কোন কার্য্য করিয়া থাকিলে, প্রথম লহরেই সেই অসতর্কতাজনিত ত্রুটীর নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা হইয়াছে, এ স্থলেও পুনর্ব্বার বিনীতভাবে ক্ষমাভিক্ষা চাহিতেছি। কিন্তু কাহারও মতের প্রতিবাদ করাকেই যদি 'গালিবর্ষণ' ধরিয়া লওয়া হয়, তবে আমার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হইবে। যাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে গুরুস্থানীয় বলিয়া শ্রদ্ধা করি, কর্ত্তব্যানুরোধে এমন ব্যক্তির উক্তিও খণ্ডনের চেষ্টা করিতে হইয়াছে — প্রয়োজনস্থলে অতঃপরও তাহা করিতে বাধ্য হইব। এই ক্ষেত্রে আমার মতই যুক্তিযুক্ত বা সুসঙ্গত বলিয়া নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইবে, এমন দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করি না; উপস্থাপিত যুক্তিগুলির ভাল-মন্দ বিচার করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু কোন বিচারক প্রতিবাদ মাত্রকেই যদি 'গালিবর্ষণ' মনে করেন, তবে তাঁহার হাত হইতে নিস্তার লাভের উপায় নাই। এই কার্য্যে যেন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট কিম্বা অসংযত পথে ভ্রাম্যমাণ না হই, ভগবান সদনে সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

রাজমালার পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি বিশেষ সতর্কতার সহিত মিলাইয়া পাঠোদ্ধার করা হইয়াছে; এবং পাদটীকায় পাঠান্তরের উল্লেখ করা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত, রাজরত্নাকর, কৃষ্ণমালা, শ্রেণীমালা, চম্পকবিজয়, ত্রিপুরবংশাবলী এবং গাজিনামা প্রভৃতি ত্রিপুরার ইতিবৃত্তঘটিত হস্তলিখিত পুথিগুলি যথাসাধ্য আলোচনাদ্বারা প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্য যে-সকল গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা ইহার পশ্চাদ্ভাগে সংযোজিত হইল। ঐ সকল গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রকাশকবর্গের নিকট চিরঋণী থাকিব। এই

আলোচনায় কঠোর পরিশ্রম এবং বিস্তর সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে। এবারও মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত রণবীরকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর হইতে যথেষ্ট গ্রন্থ-সাহায্য লাভ করিয়াছি, তাঁহার এই উপকার কখনও বিস্মৃত হইবার নহে।

এই কার্য্যে যে-সকল সহৃদয় ব্যক্তির আনুকূল্য লাভ করিয়াছি, তন্মধ্যে মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। রাজমালার কার্য্যভার শাসন-পরিষদের হস্তে থাকাকালে এই কার্য্যের প্রতি তাঁহার যে সদয় দৃষ্টি এবং উৎসাহ দেখা গিয়াছে, তাহা অতুলনীয়। স্থানীয় পূজ্যপাদ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে ত্রিপুরেশ্বরের দ্বারপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ তর্কভূষণ, রাজপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন কাব্যরত্ন, এবং উমাকান্ত একাডেমীর প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণকুমার কাব্যতীর্থ মহাশয় হইতে বিস্তর সাহায্য লাভ করিয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত নরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুর, শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর বি-এ, ডি-লিট্ এবং দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সেন বাহাদুর এম্-এ, বি-এল্; এম্-আর-এ-সি (লণ্ডন), বৃন্দারণ্যাশ্রমী শাস্ত্রদর্শী পূজ্যপাদ পরমহংস শ্রীলশ্রীমৎ গৌরগোবিন্দানন্দ ভাগবতস্বামী মহোদয় প্রথম লহরের ন্যায় এই লহরের পাণ্ডুলিপি বিশেষ পরিশ্রমের সহিত আলোচনা পূর্ব্বক আমাকে যথাযোগ্য উপদেশ দানে উপকৃত করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের সময় হইতে ত্রিপুরার রাজসরকারের সহিত দীনেশবাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা চলিয়া আসিতেছে। তিনি তৎপূর্ব্ব হইতেই এই অকৃতীকে বন্ধুর মধ্যে টানিয়া লইয়া স্বীয় অসীম ঔদার্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে যথোচিত সাহায্য দানে এবার তাঁহার অক্ষম সুহৃদ্‌কে ধন্য করিয়াছেন। তাঁহার এই উদারতা এবং স্নেহের কথা জীবনে কখনও বিস্মৃত হইবার নহে। ঢাকা মিউজিয়মের সুযোগ্য কিউরেটর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, মহাশয় অল্পকালের আলাপের মধ্যে এবং পত্রদ্বারা রাজমালা সম্পাদন কার্য্যের সহায়ক যে-সকল মূল্যবান বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। পরম শ্রদ্ধাভাজন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, সি-আই-ই, মহাশয়ের সহিত আলোচনায় এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। এবং শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ, মহাশয় হইতে ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ বহু মূল্যবান বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের সঙ্কলিত ত্রিপুর-ইতিবৃত্ত সম্বলিত গ্রন্থ নিচয় এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংগৃহীত বিবরণ, আমার কার্য্যের বিশেষ সাহায্যকারী হইয়াছে। স্নেহভাজন শ্রীমান্ দীনদয়াল দেববর্ম্মা মহাশয়ের সংগৃহীত 'দোয়াপাথরের বিবরণ' পাইয়া বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুরের আণ্ডার সেক্রেটরী প্রীতিভাজন শ্রীমান্ সত্যরঞ্জন বসু বি-এ, এবং আমার সহকারী স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়দ্বয় আমার কার্য্যের বিস্তর সাহায্য

করিয়াছেন। এই সকল ব্যক্তির নিকট তাঁহাদের সৌজন্যের নিমিত্ত চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি। এ স্থলে তৎসমস্তের নামোল্লেখ করিতে না পারায় গুরুতর ত্রুটী রহিয়া গেল।

রাজমালায় যেসকল ব্যক্তির নামোল্লেখ আছে, তাঁহাদের বিবরণ সংগ্রহ করা বর্ত্তমানকালে সাধ্যের অতীত বলিয়া মনে হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, অনেকের অধস্তন বংশ্যগণ পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাওয়ায়, তাঁহাদের পরিচয় বর্ত্তমান জনসমাজ অবগত নহে। অনেকে আবার আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের পরিচয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এই সকল কারণে প্রাচীন কালের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির পরিচয় সংগ্রহের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। স্থানের বিবরণ সম্বন্ধীয় অবস্থাও ঠিক তদনুরূপ। অনেক স্থানের নাম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এবং প্রাচীন নামগুলি বর্ত্তমান জনসমাজ ভুলিয়া যাওয়ায়, তৎসমস্তের অবস্থান নির্ণয় করিবার সুযোগ ঘটিতেছে না। অনুসন্ধানদ্বারা যে সামান্য বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা গ্রন্থের পশ্চাদ্ভাগে সন্নিবেশিত হইল; কিন্তু তদ্দ্বারা তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না।

শাসন-পরিষদ্ কর্ত্তৃক রাজকার্য্য পরিচালিত হইবার কালে রাজমালা সংক্রান্ত কার্য্য মহামান্যবর মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে থাকিবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শাসন-পরিষদ্ উঠিয়া যাইবার পরে নবীন ভূপতি — পঞ্চ-শ্রীযুত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই কার্য্য স্বকীয় তত্ত্বাবধানে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সামান্য আনন্দ বা অল্প আশার কথা নহে। শ্রীশ্রীযুত মাণিক্যবাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী মান্যবর শ্রীযুক্ত রাণা বোধজং বাহাদুর, এবং এসিষ্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারী দেওয়ান সাহেব শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ দত্ত, এম্-এ, বি-এল্, এফ্-ই-এস্, এম্-আর-এ-এস, মহাশয় এতদ্বিষয়ক কার্য্য পরিচালনের বিধি ব্যবস্থা করিতেছেন।

গ্রন্থের এই অংশ স্থানীয় 'রাজমালা যন্ত্রে' মুদ্রিত হইল। ইহাকে মুদ্রাকর প্রমাদশূন্য করিবার পক্ষে বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু নানা কারণে এ বিষয়ে পূর্ণ সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে নাই। এই ত্রুটীর নিমিত্ত বিশেষ দুঃখিত আছি। রাজমালা যন্ত্রের প্রিণ্টার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়দ্বারা প্রুফ সংশোধন কার্য্যে বিস্তর সাহায্য লাভ করিয়াছি; এ জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

শ্রীভগবানের অসীম কৃপা এবং পঞ্চশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের সদয় দৃষ্টিলাভে, রাজমালার অবশিষ্টাংশ সম্পাদন ও প্রচারের কার্য্য শেষ করিয়া উঠিতে পারিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান এবং পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

আগরতলা — 'রাজমালা' কার্য্যালয়,
দোল পূর্ণিমা — ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ। } **শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন**

রাজমালার প্রচার প্রয়াসী
স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য

প্রমাণ-পঞ্জী

(যে-সকল গ্রন্থাদি হইতে দ্বিতীয় লহরের সম্পাদন কার্য্যে প্রমাণ বা উপাদান গৃহীত হইয়াছে তাহার তালিকা)

সংস্কৃত গ্রন্থাদি

অগ্নিপুরাণ।
অথর্ব্ব বেদ।
ঊনকোটী তীর্থমাহাত্ম্য (হস্তলিখিত)।
ঋগ্বেদ সংহিতা।
কথাসরিৎসার।
কবিকল্পলতা।
কল্পতরু।
কালিকা পুরাণ।
কালীবিলাস তন্ত্র।
কাশী খণ্ড।
কূর্ম্মপুরাণ।
গরুড় পুরাণ।
গার্গ্য সংহিতা।
ঘটককারিকা।
চামুণ্ডা তন্ত্র।
জৈমিনি ভারত।
জ্যোতিস্তত্ত্ব।
তন্ত্র বিভূতি।
তন্ত্রসার।
তিথিতত্ত্ব।
তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
দশকুমারচরিত।
দানসাগর গ্রন্থ।
দিগ্বিজয় প্রকাশ।
দুর্গোৎসব তত্ত্ব।
দেবীপ্রতিষ্ঠা তত্ত্ব।
দেবী পুরাণ।
দেবীভাগবত।
নন্দি পুরাণ।
পরাশর সংহিতা।
পত্র-কৌমুদী।
প্রায়শ্চিত্ত-তত্ত্ব (রঘুনন্দন)।
বসন্তরাজ শাকুন।
বায়ু পুরাণ।
বারাহী তন্ত্র।
বিপ্রকল্পলতিকা।
বিবাদ দর্পণ।
বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিণী।
বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর।
বৃহৎ সংহিতা।
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ।
বৃহন্নারদীয় পুরাণ।
বৃহন্নীল তন্ত্র।
বৃহস্পতি সংহিতা।
ব্রহ্মপুরাণ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।
ভবিষ্য পুরাণ।
মৎস্য পুরাণ।
মহাভারত (মূল)।
মেদিনী কোষ।
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।
যুক্তিকল্পতরু।
যোগবাশিষ্ট রামায়ণ।
যোগিনী তন্ত্র।
যোগিনী হৃদয়।
রঘুবংশ।
রাজনির্ঘণ্ট।
রাজরত্নাকর।
রুদ্রযামল।

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র।
শব্দকল্পদ্রুম।
শুক্রনীতি।
শুদ্ধিতত্ত্ব।
শ্রীমদ্ভাগবত।
শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা।
শ্বেতাশ্বতর।
সংস্কৃত রাজমালা।
সায়নভাষ্য।
স্কন্দ পুরাণ।
হরিবংশ।

বাঙ্গালা গ্রন্থাদি

অদ্বৈত প্রকাশ।
আইন-ই-তীরহুত (বিশ্বকোষধৃত)।
অসাম বুরুঞ্জী।
ঊনকোটী তীর্থ (প্যারীমোহন দেববর্ম্মণ)।
কামরূপ বুরুঞ্জী।
কৃষ্ণকর্ণামৃত (যদুনন্দন দাস)।
কৃষ্ণমালা (হস্তলিখিত)।
কৈলাসবাবুর রাজমালা।
গাজিনামা (হস্তলিখিত)।
গৌরলেখমালা।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ।
চণ্ডীকাব্য (কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম)।
চণ্ডীকাব্য (মাধবাচার্য্য)।
চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য (হরকিশোর অধিকারী)।
চট্টগ্রামের ইতিহাস (পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী)।
চম্পকবিজয় (হস্তলিখিত)।
চৈতন্যচরিতামৃত (কবিরাজ গোস্বামী)।
চৈতন্যভাগবত (বৃন্দাবন দাস)।
চৈতন্যমঙ্গল (লোচন দাস)।
ঢাকার ইতিহাস (যতীন্দ্রমোহন রায়)।
তরপের ইতিহাস।
তোয়ারিখে বাঙ্গালা (অনুবাদ)।
ত্রিপুর বংশাবলী (হস্তলিখিত)।
ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস (শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)।
ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট (১১শ ভাগ, ২য় সংখ্যা)।
দুর্গামঙ্গল (মাধবাচার্য্য)।
ধর্ম্মরাজের গীত (কবি রূপরাম)।
নব্যভারত (কার্ত্তিক, ১৩০৪)।
পদ্মাবতী (আওয়াল কবি)।
পাদশাহনামা (বিশ্বকোষধৃত)।
পৃথিবীর ইতিহাস (দুর্গাদাস লাহিড়ী)।
প্রবাসী (কার্ত্তিক, ১৩২১)।
প্রাচীন রাজমালা (হস্তলিখিত)।
ফরিদপুরের ইতিহাস (আনন্দনাথ রায়)।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (দীনেশচন্দ্র সেন)।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড)।
বাঙ্গালার ইতিহাস (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)।
বিশ্বকোষ (নগেন্দ্রনাথ বসু)।
ভ্রমণ বৃত্তান্ত (ধনঞ্জয় ঠাকুর) — হস্তলিখিত।
মনসামঙ্গল (দ্বিজ বংশীবদন)।
ময়নামতীর গান (ভবানী দাস)।
মহাভারত (কাশীরাম দাস)।
মহাভারত (ছুটিখান)।
মহারাজ রাজবল্লভ সেনের জীবনী।
মহারাজোয়াং গ্রন্থ (চট্টগ্রামের ইতিহাসধৃত)।
মাদল-পঞ্জী (বিশ্বকোষধৃত)।
যশোহর-খুলনার ইতিহাস (সতীশচন্দ্র মিত্র)।
রাজমালা — প্রথম লহর।
রাজাবলী (হস্তলিখিত)।
রাজাবাবুর রাজমালা (হস্তলিখিত)।
রাজোয়াং (চট্টগ্রামের ইতিহাসধৃত)।
রামায়ণ (কৃত্তিবাস)।

রিয়াজুস-সলাতিন (অনুবাদ)।
শিলালিপি সংগ্রহ (চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ)।
শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ (চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ)।
শ্রীহট্টের ইতিহাস (অচ্যুতচরণ চৌধুরী)।
শ্রেণীমালা (হস্তলিখিত)।
সাহিত্য (শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২১)।
সীতারাম (অক্ষয়কুমার মৈত্র)।
সেক শুভোদয় (হস্তলিখিত)।

ইংরেজী গ্রন্থাদি

Akbarnama (by Beveridge).
Analysis of the Rajmala (J. A. S. B.—Vol. XIX).
Ayin-i-Akbari (Translation by Francis Gladwin).
Beal's Budhist Record— Vol. II.
Bengal Past and Present — Oct. 1907.
Bengal under Lieutenant Governors.
Buchanon Hamilton's Hindusthan.
Dacca Review — May, 1914 and Oct. 1922.
Forward — April 10, 1927.
History of Assam (by E. A. Gait).
History of Tripura (by E. F. Sandys).
History of Mediaeval Hindu India — Vol. II.
History of the World — Sir Walter Raleigh.
Ibn Batuta (Translation).
Journal of Asiatic Society of Bengal — Part I, 1878, March, 1914, Vol. XII, XLIII.
Journal of The Royal Asiatic Society — January, 1910.
Letter No. 276, from Asstt. Pol. Agent, 11th June, 1888.
Letter from Maharaja Beer Chandra Manikya — 3rd Sep. 1888.
Letter from Commissioner of the Chittagong. (No. 687 — 2nd Oct. 1888).
Muir's Sanskrit Texts.
North East Frontier of Bengal.
Pal King of Bengal (by R. D. Banerjee).
Pioneers in India — P. 163.
Regulation — XVII of 1829.
Ralph Fitch's Travells.
Science of Language — MaxMuller.
Settlement Report of Chakla Roshnabad (by J. G. Cumming, I.C.S).
Statistical Account of Bengal — Vol. VI.
Stewart's History of Bengal.
Tavernier's Travels (by J. Phillips).
Von Neor's Akbar.
Wright's Marco Polo.
Yule's Marco Polp — Vol. II.

রাজমালা —৩

দ্বিতীয় লহর—ছ পৃষ্ঠা।

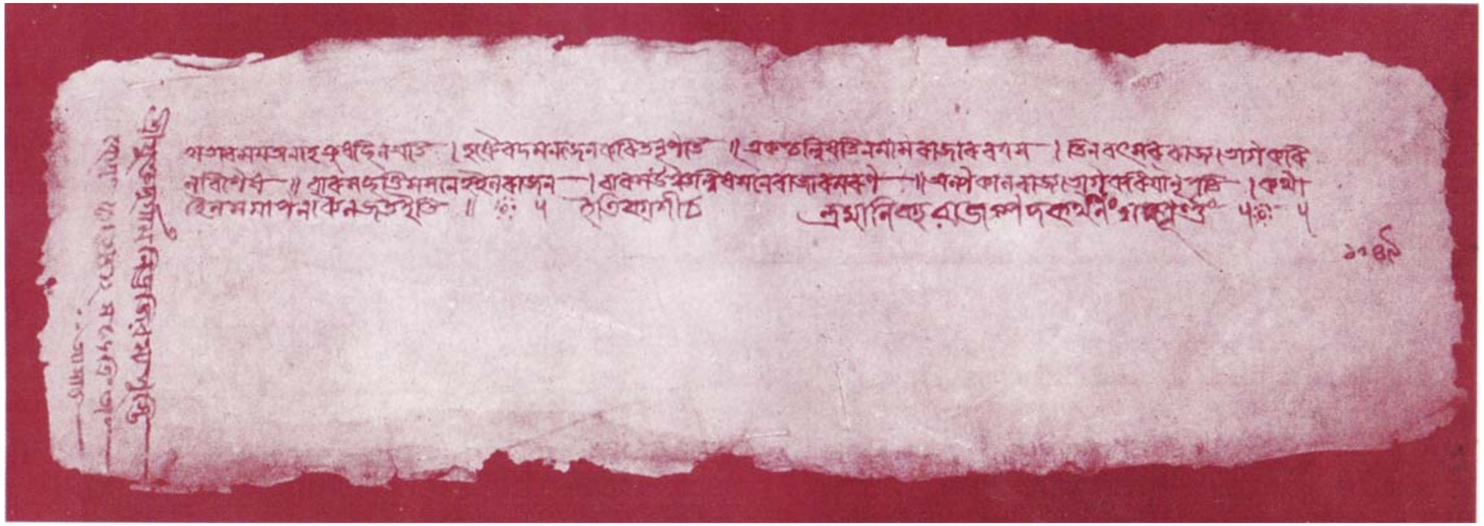

রাজমালা গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বভাষ

রাজমালার প্রথম লহর সম্পাদন কালে যে পাঁচখানি পুথির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় লহরের কার্য্যেও সেই সকল পুথিই অবলম্বিত হইয়াছে। এই পুথির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন একখানা পাণ্ডুলিপি আগরতলাস্থ উজীর বাড়ীর গ্রন্থাগারে ছিল; কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে গৃহদাহ উপলক্ষে তাহা ভস্মসাৎ হইয়াছে। তৎসমসাময়িক আর একখানা পুথি রাজ-গ্রন্থভাণ্ডার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। উক্ত উভয় গ্রন্থ আলোচনার সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়ে থাকিলেও তৎকালে রাজমালা সম্পাদনের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলাম না। এখন যে-সকল পুথি অবলম্বনে কার্য্য করা হইতেছে, তৎসমস্ত পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়েরই প্রতিলিপি। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থখানা ১২৫৬ ত্রিপুরাব্দে উজীর ভবনে রক্ষিত গ্রন্থ হইতে নকল করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের নিজ তত্ত্বাবধানে ছিল; তাঁহার গোলোক প্রাপ্তির পর, গ্রন্থখানা তদীয় সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজকুমার শ্রীলশ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ বাহাদুরের হস্তগত হয়। রাজমালার সম্পাদন কার্য্যোপলক্ষে তিনি তাহা রাজ-ভাণ্ডারে অর্পণ দ্বারা অসীম ঔদার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থের প্রারম্ভ পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি প্রথম লহরের পূর্ব্বভাষে সন্নিবেশিত হইয়াছে, এ স্থলে শেষ পৃষ্ঠার আলোক-চিত্র প্রদান করা হইল। এই পৃষ্ঠার বাম পার্শ্বে লিখিত আছে; —

রাজমালার পাণ্ডুলিপির অবস্থা

"শ্রীযুক্ত দুর্গামণি উজিরস্য পুস্তিকেয়ং।।১।।
সন ১২স ৫৬ ত্রিং তাং ৩০ আষাড়।"

স্বর্গীয় উজীর দুর্গামণি ঠাকুর সাহিত্যানুরাগী এবং সাহিত্যসেবী ছিলেন। রাজমালার শেষ দুইটী লহর তাঁহারই রচিত। কিন্তু তিনি একটী কার্য্যের দ্বারা গ্রন্থের গাম্ভীর্য্য কথঞ্চিৎ লঘু করিয়াছেন। রাজমালার সমগ্র অংশের উপর হস্তচালনা করায়, ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সমসাময়িক ভাবাপন্ন হইয়াছে। এই সংশোধন দ্বারা প্রাচীন ভাবের ব্যত্যয় না হইয়া থাকিলেও ভাষার কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এরূপ কার্য্যের দ্বারা যে প্রাচীন গ্রন্থের মৌলিকতা নষ্ট হয়, তাহা বোধ হয় তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই।

প্রাচীন ভাষা সম্বলিত একখানা পাণ্ডুলিপি রাজ-গ্রন্থাগারে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা নিতান্তই আধুনিক পতিলিপি। অতীব দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইল যে, ইহারও প্রাচীন পাণ্ডুলিপিখানা গৃহদাহে বিনষ্ট হইয়াছে। এই কারণে হস্তগত আধুনিক পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করা যাইতে পারে

প্রাচীন রাজমালার পাণ্ডুলিপি

না। এজন্যই পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় উক্ত পাণ্ডুলিপি পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের গৃহীত পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আধুনিক নকল হইলেও পুথিখানা উপেক্ষা করা যাইতে পারে না, বর্ত্তমান কালে ইহাই রাজমালার প্রাচীনত্বের একমাত্র নিদর্শন। সুযোগ ঘটিলে তাহা প্রচারের চেষ্টা করা হইবে।

পাণ্ডুলিপির বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধীয় কথা

যে পাঁচখানা পুথি লইয়া বর্ত্তমান সময়ে কার্য্য করা হইতেছে, তাহার একখানারও বর্ণশুদ্ধি নাই। নকলকারিগণ স্বীয় স্বীয় ইচ্ছা কিম্বা অভিজ্ঞতানুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের বর্ণবিন্যাস লিপি করিয়াছেন। একের সহিত অন্যের বর্ণ প্রয়োগের কোনরূপ সংশ্রব নাই। এরূপ ক্ষেত্রে সম্পাদকের পক্ষে কোন পুথির প্রণালী অবলম্বনীয়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিশেষতঃ এই সকল নকলকারীর মধ্যে কোন ব্যক্তিই বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে মূল পুথির অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় অশুদ্ধ বর্ণবিন্যাস মুদ্রিত করিয়া পাঠকবর্গের অযথা কষ্টোৎপাদন করিবার সার্থকতা নাই। সুতরাং গ্রন্থের ভাষা এবং পাঠ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অধিকাংশ স্থলেই বর্ণবিন্যাসের উপর হস্তক্ষেপ করা হইল। এবং যে সকল পাঠের ব্যতিক্রম দেখা দিয়াছে, পাদটীকায় তাহার পাঠান্তর প্রদান করা হইল। প্রথম লহরও এই প্রণালীতে সম্পাদিত হইয়াছে এবং অতঃপরও তাহাই করিতে হইবে। এই কার্য্য সঙ্গত না হইলেও পূর্ব্বোক্ত কারণে এ বিষয়ে গত্যন্তর দেখিতেছি না।

আর্য্য নিবাস সম্বন্ধীয় আলোচনা

রাজমালার মূলীভূত বিষয়ে --- যযাতি নন্দন দ্রুহ্যু এবং তাঁহার বংশধরগণের বিবরণ। দ্রুহ্য পিতাকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া, গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের সন্নিহিত প্রতিষ্ঠান নগর হইতে, সুন্দরবনের নিম্নভাগস্থ সগরদ্বীপে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্রিপুর ইতিহাসের ইহাই সার সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রদর্শন পক্ষে প্রথম লহরের পূর্ব্বভাষে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যগণের আদি বাস-ভূমি ভারতবর্ষ কি না, এই তর্কেরই আজ পর্য্যন্ত মীমাংসা হইতেছে না, এরূপ স্থলে আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া প্রশ্ন উত্থাপন কিম্বা মীমাংসার চেষ্টা করিতে যাইয়া ফললাভের আশা নিতান্তই বিরল। এতদ্বিষয়ক মতামত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমেই অনুকূল মতবাদী পাশ্চাত্য মনীষীবর্গের কথা মনে পড়ে; তন্মধ্যে আবার পৃথিবীর ইতিহাস-প্রণেতা 'সার ওয়াল্টার র‍্যালে' এর নাম সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ে উদিত হয়। তিনি সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় পৃথিবীর ইতিহাস প্রণয়ন দ্বারা বিপুল যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হইয়াছে --- ভারতবর্ষই মনুষ্যের আদি বাসস্থান।* কাউণ্ট জোরন্স্-জারোনা বলিয়াছেন --- আর্য্যাবর্ত্তই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের এবং হিন্দু সভ্যতার আদি স্থান; এখান হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সভ্যতালোক

* History of the world —— Sir Walter Raleigh.

বিকীর্ণ হইয়াছে। তাঁহার বাক্যের কিয়দংশ এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে ; —

"It is there (India) we must seek not only for the cradle of the Brahmin religion, but for the cradle of the high civilization of the Hindus, which gradually extended itself in the West to Ethiopia to Egypt, to Phoenicia; in the East, to Siam, to China and to Japan, in the South, to Ceylon, to Java and to Sumatra; in the North, to Persia, to Caldaea and to Colchis, whence it came to Greece and to Rome and at length to the remote abode of the Hyperboreans,"

Count Bjornstjerna, Theogony of the Hindus.

এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার* কর্জ্জন সাহেব, সার উইলিয়ম জোন্স, মুইর,† উইলসন; অধ্যাপক বোপ,‡ সার উইলিয়ম হাণ্টার, প্রফেসর হীরেন, সুবিজ্ঞ শ্লেজেল প্রভৃতি বহুসংখ্যক খ্যাতনামা পাশ্চাত্য মনীষী নানাভাবে ভারতের আদিমতা এবং প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

এতদ্বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীর সংখ্যাও বিস্তর আছে। তাঁহাদের মধ্যে এক পক্ষ বলেন — আর্য্যগণ মধ্য এসিয়ার কোনও প্রদেশ হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন। আর এক পক্ষের মতে — কাস্পীয়ান সাগরের উপকূলবর্ত্তী কোনও প্রদেশ আর্য্যগণের আদিম বাসভূমি। অপর এক পক্ষ বলিতেছেন — আর্য্যগণ উত্তর মেরু হইতে ভারতে সমাগত হইয়াছেন। কিন্তু কোন পক্ষই আর্য্য জাতির আদিম বাসস্থানের নাম নির্দ্দেশ, কিম্বা আপন আপন মতের পরিপোষক প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। ঋগ্বেদের সূক্তসমূহে যে-সকল নদ-নদী এবং জনপদের নাম পাওয়া যায়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়াই তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সূক্তগুলির যেরূপ অর্থ করেন, তাহা প্রাচীন বেদবেত্তাগণের মতবিরুদ্ধ। এ স্থলে একটী ঋকের উল্লেখ করা যাইতেছে। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম মণ্ডলে ৩০শ সূক্তের ৯ম ঋকে লিখিত আছে; —

"অনু প্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবি প্রতিং নরং।
যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে।।১।৩০।৯।।"

আধুনিক পণ্ডিত সমাজের মতে এই সূক্তের 'প্রত্নস্যৌকসো' বাক্যের দ্বারা আর্য্যগণের

---

* Science of Language — MaxMuller.

† "They could not have entered from the west, because it is clear that the people who lived in that direction were descended from these very Arians of India......... nor could the Arians had entered India from the north or north-west, because we have no proof from history or Philosophy that there existed any civilised nation with a language and religion resembling theirs which could have issued from either of those quarters at that early period and have created Indo-Arian civilisation." Muir's Sanskrit Texts.

‡ "Sanskrit is more perfect and copious than the Greek and Latin and more exquisite and eloquent than either." Prof. Bopp, Edinburgh Review.

বাসভূমিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সায়নাচার্য্য এই শব্দের অর্থ করিয়াছেন — 'স্বর্গ ভূমি'।

আর একটী সুপ্রচলিত ঋকের কথাও উল্লেখযোগ্য, ১ম মণ্ডল, ২২শ সূক্তের ১৮শ ঋকে পাওয়া যায়; —

"ত্রীণিপদা বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা
অদাভাঃ। অতো ধর্ম্মানি ধারয়ন্।।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই "ত্রিণীপদা বিচক্রমে" বাক্যের অর্থ করেন — "আর্য্যগণ ভারতে আগমন কালে পথিমধ্যে বিষ্ণুর আশ্রয়ে তিন স্থানে অবস্থান বা বিশ্রাম করিয়াছিলেন।" বেদের নিরুক্তকারগণ অর্থ করিয়াছেন অন্যরূপ। শাক-পুনি, ঊর্ণনাভ, প্রভৃতি বেদদর্শী মনীষিগণ 'ত্রিণীপদা' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা "পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে ও স্বর্গলোকে" বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সূর্য্যের উদয়কালে পূর্ব্বদিকে, মধ্যাহ্নকালে অন্তরীক্ষে, এবং অস্তকালে পশ্চিমদিকে বিষ্ণুর তিন পদ — "ত্রিণীপদা-বিচক্রমে" বাক্যদ্বারা এই অর্থ বুঝায়।

এতদুভয় অর্থের পার্থক্য বড় বেশী। আরও কোন কোন ঋকের ব্যাখ্যায় এত বৈষম্য ঘটিয়াছে যে, সেই সকলের পরস্পর আকাশ পাতাল প্রভেদ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এবম্বিধ পাশ্চাত্য ব্যাখ্যা মূলেই, আর্য্যগণ ভারতের বাহির হইতে এ দেশে আসিয়াছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইতেছে। বেদদর্শী মহাপুরুষ ব্যতীত এই বিরোধের সমাধান করা অন্যের পক্ষে সম্ভবপর নহে। আমাদের ন্যায় অক্ষম ব্যক্তি এই "ত্রিণীপদা বিচক্রমে" বিতর্কের ত্রি-সীমায় পাদবিক্ষেপ করিবারও অধিকারী নহে। তবে, এই প্রশ্ন স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয় যে, ঋগ্বেদের প্রথম হইতে ১০ম মণ্ডল পর্য্যন্ত অংশে এবং অন্যান্য মণ্ডলে যে-সকল নদ-নদী এবং জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহার কোনটী ভারতবর্ষে এবং কোনটী কাবুল দেশে অবস্থিত। অস্তিত্ব বিলোপ কিম্বা নাম পরিবর্ত্তন হওয়ায় বর্ত্তমান কালে অনেক নদ-নদীর পরিচয় পাওয়া অসম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বেদের কোন সূক্তেই আর্য্যগণের আদিবাসের স্থান নিঃসংশয়ে নির্ণয়োপযোগী বাক্য পাওয়া যায় না। তথাপি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের প্রাচীন ব্যাখ্যা উপেক্ষা করিয়া আর্য্যগণকে ভারতের বাহিরে ফেলিতে চাহেন কেন? বিশেষতঃ যেই বেদ-বাক্য অবলম্বনে তাঁহারা আর্য্য জাতিকে ভারতের ঔপনিবেশিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, সেই অপৌরুষেয় বেদ ভারতের বহির্ভূত কোন্ দেশের সম্পত্তি, তাহাই বা বলেন না কেন? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা যেরূপই হউক — আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী, কিম্বা উপনিবেশি যাহাই সিদ্ধান্ত হউক — চন্দ্রবংশীয় ভূপতিবৃন্দের প্রতিষ্ঠানের রাজপাট আদিম বা পরবর্ত্তীকালের প্রতিষ্ঠিত হউক — সম্রাট যযাতি যে সেই স্থান হইতেই পুত্রদিগকে নানাদিগ্দেশে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, পুরাণোক্ত এই বিবরণ অস্বীকার করিবার কোনও হেতু আছে বলিয়া মনে হয় না।

পুরাণসমূহ আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া পাশ্চাত্য সমাজ এতকাল উপেক্ষা করিতে ছিলেন, গবেষণার ফলে সেই উপেক্ষার ভাব ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পুরাণের অস্তিত্ব থাকা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। স্যার উইলিয়ম হাণ্টারও এই মতের পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু তাঁহার রচিত ভারত-ইতিহাসের পরবর্ত্তী সংস্করণে সেই মতের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখা গিয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী (১৯১৪ খৃঃ) সংস্করণে ভিন্‌সেন্ট্‌ স্মীথ্‌ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পুরাণসমূহ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইতেছিল। এই বাক্যদ্বারা পুরাণের বয়স খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হইতে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে উঠিয়াছে; এবং পূর্ব্ব ধারণা অপেক্ষা পুরাণের প্রাচীনত্ব প্রায় দেড় সহস্র বৎসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচনার ফলে উত্তরোত্তর পুরাণসমূহ আরও প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত হইবে, এরূপ আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। স্মীথ্‌ সাহেবের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল; —

পুরাণসমূহ আধুনিক গ্রন্থ নহে

"I may add that Purans in some shape were already authoritative in fourth Century B. C. The author of the Arthasastra ranks the Atharva-veda and Itihasha as the Fourth and Fifth Vedas (BK. I. Ch. 3.); and directs the King to spend his afternoons in the study of Itihasha which is defined as comprising six factors, namely, (1) Purana, (2) Itivritta (history), (3) Akhhyayika (tales), (4) Udaharona (illustrative stories), (5) Dharmasastra, and (6) Arthasastra (BK. I. Ch. 5)."

আর এক পক্ষের মতে ভারতবর্ষে চন্দ্র ও সূর্য্য বংশের যে-সকল অবস্থিতি স্থান পুরাণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের শেষ সংস্থান। সংস্কর্ত্তাগণের সে বিষয়ে ধারণার অভাব হেতু শেষ সংস্থানকেই আদি সংস্থান বলিয়া ধরিয়া লওয়ায়, আর্য্যদিগকে ভারতের আদিম অধিবাসী বলা হইয়াছে। দেশীয় সুধীবর্গের মধ্যেও এই মতের পক্ষপাতী পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে উদীয়মান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ মাননীয় C. V. Vaidya, M. A. L.L.B., মহাশয়ের বাক্য উত্থাপিত হইতে পারে। তিনি বলিতেছেন, —

"The last positions of the Solar and Lunar races, Viz, Ayodhya and Prayaga, were taken to be their first positions by these last editors of the Puranas, because they had no idea whatever of the real course of History Viz., that the Aryans spread from north-west to the south-east and south."

History of the Mediaeval Hindu India — P. 279.

ম্যাস্কমূলার, ত্রিকালদর্শী বেদবেত্তা ঋষিদিগকে বিশাল পৃথিবীর ভৌগোলিক তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এরূপ স্থলে পুরাণ সংস্কর্ত্তাগণের ধারণার প্রতি কটাক্ষ করা বিচিত্র কথা নহে। পার্জ্জিটার সাহেব, এলাহাবাদকে

চন্দ্রবংশীয়গণের প্রথম রাজপাট বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, তিনি পুরাণের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিয়াছেন বলিয়া বৈদ্য মহাশয় তাহা গ্রহণের অযোগ্য মনে করিয়াছেন।* পুরাণের এই উক্ত মানিতে হইলে বেদের সহিত বিরোধ ঘটে, ইহাই আধুনিক মত। কিন্তু কোথায় অসামাঞ্জস্য ঘটে, অনুমান ছাড়া প্রমাণের দ্বারা তাহা কেহ দর্শাইয়াছেন বলিয়া জানি না। বেদের যেরূপ অর্থমূলে আর্য্যগণের আদি অবস্থান নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরাণের সংস্কর্ত্তাগণের উপর দোষারোপ করিবার কালে, পুরাণের প্রকৃত বাক্য কি ছিল, এবং সংস্কর্ত্তাগণ তাহার কি পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন, তাহা প্রমাণদ্বারা দেখাইয়া দিলে বোধ হয় সাধারণের বিশেষ উপকারে আসিত। তাহা প্রদর্শিত না হওয়া পর্য্যন্ত পুরাণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা সকলের পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কারণ, পুরাণ সংস্কর্ত্তাগণকে যতই অনভিজ্ঞ বলা হউক না কেন, তাঁহারা জ্ঞানে না হইলেও অন্ততঃ বয়সে বর্ত্তমান কালের পণ্ডিত সমাজের জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং বর্ত্তমান কালের ন্যায় সে কালে শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ দুই চারি জনের মুঠের ভিতর ছিল না, অন্ততঃ ব্রাহ্মণ মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে তাহার আলোচনা করিতেন। বিশেষতঃ শাস্ত্রের বিকৃতি ঘটাইতে যাওয়া পাপকার্য্য বলিয়া তৎসময়ে সকলেরই বিশ্বাস ছিল। এরূপ অবস্থায় প্রকৃষ্ট যুক্তি প্রমাণ ব্যতীত পুরাণকে বিকৃত বলিয়া উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে কি না, তাহা বিশেষ বিবেচ্য। সচরাচরই দেখা যাইতেছে, যাঁহারা পুরাণের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন, প্রয়োজন স্থলে তাঁহারাও পুরাণের বচন আওড়াইয়া স্বীয় মত দৃঢ় করিতে সচেষ্ট। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, তাঁহারা কথায় যাহাই বলেন না কেন, কার্য্যকালে পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া পারেন না। প্রকৃতপক্ষে পুরাণ উপেক্ষার বস্তু নহে। নীতি-শাস্ত্রবেত্তা চাণক্য পণ্ডিত পুরাণকে চতুর্থ বেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এবং ইতিহাসের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে --- পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস নামে খ্যাত।

দ্রুহ্যুর উপনিবেশের স্থান নির্দ্দেশক পুনরালোচনা

নির্ব্বাসিত দ্রুহ্যু প্রথম কোথায় উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাও এক সমস্যার বিষয়। ত্রিপুর ইতিহাসের মতে দ্রুহ্যু সুন্দরবনের সন্নিহিত সগরদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সগরদ্বীপস্থিত দণ্ডিগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা, ত্রিপুরেশ্বরের স্থাপিত 'ত্রিপুরাসুন্দরী' বিগ্রহ, এবং সগরদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ইত্যাদি দ্বারা এ বিষয় বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।† ত্রিপুরেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত 'ত্রিপুরাসুন্দরী' মূর্ত্তি অদ্যাপি তথায় বিদ্যমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছেন। সুন্দরবনের ন্যায় উপর্য্যুপরি উত্থান-পতনশীল ভূ-ভাগে সুদূর অতীতের এতগুলি নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও তাহা উপেক্ষা করিয়া, কেহ বলিতেছেন — দ্রুহ্যু সন্তানগণ বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বাক্যের

* History of Mediaeval Hindu India — Vol. II, PP. 259 — 260.

† রাজমালা — প্রথম লহর, পূর্ব্বভাষ দ্রষ্টব্য।

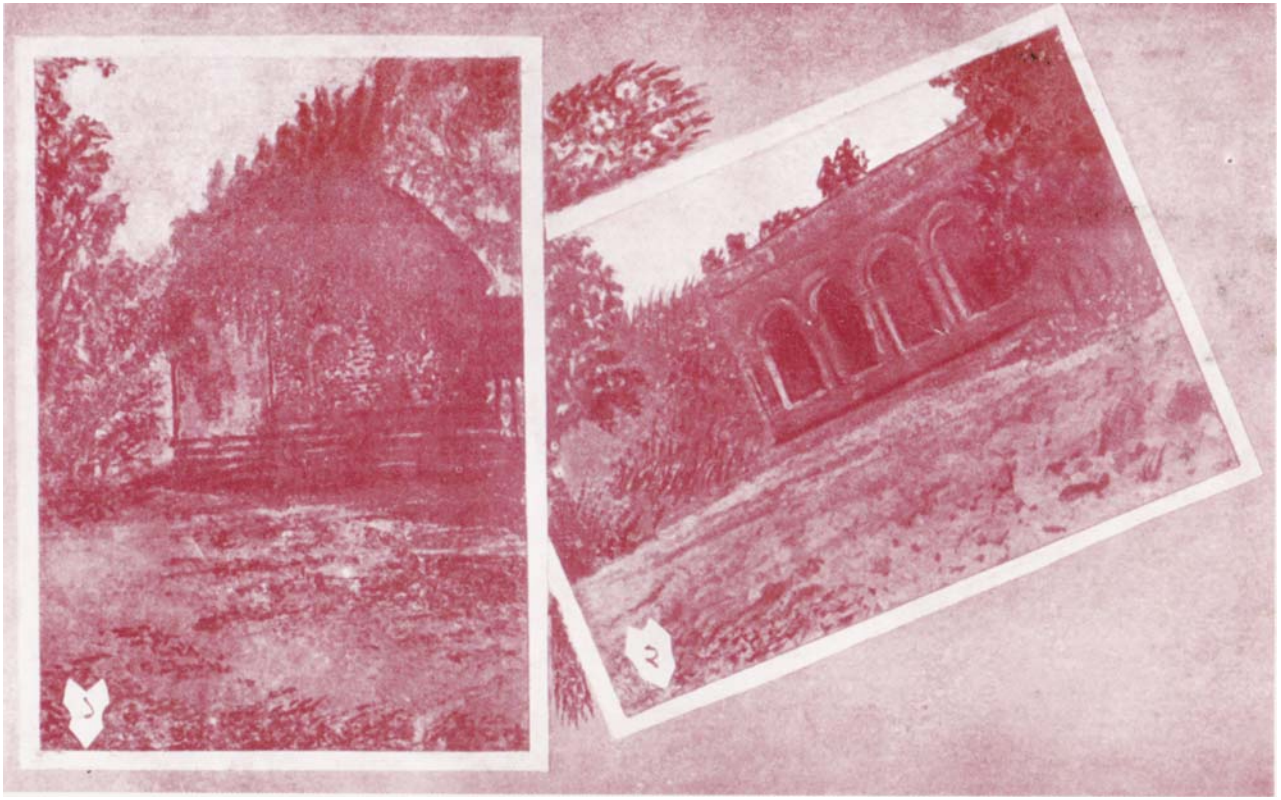

১। শ্রীশ্রীঅম্বু লিঙ্গের মন্দির - সুন্দরবন
২। শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির - সুন্দরবন

অযৌক্তিকতা প্রথম লহরে প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার কাহারও মতে আসাম প্রদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে দ্রুহ্যু-বংশীয়গণ উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই উক্তি সত্য হইলেও তাহা যে এই বংশের দ্বিতীয় উপনিবেশ, তাহাও প্রথম লহরের পূর্ব্বভাষে দর্শাইতে যথোচিত চেষ্টা করা হইয়াছে। তৎসমস্ত পুনরালোচনা করিতে যাইয়া কথা বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দ্রুহ্যু, এবং তদ্বংশ-জাত ত্রিপুরেশ্বরগণের সুন্দরবনে আধিপত্য লাভের আরও গুটি দুই আনুষঙ্গিক প্রমাণের বিষয় এস্থলে আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র বি-এ, মহাশয়, তাঁহার "যশোহর-খুলনার ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন; —

"১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশন হয়। উহাতে খুলনার রেণী সাহেবের মধ্যম পুত্র (H. J. Rainey) সুন্দরবন ও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তদনন্তর সভাপতি ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, রেভারেণ্ড লঙ্ (Rev. J. Long) সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন প্যারিস সহরে গিয়াছিলেন, তখন তথাকার বিখ্যাত রাজকীয় অনুসন্ধান-পরিষদের এক প্রধান পণ্ডিত তাঁহাকে ভারতবর্ষের একখানি পর্ত্তুগীজ মানচিত্র প্রদর্শন করেন। উহা তখন হইতে ২০০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ মোগল রাজত্বের মধ্য যুগে প্রস্তুত। ঐ মানচিত্রে সুন্দরবন সমুর্ব্বর দেশ ও তাহাতে পাঁচটী নগরী প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যারোস্ (De Barros) প্রণীত এসিয়ার ইতিবৃত্তে সংলগ্ন ম্যাপ এবং ড্যান্‌ডেন্ ব্রুকের ম্যাপ হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই সকল ম্যাপ হইতে জানা যায় যে, সুন্দরবনের সমুদ্র-কূলে প্যাকাকুলি (Pacaculi), কুইপিটাভাজ (Cuipitavaz), নলদী (Naldy), ডাপারা (Dapara), এবং টিপারিয়া (Tiparia) নামক পাঁচটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, তাহা এক্ষণে নাই।* যদিও ব্লকম্যান সাহেব এই সকল ম্যাপে কিছুই প্রতিপন্ন করে না বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন, তবুও আমরা তাঁহার পন্থানুসরণ করিতে সম্মত নহি। যাঁহারা মানচিত্র প্রস্তুত করেন, তাঁহারা কোন স্থানের নামের প্রকৃত উচ্চারণ ভুল করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কাল্পনিক কতকগুলি স্থান বসাইয়া দিতে পারেন, এরূপ বিশ্বাস করিতে পারি না।"

যশোহর-খুলনার ইতিহাস — ৮ম পরিঃ, ৮৩ পৃঃ।

সতীশবাবু অন্যত্র বলিয়াছেন ; —

"টিপারিয়া সহর ত্রিপুরার বিকৃত নাম বলিয়া বোধ হয়।"

যশোহর-খুলনার ইতিহাস — ৮ম পরিঃ, ৮৬ পৃঃ।

---

* পর্ত্তুগীজগণের মানচিত্র এবং সুন্দরবনে সমুদ্রের উপকূলস্থিত পাঁচটী বন্দরের বিবরণ লং সাহেব অন্যত্রও বলিয়াছেন, তাহা এই ; —

"I saw in the Bibliotheque Royale at Paris a Portuguese map of Bengal, drawn three centuries ago, which gave the name of five Cities to the East of Sagar Island on the borders of the Sea, the ruins in the Sundarbuns confirm the truth of the description."

J. A. S. B. Vol. XIX.

সতীশবাবুর এই উক্তি আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। ত্রিপুরেশ্বরের পূর্ব্বপুরুষগণের সুন্দরবন অঞ্চলে যখন আধিপত্য ছিল, তখন সেই প্রদেশে "ত্রিপুরা" নামক বন্দর স্থাপিত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে, এই নামের দ্বারা সুন্দরবনে ত্রিপুরার প্রাধান্য স্থাপনের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

১৯২৭ খৃঃ ১০ই এপ্রিল তারিখের 'Forward' পত্রিকায় হুগলীর প্রাচীন বিবরণ আলোচনা উপলক্ষে যে আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

"The high and broad embankment with shady trees on either side from Tribeni to Mahanad used now for cart traffic known as Jamai Jangal is another place of considerable interest. It is said to have been constructed by the Raja of Mahanad for the convenience of his son-in-law, the son of Tripura Raja of Tribeni.

Another legendary tale is attached to this embankment. It is said that the Raja got annoyed with his son-in-law and one day in a sudden gust of anger went so far as to behead him. However the councillors intervened and it was settled that the son-in-law would be allowed to go to Tribeni on horse-back and after a few minutes would be followed by the Raja with his swords unsheathed and if he succeeded in overtaking the Prince, he would instantly be killed, the young Princess would not allow her husband to go alone. She also mounted on the same horse with him. The horse started. It was a bid for life. It proceeded at full gallop for about 3 miles when if fainted and fell on the ground. The distant sound of the hoofs of Raja's horse became more and more distinct. He would overtake them in no time. Not a moment could be lost. It was a question of life and death. They ran fast for their lives, but the Princess unaccustomed to run became exhausted. The husband could not desert her at this crisis. In their distress they implored the Almighty Fathertp save them. Their earnest solicitations to Heaven did not go in vain. White foams of water were seen at a distance, on and on it approached and lo and behold! It rushed forth in tremendous violence and broke the embankment at their back. The Damodar was in floods. It had risen high and flooded the countryside. The Raja had to go back disappointed. By the mercy of Heaven, the princely couple was saved. The portion of embankment swept away by the floods is still visible. It lies in village Akna and is known since then as "Chinaa" or broken Akna as referred to in the Government Catalogue juse memtioned."

Paper on the researches into the antiquities of Hoogle District by Manindra Deb Rai read before the Hoogly District Historical Association reported in "Forward" April 10, 1927.

ইহার স্থূল মর্ম্ম এই ; — ত্রিবেণীর* ত্রিপুর রাজপুত্র হুগলীর মহানদের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ

---

* এই 'ত্রিবেণী' শব্দ দ্বারা ত্রিবেগের স্মৃতি স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হয়। (রাঃ সঃ)

করেন। জামাতার যাতায়াতের নিমিত্ত রাজা এক রাস্তা বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার নাম "জামাই জাঙ্গাল"। এই প্রশস্ত বর্ত্ম অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

একদা রাজা কোন কারণে জামাতার প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণ বিনাশে কৃতসংকল্প হন। পারিষদবর্গের অনুরোধে এরূপ নির্দ্ধারিত হইল যে, জামাতাকে আপন ভবনে যাইবার নিমিত্ত একটী অশ্ব প্রদান করা হইবে। জামাতা সেই অশ্বারোহণে শ্বশুরালয় হইতে বহির্গত হইবার পর, রাজা অন্য অশ্ব লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবেন, এবং পথিমধ্যে ধৃত হইলে তাঁহাকে বধ করিবেন।

রাজ-জামাতা শ্বশুরের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, অশ্বারোহণ করিলেন, রাজকুমারীও সেই অশ্ব পৃষ্ঠেই পতির সহগামিনী হইলেন। আরোহী আত্মজীবন রক্ষার নিমিত্ত অশ্বকে পূর্ণবেগে চালনা করায়, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পরেই অশ্বটী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তখন উপায়ান্তর অভাবে উভয়ে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু রাজকন্যা অধিক সময় দৌড়াইতে সমর্থা হইলেন না; অল্পকালের মধ্যেই তিনি অবসন্না হইয়া পড়িলেন। এই আসন্ন বিপদকালে পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জীবন রক্ষার নিমিত্ত রাজকুমার পলায়ন করিলেন না। অল্পকাল মধ্যেই পশ্চাদনুসরণকারী রাজার অশ্ব পদধ্বনি তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। তখন উভয়েই বুঝিলেন, ভবলীলা শেষ হইবার অধিক বিলম্ব নাই। নিরুপায় নব-দম্পতি ব্যাকুল প্রাণে ভগবানের পাদপদ্মে অন্তিম প্রার্থনা জানাইলেন।

এই সময় অকস্মাৎ দামোদরের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, বন্যার ভীষণ বেগে তাঁহাদের পশ্চাৎভাগস্থ পথ ধ্বসিয়া গেল, রাজার গতিরুদ্ধ হইল। এই ঘটনা হইতেই উক্ত ভগ্ন স্থানের নাম "ছিন্ন আক্না" হইয়াছে।

দামোদরের বন্যায় এখনও সময় সময় তৎতীরবাসীদিগকে বিপন্ন হইতে দেখা যায়, তথাপি এই আখ্যায়িকায় সন্নিবিষ্ট বন্যাকাহিনী অনেকে কাল্পনিক বলিয়া মনে করিতে পারেন, তাহা হইলেও উপাখ্যানের সমগ্র অংশকে উপেক্ষণীয় মনে করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। ইহা একটী প্রবাদ বাক্য। সকল প্রবাদ বাক্য বা কিম্বদন্তীর মূলেই অল্পাধিক পরিমাণে সত্য নিহিত আছে। কিম্বদন্তী হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ হইয়া থাকে।* প্রাচীন কালে, বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্মৃতিরক্ষাকল্পে তদবলম্বনে আখ্যায়িকা, গীতি, গাথা, কিম্বা পাঁচালী রচনা করিবার পদ্ধতি ছিল। তৎসমস্তের মধ্যে যে-সকল অলৌকিক এবং কাল্পনিক কথা জড়িত আছে তাহা বাদ দিয়া ঐতিহাসিক সত্য গ্রহণ করিতে হয়।

* কিম্বদন্তীকে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণও সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে চতুর্ব্বিধ উপাদান হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করা যাইতে পারে; — (১) কিম্বদন্তী, (২) বৈদেশিক ভ্রমণকারী ও ঐতিহাসিক প্রদত্ত প্রসঙ্গ, (৩) প্রাচীন স্থাপত্যাদি হইতে সংগৃহীত বিবরণ, (৪) ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ প্রাচীন সাহিত্য। এই চতুর্ব্বিধ উপাদানের মধ্যে কিম্বদন্তী সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট্ স্মিথ্ বলিয়াছেন; —

"The sources of, or original authorities for the early history of India may be arranged in four classes. The first of these is tradition, chiefly as recorded in native literature."

আমাদের দেশের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে সর্ব্বদাই দেখা যাইবে, অনেক অদ্ভুত উপাখ্যানের সহিত প্রকৃত ঘটনা জড়িত রহিয়াছে। চাঁদ কবি এবং চারণ বা ভট্টগণের রচিত গাথা হইতে রাজপুতনার ইতিহাস উদ্ধার হইয়াছে, একথা কাহারও অবিদিত নহে। কেবল আমাদের দেশের নহে — অন্যান্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অবস্থাও তদ্রূপ। রোমের প্রাচীন ইতিবৃত্তে অদ্ভুত আখ্যায়িকার অভাব নাই, ইউরোপের ইতিহাসে অনেক অলৌকিক কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু এই কারণে তৎসমস্ত উপেক্ষিত হয় নাই; তাহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক সত্য নিষ্কাসিত হইতেছে। সুতরাং উদ্ধৃত উপাখ্যানটী কিয়ৎপরিমাণে কল্পনা বিজড়িত বলিয়া মনে করিলেও অমূলক বলিয়া উপেক্ষা করিবার কারণ নাই। বিশেষতঃ ইহার সহিত ইতিহাসের স্পষ্ট সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইতেছে। এই আখ্যায়িকা আলোচনায় পাওয়া যায় ; —

(১) ত্রিপুর রাজপুত্র ত্রিবেণীতে ছিলেন, এবং তিনি হুগলীর মহানদের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন।

(২) রাজ-জামাতার গমনাগমনের নিমিত্ত রাজা যে রাস্তা বাঁধাইয়াছিলেন, তাহার নাম “জামাই জাঙ্গাল”; সেই রাস্তা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

(৩) ত্রিপুর রাজকুমার শ্বশুরালয় হইতে অশ্বারোহণে পলায়ন করিয়াছিলেন।

প্রথম কথার সহিত ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত মিলাইলে দেখা যাইবে, দ্রুহ্যু পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সুন্দরবনে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার নাম ছিল “ত্রিবেগ”।* ত্রিবেগ এবং ত্রিবেণী একার্থ বোধক এবং অভিন্ন বলিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। বিশেষতঃ, সুন্দরবনের সন্নিহিত হুগলী জেলায় অদ্যাপি ত্রিবেণী নামক গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। পূর্ব্বে এই স্থান একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহা গঙ্গাতীরে, ২২°৫৮´১০´´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৮°২৬´৪০´´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখানে যমুনা ও সরস্বতী নদী গঙ্গার সহিত বিযুক্ত হওয়ায়, স্থানের নাম ‘ত্রিবেণী’ হইয়াছে।

---

* “ততোবাচ প্রসন্নাস্য কপিলস্তং নৃপাত্মজম্।
মদ্বরেণ চ ভোগেন ক্ষয়মেনো গমিষ্যতি।।
যযাতেঃ শাপতো মুক্তিলপ্স্যন্তে তব বংশজাঃ।
এতদ্বচো নিশম্যাসৌ হৃষ্টচিত্তস্ততোঽভবৎ।।
স্থাপয়ামাস তত্রৈব ত্রিবেগ নগরীং শুভাম্।
প্রভাববানভুত্তত্র রাজ শব্দ তিরোহিতঃ।।
স দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপেন বহুদেশান্ বশেনয়ন্।
পালায়ামাস ধর্ম্মেণ প্রজা আত্ম প্রজাইব।।
যদ যদধিকৃতং রাজ্যং ত্রিবেগপতিনা নৃপ।
তত্ত্বৎ সর্ব্বং তদারভ্য ত্রিবেগ খ্যাতিমাগতম্।।”
রাজরত্নাকর — ৬ষ্ঠ সর্গ, ১৯-২৩ শ্লোক।

প্রয়াগে উক্ত নদীত্রয় সংযোজিত হওয়ায় তাহাকে ‘যুক্তবেণী’ বলা হয়, এই স্থানে নদীত্রয় বিভিন্ন পথ অবলম্বন করায়, ইহা ‘মুক্তবেণী’ নামে অভিহিত হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বে পাওয়া যায়; —

“প্রদ্যুম্ননগরাদ্ ঘাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণ প্রয়াগস্তু গঙ্গাতা যমুনা গতা।
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষ্যতে।”

মর্ম্ম ঃ— “প্রদ্যুম্ন নগরের (পাণ্ডুয়ার) দক্ষিণ ও সরস্বতী নদীর উত্তরে, দক্ষিণ প্রয়াগ। এই স্থানে গঙ্গা হইতে যমুনা চলিয়া গিয়াছেন। এখানে স্নান করিলে প্রয়াগে স্নানের ন্যায় অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।”

“দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্ত গ্রামাখ্যা দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণীতি খ্যাত।”

মর্ম্ম ঃ— উন্মুক্ত বেণী দক্ষিণ প্রয়াগ, সপ্ত গ্রামের নিকট দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণী নামে খ্যাত।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, এই স্থান কেবল ‘ত্রিবেণী’ নামে অবিহিত নহে ; — পরন্তু তীর্থ-গৌরবে ইহাকে ‘দক্ষিণ প্রয়াগ’ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। প্রাচীন কবিগণের বর্ণনায়ও এই স্থানের তীর্থজনিত সম্মান পরিলক্ষিত হয়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বলিয়াছেন ; —

“বাম দিকে হালি সহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রিদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।।
লক্ষ লক্ষ লোক এক কালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান।।
গর্ভে বসি শিব পূজা করে কোন জন।
রজতের সিপে কেহ করয় তর্পণ।।
শ্রাদ্ধ করে কোন জন জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কোন জন দেয় ধূপ দীপে।।”

— কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

কবিকঙ্কণ এই ত্রিবেণীকে “তীর্থের চূড়ামণি” বলিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও এই স্থানের তীর্থজনিত সম্মান যথেষ্ট আছে, বারুণী ও মকর-সংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে তিন দিবস ব্যাপী মেলা বসে, এবং বহু যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে। সূর্য্য এবং চন্দ্রগ্রহণ কালে এই স্নানদানাদি করা বিশেষ পুণ্যজনক বলিয়া এখনও লোকে বিশ্বাস করে।

ত্রিবেণীর তীর্থ-গৌরব অপেক্ষা সমৃদ্ধি গৌরবও কম ছিল না। এখানে একটী প্রধান

বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। প্রাচীন কালের ধনপতি সদাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বণিকগণ এই স্থান হইতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতেন। কবিকঙ্কণের কাব্যে পাওয়া যায় ; —

"ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।
আশ্রম করিয়া তথি স্নান করে ধনপতি
তরী পূরে নানা ধন কিনি।।"

— কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

ত্রিবেণী বন্দর গ্রীকদিগের পরিচিত ছিল। প্লিনির লেখায় পাওয়া যায়, দক্ষিণে গোদাবরী মোহনা হইতে পাটনাযাত্রী জাহাজসমূহ ত্রিবেণী হইয়া যাইত। টলেমীও ত্রিবেণীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। এখানে মৃত্তিকা খননকালে নৌকার ভগ্নাংশ, মাস্তুল এবং অট্টালিকার চিহ্নাদি এখনও পাওয়া যায়, এ সমস্ত ত্রিবেণীর অতীত সমৃদ্ধির ক্ষীণ নিদর্শন মাত্র।

বিদ্যা বিভবেও ত্রিবেণী কোন প্রদেশ অপেক্ষা হীন ছিল না। প্রাচীন কালে নদীয়া রাজ্যে চারিটী বিদ্যাকেন্দ্র ছিল — নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, গুপ্তিপাড়া ও ত্রিবেণী। এককালে ত্রিবেণীতে ত্রিশটী সংস্কৃত টোল প্রতিষ্ঠিত ছিল। সার উইলিয়ম জোন্সের সংস্কৃত শিক্ষক, দেশবিখ্যাত পণ্ডিত স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের জন্মভূমি ও বাসস্থান বলিয়া বর্ত্তমান কালে ত্রিবেণী গ্রাম বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই ত্রিবেণীর তুলনায় সুবর্ণগ্রামের কিম্বা আসামের ত্রিবেণী উল্লেখযোগ্যই নহে। 'ত্রিবেণী' হইতেই যদি ত্রিবেগ রাজ্যের নামোৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে এই ত্রিবেণীকে লক্ষ্য করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

উদ্ধৃত আখ্যায়িকা-বর্ণিত ত্রিপুর রাজকুমার কোন্ রাজার পুত্র এবং কোন্ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে 'ত্রিবেণীর ত্রিপুর রাজকুমার' শব্দদ্বারা ইহা বুঝা যায়, যে কালে সুন্দরবন ও ত্রিপুরা উভয় রাজ্য ত্রিপুরেশ্বরগণের করতলস্থ ছিল ইহা তৎকালের ঘটনা।

দ্বিতীয় বিষয়ের আলোচনায় বুঝা যায়, "জামাই জাঙ্গালের" অস্তিত্ব অদ্যাপি বিদ্যমান থাকায় আখ্যায়িকার বিবরণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। বিশেষতঃ হুগলীর মহানদ হইতে ত্রিবেণী বা ত্রিবেগ পর্য্যন্ত জামাতার গমনাগমনের নিমিত্ত রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায় উক্ত উভয় স্থান অদূরবর্ত্তী ছিল বলিয়াই প্রতীতি হয়। তৎকালে বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামের ত্রিবেগে, কিম্বা সুদূর পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত নওগাঁ জেলার নিকটবর্ত্তী কপিলা নদীর তীরস্থিত ত্রিবেগে ত্রিপুরার রাজপাট প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, "জামাই জাঙ্গাল" নির্ম্মাণ করা অসম্ভব হইত। এতদ্দ্বারাও সুন্দরবনের ত্রিবেগে রাজধানী থাকাই সম্ভবপর এবং সঙ্গত নির্দ্ধারণ বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয় বিষয়টী ত্রিপুর ইতিহাসের অধিকতর অনুকূল। ত্রিপুরার রাজপুত্রকে হুগলীর মহানদ হইতে স্বীয় আবাসভূমি ত্রিবেণীতে যাইবার নিমিত্ত অশ্ব প্রদান করা হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে, উক্ত উভয় স্থানের মধ্যে অশ্বারোহণে যাতায়াতের সুগম পথ ছিল। পূর্ব্বোক্ত ‘‘জামাই জাঙ্গাল’ দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। তৎকালে ত্রিপুরার রাজধানী যদি সুবর্ণগ্রামে কিম্বা আসামে থাকিত, তবে নিশ্চয়ই জামাতাকে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া পলায়ন করিবার নিমিত্ত অশ্ব প্রদান করা হইত না; এরূপ স্থলে জল-যানের ব্যবস্থা করাই সম্ভব হইত। এতদ্দ্বারাও তৎকালে ত্রিপুরার রাজধানী সুন্দরবনে থাকাই প্রমাণিত হইতেছে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যযাতি নন্দন দ্রুহ্যুর সগরদ্বীপে ও সুন্দরবনে আধিপত্য বিস্তারকালে রাজ্যের ‘ত্রিবেগ’ নামকরণ হইয়াছিল — ‘ত্রিপুরা’ নাম ছিল না। উদ্ধৃত আখ্যায়িকায় ‘ত্রিবেগের ত্রিপুর রাজপুত্র’ বাক্য পাওয়া যাইতেছে। তৎসময় যদি সুন্দরবনেই রাজধানী থাকিবে, তবে ‘ত্রিপুর রাজপুত্র’ বলা হইল কেন? এবং এই ‘ত্রিপুর’ শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা কি?

এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, সুন্দরবনস্থিত ত্রিবেগে দ্রুহ্যুবংশীয়গণের আধিপত্য থাকাকালেই ত্রিপুরার সহিত তাঁহাদের সংশ্রব ঘটিয়াছিল। ত্রিবেগপতি প্রতর্দ্দন কিরাত দেশ জয় করিয় ত্রিপুরার আধিপত্য লাভ করেন। তদবধি মহারাজ মিত্রারি পর্য্যন্ত পাঁচজন রাজা সুন্দরবন ও ত্রিপুরা, উভয় প্রদেশ শাসন করিয়াছেন। সেই সময় তাঁহারা কখনও সুন্দরবনে এবং কখনও ব্রহ্মপুত্র তীরবর্ত্তী রাজপাটে অবস্থান করিতেন। কিরাত-বিজয়ী প্রতর্দ্দনের পৌত্র কলিন্দ কর্ত্তৃক সুন্দরবনে প্রতিষ্ঠিত ‘ত্রিপুরা সুন্দরী’ বিগ্রহ ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। রাজমালা প্রথম লহরের পূর্ব্বভাষে এ বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। দ্রুহ্যুবংশীয়গণ ত্রিপুরা ও সুন্দরবন উভয় প্রদেশে প্রভাবান্বিত থাকাকালে আখ্যায়িকা বর্ণিত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সম্যক অবস্থা আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এবং এই কারণেই ‘ত্রিপুর রাজপুত্র’ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

বংশ বিবরণ

প্রাচীন বংশবল্লী সংগ্রহ করিবার বিবিধ অন্তরায়

প্রাচীন বংশবল্লী আলোচনা করা এক দুরূহ ব্যাপার। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে ভারতীয় রাজন্যবর্গের পূর্ণ বংশ-লতা পাওয়া যায় না। বংশের মধ্যে যাঁহারা বিমল কীর্ত্তিশালী, ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রকৃতিপুঞ্জের হিতকামী ছিলেন, শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহাদেরই নাম এবং কীর্ত্তিগাথা পাওয়া যায় সাধারণ ব্যক্তিগণের প্রতি শাস্ত্রকারগণের দৃষ্টি পতিত হয় নাই। যাঁহারা মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্থানভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা কীর্ত্তিমণ্ডিত হইলেও পৌরাণিক গ্রন্থে সকলের নাম গৃহীত হয় নাই। আবার এমন এক সময় গিয়াছে, যে কালে আদর্শ চরিত্র-কাহিনী কাল পরম্পরা কণ্ঠস্থ রাখা হইত। তৎকালে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের নাম তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা স্মরণীয় হইত, বংশের অকৃতী সন্তানদিগকে অল্পকালের মধ্যেই লোকে ভুলিয়া যাইত। এই সকল কারণে অনেক স্থলে বংশাবলীর ক্রমভঙ্গ হইয়াছে; বর্ত্তমান কালে আর তাহা উদ্ধার সাধনের উপায় নাই। সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি যুগের যে-সকল বিবরণ শাস্ত্রকারগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা চিরদিনের তরে বিস্মৃতির কুক্ষিগত হইয়াছে।

আমাদের উদ্দিষ্ট চন্দ্রবংশের বিবরণ আলোচনা করিতে গেলে দেখা যাইবে, এখানেও পুরাণ গ্রন্থসমূহের পরস্পর বৈষম্য রহিয়াছে। মহাভারতে ইলার পুত্র পুরূরবা হইতে পর্য্যায়ক্রমে চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু চন্দ্রের সহিত ইলা বা পুরূরবার কি সম্বন্ধ, তদ্বিষয়ে কোন কথা পাওয়া যায় না। হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের বর্ণনায় ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র, চন্দ্রের আত্মজ বুধ, এবং বুধের তনয় পুরূরবা ইত্যাদি নামসহ ধারাবাহিকভাবে বংশবল্লী পাওয়া যায়। পুরূরবা হইতে যযাতি পর্য্যন্ত বংশ-ধারার মধ্যে কোন কোন পুরাণে নামের পার্থক্য ঘটিবার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এবম্বিধ অনৈক্যের হেতু নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। তবে, লিপিকার প্রমাদ যে ইহার একটী কারণ, তাহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে — গান্ধারের পুত্রের নাম কোন গ্রন্থে 'ধর্ম্ম' এবং কোন গ্রন্থে 'ঘর্ম্ম' লিখা হইয়াছে। ধর্ম্ম বা ঘর্ম্মের পুত্রের নাম কেহ বলেন 'ধৃত' কেহ বলেন 'ঘৃত'। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, লেখকগণ 'ধ' বর্ণকে 'ঘ' অথবা 'ঘ' বর্ণকে 'ধ' লিখিয়া এই ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইবে। কেবল নামের বৈকল্য ঘটিয়াছে এমন নহে, কোন কোন স্থলে পুরুষ সংখ্যারও বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে একবার দেওয়া হইয়াছে, এ স্থলে আর একটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন কোন পুরাণের মতে দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু, বভ্রুর আত্মজ সেতু। আবার কোন কোন পুরাণে দ্রুহ্যুর পুত্র সেতু লিখিত হইয়াছে,

বভ্রুর নামোল্লেখ নাই। এবম্বিধ পার্থক্যও অনেক আছে। বিশেষতঃ দ্রুহ্যুর অধস্তন ৮ম স্থানীয় প্রচেতার নাম পর্য্যন্ত শাস্ত্র আলোচনায় পাওয়া যায়। প্রচেতার পুত্রসংখ্যা একশত ছিল, তাঁহাদের নাম বা বংশ বিবরণ কোন গ্রন্থেই নাই। সূর্য্যবংশের অবস্থাও চন্দ্রবংশেরই অনুরূপ। এই সকল কারণে শাস্ত্রগ্রন্থের সাহায্যে প্রাচীন বংশধারা বিশুদ্ধভাবে উদ্ধার করা দুষ্কর বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন বংশবল্লী স্মৃতির উপর নির্ভর করিত, পূর্ব্বোক্তরূপ বৈষম্য লক্ষিত হইবার ইহাও অন্যতর কারণ। যাহা হউক, এবম্বিধ সামান্য অনৈক্যের দরুণ স্মরণাতীত কাল হইতে রক্ষিত প্রাচীন বংশ-পত্রিকাসমূহ উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না; সুবিজ্ঞ পার্জ্জিটার সাহেব ভারতীয় প্রাচীন বংশাবলী সম্বন্ধে গভীর গবেষণাদ্বারা ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।*

বংশলতা সংগ্রহের প্রাচীন সূত্র

পুরাণের সাহায্য ব্যতীত সুদূর অতীতের বংশলতা সংগ্রহ করা অসম্ভব হইলেও অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালের বিবরণ দুষ্পাপ্য নহে। আমাদের দেশের চিরাচরিত একটি প্রাচীন প্রথা এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্যকারী হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষদিগের মহিমা কীর্ত্তন এবং তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী সংরক্ষণ পক্ষে ভারতবাসিগণ চির অভ্যস্ত। কুলাচার্য্য ও ভট্টগণের রচিত কুল-পঞ্জিকায়, কবি এবং চারণদিগের গানে ও গাথায়, বিখ্যাত কুলসমূহের বিবরণ কালপরম্পরা রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে, প্রতিদিন সায়াহ্নে বালকদিগকে পূর্ব্বপুরুষের গৌরব-কাহিনী শুনালে এবং ধারাবাহিকভাবে তাঁহাদের নাম কণ্ঠস্থ করানো প্রত্যেক অভিভাবকের কর্ত্তব্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। মুখে মুখে বংশপর্য্যায় রক্ষার পক্ষে এই প্রথা বিশেষ সহায়ক ছিল।

ত্রিপুর রাজ-বংশাবলী বিষয়ক কথা

ত্রিপুর রাজবংশাবলী আলোচনা করাই এ স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীনকালে এই পরিবারের বংশ বিবরণ রক্ষার ভার, চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক দণ্ডি-সমাজের হস্তে ছিল, পরে সভাসদ্ পণ্ডিতগণের উপর সেই ভার অর্পিত হয়। দণ্ডিগণ পুরুষানুক্রমে বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজন্যবর্গের বিবরণ রক্ষা করিতেন; এই কারণেই চন্তাইর মুখ নিঃসৃত বিবরণ লইয়া রাজমালা রচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতে এরূপ সুব্যবস্থা থাকায়, রাজপরিবারের বংশ-পত্রিকা নির্ভরযোগ্য মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু পৌরাণিক অংশ অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন বলিয়া, তাহার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই।

প্রাচীনকালের বংশকাহিনী

সে কালের লোক দীর্ঘজীবী ছিল, অনেকে সহস্র সহস্র বৎসর জীবিত থাকিবার কথা শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচনায় পাওয়া যায়। এরূপ সুদীর্ঘ জীবনলাভের যৌক্তিকতা দর্শাইবার পক্ষে প্রথম লহরে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। তখন সন্তান উৎপাদনও বর্ত্তমান কালের ন্যায় অল্প বয়সে হইত না; পুরুষের বাল্যবিবাহ প্রচলিত না থাকাই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কন্যাগণের বাল্যবিবাহও সকল সময় প্রচলিত

* Journal of the Royal Asiatic Society — January, 1910

ছিল না। এবম্বিধ নানা কারণে পুরাকালের সুদীর্ঘ সময়ের তুলনায় অনেক বংশের পুরুষসংখ্যা কম লক্ষিত হইয়া থাকে। মহারাজ ত্রিলোচনের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিপুর রাজবংশের অবস্থাও তদ্রূপ। আবার পূর্ব্বোক্ত কারণে অনেক বংশের পুরুষসংখ্যা বাদ পড়িবার সম্ভাবনাই অধিক। মাননীয় F. F. Pargiter, M.A., মহোদয় "Ancient Indian Genealogies and Chronology" শীর্ষক প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ মূল্যবান এবং এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।* এরূপ স্থলে ত্রিপুর রাজবংশের পৌরাণিককালের বংশ-পত্রিকার শুদ্ধাশুদ্ধ নির্দ্ধারণ পক্ষে দৃঢ়তার সহিত মত প্রদান করা অসম্ভব বলিয়া মনে করি।

ত্রিপুর-বংশাবলী সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের মত

পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী প্রাচীনকাল হইতে ইঁহাদের বংশ-পত্রিকা ক্রমান্বয়ে সযত্নে রক্ষিত হইবার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও কালপ্রভাবে তাহা আলোচনার বিষয়ীভূত হইতেছে। ত্রিপুর বংশাবলী সম্বন্ধীয় কৈলাসবাবুর মত — বৌদ্ধবিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণের কৃপায় এই বংশ ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। ইহা কর্ণেল ডেল্টন্ সাহেবের রচিত, বঙ্গদেশের 'ডিস্ক্রিব্টিব্ এমনলজি' গ্রন্থোক্ত বাক্যের প্রতিধ্বনি। এতদ্দ্বারা পৌরাণিক যুগের সহিত এই বংশের ধারা বিচ্ছিন্ন হইতেছে। এই মতের অযৌক্তিকতার বিষয় প্রথম লহরেই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।†

বিশ্বকোষ সম্পাদক মহাশয়ের মতও তৎকালে আংশিকভাবে আলোচিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার মতের অন্ত নাই। এ স্থলে তাহার কিয়দংশ প্রদান করা যাইতেছে ; —

"রাজমালায় ত্রিপুরাধিপতি ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। মহাভারতে কিন্তু ইঁহার নামোল্লেখ নাই, তবে রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমকর্ত্তৃক পূর্ব্বদেশ জয়কালে সাত জন কিরাত নৃপতির পরাজয় বিবরণ আছে, আর ঘোষযাত্রার পর কর্ণকর্ত্তৃক পূর্ব্বদিক জয়কালে ত্রিপুরা রাজ্যের জয় বিবরণ লিখিত আছে। ভারত-যুদ্ধে কোন পক্ষেই বোধ হয় ত্রিপুরাধিপতি উপস্থিত ছিলেন না, আর রাজসূয় যজ্ঞকালে উপস্থিত রাজন্যবর্গের মধ্যেও তাঁহার নাম দেখা যায় না; কিন্তু ত্রিলোচন ও যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণ করিয়া দেখিলে উভয়কে সমসাময়িক বলিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না। ত্রিলোচনের বংশাবলী রাজমালায় যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ত্রিপুরার বর্ত্তমান রাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র পর্য্যন্ত ত্রিলোচন হইতে ১০৯ পুরুষ হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে ১০৯ পুরুষে ৩৬০০ বৎসর হয়। এবং প্রতি তিন পুরুষে শতাব্দী গণনায় অর্থাৎ প্রতি শতাব্দীতে ৩ পুরুষ ধরিলে প্রতি পুরুষে ৩৩ বৎসর হইয়া প্রতি শতাব্দীতে যে এক বৎসর অবশিষ্ট থাকে, ৩৬০০ বৎসরে সেই হিসাবে আর ৩৬ বৎসর পাওয়া যায়। এই ৩৬ বৎসর ও ১০৯ পুরুষে যে ৩৬০০ বৎসর হইয়াছে তারা একুনে ৩৬৩৬ বৎসর হইতেছে। সুতরাং রাজমালার বংশাবলী অনুসারে ত্রিলোচন, ব্রজেন্দ্রচন্দ্র হইতে ৩৬৩৬ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজের পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের ১২৭৭ বঙ্গাব্দে ৩৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, তখন তৎপুত্র

---

* Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, — January, 1910

† রাজমালা — প্রথম লহর, ৩।/০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র অতি শিশু। এখন যদি যুধিষ্ঠির কলিযুগের প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তিনি ব্রজেন্দ্র হইতে ৪৯৬৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে হইবে। কারণ, ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর বৎসরে কলিযুগের ৪৯৬৯ বৎসর গত হইয়াছে। এই হিসাবে যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনে ১৩৩৩ বৎসরের পার্থক্য দাঁড়াইতেছে।”

বিশ্বকোষ — ৮ম ভাগ, ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা।

বহু অঙ্কপাত করিয়া, সূক্ষ্ম হিসাবানুসারে যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনের মধ্যে ১৩৩৩ বৎসর অন্তর নির্ণয় করিবার পরক্ষণেই বলা হইয়াছে ; —

“মহাভারতের বনপর্ব্বে যখন ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়, তখন অনুমান করিতে হইবে যে, ত্রিলোচনের পিতা ত্রিপুর যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ববর্ত্তী না হউন তাঁহার সমসাময়িক বটে। সভাপর্ব্বে, ভীমের দিগ্বিজয়ে যখন ত্রিপুরা নাম নাই, কিতার নামই আছে, তখন ইহাও বুঝিতে হইবে যে, রাজসূয় যজ্ঞকালে ত্রিপুর বর্ত্তমান থাকিলেও তখনও রাজ্যের নাম পরিবর্ত্তন করেন নাই। ইহাও সম্ভব। কারণ, রাজসূয় যজ্ঞের পর দুর্য্যোধন দ্যুতক্রীণায় পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বৎসর বন প্রেরণ করেন। এই বনবাসের শেষ অবস্থায় ঘোষযাত্রা ঘটে। তৎপরে কর্ণকর্ত্তৃক ত্রিপুরা বিজিত হয়, সুতরাং ভীম কর্ত্তৃক কিরাত রাজ্য জয়ের দ্বাদশ বৎসর পরে কর্ণকর্ত্তৃক ত্রিপুরা নামে কিরাত রাজ্য জয় করা কিছু অসম্ভব নহে। এই ঘটনা হইতে অনায়াসে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। *** “দ্রুহ্যু হইতে দ্বাবিংশ নৃপতির পর ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন” এই প্রবাদে বিশ্বাস করিলে দেখা যায় যে, যযাতির তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্যুর অধস্তন ৩৩শ পুরুষে ত্রিপুর, আর যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর ৩৮শ পুরুষে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান, [মহাভারত আদিপর্ব্বের সম্ভব পর্ব্বান্তর্গত ৯৫ অধ্যায়ে বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক শেষ বিস্তৃত বংশ তালিকা দেখ।] পৌরাণিক বিবরণে ৪।৫ পুরুষের অন্তর (১৫০।১৭৫ বৎসরের পার্থক্য হইলেও) ধর্ত্তব্য নহে। অতএব রাজমালার মতে ত্রিলোচনকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করা অপেক্ষা মহাভারত মতে ত্রিপুরকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক স্বীকার করাই সঙ্গত।”

বিশ্বকোষ — ৮ম ভাগ, ২০০ পৃষ্ঠা।

ইহার পরে আবার বলা হইয়াছে ; —

“এ স্থলে বলা উচিত, ঐ সকল ঘটনা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উহা পৌরাণিক আখ্যায়িকাস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।”

বিশ্বকোষে বিবৃত বিবরণের আলোচনা

এখন প্রশ্ন — ইঁহার কোন্ কথা গ্রহণীয়? নগেন্দ্রবাবু তাঁহার শেষ উদ্ধৃত উক্তিকে পৌরাণিক আখ্যায়িকা গণ্যে, ঐতিহাসিক মর্য্যাদা প্রদান করিতে অসম্মত। সুতরাং তাঁহার হিসাবে ত্রিলোচন ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যে যে ১৩৩৩ বৎসর পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে, প্রকারান্তরে তাহাই তিনি সঙ্গত নির্দ্দেশ মনে করেন। তিনি হিসাব ধরিবার কালে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের ন্যায় প্রখ্যাতনামা রাজার নামোল্লেখ করিয়াও তাঁহাকে ছাড়িয়া, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্রকে গ্রহণ করিবার কি হেতু আছে বুঝা গেল না। যাহা হউক, এই হিসাবে যে তিনি মূলেই বিষম ভুল

করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার হিসাবে ত্রিলোচন হইতে ব্রজেন্দ্রচন্দ্রকে ১০৯ পুরুষ অন্তর ধরা হইয়াছে; এতৎসহ সংযোজিত রাজ-বংশবল্লী আলোচনায় জানা যাইবে, কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্র মহারাজ ত্রিলোচনের অধস্তন ১৩৫ স্থানীয়। সুতরাং এখানে পুরুষ সংখ্যায় ভুল অঙ্ক ধরা হইয়াছে। আবার, মহারাজ ঈশানচন্দ্রমাণিক্যের পরলোক গমনের যে সময় (১২৭৭ বঙ্গাব্দ) ধরিয়া, যুধিষ্ঠির ও কুমার ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের মধ্যে ৪৯৬৯ বৎসর অন্তর নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাও ভ্রমসঙ্কুল। মহারাজ ঈশানচন্দ্র ১২৭২ ত্রিপুরাব্দের (১২৬৯ বঙ্গাব্দ) ১৭ই শ্রাবণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় গোলোক-প্রাপ্ত হইয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর এবম্বিধ প্রমাদপূর্ণ হিসাব অবলম্বন করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে।

ভারত-সম্রাট যুধিষ্ঠির এবং ত্রিপুরেশ্বর ত্রিলোচন যে সমসাময়িক, এ বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না। ইঁহারা উভয়েই কলির প্রারম্ভকালের রাজা, ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।* এখন (১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ বা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের শেষভাগে) কলির ৫০২৮ বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে। সুতরাং মহারাজ ত্রিলোচনকে যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক নির্ণয় করিতে হইলে বর্ত্তমান সময়ে তাঁহার প্রাচীনত্ব ৫০২৮ বৎসর ধরা আবশ্যক। ত্রিপুর বংশাবলীর পুরুষ সংখ্যার সহিত এই প্রাচীনত্বের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, যুধিষ্ঠির ও ত্রিলোচনের সমসাময়িকতার কথা অসম্ভব বা কাল্পনিক নহে। ত্রিপুর-সিংহাসনের বর্ত্তমান অধিষ্ঠাতা পঞ্চশ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর, মহারাজ ত্রিলোচনের অধস্তন ১৩৮ স্থানীয়।† সাধারণতঃ বংশ-পর্য্যায়ের হিসাবে তিন পুরুষে এক শতাব্দী গণ্য করিয়া, সেই অনুপাতে প্রতি পুরুষে গড়ে ৩৩ বৎসর ধরা হয়। ত্রিলোচনের প্রাচীনত্ব ৫০২৮ বৎসরের সহিত রাজবংশীয় ১৩৮ পুরুষের গড়পড়তা হিসাব ধরিলে দেখা যাইবে, প্রতি পুরুষে (৫০২৮ ÷ ১৩৮ = ৩৬.৪) ছত্রিশ বৎসরেরও কিছু অধিক সময় নির্দ্ধারিত হয়। কোন কোন স্থলে এই বংশে পুরুষ পরম্পরাক্রম ভঙ্গ করিয়া, রাজার ভ্রাতা কিম্বা নিকট সম্পর্কিত অন্য ব্যক্তিও রাজত্ব করিয়াছেন, প্রতি পুরুষের বয়স ৩৩ বৎসর স্থলে ৩৬ বৎসর দাঁড়াইবার ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। এরূপ অবস্থায় — "ত্রিলোচন ও যুধিষ্ঠিরের সময় নিরূপণ করিয়া দেখিলে উভয়কে সমসাময়িক বলিয়া কিছুতেই বুঝা যায় না" এই মন্তব্য গ্রাহ্য হইতে পারে কি?

মহাভারতে একমাত্র ঘোষযাত্রার বর্ণনায় ত্রিপুরার নাম পাওয়া যায়, প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। রাজসূয় যজ্ঞে কিরাত নরপতিগণের মধ্যে ত্রিপুরেশ্বর ছিলেন, এবং ভারত যুদ্ধে ত্রিপুরাপতি কোন পক্ষই অবলম্বন করেন নাই, ইহাও তিনি অনুমান করেন। মহাভারত নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিলে পূর্ব্বোক্ত তিন ব্যাপারেই ত্রিপুরেশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধ হইবে। এ বিষয় প্রথম লহরে আলোচিত হইয়া থাকিলেও এস্থলে মহাভারতের

* রাজমালা প্রথম লহরে এ বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে (১৬১ — ১৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

† পশ্চাৎভাগে সন্নিবিষ্ট বংশ-পত্রিকা আলোচনায় জানা যাইবে, শ্রীশ্রীচন্দ্রমা দেব হইতে মহারাজ ত্রিলোচন ৪৭ ও বর্ত্তমান মহারাজ ১৮৪ স্থানীয়। সুতরাং এতদুভয়ের মধ্যে ১৩৮ পুরুষ অন্তর সাব্যস্ত হইতেছে।

শ্লোকগুলি পুনর্ব্বার প্রদান করা যাইতেছে। ঘোষযাত্রা উপলক্ষে কর্ণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরা বিজয় সম্বন্ধে মহাভারতে পাওয়া যায় ; —

"বৎসভূমিং বিনির্জিত্য কেরলাং মৃত্তিকাবতীম্।
মোহনং পত্তনং চৈব ত্রিপুরীং কোশলাং তথা।।"

মহাভারত — কর্ণপর্ব্ব, ২৫৩ অঃ, ১০ শ্লোক।

ভারত-যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর, তদানীন্তন ভারত-সম্রাট দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভীষ্মকর্ত্তৃক রচিত ব্যূহমধ্যে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে ; —

"দ্রোণাদনন্তরং যত্তো ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
মগধৈশ্চ কলিঙ্গৈশ্চ বিশাম্পতে।।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাদনুনৃপঃ কৌশল্যোহথ বৃহদ্বলঃ।
মেকলৈঃ কুরুবিন্দৈশ্চ ত্রৈপুরৈশ্চ সমন্বিতঃ।।"

ভীষ্মপর্ব্ব — ৮৭ অঃ, ৮-৯ শ্লোক।

রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিপুরেশ্বরের উপস্থিতি বিবরণ ত্রিপুরায় প্রখ্যাত প্রবাদ বাক্যের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। এই সময় সম্রাট যুধিষ্ঠির ত্রিপুরেশ্বরকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, এবং সম্রাটের অনুজ্ঞামতে তদবধি ত্রিপুরেশ্বরগণ তাঁহাদের সম্পাদিত সনন্দ ইত্যাদিতে "রাজধানী হস্তিনাপুর" লিপি করিয়া থাকেন, এই সকল প্রবাদ বাক্য অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। কেবল প্রবাদ বাক্যে নহে — ত্রিপুরার ইতিহাসেও তাহাই পাওয়া যায়। সংস্কৃত রাজমালায়, মহারাজ ত্রিপুরের বিবরণে উক্ত হইয়াছে; —

"যুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞার্থে সহদেবেন নির্জিতঃ।
রাজসূয়ে স গতবান যুধিষ্ঠির সমাদৃতঃ।।"

ত্রিলোচনের হস্তিনা গমনের কথাও রাজমালায় বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতোক্ত রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনায় 'ত্রিপুরা' নাম থাকিতে পারে না; কারণ, তৎকালে রাজ্যের নাম ছিল 'কিরাত' বা 'ত্রিবেগ'। ইহার কিয়ৎকাল পরে 'ত্রিপুরা' নাম হইয়াছে। ঘোষযাত্রার পূর্ব্বেই যে রাজ্যের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, মহাভারত রাজমালা এবং রাজরত্নাকর আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যায়। তৎকালে রাজপাট ছিল ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী কপিলি নদীর সন্নিহিত স্থানে। মহাভারতের রাজসূয়যজ্ঞ বর্ণনোপলক্ষে লিখিত হইয়াছে; —

"যে পরার্দ্ধে হিমবতঃ সূর্য্যোদয় গিরৌনৃপাঃ।
কারূষে চ সমুদ্রান্তে লৌহিত্যমভিতশ্চ যে।।

ফলমূলাশনা যে চ কিরাতাশ্চর্ম্ম বাসসঃ।

ক্রুর শস্ত্রাঃ ক্রূরকৃতস্তাংশ্চ পশ্যাম্যহং প্রভো।।” ইত্যাদি।

সভাপর্ব্ব — ৫২ অঃ, ৮-৯ শ্লোক।

এ স্থলে ব্রহ্মপুত্রনদের উভয় তীরবর্ত্তী সমস্ত রাজন্যবর্গের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। অতএব উক্ত নদের উপকূলবর্ত্তী ত্রিবেগপতিও (ত্রিপুরেশ্বর) ইহার অন্তর্নির্বিষ্ট হইয়াছেন, এ কথা অতি সহজবোধ্য। বিশেষতঃ ত্রিপুরাধিপতির অধীনস্থ কিরাতগণের উপস্থিতিদ্বারাও তাঁহার বিদ্যমানতা প্রমাণিত হইতেছে। যে স্থান ত্রিপুরেশ্বর উপস্থিত নাই, সেই স্থানে তাঁহার অধীনস্থ কিরাতগণের উপস্থিতি সম্ভব হইতে পারে না।

ত্রিপুর-বংশাবলীর প্রতি আরোপিত দোষ ও তাহার খণ্ডন।

ত্রিপুর-বংশাবলী প্রক্ষিপ্ত দোষ-দুষ্ট বলিয়াও কেহ কেহ ইঙ্গিত করিতে ছাড়েন নাই। ঁকৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন; —

“মহারাজ রামগঙ্গামাণিক্যের কৃত (১৮০৪ খৃষ্টাব্দের) বংশাবলীতে দ্রুহ্যের পুত্র ত্রিপুর লিখিত হইয়াছে। চক্রধ্বজ ঠাকুর বনামে বীরচন্দ্র যুবরাজ, ১৮৬৩ ইং ৯নং এবং রাজকুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেববর্ম্মণ বনামে মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর ১৮৭৪ ইং ৩৫নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমায়, বিবাদী মহারাজ বাহাদুর স্ববংশের যে সুদীর্ঘ বংশাবলী উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতেও ‘ত্রিপুর পেছরে দ্রুহ্য’ লিখিত রহিয়াছে; কিন্তু জলতরঙ্গের কৃপায় রাজবংশের যে অভিনব বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দ্রুহ্য ও ত্রিপুরের মধ্যে কতগুলি কাল্পনিক নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। একেই আমাদের প্রাচীন ইতিহাস কল্পনাজালে জড়িত, তাহার উপর আবার এরূপ ঘৃণিত কার্য্য নিতান্তই বিস্ময়জনক।”

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২ ভাঃ, ২ অঃ, ১৫ পৃঃ।

মোকর্দ্দমায় যেসকল বংশ-পত্রিকা উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য আপন আপন স্বত্ব স্থাপন করা। ত্রিপুর হইতে বংশধারা দর্শাইলেই সেই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তীগণের নামাবলী প্রদান করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই ঐ সকল বংশলতায় তাহা সংযোজিত হয় নাই। তবে, ত্রিপুর রাজপরিবার যে দ্রুহ্যবংশীয়, তাহা দর্শাইবার নিমিত্তই ত্রিপুরের নামের পূর্ব্বে দ্রুহ্যর নামটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা “দ্রুহ্যর পুত্র ত্রিপুর” বলা হইয়াছে, এরূপ ধারণা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝানো আবশ্যক। কৈলাসবাবুর রাজমালার যে পৃষ্ঠায় পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যাবলী মুদ্রিত হইয়াছে, সেই পৃষ্ঠার পাদটীকায় সংক্ষিপ্তরাজমালা হইতে তিনিই উদ্ধৃত করিয়াছেন ; —

“যযাতি রাজার পুত্র দ্রুহ্য নাম যার।

তান বংশে দৈত্য রাজা চন্দ্রবংস সার।।

তাহান তনয় রাজা ত্রিপুর নাম ধর্ম্মে।”

রাজমালায় এইরূপ ভাবাপন্ন উক্তি আরও পাওয়া যায়, তাহার একটী এই ; —

"দ্রুহ্যুবংশে দৈত্য রাজা কিরাতনগর।
অনেক সহস্র বর্ষ হইল অমর।।
বহুকাল পরে তার পুত্র উপজিল।
ত্রিবেগেতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল।।"

প্রথম লহর — দৈত্য খণ্ড।

এই সকল বাক্যদ্বারা পরিষ্কার জানা যাইতেছে, দ্রুহ্যুর বংশে দৈত্যরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ত্রিপুর তাঁহার পুত্র। সুতরাং ত্রিপুর যে দ্রুহ্যুর পুত্র নহেন এবং দ্রুহ্যু ও ত্রিপুরের মধ্যে যে আরও বংশধর ছিলেন, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় কি? কৈলাসবাবু এই সকল বাক্য জানিয়া এবং নিজে উদ্ধৃত করিয়াও কেন যে উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা বুঝা দুষ্কর। আমরা দেখিতেছি, পূর্ব্বোক্তরূপ সংক্ষিপ্তভাবে বংশ বর্ণন করা ত্রিপুরার প্রাচীন প্রথা। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত সংস্কৃত রাজমালায় পাওয়া যায় ; —

"দ্রুহ্যুরাজ সুতোজাতস্ত্রিপুরাখ্যো মহাবলঃ।
তমোগুণ সমাযুক্ত সর্ব্ব দৈবাতি গর্ব্বিতঃ।।"

এ স্থলে ত্রিপুরকে দ্রুহ্যুর সুত বলা হইয়াছে। এই 'সুত' শব্দের দ্বারা পুত্র না বুঝাইয়া বংশধর বুঝানো হইয়াছে। মোকর্দ্দমায় উপস্থিত করা পূর্ব্বোক্ত বংশ-পত্রিকা ইহারই অনুসৃতিতে প্রস্তুত বলিয়া মনে হয়। রাজরত্নাকরে বর্ণিত বংশানুক্রম এবং আমাদের পূর্ব্বকথিত সময়ের সহিত পুরুষ সংখ্যার হার আলোচনা করিলে বংশপত্রের প্রতি কোন ক্রমেই 'প্রক্ষিপ্ত' দোষারোপ করা যাইতে পারে না।

আর একটী বিষয়ও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে, তাঁহার বিরুদ্ধে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী একটী সামাজিক দল গঠিত হইয়াছিল। সেই দলের প্রকাশিত "সাময়িক সমালোচনা" নামক পুস্তিকার এক স্থলে লিখিত হইয়াছে ; —

"মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পূর্ব্বে রাজা মুচুং, মাচুং, খাহাম, দানকুরু ফা, কালাতর ফা, প্রভৃতি ত্রিপুরার রাজগণের নাম শুনিলেও পার্ব্বতীয় বলিয়া মনে হয়।"

যাঁহারা সম্যক অবস্থা পরিজ্ঞাত নহেন এবং উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া, রাজ-পরিবারকে গ্লানি-লিপ্ত করাই যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহাদের এরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে। রাজমালা প্রথম লহরের পূর্ব্বভাষে দেখানো হইয়াছে, ত্রিপুরায় বর্ত্তমান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব্বে তদ্দেশে হালাম জাতির প্রাধান্য ছিল; এই কারণে ত্রিপুর-দরবারে হালাম ভাষার অনেক শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ স্থানীয় রীতিনীতি সর্ব্বত্রই সমাজ বা বংশবিশেষের প্রতি প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এই প্রভাব অধিবাসীবৃন্দের নাম এবং উপাধির উপরও সংক্রামিত হয়। ত্রিপুর-বংশাবলী নিবিষ্ট চিত্তে

আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ইহার প্রথম ও শেষভাগে (রাজবংশ সুন্দরবনে বঙ্গের সংশ্রবে থাকাকালে এবং কিরাতদেশে আগমনের পর, বঙ্গদেশের সহিত পুনঃ ঘনিষ্ঠতা জন্মিবার সময় হইতে) সকলেরই আর্য্য-সমাজ-সম্মত নাম পাওয়া যায়। মধ্যভাগে (বঙ্গের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন থাকা কালে) আর্য্য নামের সহিত এক একটী পার্ব্বত্য ভাষা-জাত উপনাম সংযোজিত হইয়াছিল; যথা — হরিহর — (মুচং ফা), চন্দ্রশেখর — (মাইচোঙ্গ ফা) ইত্যাদি। ইহা স্থানীয় প্রভাবজনিত ফল।* ইহাতে দোষের কি আছে? বরং এতদ্দ্বারা বংশ-পত্রিকার অকৃত্রিমতাই প্রমাণিত হইতেছে। বংশাবলীর মৌলিকতার উপর হস্তক্ষেপ করা হইলে, তাহাতে উল্লিখিত পার্ব্বত্য নামগুলির গন্ধও পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

ত্রিপুর রাজবংশের অতীত যেমন গৌরবান্বিত, তেমনি উজ্জ্বলতর ছিল। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজকুলের ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা বর্ত্তমান কালে অসম্ভব হইয়াছে, কিন্তু ত্রিপুর ইতিহাসের ধারা কোন কালেই বিচ্ছিন্ন কিম্বা অদ্যাপি বিনষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ মহাভারতের সময় হইতে একই বংশের হস্তে অক্ষুণ্ণ ভাবে রাজ্যের আধিপত্য থাকিবার নিদর্শন স্থলে একমাত্র ত্রিপুরার নামই উল্লেখ করা যাইতে পারে; এরূপ প্রাচীন রাজবংশ দ্বিতীয়টির অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। মহর্ষি কপিল স্বয়ং শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া যে বংশকে ধন্য করিয়াছেন — সংগরদ্বীপস্থ দণ্ডি-সমাজ যে বংশের পৌরোহিত্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন — প্রাচীন কাল হইতে সেই সকল মহাপুরুষের দ্বারা এবং পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণগমের দ্বারা যে বংশের বিবরণ ধারাবাহিক ভাবে সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সেই বংশের বংশ-পত্রিকার উপর কটাক্ষ করা অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির কার্য্য বলা যাইতে পারে না। অতীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বিস্মৃত হইয়া, আমরা ভবিষ্যৎকে দিন দিন উচ্ছৃঙ্খল এবং হেয় করিয়া তুলিতেছি। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হইলে, ভবিষ্যতের গঠন কার্য্য কিছুতেই সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না।

এ বিষয় লইয়া আর কথা বাড়াইব না। ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দের নামের ধারাবাহিক এক তালিকা প্রথম লহরে প্রদান করা হইয়াছে। এবার তাঁহাদের শাখাপ্রশাখার বিবরণসহ একটি পূর্ণ বংশ-পত্রিকা দেওয়া গেল। রাজমালায় সন্নিবেশিত নামাবলী, প্রাচীনকাল হইতে রক্ষিত বংশ-পত্রিকা, স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের প্রচারিত শ্রীমদ্ভাগবত, স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়েক সংগৃহীত রাজমালা, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয়ের রচিত শ্রীহট্টের ইতিহাস ও বিশ্বকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবেশিত বংশাবলী, রাজসরকার সংসৃষ্ট মোকর্দ্দমাসমূহে উপস্থিত করা বংশলতা বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচনা করা হইয়াছে; এবং স্বয়ং অনুসন্ধান দ্বারা বিবরণ সংগ্রহপূর্ব্বক বংশ-পত্রিকা পূর্ণ ও বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত পক্ষে যত্নের ক্রটী ঘটে নাই। এই কার্য্যে বিস্তর কষ্ট স্বীকার এবং সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে। কিন্তু বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের শাখাপ্রশাখার বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে নাই। বর্ত্তমানকালে তাহার উদ্ধারসাধন নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে। সংগৃহীত অংশও পূর্ণ বা নির্ভুল হইয়াছে, এমন কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে না।

---

* রাজমালা — প্রথম লহর, ২।/০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ত্রিপুর-বংশাবলী

(নামের বামপার্শ্বের অঙ্ক রাজগণের ক্রমিক সংখ্যা জ্ঞাপক)

১। চন্দ্র
↓
২। বুধ
↓
৩। পুরূরবা *
↓
৪। আয়ু
↓
৫। নহুষ
↓
৬। যযাতি
↓
৭। দ্রুহ্যু †
↓
৮। বভ্রু
↓
৯। সেতু
↓
১০। আনর্ত্ত (আরব্ধ বা আরদ্বান)
↓
১১। গান্ধার
↓
১২। ধর্ম্ম (ঘর্ম্ম)
↓
১৩। ধৃত (ঘৃত)
↓
১৪। দুর্ম্মদ
↓
১৫। প্রচেতা
↓
১৬। পরাচি (শত ধর্ম্ম)
↓
১৭। পরাবসু

১৭
↓
১৮। পারিষদ
↓
১৯। অরিজিৎ
↓
২০। সুজিৎ (অসুজিৎ)
↓
২১। পুরূরবা (২য়)
↓
২২। বিবর্ণ
↓
২৩। পুরু সেন
↓
২৪। মেঘ বর্ণ
↓
২৫। বিকর্ণ
↓
২৬। বসুমান
↓
২৭। কীর্ত্তি
↓
২৮। কণীয়ান
↓
২৯। প্রতিশ্রবা
↓
৩০। প্রতিষ্ঠ
↓
৩১। শত্রুজিৎ (শত্রুজিৎ)
↓
৩২। প্রতর্দ্দন ‡
↓
৩৩। প্রমথ

---

* ইনি পিতা কর্ত্তৃক প্রয়াগের পরপারস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরে প্রতিষ্ঠিত হন। এই স্থান বর্ত্তমান কালে ‘ঝুসী’ নামে পরিচিতি।

† ইনি পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও নির্ব্বাসিত হইয়া, পৈতৃক রাজধানী প্রতিষ্ঠান নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গার সাগরসঙ্গম স্থলে, সগরদ্বীপস্থিত কপিলাশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ ও তৎপ্রদেশে রাজ্য বিস্তার করেন।

‡ ইনি সগরদ্বীপের রাজপাট হইতে কাছাড়ে যাইয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নব-রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। ইঁহার প্রযত্নেই কিরাতদিগকে জয় করিয়া বর্ত্তমান ত্রিপুর রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে।

৩৩
↓
৩৪। কলিন্দ
↓
৩৫। ক্রম (ক্রথ)
↓
৩৬। মিত্রারি
↓
৩৭। বারিবর্হ
↓
৩৮। কার্ম্মুক
↓
৩৯। কলিঙ্গ (কালাঙ্গ)
↓
৪০। ভীষণ
↓
৪১। ভানুমিত্র
↓
৪২। চিত্রসেন (অঘ চিত্রসেন)
↓
৪৩। চিত্ররথ
↓
৪৪। চিত্রায়ুধ
↓
৪৫। দৈত্য
↓
৪৬। ত্রিপুর *

৪৮
↓
৪৯। তয়দাক্ষিণ (তৈদাক্ষিণ)
↓
৫০। সুদাক্ষিণ
↓
৫১। তরদাক্ষিণ
↓
৫২। ধর্ম্মতরু (ধর্ম্মতর)
↓
৫৩। ধর্ম্মপাল
↓
৫৪। সধর্ম্মা (সুধর্ম্ম)
↓
৫৫। তরবঙ্গ
↓
৫৬। দেবাঙ্গ
↓
৫৭। নরাঙ্গিত
↓
৫৮। ধর্ম্মাঙ্গদ
↓
৫৯। রুক্মাঙ্গদ
↓
৬০। সোমাঙ্গদ (সোনাঙ্গদ)
↓
৬১। নৌযুগরায় (নৌগযোগ)

৪৬।
↓
৪৭। ত্রিলোচন†
↓

দৃক্পতি বা বীরসেন (কাছাড়ের রাজা) | ৪৮। দাক্ষিণ | দক্ষ | দ্রুমায়ু | দ্রবীণ | দৃষ্টঘ্নো | ভৃগু

৪৭
↓

দুর্দ্ধর | দ্রুহ | দুষ্মায়ু | দৈবিরি | দম্পা

---

* ইঁহার সময় হইতে ত্রিপুর রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে; এবং ইনিই রাজ্যের 'ত্রিপুরা' নামের প্রবর্ত্তক।

† ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দৃক্পতি কাছাড়ে মাতামহের রাজ্যলাভ করায়, দ্বিতীয় পুত্র দাক্ষিণ ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন।

৬১
↓
৬২। তরজুঙ্গ
↓
৬৩। রাজধর্ম্মা (তররাজ)
↓
৬৪। হামরাজ
↓
৬৫। বীররাজ
↓
৬৬। শ্রীরাজ
↓
৬৭। শ্রীমান (শ্রীমন্ত)
↓
৬৮। লক্ষ্মীতরু
↓
৬৯। রূপবান্ (তরলক্ষ্মী)
↓
৭০। লক্ষ্মীবান্ (মাইলক্ষ্মী)
↓
৭১। নাগেশ্বর
↓
৭২। যোগেশ্বর
↓
৭৩। নীলধ্বজ (ঈশ্বর ফা) *
↓
৭৪। বসুরাজ (রঙ্গখাই)
↓
৭৫। ধনরাজ ফা
↓
৭৬। হরিহর (মুচং ফা) †
↓
৭৭। চন্দ্রশেখর (মাইচোঙ্গ ফা)
↓
৭৮। চন্দ্ররাজ (তাভুরাজ বা তরুরাজ)

৭৮
↓
৭৯। ত্রিপলি (তরফণাই)
↓
৮০। সুমন্ত
↓
৮১। রূপাবন্ত (শ্রেষ্ঠ)
↓
৮২। তরহোম (তরহাম)
↓
৮৩। হরিরাজ (খা হাম)
↓
৮৪। কাশীরাজ (কতর ফা)
↓
৮৫। মাধব (কালাতর ফা)
↓
৮৬। চন্দ্ররাজ (চন্দ্র ফা)
↓
৮৭। গজেশ্বর
↓
৮৮। বীররাজ (২য়)
↓
৮৯। নাগেশ্বর (নাগপতি)
↓
৯০। শিখিরাজ (শিক্ষরাজ)
↓
৯১। দেবরাজ
↓
৯২। ধূসরাঙ্গ (দুরাশা বা ধরাঈশ্বর)
↓
৯৩। বারকীর্ত্তি (বীররাজ বা বিরাজ)
↓
৯৪। সাগর ফা
↓
৯৫। মলয়চন্দ্র
↓
৯৬। সূর্য্যনারায়ণ (সূর্য্যরায়)
↓

৯৭। ইন্দ্রকীর্ত্তি (আচঙ্গ ফণাই বা উত্তঙ্গ ফণী)

৯৮। বীরসিংহ (চরাচর)
↓
৯৯। সুরেন্দ্র (হাচুং ফা বা আচং ফা)

---

* ইঁহার সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ 'ফা' উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন।

† এই সময় হইতে রাজগণের মধ্যে অনেকে হালাম ভাষাজাত এক একটি নাম গ্রহণ করিতেন। বর্ত্তমান রাজবংশের আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব্বে ত্রিপুরায় হালাম জাতির প্রভুত্ব ছিল; রাজন্যবর্গের হালাম ভাষার নাম গ্রহণ করিবার এবং বিষয় বিশেষে হালাম ভাষা প্রচলিত থাকিবার ইহাই কারণ।

৯৯
↓
১০০। বিমার
↓
১০১। কুমার
↓
১০২। সুকুমার
↓
১০৩। বীরচন্দ্র (তৈছরাও বা তক্ষরাও)
↓
১০৪। রাজ্যেশ্বর (রাজেশ্বর)

১০৫। নাগেশ্বর (ক্রোধেশ্বর বা মিছলিরাজ)

১০৬। তৈছংফা (তেজং ফা)
↓
১০৭। নরেন্দ্র
↓
১০৮। ইন্দ্রকীর্ত্তি
↓
১০৯। বিমান (পাইমারাজ)
↓
১১০। যশোরাজ
↓
১১১। বঙ্গ (নবাঙ্গ)
↓
১১২। গঙ্গারায় (রাজগঙ্গা)
↓
১১৩। চিত্রসেন (শুক্ররায় বা ছাক্রুরায়)
↓
১১৪। প্রতীত
↓
১১৫। মারিচি (মিছলি, মালছি বা মরুসোম)
↓
১১৬। গগন (কাকুথ)
↓
১১৭। কীর্ত্তি (নওরাজ বা নবরায়)
↓
১১৮। হিমতি (যুঝারু ফা বা হামতার ফা)
↓
১১৯। রাজেন্দ্র (জঙ্গি ফা বা জনক ফা)
↓
১২০। পার্থ (দেবরাজ বা দেবরায়)
↓
১২১। সেবরায় (শিবরায়)
↓
১২২। কিরীট (আদিধর্ম্ম ফা, ডুঙ্গুর ফা, দানকুরু ফা বা হরিরায়)*

---

* ইঁহার সম্পাদিত তাম্রশাসনে “ধর্ম্ম পা” লিখিত হইয়াছে।

১২২
↓
১২৩। রামচন্দ্র (খারুং ফা বা কুরুঙ্গু ফা)
↓

- ১২৪। নৃসিংহ (ছেংফণাই বা সিংহ ফণী)
- ১২৫। ললিত রায়
  ↓
  ১২৬। মুকুন্দ ফা (কুন্দ ফা)
  ↓
  ১২৭। কমল রায়
  ↓
  ১২৮। কৃষ্ণদাস
  ↓
  ১২৯। যশোরাজ (যশ ফা)
  ↓
  - ১৩০। উদ্ধব (মোচং ফা)
  - ১৩১। সাধু রায়
    ↓
    ১৩২। প্রতাপ রায়
    ↓
    ১৩৩। বিষ্ণুপ্রসাদ
    ↓
    ১৩৪। বাণেশ্বর (বাণীশ্বর)
    ↓
    ১৩৫। বীরবাহু
    ↓
    ১৩৬। সম্রাট
    ↓
    ১৩৭। চম্পকেশ্বর (চাম্পা)
    ↓
    ১৩৮। মেঘরাজ (মেঘ)
    ↓
    ১৩৯। ধর্ম্মধর (ছেংকাছাগ্)

১৩৯

১৪০। কীর্ত্তিধর (ছেংথুম ফা বা সিংহতুঙ্গ ফা)

১৪১। রাজসূর্য্য (আচং ফা বা কুঞ্জহোম ফা)

১৪২। মোহন (খিচুং ফা)

১৪৩। হরিরায় (ডাঙ্গর ফা)

১৪৪। রাজা ফা

১৪৫। রত্ন ফা (রত্নমাণিক্য)*

১৪৬। প্রতাপমাণিক্য

১৪৭। মুকুটমাণিক্য (মুকুন্দ)

১৪৮। মহামাণিক্য

১৪৯। ধর্ম্মমাণিক্য (২য়)

গগন ফা

কুচ ফা (পুরন্দর)

১৬২। কল্যাণমাণিক্য

১৫০। প্রতাপমাণিক্য

১৫১। ধন্যমাণিক্য

১৫২। ধ্বজমাণিক্য

১৫৩। দেবমাণিক্য

১৫৪। ইন্দ্রমাণিক্য

১৫৫। বিজয়মাণিক্য

১৫৯। অমরমাণিক্য (রামদাস)

ডুঙ্গুর

১৫৬। অনন্তমাণিক্য

১৫৭। উদয়মাণিক্য †

১৫৮। জয়মাণিক্য † (লোকতর ফা)

১৬০। রাজধরমাণিক্য

১৬১। যশোধরমাণিক্য

---

* এই সময় হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ 'মাণিক্য' উপাধি ধারণ করিতেছেন। ইঁহার পরবর্ত্তী কালে রাজকুমারগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির 'ফা' উপাধি পাওয়া যায়।

† ১৫৭ ও ১৫৮ সংখ্যক রাজা ভিন্ন বংশীয়।

মুদ্রাদির সাহায্যে রাজত্বকালের আলোচনা

ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্বকালের আলোচনা

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্গত রাজগণের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে গ্রন্থভাগে বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে (১৭৪ — ১৮৪ পৃষ্ঠা)। এই লহরের প্রারম্ভে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের নাম পাওয়া যাইবে। ১৩৫৩ হইতে ১৩৮৪ শক পর্য্যন্ত ইঁহার শাসনকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধে রাজমালা প্রভৃতি গ্রন্থের উক্তি ও তাম্রশাসন ইত্যাদির সাহায্যে প্রমাণ প্রয়োগের চেষ্টার ক্রুটী হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সময়ের মুদ্রা সংগ্রহ করিতে অক্ষম হওয়ায়, তৎ সাহায্যে প্রমাণ উপস্থিত করিবার সুবিধা ঘটিল না।

প্রতাপমাণিক্যের রাজত্বকাল সম্বন্ধীয় কথা

ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র, প্রতাপমাণিক্যের রাজত্বকাল এক বৎসরও পূর্ণ হয় নাই; সুতরাং তাঁহার শাসন সময়ের প্রমাণোপযোগী মুদ্রার নিদর্শন পাইবার আশা নাই।

ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকাল।

ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল সম্বন্ধে যেসকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহা বোধ হয় অপ্রচুর নহে। তিনি ১৩৮৫ শক হইতে ১৪৩৭ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। তাঁহার শাসনকালের একুশটী রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে সতরটী ১৪১২ শকের, একটী ১৪১৯ শকের, একটী ১৪২৮ শকের, এবং দুইটী অব্দবিহীন। ইঁহার প্রথম রাজ্যাঙ্কের (রাজ্যাভিষেক কালের) সময়জ্ঞাপক নির্ভরযোগ্য মুদ্রা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহা না পাইলেও হস্তগত মুদ্রাগুলি যে গ্রন্থভাগে প্রদত্ত প্রমাণের পরিপোষক, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। শকাঙ্কযুক্ত মুদ্রার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন একটী (১৪১২ শকের মুদ্রিত) এবং শকাঙ্কবিহীন একটী মুদ্রার প্রতিকৃতি এস্থলে প্রদান করা হইল। শেষোক্ত মুদ্রাটী প্রথমোক্ত মুদ্রার পূর্ব্ব কি পরবর্ত্তী কালের মুদ্রিত, শকাঙ্কের অভাবে তাহা নির্ণয় করিবার সুবিধা দেখা যায় না। তবে, একটী কারণে শকাঙ্কবিহীন মুদ্রাই অধিক প্রাচীন (রাজ্যাভিষেক কালের মুদ্রিত) বলিয়া মনে হয়। ত্রিপুরার মুদ্রায় রাজার নামের সহিত পট্ট-মহিষীর নাম উৎকীর্ণ হওয়া চিরন্তন কৌলিক প্রথা। এমনকি, যেসকল ত্রিপুরেশ্বরের একাধিক মহিষী ছিলেন, তাঁহারা আপন আপন নামের সহিত প্রত্যেক মহিষীর নামযুক্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রচলন করিয়াছেন। আলোচ্যস্থলে দেখা যাইতেছে, '১৪১২ শক' অঙ্কিত মুদ্রায় মহারাণীর নাম সংযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু শকাঙ্কবিহীন মুদ্রায় একমাত্র রাজার নাম পাওয়া যায়। রাজমালা আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ ধন্য রাজত্ব প্রাপ্তির পরে বিবাহ করিয়াছিলেন।* সুতরাং রাজ্যাভিষেক কালে অবিবাহিত ছিলেন বলিয়াই তৎ সময়ের

---

* "এ বলিয়া মন্ত্রী সবে স্নান করাইল।
সিংহাসনে বসাইয়া প্রণাম করিল।।

মুদ্রায় মহারাণীর নাম মুদ্রিত হয় নাই, ইহাই বুঝা যাইতেছে। এই কারণে উক্ত মুদ্রাকেই প্রথম মুদ্রিত বলিয়া নিদ্ধারণ করা সঙ্গত মনে হয়। উক্ত উভয়বিষয় মুদ্রায় যেসকল বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদান করা হইল।

সিংহ মূর্ত্তি
(তন্নিম্নে)
শক ১৪১২

১

ত্রিপুরেন্দ্র
শ্রীশ্রীধন্য
মাণিক্য শ্রীক
মলা দেব্যৌ

সিংহ মূর্ত্তি

২

শ্রীশ্রীধন্য
মাণিক্য
দেবঃ

ত্রিপুরার মুদ্রা সম্বন্ধীয় সাধারণ কথা

ত্রিপুরার মুদ্রা সম্বন্ধে অনেকের বিশ্বাস, ত্রিপুরেশ্বরগণ রাজ্যাভিষেক সময়ে একবার মাত্র মুদ্রা প্রস্তুত করেন, ঐ সময়ে মুদ্রার যে ছাঁচ (Die) প্রস্তুত হয়, সমগ্র রাজত্বকাল তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ধারণামূলে তাঁহারা যখন যে মুদ্রা প্রাপ্ত হন, তাহাতে অঙ্কিত শকাঙ্কই রাজার রাজ্যারম্ভের কাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্তই প্রমাদপূর্ণ ধারণা। ইতিপূর্ব্বে দেখা গেল, ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ছাঁচে মুদ্রিত চারি প্রকারের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ত্রিপুরেশ্বগণ কোনও নূতন প্রদেশ স্বয়ং জয় করিলে, তীর্থ দর্শন করিলে, কিম্বা স্মরণীয় কোনও কার্য্য করিলে, তদ্বিবরণ উল্লেখে নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন, ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সে কালে মুদ্রা প্রস্তুত করাকে “জরপ মারা”, “মোহর মারা” ইত্যাদি বলা হইত। ধন্যমাণিক্য, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ মুদ্রার অতিরিক্ত চট্টগ্রাম জয় করিয়া সেই ঘটনার

লোকে ধন্য বলিয়া তখন কহিলেক।
শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা হৈল অভিষেক।।
বড় সেনাপতি দিল আপনার কন্যা।
মহারাণী কমলা নাম পৃথিবীতে ধন্যা।।”

রাজমালা — ২য় লহর, ৮ পৃষ্ঠা।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ ধন্য সিংহাসন লাভের পরে এবং ১৪১২ শকে মুদ্রাঙ্কিত করিবার পূর্ব্বে কোনও এক সময় মহারাণী কমলা মহাদেবীকে পট্ট-মহিষীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের ১৪১২ শকের মুদ্রা।

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শকবিহীন মুদ্রা।

স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ মোহর প্রচলন করিয়াছিলেন।* এই মোহর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। প্রথম লহর সম্পাদনকালে মহারাজ রত্নমাণিক্যের ১২৮৮ শকে উৎকীর্ণ দুইটী মাত্র মুদ্রার সংবাদ অবগত ছিলাম। তৎপর তাঁহার শাসনকালের আরও ২০টী মুদ্রার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ১২৮৬ শকের, ১২৮৮ শকের ও ১২৮৯ শকের নির্ম্মিত মুদ্রা আছে। বিজয়মাণিক্য সুবর্ণগ্রাম (ধ্বজঘাট) বিজয়ের, পদ্মানদীতে স্নানের ও লক্ষ্যা-স্নানের স্মৃতিরক্ষার্থ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। সুতরাং ত্রিপুরার মুদ্রা পাইলেই তাহাকে রাজ্যাভিষেক কালের মুদ্রা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তাহা করিতে গেলে রাজগণের কালনির্ণয় সম্বন্ধে বিষম ভ্রম উৎপাদিত হইবে।

ধ্বজমাণিক্য, দেবমাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্যের বিবরণ

ধন্যমাণিক্যের পরবর্ত্তী ধ্বজমাণিক্য, দেবমাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্যের মুদ্রা অনুসন্ধানে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং ইঁহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থভাগে আলোচিত বিবরণের অতিরিক্ত কোন কথা বলিবার উপায় নাই।

বিজয়মাণিক্যের শাসনকাল

বিজয়মাণিক্য ১৪৫০ শকে সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেক কালের মুদ্রা পাওয়া যাইতেছে না। রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, ইনি সুবর্ণগ্রাম (ধ্বজঘাট) জয় ও ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া এবং লক্ষ্যা ও পদ্মা নদীতে অবগাহনান্তে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৪৮০ ও ১৪৮১ শকের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। প্রথমোক্ত মুদ্রাটির বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল। এই মুদ্রা লক্ষ্যা নদীতে স্নানোপলক্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল।

লাক্ষা স্নায়ি
শ্রীশ্রীত্রিপুর মহেশ
বিজয় মাণিক্য দেব
শ্রীলক্ষ্মী বালা
দেব্যৌ

(উপরে)
মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি
(নিম্নে)
বাম দিকে মহিষ ও
দক্ষিণ পার্শ্বে
সিংহ মূর্ত্তি।
শক ১৪৮ ×

শকাঙ্ক --- ১৪৮ × স্থলে × চিহ্নটি শূন্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ত্রিপুরায় অঙ্কপাতের এই প্রথা বহু প্রাচীন। দুই অঙ্কের মধ্যবর্ত্তী ০ শূন্য স্থলে ফাঁক রাখা হইত এবং দক্ষিণ পার্শ্বে শূন্য থাকিলে তৎ পরিবর্ত্তে × চিহ্ন ব্যবহৃত হইত।

---

* তার পরে শ্রীধন্যমাণিক্য নৃপবর।
চাট্টিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর।।
চৌদ্দশ পঁয়ত্রিশ শকে সমর জিনিল।
চাট্টিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল।।
রাজমালা — ২য় লহর, ২২ পৃষ্ঠা।

এতদ্বিষয়ক বিবরণ গ্রন্থভাগে (৯৮ --- ৯৯ পৃষ্ঠা) বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন কালে '৮' অঙ্কের পরিবর্ত্তে '×' চিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, কিন্তু '০' জ্ঞাপক ও '৮' অঙ্ক জ্ঞাপক চিহ্নদ্বয়ের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য আছে।

উপরোক্ত মুদ্রার সাহায্যে জানা যাইতেছে, বিজয়মাণিক্য ১৪৮০ শকে বঙ্গাভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই অভিযানোপলক্ষে লক্ষ্যায় স্নান করিয়া মুদ্রা প্রস্তুতের কথা রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে।*

বিজয়মাণিক্যের পরবর্ত্তী রাজগণ

বিজয়মাণিক্যের পরবর্ত্তী অনন্তমাণিক্য, উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। এই কারণে গ্রন্থভাগে বিবৃত বিবরণ ব্যতীত ইঁহাদের শাসনকাল সম্বন্ধীয় নির্ভরযোগ্য অন্য বিবরণ সংগ্রহ করিবার সুবিধা ঘটিল না।

স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উদ্যম

স্বাধীন রক্ষা ও রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা

রাজ্য রক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিজয়ার্থ ত্রিপুরেশ্বরগণ সর্ব্বদা যত্নবাদ ছিলেন। এক রাজার সময়ে রাজ্যের কোন অংশ হস্তচ্যুত হইলে, পরবর্ত্তী ভূপতিগণ সেই ক্ষতি উদ্ধারের নিমিত্ত বারম্বার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন, এবং কৃতকার্য্য না হওয়া পর্য্যন্ত সেই চেষ্টার বিরাম ঘটে নাই। রাজপুত্র, রাজভ্রাতা প্রভৃতি বীরেন্দ্রবর্গ রাজা এবং রাজ্যের কল্যাণার্থ অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কোন কোন রাজমহিষীকেও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া রাজ্যের স্বার্থ ও কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের এই অদম্য উদ্যম এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রবল আকাঙ্ক্ষা অতীব প্রশংসনীয়।

রত্ন ফা-এর ব্যবহার

সিংহাসনারূঢ় পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বিদূরিত করিয়া, অসঙ্গত উপায়ে রাজ্যলাভের প্রয়াসী রত্ন ফা, মুসলমান-শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক রাজনীতি ক্ষেত্রে যে কু-দৃষ্টান্তের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার বিষময় ফলে ত্রিপুরাকে প্রতিনিয়ত জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছে। উত্তরপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই রত্ন ফা-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ দ্বারা রাজ্যের শক্তি এবং মান-মর্য্যাদার লাঘব ঘটাইয়াছেন, রাজ্যময় অশান্তি-উপদ্রব ঘটাইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছেন। রত্ন ফা মুসলমান শক্তির কৃপায় অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সিংহাসন লাভ করিলেন, মুসলমান সম্রাট কিম্বা শাসনকর্ত্তাকে বহুমূল্য হস্তী এবং সুদুর্ল্লভ ভেক-মণি উপঢৌকন প্রদান

---

* ব্রহ্মপুত্র স্নান করি জরপ মারিল।
ধ্বজ ঘাট বিজয়ী বলি মহরে লিখিল।।
তীর্থ রাজ স্নান পরে লক্ষায় গমন।
লক্ষা স্নান করি জরপ মারিল রাজন।। ইত্যাদি।
দ্বিতীয় লহর, বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৫৫ পৃষ্ঠা।

দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, 'মাণিক্য' উপাধিলাভে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন, কিন্তু অন্যায় স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের কষ্টার্জ্জিত অমূল্য স্বাধীনতা-মণিকে কত ম্লান করা হইল, তাহা তিনি বুঝিলেন না। এই ঘটনা হইতেই ত্রিপুরার অবস্থা বিপর্য্যয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল।

রাজ্যের সীমা পরিবর্ত্তন বিষয়ক বিবরণ

ইহার পরেও ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রতিনিয়ত ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া, স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। রাজমালা প্রথম লহরের কালে রাজ্যের যে সীমা নির্দ্ধারিত ছিল, রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে বারম্বার তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোন কোন প্রদেশ পুনঃ পুনঃ ত্রিপুরার হস্তগত ও হস্তচ্যুত হইয়াছে; কিন্তু কোন সময়েই হৃত-ভূভাগ পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ত্রুটি ঘটে নাই। মহারাজ ধন্যমাণিক্য, মেহেরকুল, পাটিকারা, গঙ্গামণ্ডল, বগাসারি, বরদাখাত ও খণ্ডল প্রভৃতি ভূ-ভাগ এবং শ্রীহট্টের হৃত অংশ পুনর্ব্বার অধিকার করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত লুসাই প্রভৃতি কুকি প্রদেশ, চট্টগ্রাম এবং রসাঙ্গে (আরাকান) ত্রিপুরার আধিপত্য পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছিল। দেবমাণিক্য ভুলুয়া রাজ্য বিজয় দ্বারা রাজ্যের নষ্টোদ্ধার করিয়াছিলেন। বিজয়মাণিক্য গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। খাসিয়া, শ্রীহট্ট, সুবর্ণগ্রাম এবং ভূষণা প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইছামতী ও পদ্মা নদীর তীরে এবং অন্যান্য নানা স্থানে তাঁহার সেনানিবাস স্থাপিত হইবার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময় রাজ্যের সীমা কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল, সঙ্গীয় মানচিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু এই আধিপত্য অধিক সময় স্থায়ী হয় নাই, পাঠান জাতির অভ্যুত্থানের সময় হইতে উত্তরোত্তর অনেক প্রদেশ ত্রিপুরার কুক্ষিচ্যুত হইয়াছে।

ধন্যমাণিক্য ও গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ

মুসলমানগণের সহিত ত্রিপুর শক্তির যেসকল সংগ্রাম হইয়াছে, তন্মধ্যে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের সঙ্গে ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্যের যুদ্ধের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ক্রমান্বয়ে দুইবার ত্রিপুরা আক্রমণ করিয়া হোসেন শাহ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত এবং বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ত্রিপুর সেনাপতি রিয়াং জাতীয় রায়কাচাগ ও রায়কছম নামক সহোদরদ্বয়ের বাহুবলই তৎকালে ত্রিপুরার প্রধান সম্বল এবং সুদৃঢ় শক্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল। রায়কাচাগ এরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন যে, মেকেঞ্জি সাহেব তাঁহাকে ত্রিপুরার রাজা ভ্রমে 'চয়চাগ্‌মাণিক্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি হোসেন শাহের পরাজিত সেনাপতি হইতে একটী তোপ ও একটী ধাতু নির্ম্মিত পাতাকা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। তোপটী লম্বায় ৯"—২" ইঞ্চি। ইহার অগ্রভাগের বেড় ২" — ৮" ইঞ্চি এবং গোড়ার বেড় ২"— ১০" ইঞ্চি। মুখের ব্যাস ১১ ½" ইঞ্চি। গুলি নির্গমনের রন্ধ্রের ব্যাস ৩" ইঞ্চি। তোপটী সুদীর্ঘকাল উদয়পুরে প্রাচীন গারদের সন্নিহিত জঙ্গলে পতিতাবস্থায় ছিল, স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের

সময় তাহা আগরতলায় নীত হয়। বর্ত্তমান সময় ইহা উজ্জ্বয়ন্ত-প্রাসাদের সম্মুখে সংস্থাপিত হইয়াছে। এই তোপের গোড়া হইতে ৪৯ ইঞ্চি উপরে সংলগ্ন ক্ষুদ্র এক খণ্ড পিত্তলের পাতে পারস্য ভাষায় কতকগুলি বাক্য লিখিত ছিল, এখন তাহার কয়েকটি অক্ষর মাত্র দৃষ্ট হয়, অধিকাংশ লেখা ক্ষয় হইয়া অপাঠ্য এবং কতক সম্পূর্ণ বিলোপ হইয়াছে। সুতরাং কি লেখা ছিল উদ্ধার করা অসাধ্য হইয়াছে।

বিজিত পতাকাটী পিত্তল নির্ম্মিত এবং দীর্ঘ দণ্ডের উপর সংস্থাপিত। ইহার দুই পার্শ্বে কতিপয় ঘুঙুর আছে। এবং ইহাতে আরবী ভাষায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলি খোদিত আছে।

উপরের চূড়ায় লিখিত — “লাইলাহা ইল্লাল্লা হো মহম্মদের রসুলাল্লা।”

দক্ষিণদিকের ডানায় লিখিত — “ইয়া আলি, ইয়া আলি, ইয়া আলি।”

বামদিকের ডানায় — “আল্লা ইয়া ফাত্তা হো, ইয়া ফাত্তা হো, ইয়া ফাত্তা হো।”

বক্ষস্থলে লিখিত — “লাইলাহা ইল্লাল্লা।”

ইহার নিম্ন ভাগে সনের অঙ্ক আছে, কেহ কেহ এরূপ বলেন, কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে পাঠোদ্ধার করা যাইতে পারে নাই। এবিষয় পুনরালোচনার ইচ্ছা রহিল।

এই পতাকা সেনাপতি রায়কাচাগ্, ধন্যমাণিক্য সমক্ষে উপস্থিত করায় মহারাজ হৃষ্টচিত্তে আদেশ করিলেন — “পতাকাটি তোমার বিজিত, ইহা তোমাকেই অর্পণ করিতেছি। বিজয় গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ ইহা পুরুষানুক্রমে ধারণ করিও।” তদবধি কাল পরম্পরা রিয়াং জাতীয় রায় (প্রধান সরদার) গণ অন্যান্য রাজদত্ত চিহ্নের সহিত ইহা ধারণ করিয়া আসিতেছেন। রিয়াং ভাষায় এই পতাকাকে “তাউফিংক্রাং” (ময়ূরের ডানা) বলা হয়। বস্তুটী কিয়ৎপরিমাণে ময়ূরের আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া এই আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

হোসেন শাহের তৃতীয় আক্রমণ

হোসেন শাহের তৃতীয়বার ত্রিপুরা আক্রমণের কথা রাজমালায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই। এই আক্রমণে রাজ্যের কিয়দংশ মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল, আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা এরূপ বুঝা যায়। নিম্নে একটী প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সুবর্ণগ্রামের শিলালিপি

সুবিজ্ঞ কানিংহাম্ সাহেব সুবর্ণগ্রামের মস্‌জিদ গাত্রস্থ আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ একখণ্ড শিলালিপির উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাতে খোদিত বাক্য আলোচনায় জানা যায়, গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের শাসন কালে উক্ত মসজিদের নির্ম্মাতা, মুয়াজ্জমাবাদের উজীর খওয়াস্ খাঁ ত্রিপুরার শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই লিপির ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থভাগে (১২৮ পৃষ্ঠায়) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কোন কোন অংশ বাদ পড়ায়, আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত পর পৃষ্ঠায় পুনঃ প্রদত্ত হইল।

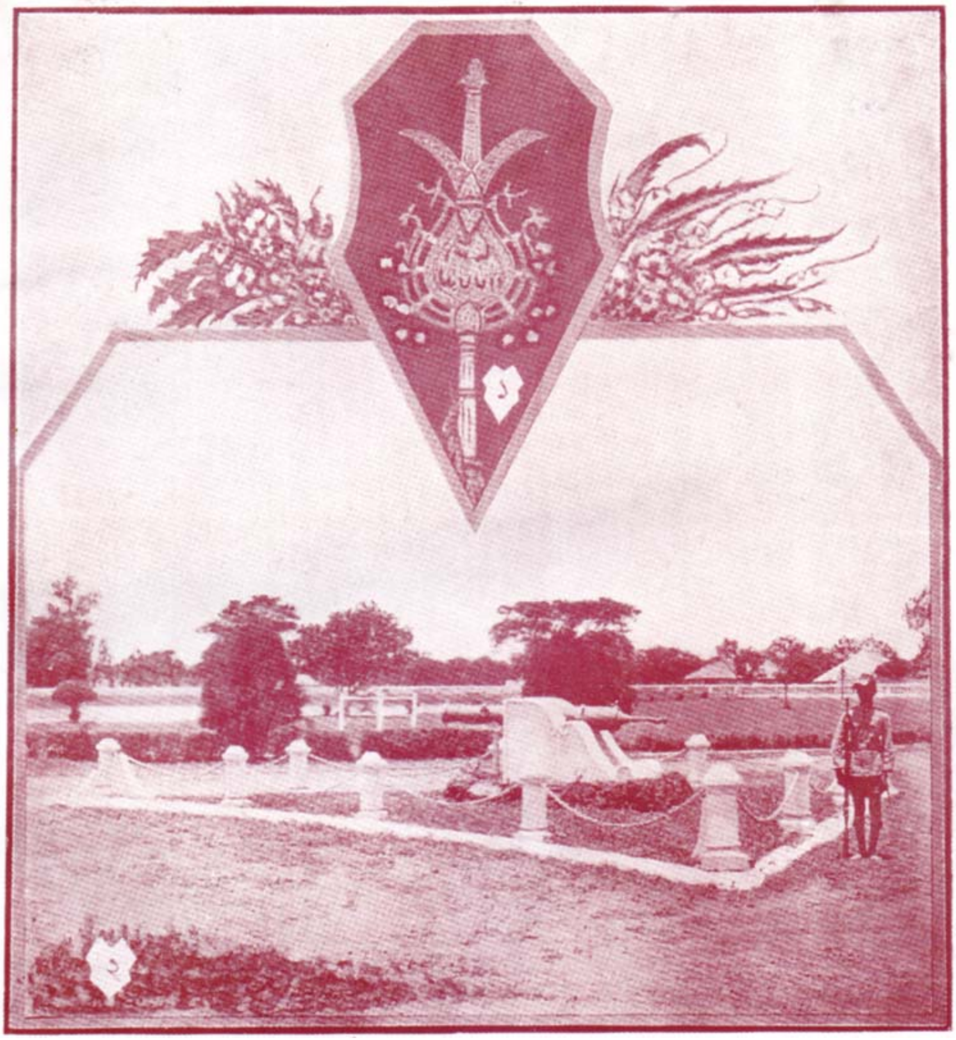

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের বিজিত বস্তুদ্বয়-
(১) গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের পতাকা।
(২) গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের তোপ

"This Mosque was built in the reign of the Sultan of the age, the heir of the Kingdom of Solomen, Alauddunya Waddin Abdul Muzaffor Hussain Shah. May God perpetuate his Kingdom and rule, and elevate his condition and dignity, and render, in every minute his proof Victorious, by the great and noble Khan, Khawas Khan, Governor of the land of Tiparah and Vazir of the District in Muazzamabad, — may God preserve him in both worlds. Dated 2nd. Rabi 11, 919 (7th June 1513)."

On a new King of Bengal — J. A. S. B — Vol. XII, 1872 Pt. I,
P.P 333 — 34.

মর্ম্ম ঃ— এই মসজিদটী তদানীন্তন সুলতান সুলেমান রাজত্বের উত্তরাধিকারী আলাউদ্দুনীয় ওয়াদ্দীন আবুল মুজফর হোসেন শাহের সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভগবান তাঁহারা রাজত্ব ও শাসন চিরস্থায়ী করুন; এবং তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা ও রাজৈশ্বর্য্য বর্দ্ধিত হউক। ত্রিপুরা ভূমির শাসনকর্ত্তা, মুয়াজ্জমাবাদের উজীর, শক্তিমান মহানুভব খওয়াস্ খানের সহায়তায় সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউক, এবং ভগবান তাঁহাকে ইহলোক ও পরলোকে রক্ষা করুন। তারিখ ২রা রবি, ৯১৯ (৭ই জুন, ১৫১৩)।

উদ্ধৃত অনুবাদ আংশিক বলিয়া বোধ হয়; সম্ভবতঃ সম্যক লিপির অনুবাদ প্রদান করা হয় নাই। উক্ত শিলালিপি আমাদের দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণ মহাশয় উক্ত লিপির মূলাংশ (আরবী) কতক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোদ্ধৃত ইংরেজী অংশ অপেক্ষা সম্পূর্ণ নূতন। তাঁহার উদ্ধৃত অংশে মসজিদ নির্ম্মাণের, খোদাতাল্লার প্রতি ইমান রক্ষার, পরলোকে বিশ্বাস স্থাপনের, নমাজ পড়িবার এবং জায়কাৎ দেওয়ার ফলের বিষয় উল্লেখ আছে। যে মসজিদের গাত্রে উক্ত লিপি ছিল, তদ্বিবরণ কিম্বা উক্ত মসজিদ নির্ম্মাতার কথা উদ্ধৃত লিপিতে নাই। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় তৎ সংগৃহীত রাজমালায়,* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার ইতিহাসে,† এবং স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় ময়মনসিংহের ইতিহাসে‡ এই শিলালিপির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কোনটীতেই অমূল্যবাবুর সংগৃহীত অংশ নাই, এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নেলেও এই অংশ গৃহীত হয় নাই। অমূল্যবাবু ইহা কোথায় পাইয়াছেন, বলেন নাই। তাঁহার সংগ্রহও অসম্পূর্ণ বলিয়াই মনে হয়।

আলোচ্য শিলালিপিতে পাওয়া যাইতেছে, খওয়াস খাঁ মুয়াজ্জমাবাদের উজীর ছিলেন।

মুয়াজ্জমাবাদের অবস্থান বিষয়ক বিবরণ

"মুয়াজ্জমাবাদ" নামদ্বারা স্থানের পরিচয় করা বর্ত্তমান কালে দুঃসাধ্য। প্রাচ্য তত্ত্ববিদ্ ব্লকম্যান সাহেব মুয়াজ্জমাবাদের অবস্থান নির্ণয় সম্বন্ধে অসমর্থ হইয়া প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন — "The union of Tiparah

---

* কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৩য় অঃ, ৫০ পৃঃ।

† বাঙ্গালার ইতিহাস — ৯ম পরিঃ, ২৫১ পৃঃ।

‡ ময়মনসিংহের ইতিহাস — ৪র্থ অধ্যায়, ৪১ পৃঃ।

(Tripurah) and Muazzamabad confirms my conjecture that Muazzamabad belong to Sonargaon." * ইহার এক বৎসর পরে তিনি অন্য এক প্রবন্ধে বর্ত্তমান পূর্ব্ব ময়মনসিংহকে "মুয়াজ্জমাবাদ" বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে মুয়াজ্জমাবাদ সুবর্ণগ্রামের নামান্তর।† এককালে সুবর্ণগ্রামের শাসনাধীন ভূ-ভাগ উক্ত নামে অভিহিত হইত, অবস্থা আলোচনায় এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

খাওয়াস খাঁ ও ত্রিপুরা

পূর্ব্বোক্ত শিলালিপিতে খওয়াস খাঁ কে "ত্রিপুরার শাসনকর্ত্তা" বলিয়া উল্লেখ করায়, ত্রিপুরার কিয়দংশ হোসেন শাহের শাসনাধীন হইবার আভাস পাওয়া যায়। সমগ্র অবস্থা আলোচনায় ইহাও বুঝা যায় যে, বিজিত ভূ-ভাগের পরিমাণ অতি নগণ্য ছিল; এবং তাহা অধিক কাল মুসলমানগণ হস্তগত রাখিতে সমর্থ হয় নাই। এই সামান্য ঘটনাকে শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ এবং মসজিদ গাত্রে সংলগ্ন করিয়া বিজয়-স্মৃতি রক্ষার চেষ্টাকে অস্বাভাবিক আড়ম্বর বলিয়া মনে হয়। ধন্যমাণিক্যের হস্তে হোসেন শাহ বারম্বার যেরূপ অপমানিত হইয়াছেন, তাহার তুলনায়, এই বিজয় কাহিনী শিলা-শাসনে উৎকীর্ণ করা, শ্রীকর নন্দীর ন্যায় চাটুকারের কার্য্য ব্যতীত অন্য কিছু বলা যাইতে পারে না। গ্রন্থভাগে সন্নিবিষ্ট বিবরণ আলোচনায় সম্যক অবস্থা প্রকাশ পাইবে।

ত্রিপুরার শৌর্য্য বিষয়ে ইংরেজগণের মন্তব্য

ত্রিপুরার শৌর্য্য ও স্বাধীনতার অবস্থা কেবল ত্রিপুর ইতিহাসেই নিবদ্ধ নহে। মুসলমান রাজপুরুষ ও ঐতিহাসিক, ইংরেজ রাজদূত, বিদেশীয় পরিব্রাজক এবং সাময়িক পত্র সম্পাদক প্রভৃতির লেখনী নিঃসৃত বিবরণ হইতেও অল্পাধিক পরিমাণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। মুসলমানগণের সংগৃহীত বিবরণ ছাড়িয়া, একমাত্র ইংরেজ লেখকগণের প্রদত্ত বিবরণই এস্থলে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়; কারণ, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী কালের কথা। তাঁহাদের মতের কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

রালফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময় রাজদূতরূপে চীন-সম্রাটের দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি পথ-ক্রমে বঙ্গদেশে আগমন করেন; ইহা ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের কথা। এই সময় তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, Sir Harry Johnston তাহা নিম্নোক্ত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ; —

"In the delta of the Ganges, on the verge of the Tipperah District, he found the people not yet subdued by the Mughal Emperors."

Pioneers in India — P. 163.

এই বাক্যে জানা যাইতেছে, ত্রিপুর রাজ্য তৎকালে গঙ্গার বদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং প্রবলপরাক্রান্ত মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিনিয়ত আক্রমণ প্রতিহত করিয়া, স্বীয় স্বাধীনতা

---

* On a new King of Bengal (J. A. S. B — 1872).

† কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৩য় অঃ, ৫০ পৃঃ।

অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। রালফ্ ফিচের কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী পরে (১৬৫২ খৃঃ অব্দে) পিটার হেলিন (Peter Heyleyn) এই রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাও এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বাক্য এই ; —

"Here is also the kingdom of Tippura, naturally fenced with hills and mountains and by that means hitherto defended against the Mongul Tartars, their bad neighbours, with whom they have continual quarrels."

Bengal Past and Present (Oct. 1907) Indian Intra and Extra Gangem – – PP. 50-51.

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, ত্রিপুর রাজ্য, প্রকৃতি গঠিত পর্ব্বত-প্রাচীন দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়া দুর্দ্দান্ত প্রতিবেশী মোগলের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে; কিন্তু তাঁহাদের সহিত এই রাজ্যকে সর্ব্বদাই আহবে লিপ্ত থাকিতে হয়। যে রাজ্য সুবিস্তীর্ণ পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিযোগী ছিল, সেই রাজ্যের বল-বিক্রমের কথা অতি সহজবোধ্য। ১৮৭০ খৃঃ ৪ঠা মে তারিখের 'Pioneer' পত্রিকায় ত্রিপুরার স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, কৈলাসবাবুর রাজমালা হইতে তাহার মর্ম্ম এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে; —

"সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও শাসন হইতে উন্মুক্ততা যদি রাজন্যবর্গকে সুখ প্রদান করে এবং সমকক্ষদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপনের কারণ হয়, তাহা হইলে পর্ব্বত ত্রিপুরার রাজা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষীয় নৃপতি মণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যশালী ও সর্ব্ব প্রধান। যিনি তিন সহস্র বর্গমাইল রাজ্যের অধিপতি, * যাঁহার আদেশই জীবন মরণের একমাত্র ব্যবস্থা, যিনি কাহাকেও কর দেন না, যিনি স্বেচ্ছানুরূপ সংগ্রাম ঘোষণা অথবা কর নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম, যিনি ব্রিটিশ কর্ম্মচারীর অনুশাসনের অধীন নহেন, যাঁহার রাজ্য বিদেশীয়গণের দৃষ্টিগোচর হয় না, কিম্বা যাঁহার কার্য্যকলাপ সংবাদ পত্রদ্বারা সমালোচিত হয় না, এবম্প্রকার গর্ব্বিত স্বাধীনতার উপর একমাত্র এই নরপতিই দণ্ডায়মান বটেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ১৭শ অঃ, ২৩৯-২৪০ পৃঃ।

মেকেঞ্জি সাহেবও এই কথাই বলিয়াছেন।† ইহা মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালের কথা। এতদ্দ্বারা ত্রিপুরার আধুনিক স্বাধীনতা গৌরবের জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কি কারণে এবং কি অবস্থায় পতিত হইয়া এই পরাক্রমশালী গৌরব-মণ্ডিত রাজ্য দিন দিন হীন-প্রভ হইয়া পড়িয়াছে, পরবর্ত্তী লহরসমূহে তাহা ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে।

---

* এ স্থলে রাজ্যের বিস্তৃতি কম লিখিত হইয়াছে। ত্রিপুর রাজ্যের বর্ত্তমান কালের সঙ্কুচিত পরিমাণ ফলও চারি সহস্র বর্গ মাইলের কিছু বেশী। রাঃ সঃ।

† North-East Frontier of Bengal — P. 561.

ত্রিপুরা কোন কালেই কোন প্রবল শক্তির নিকট অবনত মস্তকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় নাই, ইহা ত্রিপুরার অম্লান গৌরব; এ বিষয়েও ইংরেজের বাক্যদ্বারাই প্রমাণিত হইবে। এ স্থলে কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করা যাইতেছে ; —

"The British Government has no treaty with Tipperah."

Treaties Engagements and sunnuds.

Edition 1862, Vol. I, P. 77.

ত্রিপুরার এবম্বিধ উন্নতির যুগে সৈনিক বলও সুদৃঢ় ছিল। আবুল ফজল ত্রিপুরার দুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী দেখিয়াছিলেন।* 'রিয়াজউস্-সালাতিন্' প্রণেতাও তাহাই বলিয়াছেন।

সৈনিকবল সম্বন্ধীয় আলোচনা

রাজমালায় পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্য নূতন সৈনিক দল গঠন কালে তাঁহার অধীনে বার কোটি পদাতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন।† এই সংখ্যা অত্যাধিক বলিয়া মনে হয়। প্রাচীনকালে সৈন্য সংখ্যা গণনার নানাবিধ নিয়ম ছিল, 'অক্ষৌহিনী' ইত্যাদি সংখ্যা তাহারই একতর। কোষ-কার অমর ও ভরত প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ এই সংখ্যা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ; —

"একেভৈকরথা ত্র্যশ্বা পত্তিঃ পঞ্চপদাতিকা
পত্ত্যঙ্গৈস্ত্রিগুণৈঃ সর্ব্বৈঃ ক্রমাদাখ্যা যথোত্তরং।
সেনামুখং গুল্ম গণৌ বাহিনী পৃতনা চমুঃ।
অনীকিনী দশানীকিন্যক্ষৌহিণ্যপ সম্পাদ।"

অক্ষৌহিনী সংখ্যার বিশ্লেষণ নিম্নোক্ত ভাবে করা হইয়াছে ; —

"অক্ষৌহিণ্যামিত্যধিকৈঃ সপ্তত্যন্তাষ্টভিঃ শতৈঃ।
সংযুক্তানি সহস্রাণি গজানামেক বিংশতিঃ।।
এবমেব রথানান্তু সংখ্যানং কীর্ত্তিতং বুধৈঃ।
পঞ্চষষ্টি সহস্রাণি ষট্‌শতানি দশৈব তুং।।"

অমরকোষ প্রণেতা প্রভৃতির পূর্ব্বোক্ত মতানুসরণদ্বারা সৈন্য সংখ্যা নির্দ্ধারণের যে প্রণালী উপলব্ধ হয়, নিম্নে তাহা প্রদান করা যাইতেছে।

বিভাগের নাম	**পদাতি সংখ্যা**	**অশ্ব সংখ্যা**	**হস্তী সংখ্যা**	**রথ সংখ্যা**	**মোট**	**মন্তব্য**
পত্তি	৫	৩	১	১	১০	—
সেনামুখ	১৫	৯	৩	৩	৩০	ইহা পত্তির তিন গুণ।
গুল্ম	৪৫	২৭	৯	৯	৯০	ইহা সেনামুখের তিন গুণ।
গণ	১৩৫	৮১	২৭	২৭	২৭০	ইহা গুল্মের তিন গুণ।
বাহিনী	৪০৫	২৪৩	৮১	৮১	৮১০	ইহা গণের তিন গুণ।
পৃতনা	১,২১৫	৭২৯	২৪৩	২৪৩	২,৪৩০	ইহা বাহিনীর তিন গুণ।
চমু	৩,৬৪৫	২,১৮৭	৭২৯	৭২৯	৭,২৯০	ইহা পৃতনার তিন গুণ।
অনীকিনী	১০,৯৩৫	৬,৫৬১	২,১৮৭	২,১৮৭	২১,৮৭০	ইহা চমুর তিন গুণ।
অক্ষৌহিনী	১,০৯,৩৫০	৬৫,৬১০	২১,৮৭০	২১,৮৭০	২,১৮,৭০০	ইহা অনীকিনীর দশ গুণ।

* আইন-ই-আকবরী।

† রাজমালা — ২য় লহর, ১২ পৃষ্ঠা।

ইহা সৈন্য সংখ্যা নির্দ্ধারণের একটী প্রণালী। প্রাচীনকালে আরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালী অবলম্বনে এই কার্য্য সাধিত হইবার আভাস পাওয়া যায়। সহস্র, কোটী প্রভৃতি সংখ্যার সাহায্যে সৈন্যগণনার প্রথা থাকিবার বিষয়ও প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনায় পাওয়া যায়।* সেই প্রণালী অবলম্বনে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের বার কোটী পদাতি সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছিল, কিম্বা ইহা অতিরঞ্জিত বাক্য, জানিবার উপায় নাই। ইহাকে কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করিলেও ইহার ভিতরে যে ত্রিপুরার সৈন্যসংখ্যাধিক্যের আভাস নিহিত রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। প্রকৃতপক্ষে সে কালে ত্রিপুর রাজ্যের সামরিকবল যে সুদৃঢ় ছিল, রাজমালা আলোচনায় তদ্বিষয়ক বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তৎকালে রাজ্যের একটা বিশেষত্ব ছিল যে, জাতিনির্ব্বিশেষে সকল পুরুষকেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত, এবং রাজ্য রক্ষার্থ সকলেই আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য ছিল। তদানীন্তন বিস্তীর্ণ রাজ্যখণ্ডে প্রজার সংখ্যা অধিক থাকায়, সামরিক বিভাগ পুষ্ট করিবার বিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল, সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কালে ত্রিপুরার সৈন্য সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইবার প্রমাণ রাজমালা আলোচনায় পাওয়া যায়।

প্রাচীন রাজন্যবর্গের অনেক কীর্ত্তি কাহিনী রাজমালায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই। এখন তাহার অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য। অনেক কীর্ত্তি চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে; দেবায়তনাদি অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া ত্রিপুরেশ্বরগণের বিমল যশ ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু তৎসমুদয়ের স্থাপয়িতার নাম নির্দ্দেশ করিবার সূত্র পাওয়া যাইতেছে না। ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রতিষ্ঠিত অনেক বিগ্রহ দেবোত্তর সম্পত্তিসহ ব্যক্তি বিশেষের হস্তগত হইয়াছে; এরূপ অবস্থাপন্ন অনেক কীর্ত্তি সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠাতার নাম লোকে বিস্মৃত হইয়াছে। উদাহরণ স্থলে মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক লৌহগড় পরগণায় সংস্থাপিত শিব-বিগ্রহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দেবায়তন ত্রিপুর রাজ্যস্থ বক্সনগর হইতে উত্তরপশ্চিম কোণে আনুমানিক এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই দেবালয় সম্বন্ধে ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সেন বি, এ, মহাশয় হইতে প্রথম সংবাদ

---

* নিম্নোক্ত বাক্যসমূহ দ্বারা লক্ষ, কোটি প্রভৃতি সংখ্যার সাহায্যে সৈন্যগণনার প্রথা বিদ্যমান থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; —

(১) "এক লক্ষ নর যদি যুদ্ধ করি মরে।
তবে সে কবন্ধ নাচে গগন উপরে।।"
রাজমালা — ১ম লহর, ৫৮ পৃষ্ঠা।

(২) "মরে কোটি দশ পয়দর যবহি।
নাচত এক কবন্ধ রণ তবহি।।"
তুলসী দাসের রামায়ণ — লঙ্কা কাণ্ড।

(৩) "নাগানামযুতং তুরঙ্গনিযুতং সার্দ্ধং রথানাং শতং পত্তীনাং দশ কোটয়ো নিপতিতা একঃ কবন্ধো রণে।"
(ইতি প্রাচীনাঃ)। শব্দকল্পদ্রুম — ২৭১ পৃষ্ঠা।

পাওয়া যায়। তাহা দর্শন এবং তৎসম্বন্ধীয় তথ্যানুসন্ধান জন্য আমার সহকারী শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ দাস গিয়াছিলেন। শিব মন্দিরটী নবিয়াবাদ গ্রামে অবস্থিত। ইহার অবস্থা অতি জীর্ণ, বিরাট বটবৃক্ষ এবং অন্যান্য আগাছা-ভারাক্রান্ত ভগ্নদেহ লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার পরিসর ১৫ × ১৫ ফুট, ভিতরে ৬ × ৬ ফুট পরিসর বিশিষ্ট একটী মাত্র প্রকোষ্ঠ। দেওয়ালের বেধ ৪ $\frac{১}{২}$ ফুট। মন্দিরটীর উচ্চতা ২৪ ফুট হইবে। উপরের গম্বুজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার গাত্রে শিলালিপি নাই; পূর্ব্বে ছিল কি না কেহ বলিতে পারে না। মন্দিরের পশ্চিমদিকে ক্ষুদ্র একটী দ্বার, তাহার কিয়দংশ বটবৃক্ষে ঢাকিয়াছে।

মন্দিরের কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। দেবতার সেবা পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মন্দিরের সংলগ্ন চতুষ্পার্শ্বে ৭২ দ্রোণ ভূমি দেবোত্তর ছিল, তাহার অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়াছে। এখন কুমিল্লা কালেক্টরীর রেজিষ্ট্রীভুক্ত অল্প পরিমাণ ভূমি স্থিরতর রহিয়াছে মাত্র।

কৃষ্ণপুর নিবাসী পরশুরাম শর্ম্মা সেবাইত সূত্রে এই দেবালয়ের ও দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বংশধর না থাকায় স্বীয় গুরুদেবকে তাহা দান করিয়া গিয়াছেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত আউড়িয়া নিবাসী গুরু বংশীয় শ্রীযুক্ত কালীকুমার কাব্যতীর্থ মহাশয় এই দেবালয়ের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী। কৃষ্ণপুরের জয়কুমার চক্রবর্ত্তী বেতন লইয়া দেবতার সেবা পূজার কার্য্য করিতেছেন।

গঙ্গামণ্ডল ও লৌহগড় সম্বন্ধে জানিবার অনেক কথা আছে, পরবর্ত্তী লহরে তাহা আলোচনার চেষ্টা করা হইবে। উক্ত বিগ্রহ যে মহারাজ ধন্যমাণিক্যের প্রতিষ্ঠিত, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। ঁচন্দ্রনাথের ন্যায় প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভু নাথের মন্দির, এবং মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য কর্ত্তৃক ঁচন্দ্রনাথ বিগ্রহের মন্দির নির্ম্মিত হইবার কথা বর্ত্তমান কালেও অনেকের জানা আছে; কিন্তু ঁঅন্নপূর্ণা ও বড়বানলের মন্দির ত্রিপুরেশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইবার কথা প্রচলিত থাকিলেও তাহা যে ধন্যমাণিক্যের আত্মজ মহারাজ দেবমাণিক্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা অনেকেই অবগত নহেন। এই মন্দির, স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ্বর বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অগ্র-মহিষী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী প্রভাবতী মহাদেবী কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। উদয়পুর সহরের বক্ষে অবস্থিত অনেক প্রাচীন মন্দিরের পরিচয় উদ্ধার করা বর্ত্তমান কালে অসাধ্য হইয়াছে। এই সকল কারণে প্রাচীন কীর্ত্তির সম্যক বিবরণ সঙ্কলনের আশা নাই। তবে, এ বিষয়ে সাধ্যানুরূপ চেষ্টার ক্রটী হইতেছে না, অতঃপরও সেই চেষ্টায় বিরত থাকিব না, ফলাফল শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

— শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন।

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শিবমন্দির,
লৌহ গড়।

সূচীপত্র

মঙ্গলাচরণ ১

প্রস্তাবনা ১

গ্রন্থারম্ভ

ধর্ম্মমাণিক্যের সন্ন্যাস-ব্রত ... ... ১ — ৪

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড

ধর্ম্মমাণিক্যের রাজ্যাভিষেক ৪, ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান ও ধর্ম্মসাগর খনন ৫, তাম্রশাসন ৫, রাজমালা রচনা ৬ ... ... ৪ — ৬

প্রতাপমাণিক্য খণ্ড

প্রতাপমাণিক্যের রাজ্যলাভ ও হত্যা ৬, রাজ্যে অশান্তি ৬, ধন্যমাণিক্যকে রাজা করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব ৭, ধন্যমাণিক্যের সন্ধান ৭, পুরোহিত গৃহ হইতে ধন্যমাণিক্যকে আনয়ন ৭ ... ৬ — ৮

ধন্যমাণিক্য খণ্ড

ধন্যমাণিক্যের রাজ্যাভিষেক ৮, মহারাণী কমলা ৯, হিতাকাঙ্ক্ষী পুরোহিত ১০, সেনাপতি বধ ১২, নূতন সৈন্যদল গঠন ১২, বঙ্গাভিযান ১৩, খণ্ডলের লোকগণের ব্যবহার ১৩, খণ্ডল পরগণা লুণ্ঠন ১৫, ধন্যসাগর খনন ১৬, কাঠিছোঁয়া সম্প্রদায় ১৬, সুরার প্রভাব ১৭, শ্বেত হস্তী ও থানাংচি বিজয় ১৭, দুর্গ আক্রমণের কৌশল ১৯, কিরাত দেশ জয় ২০, রাজ-ভেট ২১, চট্টগ্রাম বিজয় ২২, হোসেন শাহের পরাজয় ২৪, রসাঙ্গ বিজয় ২৪, হোসেন শাহের পুনরাক্রমণ ২৫, দেবদ্বারে খোদিত মূর্ত্তি ২৬, গোমতী নদীতে বাঁধ ২৭, মাছিছা বা দেবতামুড়া ২৭, নদীর বাঁধ ভঙ্গ ও গৌড়-সৈন্যের বিপদ ২৮, নরবলির সংখ্যা নির্দ্ধারণ ২৯, সাহিত্যের পুষ্টি বিধান ২৯, ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ ২৯, ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন ৩০, চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির ৩১, সুবর্ণ খনি ৩২, ধন্যমাণিক্যের ধর্ম্মানুষ্ঠান ৩২, রাজার স্বর্গপ্রাপ্তি ৩৩, মহারাণীর সহমরণ ৩৩ ... ... ৮ — ৩৩

দেবমাণিক্য খণ্ড

ভুলুয়া বিজয় ৩৩, ফলমতী তীর্থ দর্শন ও চট্টগ্রামে থানা সংস্থাপন ৩৩, রাজার তান্ত্রিক সাধনা ৩৪, সেনাপতি বধ ৩৫, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মীনারায়ণ কর্ত্তৃক রাজহত্যা ও মহারাণীর সহমরণ ৩৬ ... ... ৩৩ — ৩৬

ইন্দ্রমাণিক্য খণ্ড

ইন্দ্রমাণিক্যের রাজ্যাভিষেক ৩৭, মহারাজকুমার বিজয়ের অবরোধ ৩৭, লক্ষ্মীনারায়ণ বিপ্রের অত্যাচার ৩৭, সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণ ও সমাতৃ ইন্দ্রমাণিক্য নিহত ৩৮ ... ... ৩৭ — ৩৮

বিজয়মাণিক্য খণ্ড

বিজয়মাণিক্যের অভিষেক ৩৯, মহারাণী পুণ্যবতীর দানশীলতা ৩৯, সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের স্থাপিত জগন্নাথ বিগ্রহ ৩৯, দৈত্যনারায়ণের প্রাধান্য ৪০, রাজাকর্ত্তৃক দৈত্যনারায়ণ নিহত ৪২, মহারাণীর আদেশে মাধবের বিনাশ সাধন ৪২, মহারাণীর বনবাস দণ্ড ৪৩, বিজয়মাণিক্যের উত্তর প্রদেশ বিজয় ৪৩, জয়ন্তীয়া রাজ্যে হাড়ি সৈন্যের অভিযান ৪৪, হেড়ম্বেশ্বরের মধ্যবর্ত্তীতা ৪৫, পাঠান সৈন্য বিদ্রোহ ৪৫, বিদ্রোহী সৈন্যের দণ্ড ৪৬, গৌড়েশ্বরের সহিত চট্টগ্রামে যুদ্ধ ৪৭, ত্রিপুর সেনাপতি হত ৪৮, ত্রিপুর সেনানি কর্ত্তৃক গৌড়ের প্রধান সেনাপতি ধৃত ও লৌহপিঞ্জরে অবরুদ্ধ ৪৯, গৌড়ের সৈন্যাধ্যক্ষকে চতুর্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান ৫১, গৌড়েশ্বরের সহিত পত্র ব্যবহার ৫২, গৌড়েশ্বরের প্রেরিত দূতের অবস্থা ৫৪, বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযান ৫৪, শ্রীহট্ট অভিযান ৫৭, চৌয়াল্লিশ প্রদেশে মৃগয়া ৫৮, খাড়াইত সৈন্য ৫৮, বিজয়মাণিক্যের স্থাপিত বিগ্রহ ৬০, রাজ্য মধ্যে শিল্পী সংস্থাপন ৬০, রাজ পুত্রগণের ব্যবহার ৬২, সেনাপতি গোপীপ্রসাদ ৬২, রাজকুমার অনন্তের সহিত গোপীপ্রসাদের কন্যার বিবাহ ৬২, বিজয়মাণিক্যের মৃত্যু ৬৪, রাজমহিষীগণের সহমরণ ৬৪ ... ... ৩৯ — ৬৪

অনন্তমাণিক্য খণ্ড

অনন্তমাণিক্যের রাজ্যপ্রাপ্তি ৬৫, গোপীপ্রসাদের প্রাধান্য ৬৫, শ্বশুর গোপীপ্রসাদ কর্ত্তৃক অনন্তমাণিক্য নিহত ৬৬ ... ... ৬৫ — ৬৬

উদয়মাণিক্য খণ্ড

গোপীপ্রসাদের উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ ও সিংহাসন অধিকার ৬৭, রাজমহিষী কর্ত্তৃক পিতাকে ভর্ৎসনা ৬৭, রাজধানীর উদয়পুর নামকরণ ৬৮, উদয়মাণিক্যের বিগ্রহ স্থাপন ও জলাশয় খনন ৬৮, উদয়মাণিক্যের ব্যভিচার ৬৮, গৌড়েশ্বর কর্ত্তৃক ত্রিপুরা আক্রমণ ৬৯, ত্রিপুর সেনাপতির পরাজয় ৭০, পাঠান কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম বিজয় ৭১, উদয়মাণিক্যের মৃত্যু ৭২ ... ... ৬৭ — ৭২

জয়মাণিক্য খণ্ড

জয়মাণিক্যের অভিষেক ৭২, রণাগণ (রঙ্গ) নারায়ণের প্রাধান্য ৭৩, অমর দেবকে বধ করিবার নিমিত্ত রণাগণের চেষ্টা ৭৪, ইঙ্গিত দ্বারা রণাগণের অভিপ্রায় জ্ঞাত হওয়ায় অমর দেবের জীবন রক্ষা ৭৪, অমর দেব কর্ত্তৃক রণাগণ নিহত ৭৬, অমর দেবের পুত্র কর্ত্তৃক জয়মাণিক্য নিহত ৭৭, অমর দেবের জন্ম বিবরণ ৭৭ ... ... ৭২ — ৭৮

মধ্যমণি (টীকা)

রাজমালা দ্বিতীয় লহর ও তাহার রচয়িতা

রাজমালা প্রথম লহর ৮১, রাজমালা দ্বিতীয় লহরের রচয়িতা ৮১, রাজমালা দ্বিতীয় লহরের প্রাচীনত্ব ও অমরমাণিক্যের শাসনকাল ৮৩, রাজমালার ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনা ৮৫, রাজমালার রচয়িতা ত্রিপুরা জেলার লোক ৮৫, রাজমালার ঐতিহাসিক মূল্য ৮৫ ... ... ৮১ — ৮৬

পারিবারিক কথা

বৈবাহিক বিবরণ ৮৬, রাজগণের বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা ৮৬, বহুবিবাহ ৮৮, রাজগণের শিক্ষা ও সাহিত্যের পোষকতা বিষয়ক বিবরণ ৮৯, মল্লবিদ্যার চর্চ্চা ৯০, স্ত্রীশিক্ষা ৯০, নৃত্যগীত বিষয়ক চর্চ্চা ৯০, সাহিত্য সেবা ৯০, বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিবিধান ৯০, পারিবারিক বিশেষ নিয়ম ৯১, মৃত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়ম ৯১, সহমরণ প্রথা ৯১, রাজমহিষীর বনবাস দণ্ড ৯১, গুপ্ত কথা বুঝাইবার ইঙ্গিত ৯১ ... ... ৮৬ — ৯১

ধর্ম্মমত

ধর্ম্মানুরাগ ৯১, রাজকুমারের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ ৯২, জলাশয় খনন ও ভূমিদান ৯২, ধর্ম্মমাণিক্যের তাম্র-শাসন ৯২, কুমিল্লানগরীস্থিত ধর্ম্মসাগরের প্রাচীনত্ব ৯৪, দেবতা প্রতিষ্ঠা ৯৪, ভুবনেশ্বরী বিগ্রহের অবস্থা ৯৫, ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির ৯৫, মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপি সমূহ ৯৬, বলিভীম নারায়ণ ৯৮, অঙ্কপাতের প্রাচীন প্রণালী ৯৮, মন্দিরের প্রথম সংস্কারক রণাগণনারায়ণ ৯৯, দ্বিতীয়বারের সংস্কার বিবরণ ১০০, তৃতীয়বারের সংস্কার বিবরণ ১০০, মহারাণী সুমিত্রা মহাদেবী কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কার ১০০, মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কার ১০১, মন্দিরের প্রাচীনত্ব ১০১, ভৈরবের মন্দির ১০১, ধন্যমাণিক্যের অন্যান্য কীর্ত্তি ১০১, মহারাণী কমলা মহাদেবীর কীর্ত্তি ১০১, দেবমাণিক্যের ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ১০১, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পঞ্চদ্রোণা ১০২, বিজয়মাণিক্যের তাম্রশাসন ১০২, উদয়মাণিক্যের ধর্ম্ম কার্য্যানুষ্ঠান ১০২, ধর্ম্মমতের সারতত্ত্ব ১০৩, বলিদানের প্রথা ১০৩, নরবলি ১০৪, বলির নিমিত্ত মনুষ্য সংগ্রহ ও মৈছিলি সম্প্রদায় ১০৪, শত্রু বলি ১০৫, নরবলির সংখ্যা নির্দ্ধারণ ১০৫, ধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাস ১০৬, রাজানুশাসনে ধর্ম্মের পুষ্টিবিধান ১০৬ ... ... ৯১ — ১০৬

তীর্থস্থানের বিবরণ

ত্রিপুরা রাজ্যের তীর্থস্থান ১০৬, ঊনকোটী তীর্থ ১০৭, ঊনকোটী তীর্থের পথ ১০৭, ঊনকোটী তীর্থের প্রাচীনত্ব ১০৭, কপিল মুনির বিবরণ ১০৮, কপিলাশ্রম ১০৮, মহর্ষি মনু ১০৯, বরবক্র ও মনু নদীর মাহাত্ম্য ১১০, ঊনকোটী তীর্থমাহাত্ম্য ১১০, ঊনকোটী তীর্থ দর্শন ১১১, ঊনকোটী তীর্থে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসমূহ ১১১, ঊনকোটীশ্বর শিব বিগ্রহ ১১২, প্রাচীন মন্দিরের লুপ্তপ্রায় নিদর্শন ১১২, ছাম্বুলনগরের অবস্থান নির্ণয় ১১৩, বিগ্রহসমূহের প্রাচীনত্ব ১১৪, ঊনকোটী তীর্থের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা ১১৪, ডম্বুর বা ডুঙ্গুতীর্থ ১১৫, ডম্বুর তীর্থের অবস্থান নির্ণয় ১১৫, ডম্বুর তীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১১৫ ... ... ১০৬ — ১১৬

সামরিক বল ও সমর ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ

সামরিক বল ১১৬, বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযান ১১৬, উদয়মাণিক্যের শাসনকালের সৈনিক বল ১১৮, সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের বিবরণ ১১৮, জয়ন্তীয়া অভিযানে হাড়ি সৈন্য ১১৯, সেনানায়ক ১১৯, সেনানায়ক নির্ব্বাচন প্রণালী ১১৯, সেনাপতিগণের উপাধি ১২০, পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য রক্ষা প্রণালী ১২০, বিনন্দিয়া সৈন্য ও নাজির উপাধি ১২০, নারায়ণ উপাধি ১২১, খাড়াইত উপাধি ১২২, সৈনিক বিভাগের গৌরবসূচক উপাধি ১২২, যুদ্ধাস্ত্র ১২৩, যুদ্ধাস্ত্রের প্রকার ভেদ ১২৩, যুদ্ধযান ১২৪, অভিযান ও

সমর ১২৪, ধন্যমাণিক্যের বঙ্গ বিজয় ১২৫, খণ্ডলবাসিগণের ব্যবহার ১২৫, থানাংচি বিজয় ও শ্বেতহস্তী লাভ ১২৫, চট্টগ্রাম অভিযান ও বিজয় ১২৬, হোসেনশাহের ত্রিপুরা আক্রমণ ১২৬, ধন্যমাণিক্যের আরাকান বিজয় ১২৬, হোসেনশাহের পুনরাক্রমণ ১২৭, বিনাযুদ্ধে পাঠানবাহিনীর পরাজয় ১২৭, হোসেনশাহের তৃতীয় আক্রমণ ও জয় লাভ ১২৮, শ্রীকর নন্দীর তোষামোদপ্রিয়তা ১২৮, দেবমাণিক্যের ভুলুয়া ও চট্টগ্রাম বিজয় ১২৯, বিজয়মাণিক্যের শ্রীহট্ট বিজয় বিবরণ ১২৯, সুলতান সুলেমান কররাণির চট্টগ্রাম আক্রমণ ও পরাজয় ১২৯, বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযান ১৩০, মঘ জাতির সহিত সঙ্ঘর্ষ ১৩১, অনন্তমাণিক্যের হত্যা বিবরণ ১৩২, উদয়মাণিক্য ও দায়ুদশাহ ১৩২, উদয়মাণিক্যের পরাজয় ১৩৩, রাজার যুদ্ধে গমন ১৩৪, রাজগণের শৌর্য্য ১৩৪, রণকৌশল ১৩৫, থানাংচি দুর্গ জয় ১৩৫, হোসেনশাহের পরাজয় বিবরণ ১৩৫, হোসেনশাহের দ্বিতীয়বার পরাজয় ১৩৬, রণক্ষেত্রে ধৃত সেনাপতিগণের অবস্থা ১৩৭, পুরস্কার ও দণ্ড ১৩৭, পুরস্কার ১৩৭, দণ্ড ১৩৮, সেনাপতিগণের আধিপত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা ১৩৮, সৈনিক বল ও শাসনভার এক হস্তে অর্পণের কুফল ১৩৮, সেনাপতিগণের প্রভাব ১৩৮, সেনাপতিগণের প্রাধান্য হেতু ধন্যমাণিক্যের অবস্থা ১৩৯, সেনাপতিগণের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম ১৪০, লক্ষ্মীনারায়ণ নামক বিপ্রের ব্যবহার ও পরিণাম ১৪১, সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের দুর্ব্যবহার ও তাহার পরিণাম ১৪১, সেনাপতিগণের শাসন ক্ষমতা রহিত ও উজীর পদের সৃষ্টি ১৪২, সেনাপতি গোপীপ্রসাদের পূর্ব্বাবস্থা ১৪২, গোপীপ্রসাদের প্রাধান্য ১৪২, গোপীপ্রসাদের বিশ্বাসঘাতকতা ১৪২, রণাগণের প্রাধান্য ও পরিণাম ১৪৩, সৈনিক বিভাগে উচ্ছৃঙ্খলতা ১৪৩, সেনাপতি বধ ১৪৩, দুর্গ ও সেনানিবাস ১৪৪, দুর্গসমূহের নাম ১৪৪, নববিজিত প্রদেশের শাসনপ্রণালী ১৪৫, সৈনিক বিভাগের ভোজ ১৪৫, মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রদত্ত ভোজ ১৪৫, ধন্যমাণিক্যের প্রদত্ত ভোজ ১৪৫, কাঠিছোঁয়া সম্প্রদায় ১৪৬, হসম ভোজন ১৪৬, 'হসম ভোজন' বাক্যের অর্থ ১৪৭, হসম ভোজন প্রথার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ১৪৮, হসম ভোজনে হালাম সরদারের প্রাধান্য ১৪৯, উপঢৌকন প্রদান প্রথা ১৪৯ ... ... ১১৬ — ১৪৯

রাজ্যের অবস্থা

রাজধানী ১৪৯, রাজধানীর অবস্থান ১৪৯, রাজ্য বিস্তার ১৫০, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের কার্য্য ১৫০, মহারাজ দেবমাণিক্যের কার্য্য ১৫০, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের কার্য্য ১৫০, বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযান ১৫১, উদয়মাণিক্যের শাসনকাল ১৫১ ... ... ১৪৯ — ১৫১

প্রাকৃতিক উপদ্রব

ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ ১৫১, মহামারী ১৫২, বসন্ত রোগের প্রাবল্যের কারণ ১৫২ ... ১৫১—১৫২

শিল্প

শিল্প কার্য্য ও শিল্পকার ১৫৩, বিবিধ শিল্প ১৫৩, বয়ন শিল্প ১৫৩, রিয়া বা কাঁচলি ১৫৩ ... ... ১৫৩ — ১৫৪

রাজ্যের বিশেষত্ব

খনিজ পদার্থ ১৫৫, বন্য ঘোটকের বিবরণ ১৫৬, ঘোড়া উৎপন্নের কথা ১৫৬, বন্য হস্তীর বিবরণ ১৫৬ ... ... ১৫৫ — ১৫৬

শাসন তন্ত্র

সেনাপতিগণের ব্যবহার ১৫৬, খাঁ উপাধিধারী সেনাপতিগণ ১৫৬, শাসন প্রণালী ১৫৭, শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তনের চেষ্টা ১৫৭, লস্কর পদের প্রবর্ত্তনা ১৫৭, বিচার প্রণালী ১৫৮, প্রাণদণ্ডের নিয়ম ১৫৮ ... ... ১৫৬ — ১৫৮

দরবারের বিশেষ নিয়ম

দরবারে পালনীয় পদ্ধতি ১৫৯, কূটনীতি ১৫৯, বিজয়মাণিক্যের অবলম্বিত নীতি ১৬০, জয়ন্তিয়া রাজের অসত্য ব্যবহার ১৬০, হাড়ি সৈন্যের জয়ন্তিয়া অভিযান ১৬০, পরাজিত জয়ন্তিয়ারাজ কে? ১৬১, জয়ন্তিয়া রাজার প্রতিহিংসা সাধনের চেষ্টা ১৬২, বিজয়মাণিক্যের রাজনীতিক কৌশল ১৬২, রাজদত্ত শাসন ১৬২, কুকি জাতির রাজভক্তি ১৬৩, রাজকর ১৬৪, মুদ্রা ১৬৪, সমাজতত্ত্ব ১৬৫, সুরার প্রভাব ১৬৫, পান দ্বারা আমন্ত্রণ ও সম্মান প্রদর্শনের প্রথা ১৬৮, মহিলা মাহাত্ম্য ১৬৯, রাজমহিষীর প্রাখর্য্য ১৭০, স্ত্রী শিক্ষার নিদর্শন ১৭০ ... ... ১৫৯ — ১৭০

ইঙ্গিত ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন

ইঙ্গিত ১৭০, কদবা ১৭১, ফুরাই ১৭২, ওয়াথ্লং ১৭২, ফুরাই ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা ১৭৩ ... ... ১৭০ — ১৭৪

রাজগণের কাল নির্ণয়

ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৪, প্রতাপমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৭৬, ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৬, ধ্বজমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৮, দেবমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৮, ইন্দ্রমাণিক্যের শাসনকাল ১৭৯, বিজয়মাণিক্যের শাসনকাল ১৮০, মহারাজ বিজয় সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ১৮০, বিবিধ মতের মীমাংসা ১৮১, অনন্তমাণিক্যের শাসনকাল ১৮১, উদয়মাণিক্যের শাসনকাল ১৮২, জয়মাণিক্যের শাসনকাল ১৮৩, শাসনকালের তালিকা ১৮৪, রাজগণের কাল নির্দ্দেশক প্রাচীন তালিকা ১৮৪ ... ১৭৪ — ১৮৪

তাম্র-শাসনের তথ্যানুসন্ধান

তাম্র-শাসনের বিবরণ ১৮৫, তাম্র-শাসন প্রবর্ত্তনের কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ১৮৫, শ্রীরামচন্দ্রের তাম্র-শাসন ১৮৫, তাম্র-শাসন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত ১৮৭, শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রতি বিশ্বাস ১৮৮, ভূমিদাতাগণের ধর্ম্মভীরুতার নিদর্শন ১৮৯, ধর্ম্মমাণিক্যের তাম্র-শাসন ১৮৯, লক্ষ্মণসেনের তাম্র-শাসন ১৮৯, শ্যামল বর্ম্মার তাম্র-শাসন ১৮৯, তাম্র-শাসন প্রদানের প্রথা আধুনিক নহে ১৮৯, ধর্ম্মের সহিত শৌর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা ১৯০, রাজা দেবখড্গের তাম্র-শাসন ১৯০, কেশব সেনের তাম্র-শাসন ১৯০, দামোদর দেবের তাম্র-শাসন ১৯১, ঈশান দেবের তাম্র-শাসন ১৯১, বিজয়মাণিক্যের তাম্র-শাসন ১৯১, তাম্র-শাসনে অঙ্কিত শৌর্য্যভাবের কথা ১৯১, তাম্র-শাসনে অঙ্কিত বাক্যদ্বারা রুচির পরিচয় ১৯১, তাম্র-শাসনে অযথা বাক্য ১৯৩, সমাজের অবস্থা বিপর্য্যয়ের কথা ১৯৩ ... ... ১৮৫ — ১৯৪

সৈন্যাধ্যক্ষের উপাধি

সৈন্যাধক্ষের ‘সেনা’ উপাধি ১৯৪, সেনাপতি উপাধি ১৯৫, দশ জল সেনাপতি নিয়োগের প্রথা

১৯৬, সরদার উপাধি ১৯৭, হাজারী উপাধি ১৯৮, বড়ুয়া উপাধি ১৯৮, নারায়ণ উপাধি ১৯৮ চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক নারায়ণ ২০০, খাড়াইত উপাধি ২০০, খাড়াইত উপাধির প্রাচীনত্ব ২০১, নাজির উপাধি ২০২ ... ... ১৯৪ — ২০২

সতী-দাহ

ত্রিপুরায় সতী-দাহের প্রচলন ২০৩, সতী-দাহ প্রথার প্রাচীনত্ব ২০৩, সতী-দাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত ২০৪, সহমরণ বিধি ২০৫, সতীর আন্তরিক দৃঢ়তা ২০৬, ভারতবর্ষে সহমরণ প্রথার বিস্তৃতি ২০৬, ভারতের বাহিরে সহমরণ প্রথা ২০৭, ব্রহ্মচর্য্যব্রত ২০৭, সহমরণ প্রথার ব্যভিচার ২০৭, ইংরেজ শাসনকালে সহমরণ প্রথা ২০৮, সহমরণ প্রথা ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ২০৮, সহমরণ প্রথা ও ত্রিপুর রাজ্য ২০৮, সহমরণ প্রথা সম্বন্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পত্র ২১০, সহমরণ সম্বন্ধে ১৮২৯ খৃঃ অব্দের রেগুলেশন ২১৩, ত্রিপুরায় সতীদাহ রহিতের আদেশ সম্বলিত রোবকারী ২১৪ ... ... ২০৩— ২১৪

হস্তী-বিজ্ঞান

বন্যহস্তী সম্বন্ধীয় বিবরণ ২১৫, হস্তীর জাতি বিভাগ ২১৯, অষ্টদিগ্‌গজ ২২০, উত্তম হস্তী ২২২, দুষ্ট হস্তী ২২৪, হস্তীর পরমায়ু ২২৮ ... ... ২১৫ — ২২৯

প্রচলিত কিম্বদন্তী

দৌচাপাথার বা দোয়াপাথর ২২৯, শ্বেতহস্তীর কথা ২২৯, শ্বেতহস্তীর জন্মকথা ২৩০ ... ... ২২৯ — ২৩৮

রাজা রামগতির আখ্যান ... ... ২৩৮ — ২৪২

বিষলতার উৎপত্তি ... ... ২৪২ — ২৪৬

প্রাচীন সংস্কার — ডাইনের কথা ... ... ২৪৬ — ২৪৮

খোজার বিবরণ ... ... ২৪৮ — ২৪৯

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ... ২৫০ — ২৬৬

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে উল্লিখিত স্থান ইত্যাদির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ ... ২৬৭ — ৩১৮

অনুক্রমণিকা ... ... ৩১৯ — ৩৪২

বিভিন্ন অভিমত ... ... (অ — ঋ)

চিত্রসূচী

১। শ্রীশ্রীচন্দ্রমা দেব .... মুখপত্র।

২। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ”

৩। রাজমালা গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠার প্রতিকৃতি .... /.

৪। সুন্দরবনস্থিত ত্রিপুরা সুন্দরী ও অম্বু লিঙ্গের মন্দির .... ৶.

৫। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মুদ্রা .... ২্

৬। হোসেন শাহের তোপ ও পতাকা ..... ২।·

৭। ধন্যমাণিক্যের শিব মন্দির ২

৮। ধর্ম্মসাগর (কুমিল্লা) ৫

৯। কমলাসাগর (কস্‌বা) ৯

১০। ধন্যমাণিক্যের প্রাসাদ ১২

১১। ত্রিপুরার কুকি সৈন্য ১৮

১২। শিশু সন্তানসহ কুকি দম্পতি ১৯

১৩। কুকি-প্রদত্ত রাজভেটের বস্তু ২১
১৪। হৈতন খাঁ-এর খোদিত মূর্ত্তি ২৬
১৫। দেবতা মুড়ায় খোদিত মূর্ত্তি ২৭
১৬। ৺স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির ৩১
১৭। ধন্যমাণিক্যের নির্ম্মিত মঠসমূহ ৩২
১৮। অন্নপূর্ণা ও বাড়বানলের মন্দির ৩৪
১৯। দৈত্যনারায়ণের জগন্নাথ মন্দির ৩৯
২০। হীরা গোপীনাথের মন্দির ৬০
২১। উদয়মাণিক্যের প্রাসাদ ৬৮
২২। অস্থায়ী সেনানিবাসের আদর্শ (শিবির) ৭০
২৩। "ছোট মা" বিগ্রহ ৯৫
২৪। ৺ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির ৯৬
২৫-২৬। ঐ মন্দিরের শিলালিপি ৯৭-৯৮
২৭। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ ১০৩
২৮। ঊনকোটী তীর্থ ১০৭
২৯। ঊনকোটী তীর্থমুখ ১১০
৩০। ঊনকোটীশ্বর শিব ১১২
৩১। ডম্বুর জলপ্রপাত (উর্দ্ধস্তর) ১১৫
৩২। ঐ প্রপাত (মধ্য ও নিম্ন স্তর) ১১৬
৩৩-৩৪। বিজয়মাণিক্যের নৌ-বিতান ১১৭
৩৫। বস্ত্র বয়ন রতা কুকি রমণী ১৫৩
৩৬। রিয়া ও রিয়া পরিহিতা রমণীবৃন্দ ১৫৪
৩৭। বিজয়মাণিক্যের প্রদত্ত শাসন (হস্তী ও ব্যাঘ্র) ১৬২
৩৮। কদ্‌বা (সাঙ্কেতিক চিহ্ন) ১৭১
৩৯। ফুরাই ও ওয়াথলং ১৭২
৪০। রাজগণের কালজ্ঞাপক তালিকা ১৮৪

মানচিত্র

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের সমসাময়িক ত্রিপুর রাজ্যের মানচিত্র ... ...

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই লহর সংসৃষ্ট চিত্র সংগ্রহ বিষয়ে, চিত্রকলাবিদ্ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মণ মহাশয়, এবং ৺চন্দ্রনাথ তীর্থের সেবায়েত ও সাহিত্যিক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরকিশোর অধিকারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় হইতে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন

ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।

শ্রীরাজমালা।

(দ্বিতীয় লহর।)

মঙ্গলাচরণ।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।

প্রস্তাবনা।

অমরমাণিক্য (১) ছিল ধর্ম্ম মহারাজ।
সিংহাসনে বসিলেক মন্ত্রীর সমাজ।।
সেই ত সভাতে ছিল বৃদ্ধ সেনাপতি।
রণ চতুর নারায়ণ ছিল তার খ্যাতি।।
অমরমাণিক্য রাজা তাকে জিজ্ঞাসিল।
মহামাণিক্যের (২) পরে যত রাজ হৈল।।
শ্রেণীক্রমে কহ তুমি সে সব কথন।
যে মতে শাসিল রাজ্য প্রজার পালন।।

গ্রন্থারম্ভ।

মহামাণিক্য নৃপতি পুণ্যতর নর।
তাঁহার তনয় ছিল পঞ্চ সহোদর।।

---

(১) **অমরমাণিক্য** — ত্রিপুরাধিপতি। ইনি মহারাজ জয়মাণিক্যের পুত্র; চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৫৮ ও ত্রিপুরা হইতে ১১৩ স্থানীয়। ইঁহার আদেশে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছিল।

(২) রাজমালা প্রথম লহরে মহামাণিক্যের শাসনকাল পর্য্যন্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই লহরে তৎপরবর্ত্তী রাজগণের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্ম নাম সন্ন্যাসী হইয়া।
কর্ম্মপাশে নানা তীর্থে গেলেক চলিয়া।।
নানা তীর্থ ভ্রমিয়া সে পুণ্য উপার্জ্জিল।
বারাণসী ক্ষেত্রে পুনি আসিয়া রহিল।।
এক দিন নিদ্রাযুক্ত বৃক্ষ মূলে শুইল।
সর্পে পট (১) ধরিয়া যে মস্তকে রহিল।।

১। পট — ফণা।

যাহার মস্তকোপরি সর্পে ফণা বিস্তার করে, সেই ব্যক্তি ভবিষ্যতে রাজা হইবে, হিন্দুগণের ইহাই বিশ্বাস। এতৎসম্বন্ধে রাজমালার সমালোচক রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেব বলিয়াছেন, —

"Dharma Manik the 104th Raja travelled as a Fakir through various places ; when at Benares his future exaltation was signified by a snake twined round his body with his head reared over his person. This is considered by the Hindus a presignification of future sovereignty ; they derive the practice from the period when Bhagaban or Krishna slept in the Ksairoda Samudra on the back of the snake Ananta who covered him with his expanded hood." J. A. S. B. — Vol. XIX

সর্পঘটিত নানা কথা প্রাচীন গ্রন্থসমূহে অনেক পাওয়া যায়। এ স্থলে দুইটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদান করা হচ্ছে —

(১) "যখন বিশুর সপ্তম বর্ষ বয়েস এক দিবস ক্রিয়ান্তে শ্রান্ত হইয়া বৃক্ষ ছায়াতে শয়ন করিয়া আছেন, সূর্য্যের উত্তাপে ঘর্ম্ম হইয়াছে, অন্য অন্য বালক সকল ব্যবধান ছিল। ইত্যবসরকালে এক প্রবীণ সর্প আসীয়া মস্তকোপরী ফণা ধরিয়া রৌদ্র নিবারণ করিয়াছিল। যখন বিশুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল তখন সেই সর্প বনেতে গমন করিল। বিশু গ্রীহেতে আশীয়া মাতাকে বিস্তার নিবেদন করিলেন।"

রাজাবলী — দেবখণ্ড, ৭ম অঃ।

ইহা বেহারের ইতিবৃত্ত-হস্ত লিখিত গ্রন্থ। ইহাতে বর্ণাশুদ্ধির অভাব নাই। উদ্ধৃত অংশের বর্ণবিন্যাস ও শব্দ অবিকল রাখা হইল।

(২) সমসের গাজির সম্বন্ধে পাওয়া যায়, —

"আর দিন গাজিবর মএদানে যাইয়া।
* * * রূপ দরাক্ষ (বৃক্ষ) দেখিয়া।।
ছাআতে (ছায়াতে) চাদর অদ্দ (অর্দ্ধ) ডালিয়া তখন।
অদ্দেক উপরে ডালি ডাকিআ (ঢাকিয়া) বদন।।
বৃক্ষের শিকরপরে কর মুণ্ড দিয়া।
পাইআ সিতল বাইউ রহিল সুতিয়া।।
হেনকালে আইখে (আঁখে) নিদ্রা আচম্বিত লাগে।
পসু পক্ষি নাই তাহে দুপ্রহর ভাগে।।
* * * * *
তাতে বিধি পরসনে বসন উপরে।
ভুজঙ্গে সংগমে দুই জরাজরি করে।।" ইত্যাদি।

— গাজিনামা পুথি।

কৌতুক নামেতে এক কনৌজিয়া (১) দ্বিজ।
সস্ত্রীক হইয়া রহে বারাণসে নিজ।।
সর্পে পট ধরিয়াছে সন্ন্যাসীর মাথে।
ব্যেস্ততে (২) জাগায় দ্বিজ সন্ন্যাসীকে পথে।।
জিজ্ঞাসিল বিপ্রে তাকে কোন দেশী লোক।
এথাতে থাকিয়া কেনে পাও এত দুঃখ।।
সন্ন্যাসীয়ে বলে আমি জাতিয়ে ত্রিপুর। (৩)
অগ্নি কোণে রাজ্য আমা হয় বহু দূর।।
ব্রাহ্মণে বলেন তুমি নিকৃষ্ট না হয়।
দেশে চল রাজ্য পাবা বলিল নিশ্চয়।।
এ কথা শুনিয়া রাজা ঈষৎ হাসিল।
আপনে যাইবা সঙ্গে বিপ্রকে বলিল।।
কৌতুক ব্রাহ্মণ বলে যাব আমি সঙ্গে।
রাঙ্গামাটী (৪) বঞ্চিব যে ত্রিপুরাতে রঙ্গে।।
সত্য করে ব্রাহ্মণে রাজা যে সত্য কৈল।
বিশ্বেশ্বর পূজা করি বাসাতে আসিল।।
সেই কালে দেশী লোক গেলেক তথাতে।
রাজা করিবার হেতু ধর্ম্মকে আনিতে।।
বারাণস স্থানে লোক চর্চ্চিল (৫) যখন।
কৌতুক ব্রাহ্মণে পাইয়া আনিল তখন।।
রাজপুত্র হইয়াছে সন্ন্যাসী স্বরূপ।
দেখিয়া দেশের লোক মনেতে বিরূপ।।
নমস্কার করি কহে যতেক প্রসঙ্গ।
রাজা হইবারে চল না ছাড়িব সঙ্গ।।
তোমা পিতা মহামাণিক্য শীতলা (৬) হইয়া।
বৈকুণ্ঠ নিবাসী হৈল পঞ্চ সুত রাখিয়া।।

(১) কনৌজিয়া — কান্যকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণ। (২) ব্যেস্ততে — ব্যস্ত হইয়া।

(৩) ত্রিপুরাবাসী বিধায় নিজকে 'জাতিতে ত্রিপুর' বলিয়াছেন, যেমন বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালী, উড়িষ্যবাসীগণ উড়িয়া ইত্যাদি।

(৪) রাঙ্গামাটী — ত্রিপুরার পূর্ব্ব রাজধানী উদয়পুরের প্রাচীন নাম।

(৫) চর্চ্চিল — অনুসন্ধান করিল।

(৬) শীতলা — বসন্ত রোগ।

তোমা চারি ভাই আছে রণের মাঝার।
সেনাপতি নাহি দিছে রাজা করিবার।। (১)
দশ সেনাপতি মধ্যে রাজা হতে চায়।
না মানে কাহাকে কেহ মনে ভয় পায়।।
পাত্র মিত্র সকলে তোমাকে আকাঙ্ক্ষিয়া।
আমা সব পাঠাইছে এই নিবেদিয়া।।
শীঘ্র চল রাজা হৈবা রাজা শূন্য দেশ।
বিলম্ব না কর এই কহিল বিশেষ।।
তাহা শুনি রাজাসুত কহিলেক রঙ্গে। (২)
কৌতুকাদি অষ্ট বিপ্র লইলেক সঙ্গে।।
কত দিনে আসিলেক দেশ সন্নিহিতে।
সৈন্য সেনাপতি আসে আগু বাড়ি নিতে।।
পঞ্চ ভ্রাতৃ মিলিয়া করিল আলিঙ্গন।
রাজপদ ধূলি লৈল সেনাপতিগণ।।

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড।

শুভক্ষণে শুভদিনে করিলেক রাজা।
সিংহাসনে বসাইল মিলি সব প্রজা।।
প্রথম বয়স কালে বহু ধর্ম্ম কৈল।
সেই কারণে ধর্ম্মমাণিক্য নাম হৈল।।
কালা খাঁ গগন খাঁ আর খাঁ ছামথুম।
অমাত্য হইল তারা শত্রু কালধূম।। (৩)
তের শত আশী শকে শ্রীধর্ম্মমাণিক্য।
নৃপতির নীতি ধর্ম্ম বলিতে অশক্য।। (৪)
চিরকাল রাজ্য পালিলেক মহারাজা।
শত্রু নাহি ছিল তার বঞ্চিলেক প্রজা।।

---

(১) তোমার চারি ভ্রাতা রাজ্য লালসায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত আছেন, কিন্তু সেনাপতিগণ তাঁহাদিগকে রাজা হইতে দিতেছেন না।

(২) পাঠান্তর — "হেন শুনি রাজপুত্র চলিলেক রঙ্গে।"

(৩) শত্রু কালধূম — শত্রুর পক্ষে ইহাঁরা যম এবং উপপ্লবের আকর ধূমকেতু স্বরূপ ছিলেন।

(৪) অশক্য — অসাধ্য।

দ্বিতীয় লহর—৫ পৃষ্ঠা।

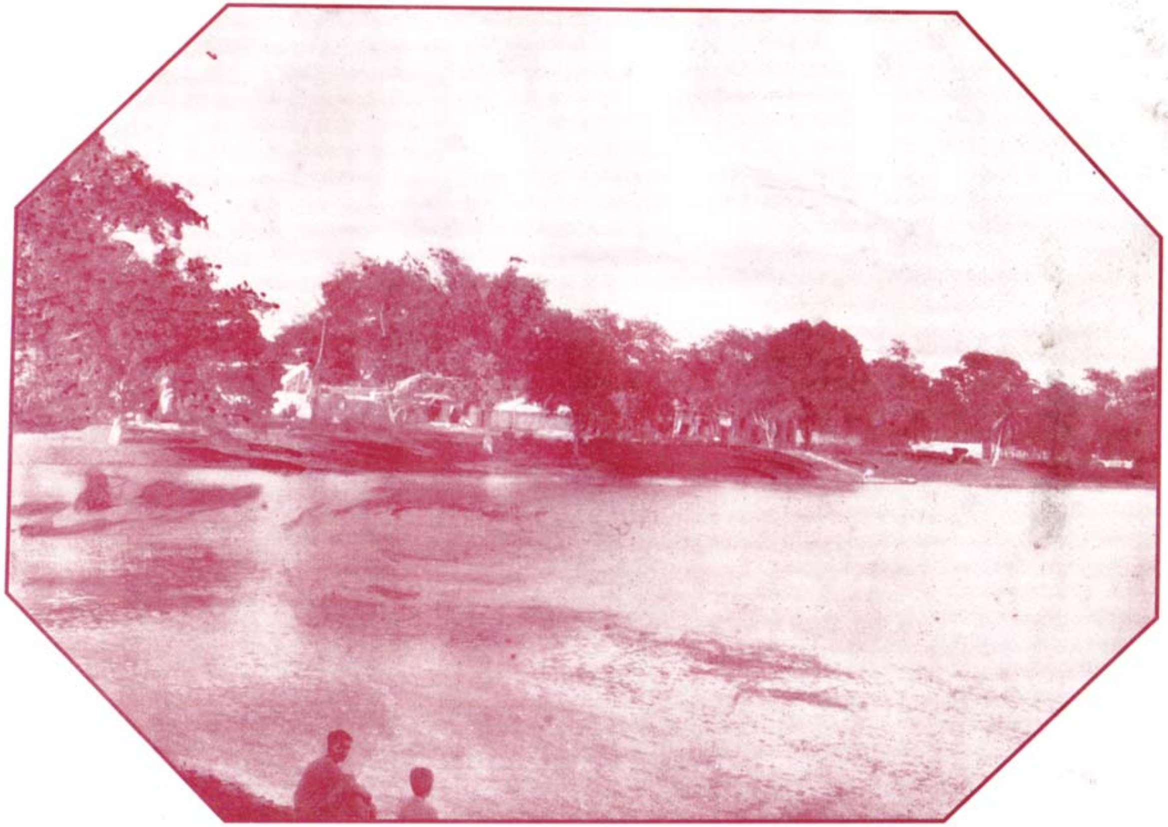

ধর্ম্মসাগর - কুমিল্লা

পরকাল চিন্তি রাজা চিত্ত শান্তাইল। (১)
ভূমি দান করিবারে ব্রাহ্মণ আনিল।।
ধর্ম্মসাগর (২) নামেতে জলাশয় দিয়া।
তার চারি পারে সব দ্বিজ বসাইয়া।।
মহা বিষুবেতে (৩) দিল ভূমি উৎসর্গিয়া।
কৌতকাদি বাণেশ্বর ব্রাহ্মণ অর্চ্চিয়া।।
কৌতকাদি ব্রাহ্মণেতে করে ভূমি দান।
তাম্র পত্রে লিখি দিল বচন প্রমাণ।।

অথ শ্লোক।

চন্দ্র বংশোদ্ভবঃ স্বাপ মহামাণিক্যজঃ সুধীঃ।
শ্রীশ্রীমদ্ধর্ম্ম মাণিক্য ভূপশ্চন্দ্রকুলোদ্ভবঃ।।

তথার পয়ার।

চন্দ্র বংশেতে মহামাণিক্য নৃপবর।
তান পুত্র শ্রীধর্ম্মমাণিক্য শশধর।।

শ্লোকঃ।

শাকে শূন্যাষ্ট বিশ্বাব্দে বর্ষে সোম দিনে তিথৌ।
ত্রয়োদশ্যাং সিতে পক্ষে মেষে সূর্য্যস্য সংক্রমে।।

তথার পয়ার।

তের শত আশী শকে সোমবার দিনে।
শুক্ল পক্ষ ত্রয়োদশী মেষ সংক্রমণে।।

---

(১) শান্তাইল — শান্ত করিল।

(২) কুমিল্লা সহরের বক্ষঃস্থলে, সুনীল ও স্বচ্ছ-বারিবিশিষ্ট যে বিশাল সরোবর শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থিত কৌস্তুভ মণির ন্যায় শোভা পাইতেছে, তাহাই মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি 'ধর্ম্মসাগর'। ইহার পূর্ব্বতীরে কুমিল্লার জেলাস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কৈলারগড়ে (কস্‌বায়) আর একটি ধর্ম্মসাগর আছে, তাহাও এই মহাপুরুষের কীর্ত্তি।

(৩) মহাবিষুব — সূর্য্য মীন রাশি হইতে যে সময় মেষ রাশিতে সংক্রান্ত হয়, সেই সংক্রান্তিকে মহাবিষুব বা মেষ সংক্রান্তি বলে। এই সময় দিবা রাত্রি সমান বলিয়া ইহার নাম মহাবিষুব। ইহার অপর নাম চৈত্র সংক্রান্তি। এই সংক্রমণ দিন অতিশয় পুণ্যাহ বলিয়া গণ্য। এই দিনে শক্তু (যবের ছাতু) ও বারিপূর্ণ ঘট দান করিলে পরমাগতি লাভ হয় ; যথা ঃ—

"এষ ধর্ম্ম ঘটোদত্তো ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাত্মক।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ।।
বৈশাখে যো ঘটং পূর্ণং সভোজ্যং বৈ দ্বিজন্মনে।
দদাতি সুররাজেন্দ্র! স যাতি পরমং গতিম্।।"

— তিথিতত্ত্ব।

এই দিন পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে জলপূর্ণ ঘট এবং ছত্র ও পাদুকাদি দান বিশেষ পুণ্যজনক।

তাম্র পত্রে লিখি দিল এ সব বচন।
আমা বংশ মারি যেবা হয় ত রাজন।।
তাহার দাসের দাস হইবেক আমি।
আমা কীর্ত্তি ব্রহ্ম বৃত্তি না লঙ্ঘিও তুমি *।।
এই মতে মহারাজা শ্রীধর্ম্মমাণিক্য।
যথেষ্ট করিল দান কহিতে অশক্য।।
পূর্ব্ব রাজমালা ছিল ত্রিপুর ভাষাতে।
পয়ার গাঁথিল সব সকলে বুঝিতে (১)।।
সু-ভাষাতে (২) ধর্ম্মরাজে (৩) রাজমালা কৈল।
রাজমালা বলিয়া লোকেতে নাম হৈল।।
বত্রিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ ছিল।
সুমধুর বাক্যে রাজা প্রজাকে পালিল।।
শীতলা হইয়া রাজা স্বর্গ আরোহণ।
শ্রীধন্য প্রতাপ দুই তাহার নন্দন।।

প্রতাপমাণিক্য খণ্ড।

প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র লোকে রাজা করে।
অধার্ম্মিক দেখি তাকে লোকে মারে পরে।।
মহা বলবন্ত দেখি দিনে না মারিছে।
সেনাপতি সবে চক্রে রাত্রিতে বধিছে।।
হুলস্থূল ভয় বহু রাঙ্গামাটী হৈল।
পুরোহিত গুপ্তভাবে ধন্যকে রাখিল।।
পরস্পর রাজা হৈতে চাহে সেনাপতি।
না মানে কাহারে কেহ প্রাণ ভয় অতি।।
শ্রেষ্ঠ বড় সেনাপতি মনেতে ভাবিয়া।
বিবেচনা করিলেক স্থিরতা হইয়া।।

---

* সনন্দের বিবিরণ পরবর্ত্তী টীকায় দ্রষ্টব্য।

(১) ইহা রাজমালা প্রথম লহর।

(২) রাজমালা ত্রিপুর ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এ স্থলে বঙ্গ ভাষাকে 'সু-ভাষা' বলা হইয়াছে।

(৩) ধর্ম্মরাজ — ধর্ম্মমাণিক্য।

ধন্য নামে আছে এক নৃপতি নন্দন।
তাঁহাকে করিব রাজা করি শুভক্ষণ।।
এহা ভাবি গেল তারা ধাত্রী আছে যথা।
জিজ্ঞাসিল ধন্য তুমি রাখিয়াছ কোথা।।
রাজা করিবার তরে চাহি যে তাহারে।
শুভ দিনে রাজা করি দেও আনি তারে।।
এ কথা শুনিয়া ধাত্রী হরিষ বিষাদ।
মারিবার চাহে বুঝি না জানি প্রমাদ।।
ধাত্রী বলে জানি ধন্য গেছে কোন স্থান।
তুমি সত্য কৈলে আমি বিচারি সন্ধান।।(১)
সত্য করি সেনাপতি শালগ্রাম ছুইল।
পুরোহিত ঘরে ছিল সঙ্গেতে বলিল।।
পরে দশ সেনাপতি সৈন্য সজ্জা করি।
পুরোহিত গৃহে গেল হস্তী অশ্বে চড়ি।।
মাচাঙ্গের (২) নীচে হৈতে ধন্যকে আনিছে।
ভয়যুক্ত মধুর বাক্য বালক বলিছে।।
একাদশ বর্ষ হৈছে ধন্যের বয়স।
বালক মারিয়া নহে রাখিও কুযশ।।
পুরোহিত ঘরে আমি সেবক হইয়া।
এক মুষ্টি অন্ন খাই উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া।।(৩)
পুরোহিতে বলে সত্য করাইছি আমি।
মনে ভয় না করিবা রাজা হবা তুমি।।

---

(১) পাঠান্তর — "আমি ত না জানি ধন্য গেলেন কোথাই।
তুমি সত্য কর আমি বিচারিয়া চাই।।"

(২) মাচাঙ্গ — বংশমঞ্চ। সেনাপতিগণের আগমনে ভীত হইয়া কুমার ধন্য, প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত বংশ-মঞ্চের নীচে লুক্কায়িতভাবে ছিলেন।

(৩) পাঠান্তর — "পুরোহিত ঘরে আনি সেবক হইয়া।
এক মুষ্টি অন্ন খাইমু উচ্ছিষ্ট ফেলিয়া।।"

প্রাণভয়ে ভীত রাজকুমার সেনাপতিগণের কৃপা লাভের নিমিত্ত এবম্বিধ দৈন্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ভার্গবে (১) আনিয়া যেন বলি রাজা করে। (২)
পুরোহিতে ধন্য দিল সবার গোচরে।।
ধন্যেরে দেখিয়া তবে যত সেনাপতি।
বিনয় পূর্ব্বক সবে করিল প্রণতি।।
অধার্ম্মিক দেখি তোমার ভ্রাতৃকে মারিল।
রাজা করিবারে তোমায় নিবার আসিল।।
তোমার পিতার ধর্ম্ম স্মরিয়া আপনে।
পালহ সকল প্রজা যার যেই স্থানে।। (৩)

ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

এ বলিয়া মন্ত্রীসবে স্নান করাইল।
সিংহাসনে বসাইয়া প্রণাম করিল।।
লোকে ধন্য বলিয়া তখনে কহিলেক।
শ্রীধন্য মাণিক্য খ্যাতি হৈল অভিষেক।।
বড় সেনাপতি (৪) দিল আপনার কন্যা।
মহারাণী কমলা নামে পৃথিবীতে ধন্যা।।
বঙ্গভাষা গীত রাজা তাতে না বুঝিল।
প্রেত চতুর্দ্দশী গান বর্ণিয়া শুনিল।। (৫)

---

(১) ভার্গব — ভৃগুনন্দন, শুক্রাচার্য্য।

(২) শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধের ১৫শ অধ্যায়ে লিখিত আছে, দৈত্যরাজ বলি, দেবতাগণের সহিত যুদ্ধে পরাজয় এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। স্বীয় গুরু শুক্রাচার্য্যের কৃপায় তিনি পুনর্ব্বার জীবিত হইয়া, তাঁহারই অনুগ্রহে স্বর্গরাজ্য জয় এবং দেবতাদিগকে বিতাড়িত করিয়া ইন্দ্রের সম্পদ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেনাপতিগণের হস্তে মৃত্যু আশঙ্কিত ধন্যমাণিক্য পুরোহিতের প্রযত্নে রাজ্যলাভ করায়, ভার্গবের কৃপায় মৃত বলিরাজ পুনর্জীবিত হইয়া রাজত্ব প্রাপ্তির সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

(৩) যে ব্যক্তি দরবারে যেরূপ স্থান পাইবার যোগ্য, তাহা তোমার পিতৃ নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে স্থিরতর রাখিয়া প্রজার পালন কর।

(৪) বড় সেনাপতি — দৈত্য নারায়ণ। ইনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ধন্যমাণিক্যের মহিষী ইঁহার কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম কমলা মহাদেবী।

(৫) পাঠান্তর — "বঙ্গভাষায়ে তেঁঞি কথা না বুঝিল।
প্রেত চতুর্দ্দশীর নাট সুভাষায়ে শুনিল।।"

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীকে ভূত চতুর্দ্দশী বা যম চতুর্দ্দশী বলে। এই তিথিতে ভূতের উপদ্রব নিবারণকল্পে নানাবিধ কার্য্য করা হয়। স্কন্দপুরাণ বিষ্ণু খণ্ডের ৯ম অধ্যায়ে প্রেত চতুর্দ্দশীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহা কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী।

দ্বিতীয় লহর—৮ পৃষ্ঠা।

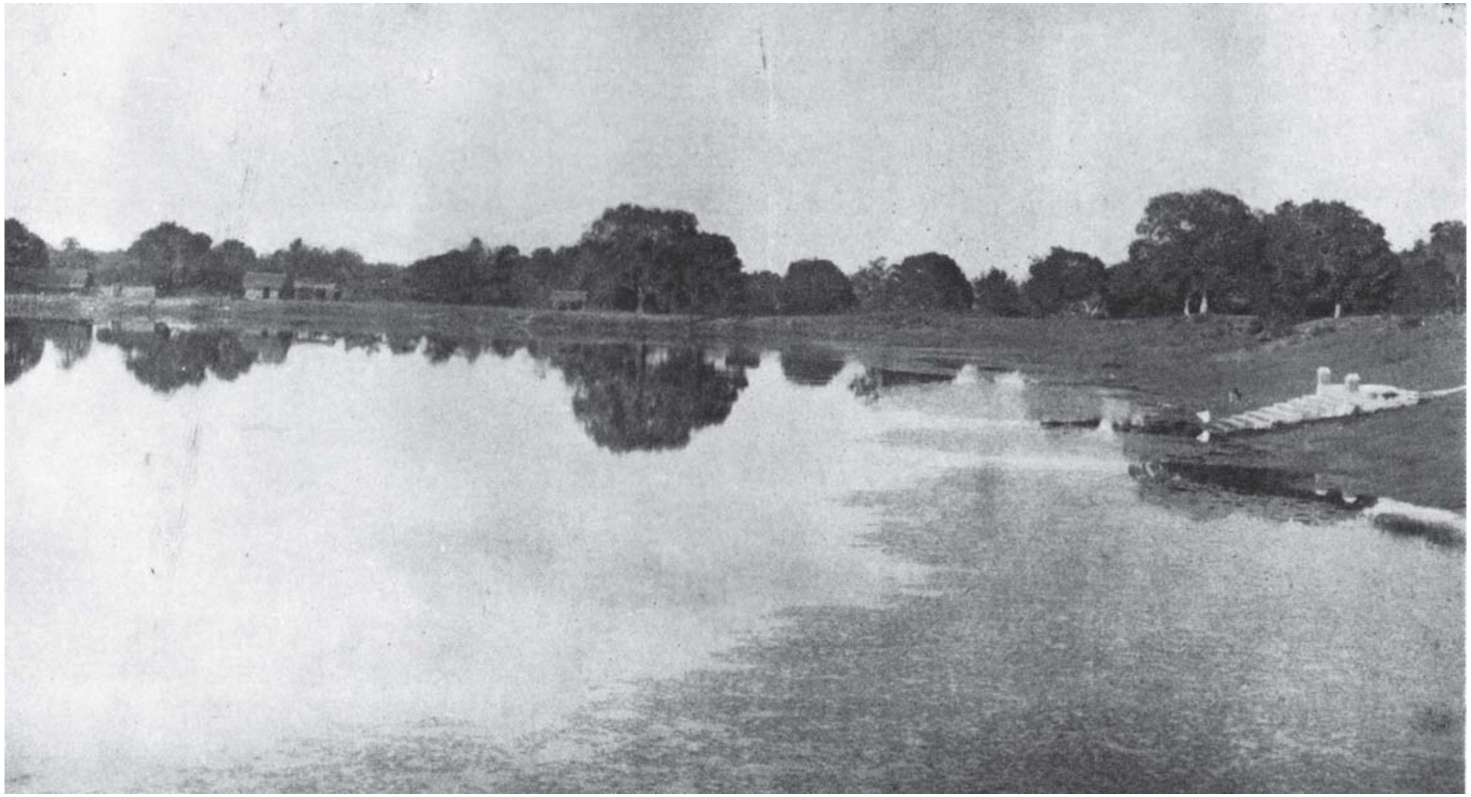

কমলাসাগর - (কস্‌বা)

রাম কবি সৃজিলেক সেই ত নৃপতি।(১)
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজার তাতে হৈল প্রীতি।।
নানা স্থানে কমলা যে দীর্ঘিকা দিয়াছে।(২)
পুণ্য হেতু পুষ্কর্ণীতে তৃণ না জন্মিছে।।
দেব গুরু দ্বিজে ভক্তি সুচরিত্রা অতি।
বিষ্ণুর কমলা হেন, শিবের পার্ব্বতী।।
অনেক করিল ধর্ম্ম শুন মহারাজ।
বিস্তারি কহিলে পুনঃ হইবেক ব্যাজ।।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা হৈয়া নরপতি।
বৎসরেক হেন মতে পালিলেক ক্ষিতি।।
সেনাপতি সকলের অনুমতি বিনে।
কিছু কর্ম্ম নৃপতি না করে কোন দিনে।।
　　এই মতে রাজ কার্য্য চলিল তখন।
পুরোহিতে নৃপতিয়ে মন্ত্রণা রচন।।
দশ সেনাপতি স্থানে সৈন্য বহুতর।
রাজ সৈন্য মধ্যে আমি বিপ্র একেশ্বর।।(৩)
সহস্রেক সৈন্য পঞ্চ সহস্র পাইছে।(৪)
সেনাপতি সবে সৈন্য বাঁটিয়া লইছে।।

বঙ্গভাষায় প্রেত চতুর্দ্দশী গান প্রচলিত ছিল বলিয়া রাজমালার কথায় বুঝা যায়। মহারাজ এই গীত বুঝিতে না পারায় সুভাষায় পুনর্ব্বার রচনা করাইয়াছিলেন। এই ‘সুভাষা’ শব্দদ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে কি না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

(১) পাঠান্তর — “রাম কবি সৃজিলেক সেই নৃত্য গীত।
　　শ্রীধন্য মাণিক্য রাজার হইলেক প্রীত।।”

এই বাদ্য দ্বারা জানা যায়, উপরিউক্ত প্রেত চতুর্দ্দশীর গীত রাম কবির রচিত। এই কবির পরিচয় বা তাঁহার রচিত গান বর্ত্তমানকালে পাইবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা প্রেত ভয় নিবারক রামায়ণ হইবে।

(২) কস্‌বার সন্নিহিত ‘কমলাসাগর’ দীঘি মহারাণী কমলা দেবীর সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। এই দীর্ঘিকার জল এত উৎকৃষ্ট যে তাহা পান করিলে রোগমুক্ত হওয়া যায়, সাধারণ লোকের ইহাই বিশ্বাস। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ‘কমলাসাগর’ ষ্টেসন এই সরোবরের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত, এবং উক্ত সরোবরের নামানুসারে ষ্টেসনের নামকরণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উদয়পুরে আর একটী ‘কমলাসাগর’ আছে।

(৩) পাঠান্তর — “দশ সেনাপতি ঘরে হসম বিস্তর।
　　রাজ সৈন্য আনি মাত্র হইছি একেশ্বর।।”

প্রাচীনকালে ত্রিপুররাজ্যে সৈন্যকে ‘হসম’ বলা হইত। বর্ত্তমানকালেও এই রাজ্যে হসম ভোজনের প্রথা প্রচলিত আছে, তদ্বিবরণ এই লহরের টীকায় দ্রষ্টব্য।

(৪) পাঠান্তর — “কেহ সহস্র কেহ পঞ্চ সহস্র পাইছে।”

ত্রিলোচন রাজাবধি এমত হইছে।
সেনাপতি সকলে রাজাকে বধিয়াছে।।
আপনা হইতে রাজা মারে সৃষ্টি করে।
এহা ভাবি চিত্ত আমার সদা থাকে ডরে।।
সৈন্য সেনা কাড়ি লৈলে নির্ব্বলী হইব।
রাজা বলবন্ত হেন তবে ভয় পাইব।।
অসম্মতে সৈন্য সব তুমি কাড়ি নিতে।
না জানি কি করে তারা আমার সহিতে।।
কোলাহল কি কারণে বাড়াইতে চাহ।
নখে ছেদি বৃক্ষ কেন কুঠার লাগাহ।। (১)
মহা ব্যাধি জন্মে যদি অধিকাঙ্গ হয়।
বিকৃতি আকারে হেরি লজ্জা যে জন্মায়।।
অস্ত্র দিয়া ছেদ করি তারে যদি ফেলে।
তবে তাকে উপহাস্য না করে সকলে।। (২)
অতি শিষ্ট না হইব নাতি ক্রোধ মতি।
এই মতে বুঝাইছে শুক্র বৃহস্পতি *।।
রাজসিক ভাব যদি রাজার না হয়।
অতি শিষ্ট হৈলে রাজা জীবন সংশয়।
কহিল তোমাতে যুক্তি আমি পুরোহিত।
আমা কথা মতে চল পাইবা বিহিত।।
মল্ল-বিদ্যা শিখিয়া থাকিবা অন্তঃপুরে।
রাজার ব্যাম বলি কব প্রজা সকলেরে।।

---

(১) নখে ছেদনযোগ্য বৃক্ষে কুঠার লাগান নিষ্প্রয়োজন।

(২) মহা ব্যাধি কিম্বা অধিকাঙ্গ হইলে তাহা ছেদন করা যেমন নিন্দনীয় নহে, তদ্রূপ অত্যাচারী সেনাপতিদিগকে বধ করাও নিন্দাজনক কার্য্য নয়।

* "ন রাজ্ঞা মৃদুনা ভাব্যং মৃদুহি পরিভূয়তে।।
ন ভাব্যং দারুণে নাতি তীক্ষ্ণাদুদ্বিজতে জনঃ।
কালে মৃদুর্যোভবতি কালে ভবতি দারুণঃ।।"
মৎস্যপুরাণ, — ২২০ অঃ, ২২-২৩ শ্লোক।

মর্ম্ম ঃ— রাজা অতিশয় মৃদু হইবেন না ; কারণ, মৃদু ব্যক্তি পরাভব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অতি উগ্র প্রকৃতিও হইবে না ; কারণ, তীব্র রাজা হইতে সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। রাজা কালে মৃদু ও কালে উগ্র হইবেন।

এই নীতিবাক্য শুক্রনীতি এবং মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

ভাল যুক্তি বলিয়াছ রাজায় বলিয়াছে।
এ হতে অধিক যুক্তি আর নাহি আছে।।
ধন জন দিয়া কার্য্য সেনাপতি করে।
তিন মাসাবধি রাজা রোগান্বিত ঘরে।।
রাজার হইয়াছে রোগ জানে সর্ব্বলোকে।
রাণী পিতা সেনাপতি রাজদ্বারে থাকে।।
রাজ কর্ম্ম করে যে সতর সেনাপতি।
মল্ল-বিদ্যা শিক্ষা করে ঘরে নরপতি।।
রাণী সঙ্গে দেখা রাজার নাহি কদাচিত।
রাণী পিতা শুনিলেক এসব চরিত।।
সেনাপতি কন্যা স্থানে জিজ্ঞাসা করিছে।
জামাতা নৃপতির কিবা ব্যাম জন্মিয়াছে।।
কন্যা বলে আমি তাকে না দেখি বিস্তর।
অন্ধকারে থাকে রাজা শরীর বৃহত্তর।।
সেনাপতি বুঝিলেক জল জন্য রোগ।(১)
এহাতে নৃপের বুঝি হবে দুঃখ ভোগ।।
নৃপতি দেখিতে চাহে সেনাপতিগণ।
পুরোহিত শুনিয়া বলে হৈল বিলক্ষণ।।
বড় দুঃখ পায় রাজা কহে পুরোহিত।
কালি দেখাইব রাজা চলিহ সহিত।।
রাজার নিকটে কহে পুরোহিত তখন।
পুরোহিত নৃপতি মন্ত্রণা সেইক্ষণ।।
ত্রিশ চল্লিশ জন সেনা তখনি আনিয়া।
গুপ্ত কথা শিখাইল গোপন করিয়া।।
পুরোহিত করে যাকে ইঙ্গিত আকার।
খড়গ গিয়া মস্তক কাটিবা শীঘ্র তার।।
এমত সন্ধানে দ্বারে রাখে বীর জন।
নিশাকালে করে রাজা এসব রচন।।

(১) রাজার শরীর হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে শুনিয়া সেনাপতি মনে করিলেন, রাজা পাণ্ডু রোগগ্রস্ত হইয়াছেন।

নৃপতি দেখিতে চলে চলে দশ সেনাপতি।
পুরোহিত লৈয়া গেল অতি শীঘ্রগতি।।
পুষ্ট হৈছে নরপতি মল্ল বিদ্যা ক্রমে।
দেখি সেনাপতিগণে রাজাকে প্রণমে।।
প্রীতি কথা কহি রাজা বিদায় করে পুনি। (১)
প্রণমিয়া সেনাপতি বিদায় তখনি।।
ইঙ্গিত করিল দ্বিজে নমস্কার কালে।
খড়্গোতে মস্তক কাটে সেনাপতি (২) ছলে।।
সেনাপতি দেহ সব করিল অন্তর।
পুত্র পৌত্র মারিয়া লুটিল সেনা ঘর।।
সেনাপতিগণ ঘরে বীর শূন্য হৈল।
নৃপতি নবীন সৈন্য বিবেচি (৩) রাখিল।।
গৌড়েশ্বর সৈন্য মত সৈন্য যে রাজার।
বার কোটী পদাতি নৃপ করয়ে প্রচার।।
সরদার করিলেক অৰ্দ্ধ সৈন্য দিয়া।
হাজারী করিয়াছিল কত সৈন্য লৈয়া।।
বার কোটী সেনা হৈল অনুক্রম মতে।
অশেষ রাজার সৈন্য হইল তাহাতে।।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা তদবধি সেনা।
বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা।।
নূতন করিল রাজা সব সেনাপতি।
রাজ আজ্ঞা অনুসারে কাৰ্য্যে করে গতি।। (৪)
এই মতে সেনা লোক করিল স্থাপন।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা পুণ্যের ভাজন।।
কালান্তরে মহারাজা মনে বিবেচিল।
বঙ্গদেশ জিনি লৈতে মনেতে চিন্তিল।।

---

(১) পুনি — পুনর্ব্বার।
(২) সেনাপতি — সেনাপতির।
(৩) বিবেচি — বিবেচনা করিয়া।
(৪) সেনাপতিগণের ক্ষমতা খৰ্ব্ব করিয়া, রাজ আজ্ঞানুসারে কাৰ্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

মহারাজ ধন্য মাণিক্যের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ
উদয়পুর।

মেহারকুল পাটীকারা গঙ্গামণ্ডল গ্রাম।
বগাসারি আদি করি বহুবিধ নাম।।
বেজুরা যে কৈলা আদি ভানুগাছ দেশ।
বিষ্ণাজুড়ী লঙ্গলা লয় জিনিয়া বিশেষ।
গৌড়াধিপতি রাজ্য বরদাখাত আদি।
রাজায়ে কাড়িয়া লৈল হইয়া বিরোধি।। (১)
বরদাখাতে জমিদার প্রতাপ মহামতি।
গৌড়ে না মিলিয়া রাজা সঙ্গে করে প্রীতি।।
এইরূপে বঙ্গ দেশ আমল সকল।
না মিলে খণ্ডল রাজ্য হইয়া সবল।।
খণ্ডলে নৃপতি সৈন্য বসাইল থানা।
লস্কর (২) করিয়া রাখে রাজ এক সেনা।।
আমল (৩) করিয়া খণ্ডল সসৈন্যে বসিল।
খণ্ডলিয়া লোকে তাতে লস্কর ধরিল।।
লস্কর ধরিয়া তারা নিলেক গৌড়েতে।
যুক্তি করি দিল নিয়া গৌড়ের অগ্রেতে।।
হস্তী দিয়া মারিতে গৌড়েশ্বরে আজ্ঞা দিল।
হস্ত পদে জিঞ্জির (৪) লস্কর লৈয়া গেল।।
লস্করে বুঝিল তাকে মারিবে নিশ্চয়।
এক সেনা হস্ত হৈতে খড়্গ কাড়ি লয়।।
মারিল বিংশতি জন বিক্রম করিয়া।
মাহুতে টুয়াইল (৫) গজ অঙ্কুশ মারিয়া।।
নাকে মুখে মারিলেক পঞ্চ তলোয়ার।
ভঙ্গ দিল সেই গজ ছাড়িয়া চীৎকার।।
অন্য মহাগজ আনি পুনঃ টুয়াইল।
বিক্রমে মারিল কোব্ দন্তেতে লাগিল।।

---

(১) এই সকল স্থানের বিবরণ এই লহরের টীকায় প্রদান করা হইয়াছে।
(২) লস্কর — শাসনকর্ত্তা। এই পদ মুসলমানের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছিল।
(৩) আমল — দখল।
(৪) জিঞ্জির — শৃঙ্খল।
(৫) টুয়াইল — রোখাইল।

ধন্য ধন্য বলি তাকে কহে সর্ব্বলোকে।
এমত বিক্রম লোক পর্ব্বতেতে থাকে।।
আর চোট্ মারিছিল খড়্গ যে ভাঙ্গিল।
সেই ত কারণে গজে তাহাকে বধিল।।
এ কথা শুনিয়া কহে গৌড়ের ঈশ্বর।
ফিরাইয়া না আনিলা আমার গোচর।।(১)
আপনার কর্ম্ম দোষে এমতে মরিল।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা এ সব শুনিল।।
অগ্নি হেন ক্রোধে জ্বলে রাজা মহাবল।
রায়কাচাগ সেনাপতি পাঠায় খণ্ডল।।
কটক (২) দেখিয়া তারা ভয়াতুর হৈল।
বিষ কুম্ভ পয়ো মুখ মতে মিলি ছিল।।(৩)
দ্বাদশ বসিক (৪) সে যে খণ্ডল জমিদার।
আনিল রাজার পাশে মান্য ব্যবহার।।(৫)
প্রধান বসিক সঙ্গে মিত্রতা রাজার।
আর বসিক মিত্রতা যে সেনা সমখার।।
আর দিন রাজা বলে বসিকের ঠাঁই।
আপনা হাজিরা দেহ দেখিতে যে চাই।।
গোপনেতে শিখাইল ত্রিপুর সৈন্যেরে।
এক সেনা এক বসিক থাকিবা অন্তরে।।
যে সময় আমি বলি সবে মিত্র কর।
যার যেই ভাগে পড়ে কাটিবা সত্বর।।

---

(১) আমার নিকট ফিরাইয়া আনিলা না কেন?

(২) কটক — সৈন্য।

(৩) বিষপূর্ণ কুম্ভের মুখে কিঞ্চিৎ ঘৃত ঢালিয়া তাহাকে ঘৃতকুম্ভ প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসের ন্যায়, অনেক শত্রু হৃদয়ের বিদ্বেষবহ্নি মিষ্ট বাক্যের আবরণে ঢাকিয়া, সম্মুখে মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করে এবং পরোক্ষে শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়। নীতি শাস্ত্রে এই শ্রেণীর লোক 'বিষকুম্ভ পয়োমুখম্' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বলা হইয়াছে, যথা ; —

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিন।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।।"

(৪) বসিক — ভূম্যধিকারী, শাসনকর্ত্তা। মুসলমান শাসনকালে খণ্ড খণ্ড ভূভাগে এক এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হইত, উক্ত বিভক্ত ভূভাগকে 'সিক' এবং তাহার শাসনকর্ত্তাকে 'বসিক' বা 'সিকদার' বলা হইত। 'দক্ষিণ সিক' ও 'ছত্র সিক' ইত্যাদি ভূখণ্ডের নাম তেদনুকরণে হইয়াছে।

(৫) মান্য ব্যবহার — ভেট।

আমিহ কাটিব তার প্রধান বসিক।
আদ্যে (১) বসাইব তাকে মান্যে মিত্রাধিক।।
এ সব মন্ত্রণা শুনি রাজ সৈন্যগণে।
সুসজ্জা করিয়া আইল রাজার সদনে।।
বসিক সকল আইল হাজিরা দিবারে।
দুই সহস্র পদাতি আসিল ধনুঃশরে।।
বসিয়াছে মহারাজা সিংহাসন পরে।
বসিক সকল বৈসে তারা পাট ঘরে।। (২)
পংক্তি করিয়া সবে লিখায় হাজিরা।
কাহেস্তে গণিয়া বসিক লিখয়ে মুজরা।।
এক এক সেনা আগে এক এক বসিক।
পংক্তি পাছে রৈল গিয়া হইয়া রসিক।।
রাজ আজ্ঞা অনুসারে দাঁড়াইল গিয়া।
ইসারাতে কহে সেলাম বাদ্য বাজাইয়া।।
সেলাম করিতে শির নত যেই কাল।
সেই কালে সেনা বসিক কাটে খড়্গে ভাল।।
প্রধান বসিক ঘাতে নৃপতিয়ে আগে।
সেনায় কাটিল বসিক যার যেই ভাগে।।
এই রূপে কাটিয়া যে খণ্ডলের প্রজা।
সসৈন্যে খণ্ডলে গেল সেই মহারাজা।।
বৃক্ষ পত্র পৈরাইয়া (৩) খণ্ডল লুটিল।
এই রূপে খণ্ডল দেশ আপনা হইল।। (৪)
পুনর্ব্বার দেশে আসি ধর্ম্ম আরম্ভিল।
ধর্ম্ম মঠ ধন্যসাগর (৫) প্রতিষ্ঠাদি কৈল।।

---

(১) আদ্যে — অগ্রে।

(২) তারা পাট ঘর — দরবার গৃহ। নক্ষত্রসদৃশ পারিষদবর্গের দ্বারা দরবারে উপবেশনের পাট (আসন) সুশোভিত বলিয়া, আসনের নাম 'তারা পাট' এবং দরবার গৃহের নাম 'তারা পাট ঘর' হইয়াছে।

(৩) পৈরাইয়া — পরিধান করাইয়া।

(৪) খণ্ডল অঞ্চলে রাজা রামগতির এক গল্প প্রচলিত আছে। পরবর্ত্তী টীকায় এই গল্প সন্নিবিষ্ট হইবে।

(৫) ধন্যসাগর ; --- এই সুবিশাল সরোবর ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া মহারাজ ধন্যমাণিক্যের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই বিশালব্যাপী

দুই বর্ষে কাটিছিল সে ধন্য সাগর।
করিল অনেক দান সেই নৃপবর।।
ভূম্যাদি ষোড়শ দান (১) করিল বিস্তর।
বিবাহ করায় রাজা ব্রাহ্মণ কোঁঙর।।
দ্বিজ জ্ঞাতি ভোজন করায় নৃপবর।
আর খাওয়াইল সৈন্য সেনা বহুতর।।
সাগরের চারি পারে বৈসায় নানা জাতি।
রন্ধন ভোজন তথা যার যেই পংক্তি।।
সেই স্থানেতে রাজা মঞ্চেতে বসিল।
কুকির সরদারে সেনা গণিতে বলিল।। (২)
সেনাগণে রন্ধন ভোজন করে সুখে।
সরদার গণিবারে গেলেন সমুখে।।
সেনা অন্ন যষ্টি (৩) লৈয়া স্পর্শিয়া গণিল।
খাইতে ছুইল যাকে কাঠি ছোয়া হৈল।।
না ছুইতে আগু পিছে খাইল উত্তম।
যার মুখে অন্ন ছিল সেই ত অধম।।
রাজ ঘরে দিছে সিধা (৪) ত্যজিতে না পারে।
ছোয়া অন্ন গিলিলেক মারিবেক ডরে।।
এই মতে কাঠি ছোয়া নাম কত সেনা। (৫)
শ্রীধন্য মাণিক্যাবধি হইল গণনা।।

'ফুলকুমারী' মৌজায় অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১,০০০ হাজার গজ, প্রস্থ ২৭০ গজ, গর্ত্তস্থ ভূমির পরিমাণ কিঞ্চিন্ন্যূন নয় দ্রোণ। এই সরোবর সম্বন্ধে শ্রেণীমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ; —

"ধন্যসাগর উদয়পুরে করিল খনন।।"

(১) ষোড়শ দান — শ্রাদ্ধাদিকালে অথবা পুণ্য কামনায় ষোল প্রকার দ্রব্য দান করা ব্যবস্থেয়। (১) ভূমি, (২) আসন, (৩) জল, (৪) বস্ত্র, (৫) দ্বীপ, (৬) অন্ন, (৭) তাম্বুল, (৮) ছত্র, (৯) গন্ধ, (১০) মাল্য, (১১) ফল, (১২) শয্যা, (১৩) পাদুকা, (১৪) ধেনু, (১৫) হিরণ্য, (১৬) রজত, এই ষোলবিধ দ্রব্য দান করাকে ষোড়শ দান বলে। (শুদ্ধি তত্ত্ব)।

(২) পাঠান্তর — "এমত সময়ে রাজা মঞ্চেত বসিয়া।
লম্ফুল সরদারকে বোলে দেখহ গণিয়া।।"

(৩) অন্নযষ্টি — ভাতের কাঠি।

(৪) সিধা — ভেট। চাউল, ডাল ইত্যাদি আহার্য্য বস্তু একত্রিত করিয়া দিলে তাহাকে সিধা বলে।

(৫) কাঠিছোঁয়া সম্বন্ধীয় বিবরণ এই লহরের টীকায় প্রদান করা হইয়াছে।

সাগরের খনন দেখিতে মহারাণী।
সৈন্যের রমণী সঙ্গে রাত্রিতে আপনি।।
জ্যোৎস্না কাল কোন রাত্র নারীগণ সঙ্গে।
মদ্য মাংস খাওয়াইয়া চাহে বহু রঙ্গে।
এই মতে আনন্দেতে বঞ্চিল তখনি।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা কমলা মহারাণী।।
ডাঙ্গর ফা রাজার কালে থানাংছিতে থানা।
থানাংছি না মিলিলেক রাজাতে আপনা।। (১)
থানাংছিতে এক হস্তী ধবল আছিল।
হেড়ম্ব (২) রাজায়ে তাকে চাহিয়া পাঠাইল।।
হেড়ম্বের দূতে আসি থানাংছিতে বলে।
ত্রিপুর সেবক তুমি আমার যে হৈলে।।
তাহা শুনি রুষ্ট হৈল থানাংছি নৃপতি।
ত্রিপুর তোমাতে নাহি দিব এই হাতী।। (৩)
সেবক নহে আমি ত্রিপুর রাজার।
শুক্ল হস্তী নাহি দিব যুদ্ধ কর সার।।
শুনিয়া হেড়ম্ব পতি আসিলেক রোষে।
সৈন্যেতে বেষ্টিত কৈল থানাংছি চারি পাশে।।
সেই কালে ত্রিপুর দূত কহে থানাংছিতে।
ত্রিপুরে না দিয়া হস্তী দেহ হেড়ম্বেতে।।
এত শুনি বলিলেক থানাংছি নৃপতি।
আমাকে জিনিয়া তোরা নেহ এই হাতী।।
মহা পর্ব্বতেতে থানা এক তার দ্বার।
মহা যত্নে হেড়ম্বে না পারে পশিবার।।
ছয় মাস চেষ্টা করি হেড়ম্বে চাহিল।
তথাপিহ থানাংছি হেড়ম্ব না ভজিল।।
সেই সে কারণে কুকি রাজাতে না মিলে।
সে পথে আসিতে কুকি থানাংছি লুটে বলে।।

---

(১) থানাংছিতে (কুকি প্রদেশে) ডাঙ্গর ফায়ের সময় সৈন্যের থানা ছিল, ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে সেই প্রদেশের কুকিগণ বিদ্রোহী হইয়া ত্রিপুরেশ্বরের সহিত মিলনে অসম্মত হইয়াছিল।

(২) হেড়ম্ব — কাছাড় রাজ্য।

(৩) এই হাতী ত্রিপুরেশ্বরকে অথবা তোমাকে দিব না।

শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা এ বার্ত্তা শুনিয়া।
রায়কাচাগ সেনাপতি যুদ্ধে পাঠাইয়া।।
ত্রিপুর সহস্র সৈন্য দিল তার সঙ্গে।
রায়কাচাগ সেনাপতি চলে যুদ্ধে রঙ্গে।।
শুভক্ষণে সৈন্য সেনা করিল গমন।
কত দিনে থানাংছি পাইল সৈন্যগণ।।
রাজদূতে চাহে থানাংছি মিলাইতে।
না মিলিয়া সেই রাজা প্রণয় করিতে।।
অষ্ট মাস যুদ্ধা সব গড় (১) বেড়ি রহে।
তথাপি থানাংছি গড় লঙ্ঘিবার নহে।।
চারি দিকে গড় সব পাষাণ পর্ব্বতে।
লঙ্ঘিবার কার শক্তি নহিল তাহাতে।।
বিশ ত্রিশ জন গড়দ্বারে বসি থাকে।
মদ্য মাংস খায় তারা অস্ত্রধারী ফাকে।।
গড়ের উপরে সৈন্য মদে মত্ত হৈয়া।
ত্রিপুরাকে গালি দেয় পদ দেখাইয়া।।
রায়কাচাগ সেনাপতি তাতে ক্রুদ্ধ হৈল।
আপনা সৈন্যের প্রতি বহুল ভর্ৎসিল।।
কাপুরুষ হও তোরা চরখা হস্তে লবা। (২)
রাজার সাক্ষাতে যাইয়া কি উত্তর দিবা।।
এ বলিয়া সেনাপতি ঘর চাল ফোড়ে।
বৃষ্টি জল পড়ুক ঘরের ভিতরে।।
জলেতে ভিজিলে সৈন্য নিদ্রা না আসিবে।
তবে সে রাজার কর্ম্ম বুঝিয়া করিবে।।
এই যুক্তি সেনাপতি করিল সলিকা (৩)।
দৈবগতি তথা এক পাইল গোধিকা (৪)।।
অষ্ট হস্ত দীর্ঘ গোধা পার্শ্বে তিন হাত।
গোধার কমরে (৫) বান্ধে দীর্ঘ বেত্র তাত।।

---

(১) গড় — দুর্গ।

(২) ত্রিপুরা রাজ্যে অকর্ম্মণ্য সৈন্যগণের দণ্ডস্বরূপ চরখা প্রদান করা হইত। এতদ্বিবরণ পরবর্ত্তী টীকায় দ্রষ্টব্য।

(৩) সলিকা — সন্ধান। (৪) গোধিকা — গো সাপ। (৫) কমর — কটীদেশ।

১। শক্তি-অস্ত্রধারী সৈন্য। ত্রিপুরা কুকি সৈন্য। ২। বন্দুকধারী সৈন্য।

শিশু সন্তান সহ কুকি দম্পতি

ছাড়িয়া দিলেক গোহিল গড়ের উপর।
যত দূর যায় গোধা যোড়ে বেত্রান্তর।।
এই মতে চড়ে গোধা গড়ের উপর।
টানিয়া চাহিল সৈন্য হৈল দৃঢ়তর।।
গড়ে ছিল যত লোক মদ্য মাংসে ভোলা।
না লৈল চৌদিগে বার্ত্তা করি অবহেলা।।
রাত্রি যোগে যুদ্ধা সবে বেতে ধরি তায়।
খড়্গ চর্ম্ম হাতে করি কোঠ (১) পরে যায়।।
গড়ে চড়িতে সেনা ঢালে শব্দ হৈল।
গবয়ে (২) ঘসিছে গাও থানাংছি বুঝিল।।
রাত্রি শেষ হয় তাতে দুই খণ্ড আছে।
রাজ সৈন্য কোঠে গেল কৌতুকেতে নাচে।।
পুরুষ সকল যত প্রাণীকে বধিল। (৩)
থানাংছির গড়োপরে রক্ত নদী হৈল।।
নারী সব লুটিয়া লইল সর্ব্বজন।
দৈবগতি মাসেকের (৪) বালক রক্ষণ।।
যার মাতা তখনেতে (৫) স্বামী এক করে।
কন্যা বলিয়া তাকে পালিল সত্বরে।। (৬)
এই মতে আমল হৈল থানাংছির থানা।
রাজনীতি থানাদার থাকে এক জনা।।
দুর্গোৎসব হয় তথা নৃপ নাম করি।
তদবধি থানার নাম ত্রিপুরার পুরী।।

---

(১) কোঠ — দুর্গ।
(২) গবয় — গরাল, গো ও মহিষের লক্ষণবিশিষ্ট বন্য জন্তু।
(৩) গড়ে যত পুরুষ ছিল তাহাদের সকলকেই বধ করিল।
(৪) মাসেকের — এক মাস বয়ক্রমের।
(৫) তখনেতে — সেই সময়, তৎকালে।
(৬) পাঠান্তর — "সার মাতা সেইক্ষণে স্বামী এক কৈল।
কন্যাটী লইয়া তারে পালিতে রাখিল।।"

ত্রিপুরবাহিনী কর্ত্তৃক থানাংচি দুর্গ জয় হইবার পর, বিজিত সৈন্যের পুরুষমাত্রকেই বধ করিয়াছিল, দৈবগতি এক মাস বয়স্ক বালকগণ রক্ষা পায়। স্ত্রীলোকদিগকে ত্রিপুর সৈন্যগণ লুণ্ঠন করিয়া লইল। যে সকল রমণী সেইকালে ত্রিপুর সৈন্যের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, সেই রমণীগণের কন্যাদিগকে প্রতিপালনার্থ রাখা হইয়াছিল।

রায়কাচাগ সেনাপতি নৃপেতে লিখিল।
যেমতে থানাংছি থানা আমল হইল।।
তাহা শুনি মহারাজা বড় তুষ্ট হৈল।
তদবধি সেনাপতি পুত্র মান্য ছিল।।
যত যত ভাল দ্রব্য যুদ্ধে পাইয়াছিল।
রাজার সাক্ষাতে সব তাহা পাঠাইল।।
ইনাম (১) পাঠাইল নৃপে অনেক বসন।
পরে রায়কাচাগ গেল কিরাত ভুবন (২)।।
পূর্ব্ব দিগেতে আদ্যে কুকি মিলাইল।
দক্ষিণেতে ছিল কুকি জিনিয়া আনিল।।
সাম্বুল প্রধান স্থানে আপনে রহিয়া।
ছাইমার ছাইবেম দেশে দূত পাঠাইয়া।।
ছাকাচের খামাচেব রাঙ্গরঙ্গ আদি।
ছাকা রাঙ্খল খামা রাঙ্খল পূর্ব্ব কূলাবধি।।
গুনৈছা খর্চ্চুং মার্ছিল আর কুকি জাতি।
ভেটিল সকল আসি পূর্ব্বপর রীতি।।
সেনাপতি কহিলেক পূর্ব্বপর কথা।
ত্রিপুরার প্রজা তোরা পূর্ব্বাবধি গাথা।।
অধর্ম্ম করিলা তোরা লঙ্ঘি নিজ ধর্ম্ম।
সে কারণ ক্ষয় তোরা বুঝিয়াছি মর্ম্ম।।
নৃপেতে দিলেক ভেট্ পূজিব চৌদ্দদেবা।
সেই পুণ্যে তোমা সব দীর্ঘজীবী হবা।।
এহা যদি সেনাপতি তাহাকে কহিল।
দেবতা সাক্ষাতে তারা সত্য নির্ব্বন্ধিল (৩)।।
রাজাতে না দিয়া ভেট্ আদ্যে না খাইব।
যদি ইহা নাহি করি তবে নষ্ট হৈব।।
শিবালয় স্থান সুবরাইখুঙ্গ (৪) নাম।
উৎসব করিল তথা যথা অনুপম।।

(১) ইনাম — বক্‌শিস, পুরস্কার।
(২) কিরাত ভুবন — লুসাই পর্ব্বত ও তৎসন্নিহিত কুকি প্রদেশ।
(৩) সত্য নির্ব্বন্ধিল — প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।
(৪) স্থানসমূহের বিবরণ পরবর্ত্তী টীকায় দ্রষ্টব্য।

কিরাতের প্রদত্ত রাজভেটের বস্তু।
(১) গবয় (গয়াল), (২) গজদন্ত, (৩) ঘোংবাদ্য, (৪) কুকিয়া ছাগ, (৫) শক্তিঅস্ত্র ও খড়গ।

এই মতে সেনাপতি সত্য করাইয়া।
রাজার সাক্ষাতে কুকি দিল পাঠাইয়া।।
গজ দন্ত গবয় ছাগ (১) কাংস্য বাদ্য ঘোঙ্গ (২)।
রক্ত কৃষ্ণ শ্বেত বস্ত্র বিশাল সু রঙ্গ (৩)।।
কাংস্য থালি পিকদানী তাম্রের কঙ্কণ।
উবাফেরু (৪) জলপাত্র দেবদারু বন।।
কিরাতিয়া খড়গ শক্তি পিত্তল কাংস্য ঝারি।
রাজ ভেট্ পাঠাইল পূর্ব্ব অনুসারি (৫)।।
নানাবিধ বস্তু যত নানা রঙ্গ ঘোড়া।
সহস্র সহস্র কুকি আসিল দিগম্বরা (৬)।।
ইত্যাদি করিয়া দ্রব্য লইয়া বিস্তর।
মিলিল আসিয়া কুকি রাজার গোচর।।
ভেট্ দেখি নরপতি হরিষ অন্তর।
সেনাপতির মন্দ কহে রাজার গোচর।।
দুই বৎসর হয় তথা সেনাপতি যায়।
আসিবার ইচ্ছা নাহি রাজা হৈতে চায়।।
বড়ুয়া সবের কন্যা মনোরম যত।
সম্ভোগ করয়ে সে যে নানাবিধ মত।।
এ কথা শুনিয়া রাজা হাসিল তৎপর।
তাকে কেনে মন্দ-বল রায়কাচাগ পুত্রবর।।
ফরমান (৭) লিখিল রায়কাচাগ আসিতে।
রাজধানী সেনাপতি আনিতে ত্বরিতে।।
সাম্বুল থানাতে লস্কর রাখি একজন।
বহুতর ভেট্ লৈয়া আসিল তখন।।

---

(১) ছাগ — কুকিগণের পালিত একজাতীয় ছাগ, ইহা তিব্বত দেশীয় ছাগের অনুরূপ।

(২) ঘোঙ্গ — কাংস্য ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত কাঁসর বাদ্য বিশেষ। ইহার শব্দ গম্ভীর এবং দূরগামী। কুকিগণ যুদ্ধকালে ও উৎসবাদি উপলক্ষে ইহা বাজাইয়া থাকে।

(৩) সু রঙ্গ — সুন্দর বর্ণ বিশিষ্ট।

(৪) উবাফেরু — জলপান করিবার পাত্র বিশেষ।

(৫) পূর্ব্ব অনুসারি — পূর্ব্ব নিয়মানুসারে।

(৬) দিগম্বরা — উলঙ্গ।

(৭) ফরমান — রাজ-আজ্ঞা।

সিংহাসনে বসিয়াছে ত্রিপুর রাজন।
সেই কালে সেনাপতি করিল ভেটন।।
সুবর্ণ রজত আদি বস্ত্রের আধিক্য।
দেখি বড় তুষ্ট হৈল শ্রীধন্য মাণিক্য।।
রায়কাচাগ সেনাপতি নৃপেতে বলিল।
আমার বিপক্ষে মন্দ সাক্ষাতে (১) বলিল।।
কুগন্ধা পত্নীতে কেন এত শ্রদ্ধা কর।
সুগন্ধা নারীকে কেন প্রাণেতে সংহার (২)।।
হাসিয়া নৃপতি তাকে বহু মান্য কৈল।
বস্ত্র পুষ্প হস্তী দিয়া গৃহে পাঠাইল।।
বহুতর গ্রাম পাইল রাজপুত্র সম।
রায়কাচাগ রায়কছম যুদ্ধেতে উত্তম।।
তার পরে শ্রীধন্যমাণিক্য নৃপবর।
চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর।।
চৌদ্দ শ পাঁচত্রিশ শাকে সমর জিনিল।
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল (৩)।।
গৌড়ের যতেক সৈন্য চট্টলেতে ছিল।
শ্রীধন্যমাণিক্য তাকে দূর করি দিল।।
হোসন সা গৌড়েশ্বর এ বার্ত্তা শুনিয়া।
বহুল কটক পাঠায় গৌড় মল্লিকা দিয়া।।
বার বাঙ্গালা (৪) সৈন্য গৌড় মল্লিক সঙ্গে।
আর বহু সৈন্য দিল যত আছে বঙ্গে।।
বহুতর নৌকা সঙ্গে গোমতী (৫) উজাইয়া।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য সঙ্গে সাজাইয়া।।
মেহারকুল (৬) গড়ে আসি প্রথমে যুঝিল।
সেই কোঠে যুদ্ধে তাতে মোগল লইল।।

(১) সাক্ষাতে — রাজার সদনে।

(২) রায়কাচাগ নিজেকে সুগন্ধা এবং অভিযোগকারী প্রজাবৃন্দকে কুগন্ধা বলিয়াছেন।

(৩) পূর্ব্বকালে দেশ জয় করিয়া বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিয়ম ছিল। এস্থলে স্বর্ণ মুদ্রাকে মোহর বলা হইয়াছে।

(৪) বার বাঙ্গালা — দ্বাদশ ভৌমিক কর্ত্তৃক শাসিত বঙ্গের বার বিভাগ।

(৫) গোমতী — ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর, এই নদীর তীরে অবস্থিত।

(৬) মেহারকুল — কুমিল্লা নগরী ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহ।

ত্রিপুর সৈন্যে চণ্ডিগড় (১) পরে থানা করে।
গৌড়াই মল্লিক সেই গড় লৈতে নারে।।
খোজা ছিল এক জন মন্ত্রণা পরিপাটী।
গোমতী বান্ধিল সেই সোণামুড়ার ভাটি।।
নদীকুলে বৈসে ত্রিপুর রাঙ্গামাটি রাজ।
নদী বান্ধি ডুবাইয়া মারিব সমাজ (২)।।
এই যুক্তি করিয়া সেনাকে আজ্ঞা দিল।
সোণামুড়া ভাটি দিয়া গোমতী বান্ধিল।।
তিন দিন রাখিলেক বান্ধিয়া গোমতী।
পর দিন ভাঙ্গি নদী হৈয়া বেগবতী।।
পাঠান সকল জলে চাবুক মারয়।
রহ রহ বলি গালি দেয় এ বিষয়।।
ক্রোধে মত্ত হৈয়া যত পাঠান বর্ব্বর।
না মানে নদীয়ে বাক্য কম্পে থর থর।।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা গুরুতে কহয়।
অভিচার (৩) কর্ম্ম কর শত্রু হউক ক্ষয়।।
অভিচার কর্ম্মারম্ভ করে দ্বিজবরে।
সুন্দর মণ্ডপ কৈল তথায় চত্বরে।।
প্রথম বয়স কৃষ্ণ বর্ণের চণ্ডাল।
কুণ্ডের উপরে দিল চান্দোয়াদি ভাল।।

---

(১) চণ্ডিগণ — এই স্থান সোণামুড়ার পূর্ব্বদিকস্থ মেলাঘর ও কাঁকড়াবনের মধ্যবর্ত্তী। এই স্থানে ত্রিপুর রাজ্যের একটি দুর্গ ছিল।

(২) সমাজ — দল। এস্থলে পাঠান সৈন্যদলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

(৩) অভিচার — হিংসাকর্ম্ম। অথর্ব্ববেদে মারণ, উচ্চাটনাদি অভিচার কর্ম্মের বিধান আছে। তন্ত্রে ছয় প্রকার অভিচারের উল্লেখ পাওয়া যায়, — (১) মারণ, (২) মোহন, (৩) স্তম্ভন, (৪) বিদ্বেষণ, (৫) উচ্চাটন ও (৬) বশীকরণ।

(১) মারণ — দৈব ক্রিয়াদি দ্বারা কাহারও প্রাণ নষ্ট করা।
(২) মোহন — কাহারও মনকে ভুলান।
(৩) স্তম্ভন — মন্ত্র প্রভৃতি দ্বারা অস্ত্র, অগ্নি প্রভৃতির শক্তি নষ্ট করা।
(৪) বিদ্বেষণ — মন্ত্রাদি প্রয়োগ দ্বারা দুইজনের পরস্পর প্রণয় ভঙ্গ করিয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধ জন্মান।
(৫) উচ্চাটন — মন অস্থির করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ মন্ত্র বা ঔষধিদ্বারা উন্মাদ করা।
(৬) বশীকরণ — স্ত্রীলোক প্রভৃতিকে বশীভূত করা।

ইহার প্রত্যেক কার্য্যের মন্ত্রাদি, কার্য্যপ্রণালী এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিবরণ তন্ত্রে লিখিত আছে।

সপ্ত দিন সপ্ত রাত্র মণ্ডপে রহিল।
যজ্ঞ শেষে চণ্ডালের মস্তক কাটিল।।
রায় বার (১) সঙ্গে দিল সে মুণ্ড লুকাইয়া।
গৌড়াই মল্লিকের সৈন্যে (২) মুণ্ড গাড়ে (৩) নিয়া।।
আচম্বিত (৪) রাত্র কালে মহা শব্দ হৈল।
ত্রিপুর সৈন্য আইসে বলি গৌড় ভঙ্গ দিল।।
ভয় পাইয়া গৌড় সৈন্য দূরেতে রহিল।
কাপুরুষ বলিয়া সবে ডাকিয়া কহিল।।
হোসন সাহা মল্লিককে ভর্ৎসিল বিস্তর।
লজ্জা ভয় পাইয়া মল্লিক হইল কাতর।।
গৌড়াই মল্লিক ভঙ্গ দিল যুদ্ধ হৈতে।
শ্রীধন্য মাণিক্য চলে চাটিগ্রাম লৈতে।
চাটিগ্রাম হতে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা।
রসাঙ্গ মর্দ্দন (৫) নারায়ণকে বসাইল থানা।।
রাম্বু ছত্রসিক রাজা আমল করিল।
রসাঙ্গ জিনিয়া কিল্লা পুষ্কর্ণী খনিল।।
নিজ রসাঙ্গ লৈতে নারে সেনাপতি।
রসাঙ্গ মর্দ্দন নারায়ণ তার হৈল খ্যাতি।।
রায়কাচাগ রায়কছম দুই সেনাপতি।
ক্রোধ হৈয়া নৃপতিয়ে পাঠায় শীঘ্রগতি।।
চৌদ্দ শ সাত্রিশ শকে চাটিগ্রাম জিনে।
শুনিয়া হোসন সাহা মহাক্রোধ মনে।।
যুদ্ধেতে আসাম কোচ মারিয়া লইল।
ত্রিপুরার সৈন্যে আমা অপমান দিল।।
মনেতে চিনিয়া সৈন্য পাঠায়ে বিস্তর।
হৈতন খাঁ করা খাঁ দুই পাঠায় সত্বর।।
রাঙ্গামাটি জিনিবারে হৈতন খাঁ চলিল।
হোসেন সাহা আশ্বাসিয়া বহু সৈন্য দিল।।
রাঙ্গামাটি দেশেতে ত্রিপুর সৈন্য রয়।
মারিয়া আনহ তাকে শীঘ্র করি জয়।।

(১) রায়বার — দূত। (২) সৈন্যে — সৈন্য মধ্যে, শিবিরে। (৩) গাড়ে — প্রোথিত করে। (৪) আচম্বিত — অকস্মাৎ, হঠাৎ। (৫) রসাঙ্গ মর্দ্দন — রসাঙ্গ (আরাকান) বিজয়ী সৈন্যাধক্ষের উপাধি।

এক শত হস্তী পঞ্চ সহস্র ঘোটক।
লক্ষৈক পদাতি চলে ধানুকী কটক।।
দ্বাদশ বাঙ্গালা চলে হৈতন খাঁ সহিতে।
বিদায় করিল গৌড়ে শিরস্ত্রাণ মাথে।।
চলিল হৈতেন খাঁ মহী কম্পমান।
কত দিনে উত্তরিল রাজ্য সন্নিধান।।
সরাইল পথে আইসে যুদ্ধ সৈন্য লৈয়া।
কৈলাগড় হৈয়া আইসে বিশালগড় দিয়া।।
জামির খাঁ গড়ে প্রাতে চড়িল পাঠান।
ত্রিপুরার অল্প সৈন্য তার ছিল জ্ঞান।।
খড়্গা রায় আদি করি অনেক ত্রিপুর।
সেই গড়ে বহু যুদ্ধ করিল প্রচুর।।
লইলেক সেই গড় হৈতন খাঁ পাঠান।
ছঘরিয়ার গড়ে গেল রাজা বিদ্যমান।।
গগন খাঁ নামেতে রাজার সেনাপতি।
তার সনে ঘোর যুদ্ধ হৈল হাতাহাতি।।
পরস্পর মহারণ তাতে বহু হৈল।
হেন মতে দুই সৈন্যে ঘোর যুদ্ধ কৈল।।
তিন প্রহর যুঝিলেক গগন খাঁর সনে।
ভঙ্গ দিল গগন খাঁ জিনিলেক হৈতনে।।
যশপুর ছাড়ি রাজা রাঙ্গামাটি আইসে।
সেই পথে হৈতন খাঁ চলিল বিশেষে।।
গঙ্গানগর হৈতে রাজা ডোম ঘাটি পথে।
রহিলেক হৈতন খাঁ গড় করি তাথে।।
দুই প্রহরে খনিলেক তাতে এক দীঘী।
না খায় গোমতীর জল বিষ দিব লাগি।।
তদবধি সেই দীঘী ডোক নাম তার।
পরে দেবমাণিক্য তাকে করিছে বিস্তর।। (১)

---

(১) পাঠান্তর — "দুই প্রহরে খনিলেক এক মহা দীঘি।
না খায়ে নদীর জল বিষ দিছে লাগি।।"

পরে রাজা রহে গিয়া ছন গাঙ্গ উপর।
আর যত সেনাগণ রহে থরে থর।।
ছন গাঙ্গ তৈকাতান দেবদ্বার নাম।
তার কত বাঁক উজান মাছি ছড়া ধাম।।
হৈতন খাঁ সঙ্গে ছিল যত শিল্পকর।
নির্ম্মাইছে গড় পরে দেব বহু তর।।
গড় দেখিবার তরে চলিল ভূপতি।
উচ্চ স্থানে থাকি গড় দেখিল নৃপতি।।
ভাটি বাঁকে (১) গৌড় সৈন্যে বান্ধিয়াছে গড়।
তাহার উজানে গড় ত্রিপুরার তৎপর।।
বসিলেক নরপতি বৃক্ষ ছায়া তলে।
ডাইন (২) সব ডাকি আনি রাজা তাকে বলে।।
আমার প্রজা খাও তোরা ডাইন সব লোক।
এখন না খাও কেন হৈতন খাঁ সম্মুখ।। (৩)
নৃপতির বাক্য শুনি বলাগমা যুবতী।
নমস্কার করি কহে শুন হে ভূপতি।।

"সেই ত তুডুক দীঘি দেশেতে প্রচার।
শ্রীদেব মাণিক্য তারে করিল বিস্তার।।"

পর্ব্বতে একপ্রকার লতা জন্মে তাহার রস অত্যন্ত বিষাক্ত। সেই লতা থেঁতলাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিলে নদীর জল বিষাক্ত হয়। পার্ব্বত্য প্রজাগণ বর্ত্তমান কালেও এই প্রণালী অবলম্বনে মৎস্য মারিয়া থাকে। এই লতা ফেলিয়া নদীর জল বিষাক্ত করায়, মুসলমানগণ নদীর জল পান করে নাই, জল পানের নিমিত্ত নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়াছিল। মুসলমানের খনিত বলিয়া জলাশয়ের নাম 'তুডুক দীঘি' হইয়াছে। নকলকারীর ক্রটী বশতঃ 'তুডুক দীঘি' স্থলে 'ডোক দীঘি' লিখিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে দেব মাণিক্য কর্ত্তৃক এই সরোবরের আয়তন বৃদ্ধি হইয়াছিল। বিষ লতার উৎপত্তি বিষয়ে কৃষ্ণমালা গ্রন্থে লিখিত আখ্যায়িকা পরবর্ত্তী টীকায় প্রদত্ত হইল।

(১) ভাটিবাক — নদীর নিম্নভাগস্থ বক্র স্থান।

(২) ডাইন — ডাকিনী। পার্ব্বত্য জাতির বিশ্বাস, কোন কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দৈবশক্তি দ্বারা লোকের ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে পারে এবং ইহারা অকারণে বা সামান্য কারণে লোকদিগকে মন্ত্র বলে বধ করে। ইহারা স্থানীয় ভাষায় 'ডাইন' নামে অভিহিত। লোকে ইহাদিগকে ভয় করে। এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসমূলে সুযোগ পাইলে তাহাদিগকে বধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

(৩) তোমরা আমার প্রজাদিগকে ভক্ষণ কর, এখন হৈতন খাঁ সম্মুখে আছে, তাহাকে খাও না কেন?

পর্ব্বত গাত্রস্থ প্রস্তরে খোদিত দেবদেবী মুর্ত্তি

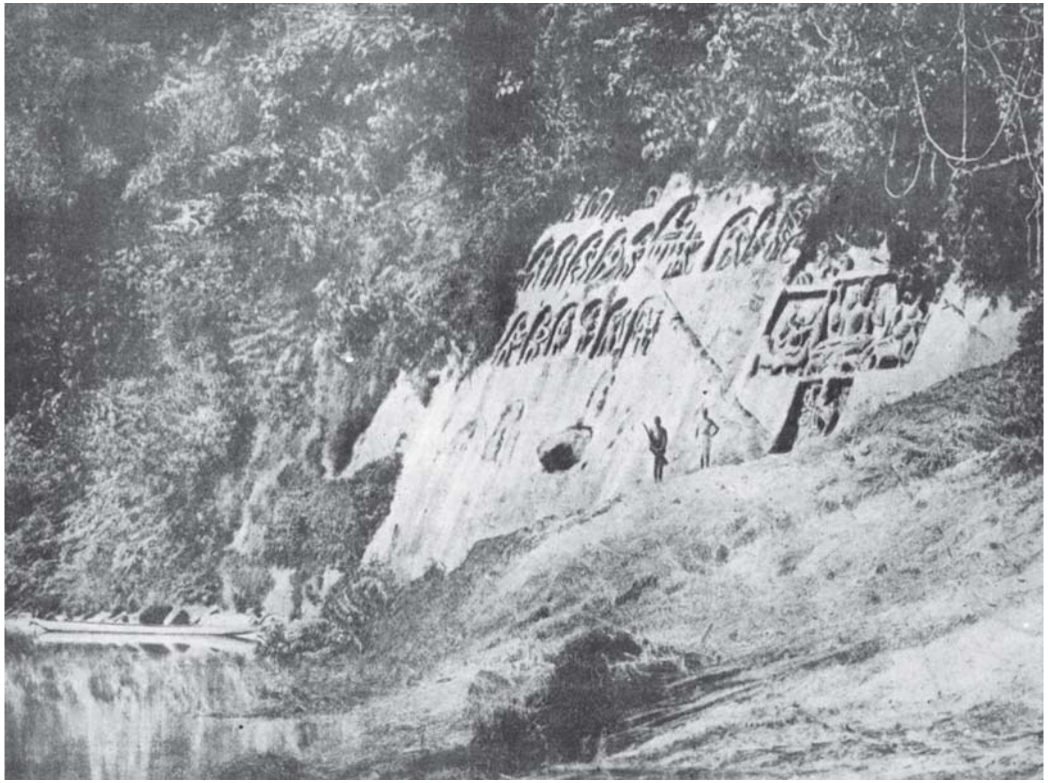

দেবতা মুড়া - (মাছি ছা)।
পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত দেবদেবীর মুর্ত্তি সমূহ।
পরবর্ত্তী (৩১০ পৃষ্ঠায়) এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

মঙ্গল বার রাত্রে আমি স্তম্ভিব গোমতী।
সপ্ত দিন জল স্তম্ভ রাখিব সম্প্রতি।।
বলাগমার বাক্যে রাজার তুষ্ট হৈল মন।
বলাগমাকে রাজ প্রসাদ দিল সেই ক্ষণ।।
মঙ্গল বার রাত্রিতে সসজ্জ হইল।
দুই কুলা বাহুমূলে বান্ধি উড়াদিল।। (১)
দুই শত হাত উচ্চে উড়িল গগন।
উড়িয়া নদীর মধ্যে হইল পতন।।
উজানে চালায় স্রোত চর পড়ে ভাটি।
আনন্দিত গৌড় সৈন্য রহে পরিপাটী।।
হোসেন সাহের ভাগ্যে নদী দিল চর।
চরেতে রহিল সৈন্য সৈন্য করি বাসা ঘর।।
আর দেখে নদী তীরে পাষাণ প্রতিমা।
হিন্দু সবে পূজা করে জানিয়া মহিমা।।
সেই স্থানে নাম ছিল মাচিছা বিখ্যাত।
পুনর্জ্জন্ম নহে বলে ত্রিপুরা সাক্ষাত।। (২)
এই মত নানালাপ সৈন্য মধ্যে হৈল।
নানা ভোগে গৌড় সৈন্যে বহু নিদ্রা গেল।।
ভেরুয়া (৩) কাটিয়া সৈন্যে সাজায় বিস্তর।
তিন তিন পুতলা রাখে ভেরুয়া উপর।।
দুই দুই বুন্দা (৪) দিল পুতলার হাতে।
সহস্র সহস্র বুন্দা পুতলা সহিতে।। (৫)
নিশাকালে বলাগমায় উঠে জল হতে।
কল কল শব্দ করে গোমতীর স্রোতে।।
সহস্র সহস্র ভেরুয়া চলিল ভাটিত।
সহস্র সহস্র বুন্দা তাতে প্রজ্বলিত।।

---

(১) উড়াদিল — উড্ডীয়মানা হইল।
(২) এই দেবস্থান দর্শন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ত্রিপুরাগণ এইরূপ বলিয়া থাকে।
(৩) ভেরুয়া — ভেলা।
(৪) বুন্দা — অগ্নির বোন্দা, উল্কা, মশাল।
(৫) প্রত্যেক ভেলায় তিনটী পুতুল এবং প্রত্যেক পুতুলের হস্তে দুইটী প্রজ্বলিত মশাল দেওয়া হইয়াছিল।

গৌড় সৈন্য নদী চরে সুখে নিদ্রা যায়।
হেন কালে নদী স্রোতে সকল ডুবায়।।
হস্তী ঘোড়া নৌকা যত ভাসাইল বেগে।
মনুষ্য নির্ব্বল হয়ে কি করিব রাগে।।
প্রজ্বলিত বুন্দা সব পুতলার হাতে।
নদী তীরে ত্রিপুর সৈন্য পথে ঘিরে তাতে।।
গৌড়ের সৈন্যের পাছে ছিল এক বন।
সেই বনে অগ্নি দিল ত্রিপুরার গণ।।
মহাশব্দ করি অগ্নি উঠিল তখন।
অন্য পথে ত্রিপুর সেনা করে নিরীক্ষণ।।
নদীর স্রোতে সর্ব্ব সৈন্য প্রলয় করিল।
ভয় পাইয়া গৌড় সৈন্য সবে ভঙ্গ দিল।।
হৈতন খাঁয় করা খাঁয় সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিল সৈন্য সঙ্গে ঘোড়ার উপরে।।
কাটিতে কাটিতে যায় ত্রিপুরার সেনা।
সেই রাত্রে ভাগাইল (১) চারি পাঁচ থানা।।
বহু অশ্ব গজ তার পাইল তথায়।
তাহা ছাড়ি হৈতন খাঁয় ভঙ্গ দিয়া যায়।।
ছকড়িয়ার ঘাটে গিয়া সত্য করি কৈল।
এত সৈন্য সঙ্গে আমি জিনিতে না পাইল।।
এহার অধিক সৈন্য যাহার যে হয়।
সে পুনি আসুক এথা পরম নির্ভয়।।
তা হতে অল্প সৈন্য না আসুক এথা।
শপথ করিল আমি এই সত্য কথা।।
যে সব পাঠান হয় যেই যোদ্ধা সব।
অল্প সৈন্যে যেবা আসে সে সব গর্দ্দভ।।
এ বলিয়া হৈতন খাঁ গৌড়ে চলি গেল।
গৌড়েশ্বরে তার প্রতি নিষ্ঠুর বলিল।।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা যুদ্ধে জয় পাইয়া।
চতুর্দ্দশ দেব পূজে বিধি বলি দিয়া।।

(১) ভাগাইল — তাড়াইল।

পূর্ব্বেতে ত্রিপুর রাজা নরবলি দিত।
সহস্রে সহস্রে বঙ্গ (১) বর্ষে কাটা যাইত।।
শ্রীধন্য মাণিক্যে মানা তাহাকে করিল।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল।।
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দ্দশ দেবে।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে।।
দৌচা পাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয়।
গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময়।। (২)
ইহাতে অধিক বলি মানা করে রাজা।
তদবধি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য প্রজা।।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা কমলার পতি।
উৎকল খণ্ড পাঁচালী রচাইল মহামতি।।
জ্যোতিষের যাত্রারত্নাকরনিধি আর।
পাঁচালী রচাইল রাজা লোকে বুঝিবার।। (৩)
ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্য গীত আনি।
রাজ্যেতে শিখায় গীত নৃত্য নৃপমণি।।
ত্রিপুর সকলে গীত সেই ক্রমে গায়।
ছাগ অন্তে (৪) তার যন্ত্রে ত্রিপুরে বাজায়।।
এই মতে অতি সুখে আছেন নৃপতি।
প্রজা সব মহাসুখে বঞ্চিলেক ক্ষিতি।।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা ধর্ম্মে চিত্ত দিল।
প্রতিমা ভুবনেশ্বরী সুবর্ণে নির্ম্মাইল।। (৫)
এক মণ সুবর্ণের প্রতিমা নির্ম্মাইয়া।
জীবন্যাস করাইল সাধক আনিয়া।।
প্রতিমা নাসায় তুলা লাগাইয়া রাখে।
শ্বাসে তুলা উড়ি যায় পূজা কালে দেখে।।

---

(১) বঙ্গ — বঙ্গদেশী লোক, বাঙ্গালী।

(২) গঙ্গা পূজার সময় গোমতী নদীতে বলি প্রদান করা হইত। বর্ত্তমান কালে, রাজধানী আগরতলার পাদবাহিনী হাওড়া নদীতে গঙ্গা পূজা হয়।

(৩) এই সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায় না।

(৪) অন্ত — অন্ত্র, আঁতুড়ি। ইহার দ্বারা বাদ্য যন্ত্রের তার (তাত) প্রস্তুত করা হয়।

(৫) এই প্রতিমা বর্ত্তমান কালে নাই।

রাজার পুত্রেহ মূর্ত্তি দেখিতে না পারে।
গুপ্ত করি রাখিলেক পূজার মন্দিরে।।
পরে বিষ্ণু মঠ এক নৃপে নির্ম্মাইল।
সাত্ত্বিক হইয়া রাজা উৎসর্গিয়া দিল।।
আর এক মঠ নিতে আরম্ভ করিল।
বাস্তু পূজা সঙ্কল্প বিষ্ণু প্রীতে কৈল।।
ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে।
এই মঠে আমা স্থাপ রাজা মহা সত্ত্বে।।(১)
চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট।।
তথা হৈতে আনি আমা এই মঠে পূজ।
পাইবা বহুল বর যেই মতে ভজ।।(২)
স্বপ্ন দেখি নরপতি দ্বিজেতে কহিল।
ব্রাহ্মণ সকলে মিলি সাধু বাদ কৈল।।
রসাঙ্গ মর্দ্দন নারায়ণ পাঠায় চট্টলে।
স্বপ্নে যেই স্থানে দেখে মিলিলেক ভালে।।
উৎসব মঙ্গল বাদ্যে রাজ্যেতে আনিল।
সত্বর গমনে রাজা নমস্কার কৈল।।
কত দিন পরে মঠ প্রস্তুত হইল।
পুণ্যাহ দিনেতে রাজা উৎসর্গিয়া দিল।।
জন্ম সফল রাজার কালিকা স্থাপিয়া।
নানা বলিদান করে নর আদি দিয়া।।(৩)
নানাবিধ উপহার দিলেন পূজার।
মৎস্য মাংস প্রভৃতি যতেক প্রকার।।
মঠ মধ্যে পাথরে লিখিল এই শ্লোক।
পয়ারে লিখিল শ্লোক বুঝিবারে লোক।।

---

(১) ইহা পীঠ দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির। এই মন্দিরের বিবরণ এই লহরের পরবর্ত্তী টীকায় দ্রষ্টব্য।
(২) ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তির বিবরণ প্রথম লহরের টীকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।
(৩) বলি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় বিধান এই লহরের পরবর্ত্তী টীকায় পাওয়া যাইবে।

ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্য মাণিক্য কর্ত্তৃক নির্মিত
শ্রীশ্রীস্বয়ম্ভুনাথের মন্দির
চঁন্দ্রনাথ তীর্থ।

অথ শ্লোক
মায়া মুবারে রিয়মম্বিকা যা।
মুগুত্য মুষ্যা নিকটং ন কুত্র।।
প্রান্তে ভবান্যা ধ্রুব মাস কেশবঃ।
শ্রীধন্য মাণিক্য বিনিশ্চিতি স্তিয়ম্।।(১)
শ্লোকের পয়ার
হরির মায়াতে মল্লিকার প্রকাশ।
তেন মায়া বেষ্টিত থাকে মানবের পাশ।।
এই তত্ত্ব সত্য জান কেশব তাহাতে।
শ্রীধন্য মাণিক্য কৃত নির্ম্মিত ইহাতে।।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা আর মঠ দিল।
রত্নপুরে চতুর্দ্দশ দেবতা স্থাপিল।।
সেই মঠে পূজা কৈল শ্রীধন্য মাণিক্য।
ফলমতীশ্বর তীর্থ দক্ষিণে আধিক্য।।
ফলমতীশ্বর তীর্থে জরব মারিয়া।
চাটিগ্রাম আমল করে মোহর নির্ম্মাইয়া।।
হেনকালে শুনে রাজা কুকির সমাচার।
কুকিনী সবের সঙ্গে শিবের ব্যবহার।।
আর তত্ত্ব মহারাজা শুনিল তখন।
কুকি রাজ্যে সুবর্ণের হয়েত উৎপন্ন।।
রাজার জামাতা হোপাকলাউ নাম তার।
কুকিতে পাঠায় শিব লিঙ্গ আনিবার।।
কত দিনে উত্তরিল কিরাত ভবন।
শিব লিঙ্গ যত্নে সে যে ধরিল তখন।।
পান বাটা মধ্যে লিঙ্গ কাপড়ে জড়িল।
মোহর করিয়া বাটা সত্বরে পাঠাইল।।
শিব লিঙ্গ লৈয়া গেল রাজার সাক্ষাতে।
বাটা হৈতে নিকলিছে (২) শিব লিঙ্গ পথে।।
মনু নদী সীমানা তক বাটাতে আছিল।
মনু নদী পার হৈতে ফিরি তথা গেল।।

(১) ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপির বিবরণ পরবর্ত্তী টীকায় দ্রষ্টব্য।
(২) নিকলিছে — বাহির হইছে।

এ কথা শুনিয়া রাজা বিস্মিত অন্তরে।
মনে বিবেচিয়া রাজা বলিল তাহারে।।
ব্রহ্মা ধরিতে নারে যে পদারবিন্দ।
তাহাকে ধরিতে চাহি আমি মতি মন্দ।।
জামাতা হোপাকলাউ মনে গর্ব্ব তার।
থাংচাঙ্গ (১) চড়িয়া যায় সোণা আনিবার।।
কিরাত সকলে মিলি যুক্তি করে সার।
সোণা পাইলে থানা এথা থাকিব রাজার।।
মন্ত্রণাতে জামাতাকে মদ্য পান দিল।
মদ্যেতে বিহ্বল জামাই কুকিয়ে কাটিল।।
নৃপতি শুনিয়া তাতে জামাতা মরণ।
আনিয়া সে সব কুকি করিল দণ্ডন।।
শ্রীধন্য মাণিক্য চারি মঠ দিল ক্রমে।
কারিকর গণে ইনাম (২) পাইলেক শ্রমে।।
কারিকর স্থানে পরে নৃপতি জিজ্ঞাসে।
তা হৈতে অধিক শিক্ষা জানহ বিশেষে।।
রাজার বচন শুনি বলে কারিকরে।
তা হৈতে অধিক জানি মঠ বানাইবারে।।
তাহা শুনি ক্রুদ্ধ হৈল রাজা মহাজন।
বার বার কহ তোরা এমত কথন।।
যত গুণ আছে তোমা দেখাইতে বলিলা।
এখানে রাখিলা শিক্ষা আমাকে বঞ্চিলা।।
আমা কথা হেলা কৈলে জানিল নিশ্চিতে।
আজ্ঞা করে কাট নিয়া নদীর তীরেতে।।
নিজার্জ্জিত কর্ম্মে তার এমত ঘটিল।
রাজ আজ্ঞায় কাটে তাকে কেহ না বলিল।। (৩)
নানা বাদ্য সব যন্ত্র বহু রঙ্গ তাতে।
বহুল কবিতা গান রচিল সে মতে (৪)।।

---

(১) থাংচাঙ্গ — তাঞ্জাম, দোলাবিশেষ।
(২) ইনাম — পুরস্কার।
(৩) রাজ-আজ্ঞায় বধ করা হইল, তাহার রক্ষার নিমিত্ত কেহ অনুরোধ করিল না।
(৪) এই সকল কবিতা সংগ্রহের উপায় নাই।

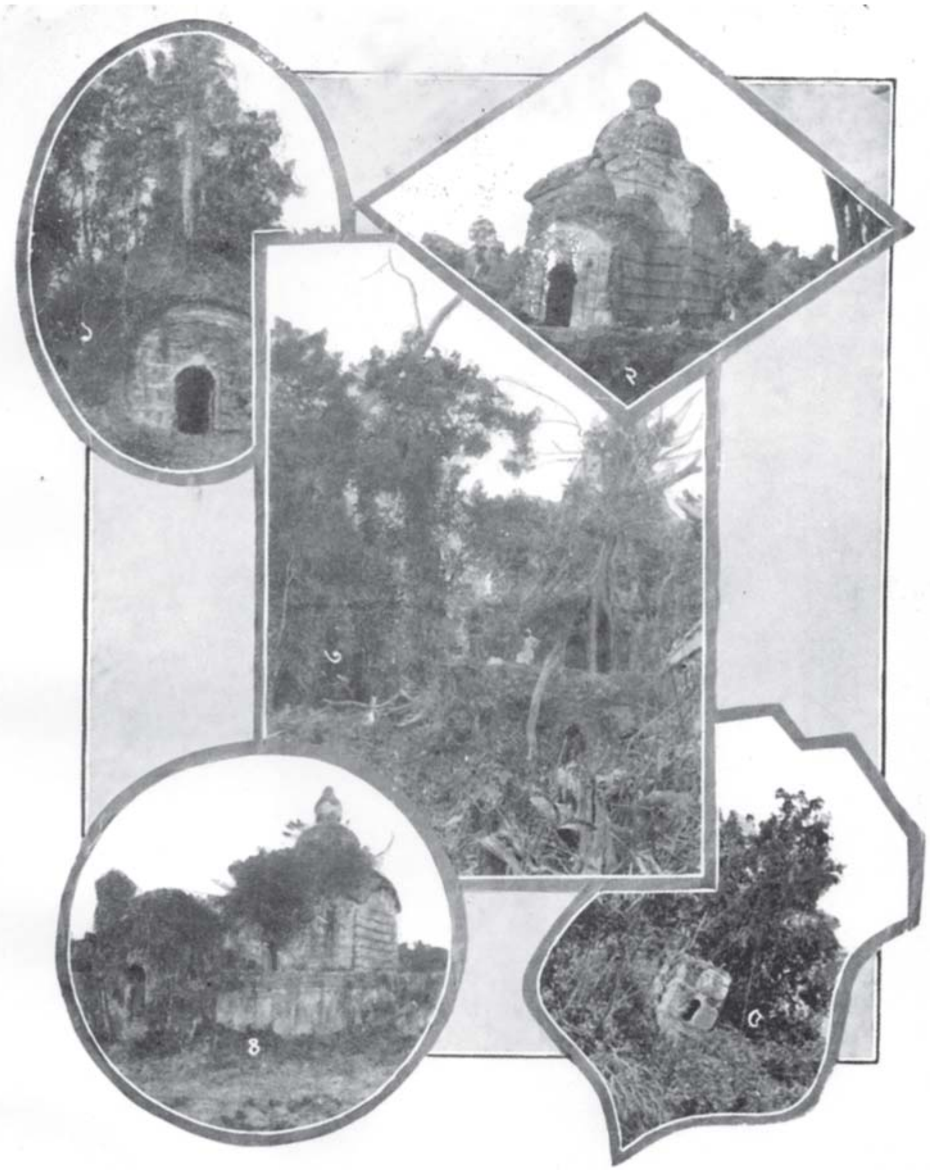

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের নির্ম্মিত মঠ সমূহ।
(১) বিষ্ণুমন্দির (২) পুরাতন দীঘীর তীবরবর্ত্তী মন্দির, (৩) লোকপালানী (ঝুলন) মন্দির,
(৪) বর্ত্তমান হরি মন্দির (৫) ভগ্ন মন্দির।

কত কাল সুখে নৃপে রাজত্ব করিল।
দৈবগতি মহারাজার বসন্ত হইল।।
এইরূপে মহারাজার স্বর্গ প্রাপ্তি হৈল।
মহাদেবী কমলা যে সহগামী গেল।।
তার পরে যেবা হৈল শুন নৃপমণি।
মন্বন্তর (১) ফিরে যেন হেন রাজধানী।।
অমর মাণিক্য স্থানে কহে রণ চতুর।
তোমা বংশাবলী শুন বড়হি নিষ্ঠুর।।

দেবমাণিক্য খণ্ড।

শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা কাল বশ পরে।
তান পুত্র দেবমাণিক্য অভ্যন্তরে (২)।।
দেবমাণিক্য মহারাজা অতি শুভাজন।
ভুলুয়া আমল করি সমুদ্র গমন।।
ফলমতি তীর্থে স্নান করে মহামতি।
মোহর মারিল তথা দান ধর্ম্ম যতি।।
দুরাশা বলিয়া সেই স্থানের নাম বলে।
স্নান তর্পণ তথাতে নৃপতি করিলে।।
এ তীর্থ করিয়া রাজা ফিরিল তখন।
চাটিগ্রামে থানা রাখি রাজ্যে আগমন।।

---

(১) মন্বন্তর — প্রত্যেক মনুর শাসনকাল। এক এক মন্বন্তরে দেবমানের ৭১ যুগ। শাস্ত্রে আছে, প্রতিকল্পে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি ও ইন্দ্র সাবর্ণি — এই চতুর্দ্দশ মনু আবির্ভূত হইয়া থাকেন। বর্ত্তমানে বৈবস্বত মনুর আমল চলিতেছে। প্রতি মন্বন্তর অতীতে মহাপ্রলয় হইয়া থাকে। ধন্যমাণিক্যের ন্যায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রাজার পরলোক গমনের পর, ত্রিপুর রাজধানীর মন্বন্তর পরিবর্ত্তনের অবস্থা ঘটিয়াছিল।

(২) পাঠান্তর — "হরিনাম স্মরণে নৃপতি স্বর্গ হৈল।
তান পুত্র শ্রীদেবমাণিক্য রাজা হৈল।।"

লক্ষ্মী নারায়ণ নাম মিথিলা নিবাসী।
জানেন্ত অনেক তন্ত্র যে মত সন্ন্যাসী।।
তার স্থানে দীক্ষিত মহাবিদ্যা (১) ক্রমে।
পুরশ্চরণ (২) করে নৃপে দিব্য-ভাব (৩) ভ্রমে।।

---

(১) মহাবিদ্যা — মহাবিদ্যার সংখ্যা দশ, যথা ; —

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।।
বগলা সিদ্ধিবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধিবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।"

— চামুণ্ডা তন্ত্র।

কালী, তারা ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলাত্মিকা এই দশ মহাবিদ্যা। ইঁহাদিগকে সিদ্ধিবিদ্যাও বলে।

তন্ত্রসারের মতে কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যা, বাসলী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী এই সকল দেবী মহাবিদ্যা, যথা, —

"অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে।
দোষজালৈর সংস্পৃষ্টা স্তাঃ সর্ব্বাহি ফলৈঃ সহ।।
কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্ বাদিনীচান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ।।
কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাহিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফল প্রদাঃ।।"

— তন্ত্রসার।

(২) পুরশ্চরণ — মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তৎসিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োগ বিশেষ। এতদ্বিষয়ে যোগিনী হৃদয়ে লিখিত আছে; —

"গুরুরাজ্ঞাং সমাদায় শুদ্ধান্তঃ করণোনরঃ।
ততঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্র-সংসিদ্ধি কাম্যয়া।।
জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণ হীনোহপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।"

মর্ম্ম ঃ— "পবিত্রচেতা মানব গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মন্ত্র সিদ্ধি করিবার অভিলাষে মন্ত্রের পুরশ্চরণ বিধান করিবেন। পুরশ্চরণ ভিন্ন মন্ত্র সিদ্ধি হইবার অন্য উপায় নাই। জীবহীন দেহীর যেমন কোন বিষয়ে ক্ষমতা থাকে না, সেইরূপ পুরশ্চরণ হীন মন্ত্রেরও কোন সামর্থ্য নাই।"

(৩) দিব্য-ভাব — তান্ত্রিক আচার বিশেষ। দিব্য, পশু ও বীর এই তিন ভাবে তান্ত্রিক কার্য্য হইয়া থাকে। তন্ত্রে এতদ্বিষয়ক যে বিধান আছে তাহা নিম্নে প্রদান করা গেল; —

"শৃণু ভাবত্রয়ং দেবি দিব্য বীর পশু ক্রমাৎ।
দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধত মানসঃ।।
সত্যত্রেতার্দ্ধ পর্য্যন্তং দিব্যভাব বিনির্ণয়ঃ।
ত্রেতাদ্বাপর পর্য্যন্তং বীরভাব ইতীরিতং।।
মদ্যং মৎস্যং তথা মাংসং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
শ্মশান সাধনং ভদ্রে চিতাসাধনমেব চ।।
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং দিব্যবীর মতং প্রিয়ে।
দিব্যবীর মতং নাস্তি কলিকালে সুলোচনে।।

— কালীবিলাস তন্ত্র।

অন্নপূর্ণা ও বাড়বাননলের মন্দির।
(চন্দ্রনাথ তীর্থ)

বীর ভাবী (১) হৈল রাজা তাহার পশ্চাৎ।
চক্রেতে (২) আরম্ভ করে অধর্ম্ম সাক্ষাৎ।।
শ্মশান সাধন (৩) কার্য্যে রাজাকে বৈসায়।
সেই কালে বাসুয়াকে (৪) ব্রাহ্মণে শিখায়।।
বৃক্ষে উঠি বাসুয়ায় ডাকি তাকে কহে।
সেনাপতি বলি দেহ দেখা হবে তাহে।।
আর দিন রাত্রে রাজা সেনাপতি নিয়া।
বলিদান করে রাজা শ্মশানেতে গিয়া।।
আর দিন মহারাজা বসিল শ্মশানে।
আর সেনাপতি চাহে নৃপতির স্থানে।।
আষ্ট জন সেনাপতি ক্রমে বলি দিল।
তথাপিহ মহারাজা দেবী না দেখিল।।
কৃষ্ণ বর্ণ হৈল রাজা সেনাপতি বধি।
এক জন বলিলেক নৃপতি সম্বোধি।।
স্নান কালে স্নান ঘরে (৫) নৃপেতে কহিল।
তোমা শত্রু মঘ পাঠান আনন্দ হইল।।
পৈতৃক সেনাধিপতি তুমি সে বধিলা।
রাজধানী স্থান তুমি বীর শূন্য কৈলা।।

---

(১) বীরভাব — তান্ত্রিক ভাব বিশেষ, 'দিব্যভাব' শীর্ষক টীকায় বীরভাবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যে তিন ভাবে তান্ত্রিক সাধন হয়, তাহা পুনর্ব্বার এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে ; —

"ভাবস্তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তা দিব্য বীর পশুক্রমাৎ।
গুরবস্তু ত্রিধা ছাত্র তত্রৈব মন্ত্র দেবতা।।"

রুদ্রযামল — ১১শ পটল।

(২) চক্র — তন্ত্রোক্ত ভৈরবী প্রভৃতি চক্র। তন্ত্র শাস্ত্রে ভৈরবী চক্রকে তত্ত্বচক্র বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রুদ্রযামলে মহাচক্র, রাজচক্র, বিদ্যচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই পাঁচ প্রকার চক্রের কথা উল্লেখ আছে। চক্র সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

(৩) শ্মশান সাধন — তান্ত্রিকগণ শ্মশানে উপবিষ্ট হইয়া স্বীয় ইষ্টদেবতার সাধনা করিবার ব্যবস্থা তন্ত্র শাস্ত্রে আছে।

(৪) বাসুয়া — ব্রাহ্মণদিগের গোলাম সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণীর শূদ্র আছে, ত্রিপুরা অঞ্চলে তাহাদিগকে 'বাসুয়া' বলে। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরে, 'বাসুয়া পাড়া' নামে একটী গ্রাম আছে; তথায় এই শ্রেণীর অনেক শূদ্রের বসতি ছিল।

(৫) রাজার নিকট গুপ্ত কথা বলিবার নিমিত্ত স্নানঘরই সুবিধাজনক স্থান। এরূপ নির্জ্জন স্থান আর নাই। স্নান কার্য্যের নির্দ্দিষ্ট ভৃত্য ব্যতীত অন্য লোকের তথায় প্রবেশাধিকার নাই।

বীর শূন্য হৈল তোমা শুন নরেশ্বর।
ব্রাহ্মণে করিল তোমা এত অথান্তর (১)।।
দেশের যতেক লোক অতি ভয় পায়।
কাহাকে কোন্ রাত্রে শ্মশানে লৈয়া যায়।।
আপনার বল রাজা আপনে ভাঙ্গিলা।
ব্রাহ্মণের হেতু সর্ব্ব রাজ্য নষ্ট কৈলা।।
এতশুনি নৃপতিয়ে না দিল উত্তর।
সাধন করিতে গেল শ্মশান উপর।।
এসব শুনিয়া বিপ্রে মনে ভয় পাইল।
রাজারে ধরিয়া বিপ্রে শ্মশানে বধিল।।
বধিয়া রাখিল রাজা শ্মশান মাঝার।
লোকেতে জানায় বিপ্র বহু শিষ্টাচার।।
বিপ্র বলে মহারাজা মরিল শ্মশানে।
যক্ষ (২) কিন্নর (৩) ভয় পাইয়াছিল মনে।।
সৈন্য সহিতে বিপ্র চিতা স্থানে গেল।
মৃত রাজা দেখি সবে ক্রন্দন করিল।।
বিজয় কুমার মাতৃ চন্তাইর কন্যা।
সহগামী হৈল রাণী রূপে গুণে ধন্যা।।

---

(১) অথান্তর — অনিষ্ট।

(২) যক্ষ — দেবযোনি বিশেষ, কুবেরের ধন রক্ষক।

(৩) কিন্নর — দেবযোনি বিশেষ, ইহাদের মুখ অশ্বের ন্যায়, অন্যান্য অবয়ব মনুষ্য তুল্য। এই জাতি সঙ্গীত পটু, ইহারা দেবসভার গায়ক।

ইন্দ্রমাণিক্য খণ্ড।

কনিষ্ঠা রাজরাণী ইন্দ্রমাণিক্য জননী।
দুরাচার বিপ্র সনে করিছিল তিনি।।
সেই বিপ্র মন্ত্রণা করিল আপনি।
ইন্দ্রমাণিক্য রাজা করে রাজধানী।।
রাজার প্রধান পুত্র বিজয় যে নাম।
মহাশিল (১) দিয়া রাখে হিরাপুর গ্রাম।।
এই মতে বৎসরেক ব্রাহ্মণে শাসয়।
অড়াই শত যোদ্ধা আনি মিথিলা রাখয়।।
লক্ষ্মীনারায়ণে করে রাজ্যের ব্যবার।
কাট মার সদাকাল ব্রাহ্মণ দুরাচার।।
এ সব অধর্ম্ম দেখি ত্রিপুর সকল।
মন্ত্রণা করয়ে সবে হইয়া সবল।।
সর্ব্বলোকে বোলে দেশে হৈল অমঙ্গল।
ত্রিপুর রাজ্যের লোক অনাথ সকল।।
দৈত্য নারায়ণ নাম প্রধান সেনাপতি।
ব্রাহ্মণ মারিতে যুক্তি করিল সঙ্গতি।।
মন্ত্রণা করিয়া তারা ঘাটে চকি (২) দিব।
রাজপুরে দ্বিজ আইসে সে কালে ধরিব।।
দ্বিতীয় প্রহর কালে ব্রাহ্মণেতে কহে।
রাজমাতা ব্যামোহ হৈল আসিয়া দেখ হে।।
উদরেত ব্যথা হৈছে শীঘ্র আসি দেখ।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে দেখ বা না দেখ।।
ব্রাহ্মণে বলেন আমি দেখিয়াছি ভাল।
দৈবগতি হৈতে পারে না জানি কি হৈল।।

---

(১) মহাশিল — কয়েদ। পূর্ব্বকালে কয়েদীগণের বক্ষে শিল (প্রস্তর) চাপান হইত, এজন্য 'মহাশিল' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) চকি — পাহারা।

চতুর্দ্দোল (১) আন বলি ডাকয়ে সত্বর।
চৌদলে চড়িয়া বিপ্র যায়ে একেশ্বর (২)।।
নদী পার হৈয়া ঘাটে উত্তরিল (৩) যবে।
ত্রিপুরের সেনায় বিপ্র ধরিলেক তবে।।
সেই ক্ষণে শূলেতে দিলেক দ্বিজবর।
শ্লোক এক পড়ি মরে শূলের উপর।।

অথ শ্লোকঃ।

কিং নৈব সন্তি ভুবি তামরসাবতংসা
হংসাবলীবলয়িনো জলসন্নিবেশাঃ।
কোদগ্রদুর্গ্রহতরাং খলু চাতকস্য
পৌরন্দরীং তদপি বাঞ্ছতি বারিধারাং।।

অথ পয়ার।

পৃথিবীতে নাহি কিবা, পদ্মে অলঙ্কৃত
হংস শ্রেণী বলয়াকৃতি জল সন্নিহিত।।
কোন দুগ্রহ তাতে নিশ্চয় চাতকের।
তথাপিহ বাঞ্ছিত জলধারা ইন্দ্রের।।
পরে দৈত্য নারায়ণ মহা সেনাপতি।
সসৈন্যে সাজিয়া গেল যথায়ে নৃপতি।।
ইন্দ্রমাণিক্য রাজা আছাড়িয়া বধে।
আড়াই শ মিথিলা সেনা খেদাইল যুদ্ধে।।
কত মৈল কত গেল আত্মা রক্ষা করি।
রাজমাতা বধিলেক সর্ব্বলোকে বেড়ি।।

---

(১) চতুর্দ্দোল — উচ্চ অঙ্গের দোলা বিশেষ, চৌদল।
(২) একেশ্বর — একাকী।
(৩) উত্তরিল — উপস্থিত হইল।

দৈত্যনারায়ণের জগন্নাথ মন্দির
উগয়পুর।

বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

পরে দৈত্য নারায়ণ হিরাপুরে গেল।
সসৈন্যে গিয়া বিজয় দেবকে আনিল।।
শুভক্ষণে বিজয় দেব বৈসায়ে সিংহাসনে।
প্রণাম করিল সবে যত সৈন্যগণে।।
বিজয় মাণিক্য নাম হইল নরপতি।
তাহান মহাদেবী (১) নাম ছিল পুণ্যবতী।।
ত্রিপুর কুলেতে সে যে শুভজন্মা কন্যা।
পুণ্যবতী নামে হৈল পৃথিবীতে ধন্যা।।
হোমনাবাদে দ্বিজে দিল বহুতর গ্রাম।
তিষিণাতে দিল গ্রাম ব্রাহ্মণ অনুপাম।।
তাম্রপত্রে লিখি দিল পুণ্যবতী নামে।
পুণ্যবতী মতী সতী শ্লোকে অনুক্রমে।।
বিধিমতে ভূমি কত উৎসর্গিয়া দিল।
যেন মত নাম দেবী তেন ধর্ম্ম কৈল।।
দৈত্য নারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান।
জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া নির্ম্মাণ।।
শুভক্ষণে মঠ দিল দেবে উৎসর্গিয়া।
উৎকল হৈতে জগন্নাথ ব্রহ্ম স্পর্শাইয়া।।
জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা আনিল।
বার মাসে বার যাত্রা ক্রমে আরম্ভিল।।
বহুতর ভক্তি করি পূজন করিল।
বহু ভাগ্য সেনাপতির পূর্ব্ব জন্মে ছিল।।
সেই দেব নৃপতিয়ে সেবা করে গিয়া।
সন্ধ্যাকালে জগন্নাথ আইসে প্রণমিয়া।।
কত দিনে সেই মঠ ভূমিকম্পে ফাটে।
হইল অনিষ্ট এক দেবের কপটে।।

---

(১) ত্রিপুর রাজ্যে রাজমহিষীগণ 'মহাদেবী' ও 'ঈশ্বরী' আখ্যায় অভিহিতা হইয়া থকেন। সাধারণ ভাষায় তাঁহাদিগকে 'মাইদেবতা' বলা হয়। বেহারের ইতিবৃত্ত 'রাজাবলী' গ্রন্থে, রাণীদের 'আইদেবতী' উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায়।

যুবক হইল রাজা ষোড়শ বৎসরে।
রাজনীতি কর্ম্ম দৈত্য নারায়ণের ঘরে।।
হস্তী ঘোড়া বাদ্য-ভাণ্ড যতেক রাজার।
সেনাপতির বিনা আজ্ঞা না পারে আনিবার।।
হস্তী ঘোড়া বাদ্য আদি রাজ কার্য্য তরে।
সেনাপতি না দিলে তা কে আনিতে পারে।।
সেনাপতি বোলে রাজ দ্রব্য আমা ঘরে।
আমা মৃত্যু পরে নিবা কে রাখিতে পারে।।
হেন শুনি নরপতি ভাবে মনে মন।
চাহিলে না দেয় দ্রব্য কি করি এখন।।
দৈত্য নারায়ণ ভাই দুর্ল্লভ নারায়ণ।
দুষ্ট হয়ে সে যে কুকর্ম্ম আচরণ।।
অন্যের সুন্দরী কন্যা কাড়িয়া আনয়।
আত্ম ইচ্ছায় কর্ম্ম করে ভাই সর্ব্বময়।।
মাধব তলার হাটে এক যে সুন্দরী।
নানা বিধ শাক বেচে দরিদ্রের নারী।।
দোলাতে চড়িয়া যায়ে দুর্ল্লভ নারায়ণ।
দেখিয়া ধরিয়া নিল সুন্দরী তখন।।
তার স্বামী নিবেদিল রাজার সাক্ষাতে।
তথাচ না দিল ছাড়ি নির্ভয় বিখ্যাতে।।
মনোদুঃখ হৈয়া রাজা কিছু না বলিল।
আত্ম মনে ক্রোধ জন্মে মনে সম্বরিল।।
মাধব নামেতে ছিল বৃহৎ জামাতা (১)।
তার পাশে রাজা বোলে এই সব কথা।।
শুন শুন মাধব তুমি আমার বচন।
আমার নহে এ রাজ্য দৈত্য নারায়ণ (২)।।

---

(১) বহৎ জামাতা — বড় জামাই। সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে মাধব বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর কন্যা পুণ্যবতী, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের মহিষী ছিলেন।

(২) এ রাজ্য আমার নহে — দৈত্যনারায়ণের।

পাঠান্তর — "শুন শুন মাধব যে আমার বচন।
আমার না হয়ে রাজ্য লুটে অন্যজন।।"

দৈত্যনারায়ণ বধিতে রাজার ইঙ্গিত।
কহিতে লাগিল মাধব যেমত উচিত।।
তোমার হইব রাজ্য মাধব মরিব।
তবে সে তোমার রাজ্য নিরুদ্বেগ হৈব।।
দৈত্যনারায়ণের কন্যা তোমার মহারাণী।
এ কথা শুনিলে আমা বধিব পরাণী।।
তুমি দয়া কর রাজা আমা অতিশয়।
দৈত্য নারায়ণ দয়া আমা প্রতি রয়।।।
আমি দিলে করে সে যে নিয়ত ভোজন।
আমা হস্তে রাখে সে যে যত উপার্জ্জন।।
প্রধান জামাতা আমি প্রতীত আমাতে।
বিশ্বাস আমার প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্র মতে।।

অথ শ্লোক।

মিত্র দ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে যে বিশ্বাস ঘাতকাঃ
তে নরা নরকে জান্তি যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ।।

অথ পয়ার।

নরকে উদ্ধার নহে বিশ্বাস ঘাতক।
চন্দ্র সূর্য্য যত কাল থাকে সে নরক।।
তা হৈতে অধিক পাপ ধর্ম্ম শাস্ত্রে নহে।
বিশ্বাস ঘাতকী পাপ যেই মত তাহে।।
মাধব সহিতে রাজা সত্য নির্ব্বন্ধিল।
ভূষণা (১) যাইয়া তাকে থাকিতে বলিল।।
আমার ফরমান চিঠি তোমা নামে যায়।
তাহা না মানিবা তুমি আমার আজ্ঞায়।।
আমার অঙ্গুরী হিরা যখনে দেখিবা।
তবে সে আসিবা তুমি প্রত্যয় করিবা।।
মাধবেরে না বধিতে সত্য কৈল রাজা।
মাধব চলিয়া গেল যথা নিজ ভার্য্যা।।

(১) ভূষণার বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া গিয়াছে। এই প্রদেশ ত্রিপুরেশ্বরের হস্তগত হওয়ায়, মাধবকে তথাকার লস্কর পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

নিঃশব্দে আছিল মাধব ঘরে বিমর্ষিয়া (১)।
দৈত্যের ভৃত্য মাধব আনিল ডাকিয়া।।
দৈত্যনারায়ণে বলে কোথায় গিয়াছিলা।
সময়ে না দিলা অন্ন বহু বেলা কৈলা।।
পরে নানা বিধ অন্ন দিলেক মাধবে।
দৈত্যনারায়ণ অন্ন খাইলেক তবে।।
স্বভাবে ত্রিপুরা জাতি মদ্য মাংসে রত।
অন্ন খাইয়া মদ্য পান করিল বহুত।।
আর মদ্য না খাইব কহে সেনাপতি।
পিয় বলি মাধবে পিয়ায়ে মদ্য অতি।।
মদ্য পানে সেনাপতি পড়িলেক খাটে।
খড়গ লৈয়া তখনে মাধবে মাথা কাটে।।
কাটিয়া দিলেক অগ্নি সেই মহা গৃহে।
ঘর পুড়ি মৈল হেন মাধবে যে কহে।।
অতি বড় অগ্নি দেখি হা হা করে লোকে।
গৃহ দাহে দৈত্যনারায়ণ মরিলেক দেখে।।
অশ্ব আরোহণ করি রাজা শীঘ্র গেল।
সকল দহিছে অগ্নি রাজায়ে দেখিল।।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য সেনা রাজনীতি যত।
সকল আনিল রাজা আপনা পুরীত।।
দৈত্যনারায়ণের কন্যা লক্ষ্মী আর রাণী।
মাধবে রাজার চক্র শুনিয়াছে তিনি।।
মাধব কুতর্ক রাণী রাজাতে কহিল।
রাণীর কুতর্ক রাজা কিছু না শুনিল।।
রাজা গেল শিকারেতে অঙ্গুরী রাখিয়া।
সেইরূপ অঙ্গুরী রাণী ঘটায়ে আনিয়া।।
সেই ত অঙ্গুরী রাণী মাধবকে পাঠায়।
অঙ্গুরী দেখিয়া মাধব আসিল ত্বরায়।।
রাণী আজ্ঞা মাধবকে বধিল তখনে।
এই বার্ত্তা নৃপতিয়ে শুনিল তিন দিনে।।

(১) বিমর্ষিয়া — বিমর্ষ হইয়া।

ক্রোধ হইল নৃপতি অগ্নির সমানে।
যে লোকে মাধব বধে তাকে ধরি আনে।।
জিজ্ঞাসিল রাজা তোকে কেবা নিয়োজিল।
ভয়ে কম্পমান হৈয়া সভাতে কহিল।।
মহাদেবী আজ্ঞা দিল মাধব বধিতে।
এই অপরাধ আমার বলিল রাজাতে।।
এ কথা শুনিয়া রাজা বড় উষ্মা (১) হৈল।
তখনে প্রান্তরে নিয়া তাহাকে বধিল।।
সেই ক্ষণে মহাদেবী দিল বনবাস।
হিরাপুরে রাখে রাণী জীবন নৈরাশ।।
হিরাপুর নাম পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুর ছিল।
উদয়মাণিক্য রাণী হিরাপুর কৈল।।
হিরাপুরে লক্ষ্মী রাণী বনবাস সেবী।
পরে রাজা বিভা করে আর মহাদেবী।।
প্রধানস্থ পাত্র মিত্র রাজাতে কহিল (২)।
কত দিন পরে রাজা লক্ষ্মী রাণী নিল।।
বিজয়মাণিক্য রাজা প্রথম যৌবন।
উত্তর দক্ষিণ রাজ্য লৈতে করে মন।।
দক্ষিণ বাজু (৩) বাম বাজু (৪) রাজ সেনাগণ।
দক্ষিণ বাজু উত্তর রাজ্য নৃপে লৈতে মন।।
কালা নাজির আদি যত দক্ষিণ সৈন্যগণ।
উত্তর রাজ্য পাঠাইল করিবারে রণ।।
আত্মারাম আদি যত খাসিয়া নৃপ থানা।
ত্রিপুরে জিনিয়া করে আপন সীমানা।।
শ্রীহট্ট দেশে ত যত ছিল জমিদার।
মিলিল সকল লোক ত্রিপুর ভেটিবার।।

---

(১) উষ্মা — রাগান্বিত।

(২) প্রধান পাত্রমিত্রগণ, রাণীকে রাজভবনে আনিবার নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন।

(৩) দক্ষিণ বাজু — (ডাইন বাজু)। উদয়পুর রাজধানীর উত্তর দিকস্থ প্রদেশ সমূহ 'দক্ষিণ বাজু' নামে অভিহিত ছিল।

(৪) বাম বাজু — রাজধানীর দক্ষিণ দিকস্থ প্রদেশ সমূহ।

খাসিয়ার রাজা আইসে আপনে মিলিয়া।
ত্রিপুর রাজাতে মিলে বহু আশ্বাসিয়া।।
পঞ্চ হস্তী দশ ঘোড়া তাকে দিল নৃপে।
সবৎসা হস্তিনী চাহে খাসিয়ার ভূপে।।
বিজয় মাণিক্য রাজা হস্তী ইনাম দিল।
হস্তিনী পাইয়া রাজা জয়ন্ত্যা দেশে গেল।।
নিজ দেশে গিয়া রাজা কহে উচ্চ স্বরে।
হস্তী ভেট দিছে আমা ত্রিপুর ঈশ্বরে।।
সবৎসা হস্তী ঘোটক আমি সে পাইল।
জয়ন্ত্যা রাজায়ে বার্ত্তা দেশেতে কহিল।।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ শুনি আসে জয়ন্ত্যা হনে (১)।
সে সবে শুনিয়া কহে ত্রিপুরের স্থানে।।
এ কথা শুনিয়া রাজা বহু ক্রুদ্ধ হৈল।
হাড়ি সৈন্য (২) জয়ন্ত্যাতে যুদ্ধে আজ্ঞা দিল।।
রাজার রাজ্যেতে আছে যত হাড়িগণ।
চট্টলে সুবর্ণ গ্রামে শ্রীহট্টে যত জন।।
দ্বাদশ হাজার হাড়ি তালিক করিল।
যার যেই রাজ্যের হাড়ি সেনাপতি হইল।।
দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া।
হাড়িয়ে ডগর বাদ্য চলে বাজাইয়া।।
চারি মাস হাড়ি সৈন্য পাইয়া বেতন।
মদ্য শূকর খাইয়া চলিলেক রণ।।
ঘুরি ঘুরি শব্দ করি ডগর বাজায়।
সাজনি সাজিয়া সব হাড়ি সৈন্য যায়।।
উত্তরের হাড়ি চলে আগে লৈয়া বানা (৩)।
বঙ্গ দেশী হাড়ি সব মধ্যে থাকে থানা।।

---

(১) হনে — হইতে।

(২) হাড়ি — হীনজাতি বিশেষ। ইহাদের মধ্যে সম্প্রদায় বিভাগ আছে। মলমুত্র পরিষ্কার, শূকর পোষণ, বাদ্যবাদন, পাল্কীবহন ও তাড়ি প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি কার্য্য সম্প্রদায় বিভেদে করিয়া থাকে। চৌকিদারী করাও ইহাদের একটি কার্য্য।

(৩) বানা — পতাকা।

দক্ষিণ দিগের হাড়ি চাটিগ্রাম আদি।
তার সেনা পাছে চলে মহা শব্দ বাদি।।
ঢেমস্ ডগর বাজে নাচে উর্দ্ধ হাতে।
শূকর খেদান লাঠি পাকাইয়া (১) মাথে।।
এমত সাজিয়া সবে থানাতে গেলেন্ত।
শুনিল খাসিয়া রাজা এ সব বৃত্তান্ত।।
শীঘ্র গিয়া মিলিলেক হেড়ম্ব রাজাতে।
দূত এক পাঠাইল ত্রিপুরেশ্বরেতে।।
হেড়ম্বের নরপতি নির্ভয় নারায়ণ।
পত্র এক লিখিলেক ত্রিপুর সদন।।
নির্ভয় নারায়ণে পত্র হাসিয়া লিখায়। (২)
রাজা নাম ধরে সে যে উচিত না হয়।।
হাড়িয়ে জয়ন্ত্যা যুঝে সর্ব্ব লোকে কয়।
আমাকে দেখিতে ভাই ক্ষম মহাশয়।।
এই পত্র লিখিল নির্ভয় নারায়ণ।
পত্র পাইয়া হাড়ি সৈন্য ফিরায়ে রাজন।।
ত্রিপুর রাজার থানা শ্রীহট্টে বৈসাইল।
কালা নাজির ত্রিপুর থানাতে রহিল।।
চাটিগ্রামে চলিল বিজয় মহারাজা।
দুই সহস্র চলিলেক সৈন্য মহাতেজা।।
চাটিগ্রাম রাজা সঙ্গে সহস্র পাঠান।
প্রচণ্ড উজির সঙ্গে সহস্র বঙ্গ যান।।
দুই মাস পাঠানের বাকী যে বেতন।
উজিরে পাঠান বেতন না দিল তখন।।
আজি দিব কালি দিব কথায় টালন।
পাঠানে মারিল উজির এই সে কারণ।।
প্রচণ্ড উজির মেহারকুলে মারা গেল।
তান পুত্র প্রতাপ নারায়ণ পলাইল।।

---

(১) পাকাইয়া — ঘুরাইয়া।

(২) হেড়ম্ব নৃপতি পরিহাস করিয়া লিখিলেন, জয়ন্ত্যায় হাড়িতে যুদ্ধ করে, সকলে এইরূপ বলিতেছে। রাজা হইয়া তোমার এরূপ করা অকর্ত্তব্য। আমার দিকে চাহিয়া (আমার অনুরোধে) জয়ন্ত্যা রাজাকে ক্ষমা কর।

রাখিল আপনা প্রাণ বনে প্রবেশিয়া।
যতেক পাঠান রহে বেগণা (১) হইয়া।।
রাঙ্গামাটি রাজবাটী লুটিতে চাহে পাঠান।
রাজবাটী প্রহরী গড় ধরে সাবধান।।
তথা চাটিগ্রামে সেই পাঠান বর্ব্বর।
রাজাকে মারিতে যুক্তি করেন অপর।।
মদ্য পানে পাঠানের কলহ জন্মিল।
পাঠানের কুমন্ত্রণা তাতে ব্যক্ত হৈল।।
পাঠানের তারে রাজা জিজ্ঞাসিল পুনি।
বঙ্গে চাটিগ্রামে পাঠান যুক্তি হৈছে শুনি।।
পুনরপি এই কথা রাজাতে কহিল।
নিশ্চয় জানিয়া রাজা পাঠান ধরিল।।
সহস্র শোয়ার কর্ত্তা পাঠান বিস্তর।
চতুর্দ্দশ দেবতারে দিল নরেশ্বর।।
শীঘ্র গতি নরপতি রাঙ্গামাটি আইসে।
পথেত শুনিল রাজা উজির মরিছে।।
ফিরিয়া নৃপতি পরে বঙ্গেতে চলিল।
এই সব বৃত্তান্ত তাতে পাঠানে শুনিল।।
ভঙ্গ দিয়া গেল পাঠান গৌড়েশ্বর স্থানে।
ক্রোধে গৌড়েশ্বর সৈন্য বহু দিল রণে।।
চাটিগ্রামে চলিলেক সৈন্য সেনাগণ।
চলি আইসে বহু সৈন্য করিয়া গর্জ্জন।।
মমারক খাঁ (২) নামেত গৌড়েশ্বর (৩) শালা।
মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভালা।।
তিন সহস্র অশ্ব চলে তাহার সঙ্গতি।
দশ সহস্র ঢালি চলে ধানুকী পদাতি।।
দুরন্ত পাঠান জাতি ক্রোধে অহঙ্কারী।
চলিয়াছে চট্টগ্রামে পাঠান সঙ্গে করি।।

---

(১) বেগনা — সম্পর্কবিহীন, এস্থলে বিদ্রোহী।
(২) মতান্তরে মহম্মদ খাঁ।
(৩) এই গৌড়েশ্বর, উড়িষ্যা বিজয়ী সুলতান সুলেমান।

মমারক খাঁ সৈন্য সমে চাটিগ্রামে গেল।
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য মগলে জিনিল।।
এই বার্ত্তা শুনি রাজা মহা ক্রোধ হৈল।
সেনাপতি সকলেরে অনেক ভর্ৎসিল।।
কালা নাজির দক্ষিণ বাজু (১) শ্রীহট্ট বিজয়।
বাম বাজু (২) সৈন্য পলায় পাঠানের ভয়।।
শোয়ার নাহিক দেখি ত্রিপুরের সেনা।
পাঠানে লইল আসি চট্টগ্রাম থানা।।
পাঠান শোয়ার রাজার হইল বেগনা।
অশ্বহীন রাজ সৈন্য দেখে সর্ব্বজনা।।
ত্রিপুরার সেনা যত অশ্ব আরোহিয়া।
যুদ্ধ হেতু নরপতি দিল পাঠাইয়া।।
আট মাস যুদ্ধ করে পাঠানের সনে।
লইতে না পারে গড় চাটিগ্রাম স্থানে।।
হেন শুনি বিজয় মাণিক্য ক্রোধ হইল।
সেনাপতি সকলেরে চরখা পাঠাইল (৩)।।
শ্রীহট্ট হনে কালা নাজির আনিল ত্বরায়।
দক্ষিণ বাজুর সৈন্য লইয়া ত্রিপুরায়।।
পুত্রবৎ মান্য দিয়া পাঠায় নাজির।
সৈন্য সমে চাটিগ্রামে গেল মহাবীর।।
প্রাতঃকালে কালা নাজির যুদ্ধ আরম্ভিল।
পূর্ব্ব প্রেরিত বাম বাজু পশ্চাতে রহিল।।
দুই সৈন্য আগু হৈয়া সংগ্রাম মাঝার।
তীর বন্দুকের যুদ্ধ পাছে খড়্গ ধার।।
খড়্গাঘাতে মহাশব্দ ঝনরব হৈল।
ত্রিপুর পাঠান মহা সংগ্রাম বাজিল।।
রক্তময় হৈল সব অশ্ব নর দেহে।
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া হস্তী সব রহে।।
স্থানে স্থানে মত্ত গজ দন্তে দন্তে ভিড়ি।
দুই মেঘে গর্জ্জে যেন করে জড়াজড়ি।।

(১-২) রাজধানীর উত্তরভাগ (শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশ) দক্ষিণ বাজু এবং দক্ষিণভাগ (চট্টগ্রাম প্রভৃতি) বাম বাজু নামে অভিহিত হইত। (৩) ইহা রণ-পরাঙ্মুখ সেনাপতিগণের দণ্ড বিশেষ।

যার যেই সীমাতে থাকিয়া যুদ্ধ করে।
চতুর্থ প্রহর গেল দুর্জ্জয় সমরে।।
চারি দণ্ড বেলা আছে সায়ং সময়।
আগে যুদ্ধে নাজিরে পশ্চাতে সৈন্য রয়।।
যুদ্ধে কালা নাজির নাম সেনাপতি ছিল।
নাজিরের নাম শুনি পাঠানে বেড়িল।।
পৈশুন্যে (১) না করে যুদ্ধ রাজ সেনাগণ।
যুদ্ধে পড়িল নাজির এই সে কারণ।।
যুদ্ধ জয় হৈল বলি পাঠান বর্ব্বর।
শ্রান্ত হৈয়া গেল তারা গড়ের ভিতর।।
বহুতর শ্রান্ত হৈছে ক্ষত হৈছে দেহ।
ক্ষুধায় ব্যাকুল পাঠান খাইতে চাহে কেহ।।
কেহ শান্ত হৈতে আছে কেহ জল খায়।
জল পিয়া হস্তী ঘোড়া সকল শান্তায়।।
রন্ধনেতে গেছে কেহ খাইতে লাগিছে।
হেনকালে ত্রিপুর সৈন্যে মন্ত্রণা করিছে।।
রাজার পালক পুত্র নাজির পড়িল।
কি উত্তর দিবা সবে গজ ভীমে কৈল।।
যুক্তি করিয়া সৈন্যে করিল নিশ্চয়।
সন্ধ্যাকালে কোঠ তলে সুরঙ্গ নির্ম্মায়।।
হাতে হাতে সুরঙ্গ খনিল সৈন্যগণ।
রাজ সৈন্য কোঠে গেল করিবারে রণ।।
তিন সহস্র ত্রিপুরগণ খড়্গ চর্ম্ম লৈয়া।
কাটয়ে পাঠান সৈন্য কোঠে প্রবেশিয়া।।
ভঙ্গ দিল পাঠান অনেক মারা গেল।
মাতৃ সমে মমারক খাঁ গড়ে লুকাইল।।
লুকাইয়া রহে গড়ে প্রাচীর উপর।
চারি পার্শ্বে ত্রিপুর সৈন্যে বলে ধর ধর।।

(১) পৈশুন্য — খলতা, ধূর্ত্ততা। পূর্ব্ব প্রেরিত সেনাপতিগণ পরাজিত হওয়ায়, মহারাজ কোপান্বিত হইয়া, তাহাদিগকে সূতা কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ চরখা উপহার দিয়াছিলেন এবং কালা নাজিরকে তাহাদের নায়ক করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন। এজন্য সেনাপতিগণ ধূর্ত্ততা করিয়া যুদ্ধ করে নাই।

প্রাচীর বেড়িল সবে ত্রিপুর সেনাগণ।
মমারক বলিয়া সৈন্যে করয়ে তর্জ্জন।।
মমারক খাঁর মাতা কহিল তখন।
অগ্নিয়ে পুরিলে মাটি না পাইব কখন (১)।।
মাতার কথন শুনি কহিল ডাকিয়া।
সত্য কর তোমা সব মিলিব আসিয়া।।
ত্রিপুরা সেনায়ে বলে না মারিব তোকে।
রাজার সাক্ষাতে নিব বলিল তাহাকে।।
এ কথা শুনিয়া খাঁয়ে আপনে মিলিল।
লোহার পিঞ্জর মধ্যে তাহাকে ভরিল।।
কাফির (২) বলিয়া খাঁয়ে বহু গালি দিল।
ত্রিপুরের সেনা তাকে লইয়া চলিল।।
থানাদার চট্টগ্রাম গড়েতে রাখিয়া।
পাঠানের যত দ্রব্য সকল লুটিয়া।।
হস্তী ঘোড়া যত দ্রব্য সকল রাজার।
অন্য দ্রব্য লুটে সবে যেই পায়ে তার।।
সুবর্ণ কুষ্মাণ্ড ছিল সের পরিমাণ।
সকল পাঠাইয়া দিছে রাজা বিদ্যমান।।
দৈবে কুষ্মাণ্ড এক পাইকে (৩) লুকাইয়া।
মদ্যপান করিছিল শুঁড়ী ঘরে নিয়া।।
পিতলের জানিয়া কুষ্মাণ্ড নিয়াছিল।
এক আনা মূল্য করি মদ্যপান কৈল।।
অবশিষ্ট লৈয়া গেল রাজার সাক্ষাত।
সুবর্ণ কুষ্মাণ্ড হেন জানিল পশ্চাত।।
দূত মুখে শুনি রাজা তদন্ত করিল।
শুঁড়ী ঘরে দিয়া পাইকে মদ্যপান কৈল।।
আষ্ঠ সের মদ্য তাতে করিয়াছে পান।
এ সব বৃত্তান্ত কহে রাজা বিদ্যমান।।

---

(১) মমারক খাঁয়ের মাতা তাঁহাকে বলিলেন, ত্রিপুর সৈন্যগণ যদি অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করে, তবে মাটি পাইব না, অর্থাৎ মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত কবর পাইব না।

(২) কাফির — ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত ব্যক্তি, অধার্ম্মিক।

(৩) পাইক — সৈন্য।

এহি ত শুনিয়া রাজা চর নিয়োজিল।
কুষ্মাণ্ড সহিতে শুঁড়ী ধরিয়া আনিল।।
হেন মতে পঞ্চশত কুষ্মাণ্ড পাইল।
রাজায় কুষ্মাণ্ড নিয়া মূল্য যত দিল (১)।।
পরে মমারক খাঁকে পিঞ্জরে রাখিয়া।
সুবর্ণ দ্বারের (২) বাহির রাখিলেক নিয়া।।
নৃপতির স্থানে সব বৃত্তান্ত কহিল।
মমারক খাঁকে সুবর্ণ দ্বারেতে আনিল।।
পিঞ্জর হতে খসাইতে নৃপে আজ্ঞা দিল।
বিচিত্র ভূষণ কত খাঁকে রাজা দিল।।
রাজা দেখি মমারক খাঁ সেলাম না করে।
কিছু না বলিল রাজা ক্রোধ নাহি তারে।।
রাজাজ্ঞাতে খাঁকে আনিল মহল দ্বারে (৩)।
গৌড়েশ্বর শালা সে যে মনে গর্ব্ব করে।।
নৃপতির ইচ্ছা আছে না বধিতে তাকে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ যার যে মত যে থাকে।।
দুর্ল্লভ চন্তাই নাম রাজাতে যে কহে।
চতুর্দ্দশ দেব বলি খাঁকে দিব তাহে।।
নৃপতিয়ে বলে চন্তাই উচিত না হয়।
মমারক খাঁ বড় লোক সর্ব্ব লোকে কয়।।
চন্তাই বলে খাঁকে বলি দিবার তরে।
দেবতার আজ্ঞা হৈছে বলিল রাজারে।।
নিঃশব্দে রহিল রাজা, অনুমতি জ্ঞানে।
চন্তাই যে খাঁকে নিল রত্নপুর (৪) স্থানে।।
রজনী বঞ্চিল খাঁয়ে রত্নপুর গ্রামে।
রাত্রি অবসানে চন্তাই দেওড়াই সমে।।

---

(১) পাঠান্তর — "হেনমতে পঞ্চশত কুষ্মাণ্ড লইল।
রাজঘর হনে কড়ি শুঁড়ীরে দেওয়াইল।।"

(২) সুবর্ণ দ্বার — সদর দরজা, সিংহদ্বার।

(৩) মহল দ্বার — প্রাসাদের সদর দরজা।

(৪) রত্নপুর — এইস্থানে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির ছিল।

পৃষ্ঠ হস্তে বান্ধি তারে স্নান করাইল।
হরিদ্রা বর্ণের বস্ত্র খাঁকে পৈরাইল।।
চতুর্দ্দশ দেব অগ্রে খাঁকে বৈসায়।
পশ্চিম মুখি হয় সে যে আপনা ইচ্ছায়।।
বলাৎকারে (১) পূর্ব্বমুখ খাঁকে করে পরে।
পশ্চিমেত মুখ সে যে হৈল পুনর্ব্বারে।।
বারম্বার খাঁয়ে স্কন্ধ দিয়া যে ফিরায়ে।
সেই কালে খাঁয়ের ভৃত্য ছিল সে যাগায়ে।।
খাঁর ভৃত্যে সেই কালে খাঁকে বলিয়াছে।
হজরত আনি (২) ভ্রাতা তুমি জানা আছে।।
মমারক খাঁ তোমা নাম গৌড় সেনাপতি।
হেন জন পড়িয়াছ কাফির সঙ্গতি।।
পশ্চিমেত খোদা আছে পূর্ব্বে কিবা নহে (৩)।
এমত সময় তোমার কি বিচার তাহে।।
কাফিরে (৪) মারিলে তোমা পরে ভাল হৈবা।
অনায়াসে তুমি যেন ভেস্তেতে (৫) যাইবা।।
স্কন্ধ মেলিয়া দেও পূর্ব্ব মুখ হৈয়া।
এই দেহ ছাড় তুমি শীঘ্র যে করিয়া।।
এ কথা শুনিয়া খাঁয়ে কলিমা (৬) পড়িল।
পূর্ব্ব মুখি হৈয়া খাঁয় স্কন্ধ পাতি দিল।।
চন্তাই খিতুঙ্গ নামে (৭) দিল উৎসর্গিয়া।
লিকা দেহড়াই ছেদে বারণা (৮) লইয়া।।
কাটিল মমারক খাঁ ত্রিপুরার বৈরী।
কলিজা (৯) মস্তক রক্ত একত্রতা করি।।

---

(১) বলাৎকারে — বলপূর্ব্বক।
(২) হজরত আনি — প্রভুত্ব, প্রাধান্য।
(৩) খোদা কেবল পশ্চিমে আছেন, পূর্ব্বদিকে নাই, এমন নয়। খোদা — ঈশ্বর।
(৪) কাফির — ধর্ম্মজ্ঞান বিগর্হিত ব্যক্তি।
(৫) ভেস্ত — পুণ্যময় স্থান, স্বর্গ।
(৬) কলিমা — মুসলমান ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, ইহা উচ্চারণ করিলে, উক্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া যায়।
(৭) খিতুঙ্গ — চন্তাইর নাম।
(৮) বারণা — খড়্গ।
(৯) কলিজা — হৃদ্‌পিণ্ড।

দেবতা সাক্ষাতে নিয়া উৎসর্গিয়া দিল।
যে মত বিধান ছিল তে মত করিল।।
হৃদয় ফাড়িতে তার দেখে গুরুতর।
সোণার পুতুল এক হৃদয় ভিতর।।
অপূর্ব্ব দেখি চন্তাই দেখায়ে রাজারে।
লক্ষ্মী চিহ্ন বলি নৃপ রাখিল অন্তরে।।
সপ্ত দিন পরে আইসে গৌড়েশ্বর লিখা।
মমারক খাঁ ছাড়ি দেও তুমি আমার সখা।।
পদ্মা অবধি করি যাত্রাপুর (১) দেশ।
সীমানা করি দিব রাজ্য তোমাকে বিশেষ।।
পত্র শুনিয়া রাজা হইয়া বিস্মিত।
চন্তাই গঞ্জিল রাজা সভার বিদিত।।
মমারক খাঁকে দিত যদি হৈত গৌড় বশ।
তুমি চন্তাই করিলা যে আমা অপযশ।।
নৃপে বলে চিন্তিয়া যে নহে কিছু কাজ।
খাঁয়ের মরণ বার্ত্তা লিখে মহারাজ।।
কনক রচিত পত্র (২) বিশ্বাসে লিখিল (৩)।
নৃপ পত্র শুনি গৌড় উত্থিত হইল।।
পুনর্ব্বার বাদসায়ে দূতকে পাঠায়ে।
দিল্লী সৈন্য সঙ্গে করি আসিব ত্বরায়ে।।
পরিবার সমে সাহা আসে ত্রিপুরাতে।
দূতে কহে বাদসায় বলিল যে মতে।।

---

(১) যাত্রাপুর — ইছামতীর তীরবর্ত্তী স্থান বিশেষ।

(২) পুরাকালে পত্র রঞ্জিত করিবার নিয়ম ছিল। সুবর্ণ দ্বারা রঞ্জিত পত্র উত্তম, রৌপ্য রঞ্জিত পত্র মধ্যম এবং রঙ্গাদি দ্বারা রঞ্জিত হইলে তাহা অধম পত্র বলিয়া গণ্য হইত। এতদ্বিষয়ে বররুচির মত এই ; —

"সুবর্ণ রুপ্য রঙ্গাদ্যৈরঞ্জয়েৎ পত্রমুত্তমং।
সামান্যোত্তম মধ্যানাং পত্ররঞ্জনমীরিতম্।।"
বররুচিকৃত পত্র কৌমুদী।

(৩) রাজার পত্র লেখক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারী থাকিত, পত্র কৌমুদী আলোচনায় ইহা পাওয়া যায়। ত্রিপুর রাজ্যেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল। রাজ দরবারের পত্র লেখক 'বিশ্বাস' ও 'পত্রনবীস' ইত্যাদি উপাধি লাভ করিতেন।

তুষ্ট হৈয়া নৃপতি করিল অঙ্গীকার (১)।
আর দিন দূতেতে জিজ্ঞাসে পুনর্ব্বার।।
একাব্বর (২) পশ্চিমেতে আমি পূর্ব্বদিগ।
মধ্যেতে পাঠান জাতি রাজ্য করে ভোগ।।
এ কথা শুনিয়া দূত দিলেক উত্তর।
দাউদ বাদসা (৩) হয়ে বড় মহত্তর।।
দুই পত্নী দুই দিগে সুখে নিদ্রা যায়।
এই মতে সুখে বঞ্চে দাউদ বাদসায়।।
দূত বাক্যে ক্রোধ হৈল নৃপতি বিস্তর।
দূতেরে কাটিতে আজ্ঞা করিল সত্তর।।
বাছার (৪) সকলে দূত নিল সেই ক্ষণে।
গজ ভীম নারায়ণে কহিল কথনে।।
দূত মারিবার নহে উচিত রাজন।
পাঠান বর্ব্বর জাতি গুমান (৫) কথন।।

---

(১) পাঠান্তর — "পুনরপি গৌরপতি দূত পাঠাইল।
দিল্লীর সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।।
পরিবার রাখিবারে রাজার আবাসে।
দূত আসি বলিলেক একথা রাজাতে।।
তুষ্ট হৈয়া নরপতি কৈল অঙ্গীকার।" ইত্যাদি।

গৌড়েশ্বর দাউদসাহ, দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া, পরিবারবর্গ নিরাপদে রক্ষার অভিপ্রায়ে ত্রিপুরায় প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইয়া, মহারাজ বিজয় মাণিক্যের দরবারে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহারাজও হৃষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন ; কিন্তু মহারাজ দূতের অশিষ্ট ব্যবহারের দরুণ তাঁহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দেওয়ায়, সেই সূত্রেই গৌড়েশ্বরের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

(২) একাব্বর — আকবর বাদশাহ। ধার্ম্মিকতা এবং সকল জাতির প্রতি সমদর্শিতার দরুণ তিনি সাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছিলেন। একাব্বরী বা আকবরী মোহর (সুবর্ণ মুদ্রা) অদ্যাপি লক্ষ্মীযুক্ত বলিয়া হিন্দুসমাজে আদরণীয় ; হিন্দুগণ তাঁহাকে 'জগদীশ্বরো বা' বলিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শনের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তিনি পঞ্চ গৌড়েশ্বর বলিয়া ঘোষিত হইতেন, একথা মাধবাচার্য্যের 'দুর্গামঙ্গল' গ্রন্থেও পাওয়া যায়, যথা ; —

"পঞ্চ গৌড় নামে দেশ পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার।।"

(৩) দাউদ বাদসা — ইনি বঙ্গেশ্বর ছিলেন। ১৫৭৪ খৃঃ অব্দে ইনি বিদ্রোহী হওয়ায়, সম্রাট আকবর ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া সলিমকে বাঙ্গালার মসনদে স্থাপিত করিয়া ছিলেন।

(৪) বাছার বাছাল — যুদ্ধে বিজিত কুকিগণের যে সকল রমণী ধরিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ বাছাল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৫) গুমান — অহঙ্কার।

রাজধানী পার করি দূতকে দিবার।
রাজাজ্ঞাতে সেই ক্ষণে দূত করে পার।।
গৌড়েশ্বর স্থানে দূতে কহিল বৃত্তান্ত।
বহুল ভর্ৎসিল তাকে পাঠান দুরন্ত।।
প্রীতি করিবার তোকে পাঠায়ে বাদসায়ে।
কলহ করিয়া আইলে খোদার ইচ্ছায়ে।।
দূতে কহেত পাঠান এবে না রহিব।
মগলে পাইবে রাজ্য পাঠান ভাগিব (১)।।
এই অবকাশেতে বিজয় মাণিক্য রাজা।
বঙ্গদেশে চলিলেক লৈয়া সৈন্য প্রজা।।
পঞ্চ সহস্র নৌকার করিল সাজন।
এক সহস্র অশ্ব রাখে নৌকাতে আপন।।
নৌকা প্রতি পঞ্চ বন্দুক পঞ্চ তীরন্দাজ।
আর নৌকায় রাখিলেক পদাতি সমাজ।।
ডিঙ্গি আদি নৌকায়ে রাখে যত সৈন্যগণ।
বিজয় মাণিক্য চলে অনেক সাজন।।
প্রথমে করিল রাজা ব্রহ্মপুত্র স্নান।
ধ্বজ আরোপিয়া (২) ঘাটে করে বিধি দান।।
তীর্থরাজ লোহিত্য (৩) দেখিল নরেশ্বর।
স্নান দান করিলেক পুণ্য কলেবর।।
ভৃগুরামে (৪) যথা ধ্বজ করিছে আরোপণ।
সেই স্থানে করে নৃপ ধ্বজের স্থাপন।।
সহস্র সুবর্ণ ধ্বজ আরোপিল ভূপে।
উৎসর্গিয়া দিল স্বর্ণ ব্রাহ্মণ সমীপে।।

---

(১) ইহা পাঠান রাজত্বের শেষ অবস্থার সময় ; মোগল ও পাঠানের মধ্যে এইকালে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল।

(২) ধ্বজা রোপণ — ইহা পুণ্যজনক কার্য্য। তীর্থস্থান, দেবালয় ও প্রাসাদ প্রভৃতিতে ধ্বজোত্তোলন না করিলে, তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না। শাস্ত্রে ধ্বজা রোপণ সম্বন্ধে পাওয়া যায়, —

"চূলকে ধ্বজদণ্ডে চ ধ্বজে দেবকুলে তথা।
প্রতিষ্ঠা চ যথোদ্দিষ্টা তথা স্কন্দ বদামি তে।।"

অগ্নিপুরাণ — ১০৩ অঃ।

(৩) লোহিত্য — ব্রহ্মপুত্র। (৪) ভৃগুরাম — পরশুরাম।

উৎসর্গ সুবর্ণ যত ব্রাহ্মণে লুটে।
বিজয় মাণিক্য কীর্ত্তি হৈল ধ্বজ ঘাটে।।
সেই রাজ্য জমিদার আনয়ে রাজন।
পঞ্চ দ্রোণ ভূমি ক্রয় করিল তখন।।
সেই পঞ্চ দ্রোণ ভূমি ব্রাহ্মণকে দিল।
সেই হনে পঞ্চ দ্রোণা গ্রাম নাম হৈল।।
ধ্বজঘাট সমীপেতে পঞ্চ দ্রোণ গ্রাম।
বিজয় মাণিক্য রাজা পুণ্যতর ধাম।।
লোহিত্য পশ্চিম ভাগে বসতি জাহ্নবী।
পূর্ব্বভাগে যমুনা যে সরস্বতী দেবী।।
ব্রহ্মপুত্র স্নান করি জরপ (১) মারিল (২)।
ধ্বজঘাট বিজয়ী বলি মহরে লিখিল।।
তীর্থরাজ স্নান পরে লক্ষাতে গমন।
লক্ষা স্নান বলি জরপ মারিল রাজন।।
ইচ্ছামতী পথে পদ্মাবতী গেল পরে।
যাত্রাপুরে গিয়া রাজা স্নান তর্পণ করে।।
পদ্মাবতী স্নান পরে মহর মারিছে।
পদ্মাবতীর জল পান সসৈন্যে করিছে।।
কত দিন নরপতি রহিল তথাতে।
অব্যক্ত গৌড়ের দূত (৩) আসিল দেখিতে।।
মহা এক বৃক্ষে চড়ি দুই জন ভাট (৪)।
দেখিলেক পদ্মাতীরে রাজা করে পাট (৫)।।
হেন কালে রাজদূতে দেখিল তাহাকে।
ধরিয়া আনিল ভাট রাজার সম্মুখে।।
জিজ্ঞাসিল নরপতি সত্য করি কহ।
কাহার প্রেরক (৬) তুমি কি হেতু আইসহ।।

---

(১) জরপ — স্বর্ণমুদ্রা।
(২) মারিল — ছাপ দিল, স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিল।
(৩) অব্যক্ত দূত — গুপ্তচর।
(৪) ভাট — অবস্থা বর্ণনকারী দূত বা বার্ত্তাবহ।
(৫) পাট — রাজার আবাস স্থান।
(৬) প্রেরক — প্রেরিত।

রাজার বচন শুনি সে ভট্টে কহিল।
তোমাকে দেখিতে গৌড়েশ্বরে পাঠাইল।।
ত্রিপুরার সৈন্যগণ কিমত আকার।
কিবা ক্রমে ঘোড়া চড়ে, খড়্গ ঢাল তার (১)।।
এই ত স্বরূপ কথা আমি নিবেদিল।
তোমা চরে আমা পাইয়া ধরিয়া আনিল।।
একথা শুনিয়া রাজা ভট্ট বিদায় কৈল।
এ সব কহিত (২) গিয়া প্রাণে না মারিল।।
সুবর্ণ গ্রামেতে কত আছিল সুন্দরী।
বলেতে ধরিয়া আনে তাহার যে পুরী।।
বিক্রম পুরেতে যাইয়া আসিল ফিরিয়া।
নিন্দা করে সুবর্ণ গ্রামে ত্রিপুর দেখিয়া।।
এসব দেখিয়া নৃপ মনে ক্রোধ হৈল।
সুবর্ণ গ্রামেতে নৃপ কত দিন ছিল।।
কুলীন চৌধুরী সবের সুন্দরী যার কন্যা।
সেই ঘরে নৃপতির পালঙ্ক রাখে ধন্যা।।
সহস্রেক তঙ্কা পায় পালঙ্ক সহিত।
এই রূপে সুবর্ণ গ্রামে করিল পরিমিত।।
এই দোষ নৃপতির শরীরেতে ছিল।
সুন্দরী নিকৃষ্ট জাতি তাকে না দূষিল (৩)।।
শরীর সুন্দর রাজার চন্দ্র সমান খ্যান।
গৌর বর্ণ পণ্ডিত রাজা পুরুষ প্রধান।।
কন্দর্প সমান রূপ অতি মনোহর।
রাজসিক ভাব নিত্য থাকয়ে অন্তর।।
এক দিনে ব্রহ্মপুত্রে পোল নির্ম্মাইল।
সসৈন্য সহিতে রাজা পোল পার হৈল।।

---

(১) তাঁহার খড়্গ, ঢাল ইত্যাদি অস্ত্র কিরূপ। তাহা দেখিতে পাঠাইয়াছে।

(২) কহিত — বলিবার নিমিত্ত।

(৩) পাঠান্তর — "এক দোষ নৃপতির শরীরে আছিল।
ভৌমিক সুন্দরী শুনি তাকে না বাছিল।।"
এস্থলে ভূঁই মালীকে ভৌমিক বলা হইয়াছে।

সরণির পথ ক্রমে কৈলাগড়ে (১) আসি।
খনাইল এক নদী তথা নৃপে বসি।।
বিজয় নন্দিনী (২) নাম রাখিল নদীর।
শ্রীহট্টে চলিল রাজা বিজয় মহাবীর।।
তার পরে জাঙ্গাল রাজা বান্ধায়ে আজ্ঞাতে।
ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি খ্যাতি হয় তাতে (৩)।।
জিনার পুরেত (৪) রাজা খাল কাটি দিল।
ত্রিপুরার খাল বলি নাম তার হৈল।।
পঞ্চ খণ্ড দেশ হইয়া ইটাতে আসিল।
ভানু নারায়ণ তাতে তালুকদার ছিল।।
চারিদিগে জমিদারে হিংসে যে তাহারে।
সীমা করিল নৃপে তাকে দিতে ইচ্ছা করে।।
নৃপ স্থানে প্রতিগ্রহ দ্বিজে ভূমি চাহে।
উৎসর্গিয়া দিল ভূমি তাম্র পত্রে তাহে।।
সেই হনে চৌধুরী খ্যাতি হৈল দ্বিজবর।
পুনি নৃপতি স্থানে চাহিল অপর।।
সমস্ত পাইল কহে সেই দ্বিজবর।
চতুর্থাংশ রাজ ভূমি দিতে চাহে কর।।
তবেত রহিব আমা পুরুষানুক্রম।
তাহা নাহি হৈলে আমা বৃথা হৈল শ্রম।।

---

(১) কৈলাগড় — কসবা।

(২) বিজয় নন্দিনী — বিজয় নদী। তিতাস নদী হইতে, নয়ানপুরের সন্নিহিত বুড়িমা নদী পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আছে। বিজয়মাণিক্য এই নদীর বাঁক কাটাইয়া সোজা করায়, তদবধি নদীর নাম 'বিজয় নদী' হইয়াছে। ইহাকে বিজনা নদীও বলে।

(৩) পাঠান্তর — "শ্রীহট্টে ত গেলেন বিজয় মহাবীর।।
তরপে জাঙ্গাল বান্ধে রাজার আজ্ঞায়ে।
ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি অদ্যাপি কহয়ে।।"

'তরপে' স্থলে, এখানে 'তারপরে' লিখিত হইয়াছে। তরপ শ্রীহট্ট জেলার একটী পরগণার নাম। এই পরগণার ভিতর যে প্রাচীন সড়ক আছে, তাহা বিজয় মাণিক্যের কীর্ত্তি।

(৪) জিনারপুর — এই স্থান শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত।

পরে নৃপতি বলে তোমা ইচ্ছা মতে।
কর দিতে কহে নৃপে ব্রাহ্মণ ইচ্ছাতে।।
তথা হনে নরপতি চৌয়াল্লিশ দেশে।
শিকার করিল নৃপ হরিষ বিশেষে।।
বহু দিন সসৈন্যেতে নৃপ সেই স্থান।
রাজ সৈন্য লুটিতে রাজ্য করিল পয়ান।।
মহা খাড়াইত (১) তারা দুই সহস্র পাইক।
খড়্গ চর্ম্ম জাঠি হাতে দেখি ভয়ানক।।
সাতবার ধন্য সাগর ফিরিতে যে পারে।
সেই জনা তার নাম খাড়াতাইয়া ধরে।।
দিবা রাত্র থাকে রাজ দ্বারেতে প্রহরী।
বড় বড় অঙ্গ তারার (২) বিক্রমে কেশরী।।
এক খাড়াইত গেল দেশ লুটিবার।
ভঙ্গ দিল বঙ্গদেশী (৩) দেখি ব্যবহার।।
এক নারীয়ে তাহার চরণে পড়িল।
কেশ দিয়া খাড়াইত পায়েতে বান্ধিল।।
পদে বান্ধিল নারী নড়িতে না পারে।
হেন কালে তার পতি আসিল সত্বরে।।
প্রহার করিল স্বামী পাইকের মাথে।
সূর্য্য খাড়াইত মরে প্রহারের ঘাতে।।
রাজার সাক্ষাতে বার্ত্তা গেল ততক্ষণ।
অগ্নি সম ক্রোধ হৈল শুনিয়া রাজন।।
গ্রাম সমে (৪) ধরিয়া আনিতে আজ্ঞা দিল।
ধরিলেক কত জনা কত পলাইল।।
জমিদারে ধরি দিল যে জনা মারিছে।
সূর্য্য খাড়াইত যেই প্রাণেতে বধিছে।।

---

(১) 'খাড়াইত' উপাধি বহু প্রাচীন। এই লহরের টীকায় খাড়াইতের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

(২) তারার — তাহাদের। ইহা ত্রিপুরা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষা।

(৩) এই সময় শ্রীহট্ট অঞ্চল বঙ্গের শাসনাধীন ছিল।

(৪) গ্রামসমে — গ্রাম সহিত, গ্রামের সমস্ত লোক।

তথা হনে নরপতি বালিশিরা গেল।
বিজয়পুর নাম গ্রাম তথাতে বৈসাইল (১)।।
কত দিন পরে রাজা ঊনকোটী (২) গেল।
এক ঊনকোটী লিঙ্গ তথাতে দেখিল।।
লঙ্গলা দেশ হৈতে ধৰ্ম্মনগর আইসে।
হর গৌরী পূজিছিল কামনা বিশেষে।।
ডাঙ্গর ফার পুরী মধ্যে ছিল কত দিন।
নারেঙ্গি কমলা বাগ দেখিল প্রবীণ।।
ডাঙ্গর ফার আর বাড়ি তমকান (৩) স্থান।
তথাতে আছিল রাজা বীরদর্প জ্ঞান।।
রাঙ্গামাটি আসিল রাজা যশপুর পথে।
রাজধানী গিয়া রাজা বহু দান তাতে।।
তুলাপুরুষ (৪) আদি করি কল্পতরু (৫) দান।
এমত করিল দান পুণ্য অনুষ্ঠান।।

---

(১) 'ত্রিপুর বংশাবলী' নামক হস্তলিখিত পুস্তিকায় আছে, —

"সোনাই নদী উজাইয়া,　　নৌকা সব চলে ধাইয়া,
দেখে ভূমি পতিত রহিল।
মহারাজা ভাবি মনে,　　আপনার নিজ নামে,
বিজয়পুর গ্রাম বসাইল।।"

(২) ঊনকোটী — একটী তীর্থ স্থান, ইহার বিবরণ পরবর্ত্তী টীকায় দ্রষ্টব্য। এই স্থান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) তমকান — ইহা বাল্লাঘাটের (খোয়াইর) প্রাচীন নাম। 'ত্রিপুর বংশাবলী' পুস্তিকায় পাওয়া যায়, —

"শ্রীহট্টের গড়ে গিয়া,　　বাণ্যাচঙ্গ পরগণা হৈয়া,
বাল্লাঘাটে উপস্থিত হৈল।
হেরিয়া কমলা বন,　　আনন্দিত রাজা হন,
পরিপক্ক কমলা আনিল।"

(৪) তুলাপুরুষ দান — দাতা তুলা দণ্ডের একদিকে থাকিয়া, অপরদিকে সুবর্ণ ও রজত প্রভৃতি দিয়া ওজন করতঃ সেই সকল বস্তু দান করাকে তুলাপুরুষ দান বলে। এক এক ধাতুদ্রব্য দ্বারা তুলাপুরুষ করিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে; দান সাগর গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

(৫) কল্পতরু — দেবলোকের বৃক্ষ বিশেষ। এই বৃক্ষের নিকট যে কোন বস্তু প্রার্থনা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায়। মনুষ্যও পুণ্য অর্জ্জনের নিমিত্ত কল্পতরু হইবার বিধান শাস্ত্রে আছে। কল্পতরু হইবার কালে, যে ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই প্রদান করিতে হয়। কাহারও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখা যাইতে পারে না।

হীরাপুরে এক মঠ দুই দীঘী তান।
ভূমি উৎসর্গিল তাম্র পত্রেতে প্রমাণ।।
হীরা গোপীনাথ নামে শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিয়া।
তাম্র পত্র করি তাতে শ্লোক যে লিখিয়া।।

অথ শ্লোক।

ধন্য মাণিক্য ভূপালো বহুভির্ভূবি দুর্ল্লভঃ।
তৎ সুতো দেব মাণিক্যস্তৎ সুতোবিজয় স্মৃতঃ।।
রাজা রাজশিরোরত্ননিঘৃষ্ট চরণাম্বুজঃ (১)।
শ্রীশ্রীবিজয় মাণিক্যো রাজা রাজভিরাজতে।।

পয়ার।

ইত্যাদি কথন শ্লোক লিখে তাম্র পত্রে।
পয়ার করিয়া লিখে বুঝিবার তত্রে।।
শ্রীধন্য মাণিক্য রাজা পৃথিবী দুর্ল্লভ।
তার পুত্র দেব মাণিক্য রত্নের সম্ভব।।
তাহার পুত্র বিজয় মাণিক্য রাজন।
রাজা সবের শিরোরত্ন চরণে ঘর্ষণ।।
শ্রীশ্রীবিজয় মাণিক্য দেব মহারাজা।
রাজা মধ্যে বিরাজিত বলে মহাতেজা।।
ধ্বজ ঘাট হনে যত বানিয়া কাঁসারি।
আনিয়া বসাইল নাম ধ্বজ যে নগরী।।

---

(১) তাম্রশাসনে এবম্বিধ গর্ব্বিত বাক্য উৎকীর্ণ করিবার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম নহে। মহারাজ বিজয় মাণিক্যের প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে (১১৬৫ শকে) সম্পাদিত দামোদর দেবের তাম্রশাসনেও এইরূপ বাক্য পাওয়া যাইতেছে, —

"যদ্বংশ প্রভবেন্দু সুন্দর বশো নির্ধৌত লোকত্রয়ী বন্ধোঃ
শ্রীপুরুষোত্তমস্য তনয়ঃ প্রৌঢ় প্রতাপোহভবৎ।
দেবঃ শ্রীমধুসূদনাখ্য নৃপতির্যেনাপি সেবানমৎ
ভূমীপাল ললাটঘৃষ্টচরণঃ শ্রীবাসুদেবোহজনি।।
তস্যাত্মজঃ পুণ্যরাজশিরোমালশ্চাকিঞ্চনবিতায়িনখচন্দ্রময়ূখমালঃ
প্রজ্ঞা প্রসারিত মহীদয়িত পুত্রঃ শ্রীদামোদরঃ সকল নৃপতি চক্রবর্ত্তী।।"

এই তাম্রফলক দামোদর 'ত্রিপুর জয়িনং' বিশেষণে ভূষিত হইয়াছেন। এ বিষয় স্থানান্তরে আলোচিত হইবে।

হীরা গোপীনাথ বিগ্রহের ভগ্নমন্দিরের স্থান,
ভূ-পৃষ্ঠে পতিত তোরণসহ
(হীরাপুর - উদয়পুর)

সেই কালে পুরাতন চন্তাই মরিল।
নবীন চন্তাই নৃপে করিতে চাহিল।।
প্রাতঃকাল হৈল তবে দেবতা পূজন।
সেই রাত্রে নৃপতিয়ে দেখিল স্বপন।।
বিজয় দুর্ল্লভনারায়ণ চন্তাই বিনে।
অন্য হস্তে পূজা না লইব কদাচনে।।
এই স্বপ্ন নরপতি রাত্রেতে দেখিল।
সেই সে কারণে দুর্ল্লভ চন্তাই হইল।।
সেই দিনে দুর্ল্লভ করে দেবতা পূজন।
হেন মতে রাজ্যপদ করেন রাজন।।
    নরপতির দুই পুত্র জন্মে ক্রমে ক্রম।
ডুঙ্গু তীর্থে (১) জন্ম জ্যেষ্ঠ ডুঙ্গুর নাম উত্তম।।
অনন্ত হইল নাম তাহার কনিষ্ঠ।
কুচরিত্র দুই পুত্র প্রকৃতি অনিষ্ট।।
তাহা দেখি নরপতি মনেতে বিস্ময়।
দৈবজ্ঞেতে জিজ্ঞাসিল কুষ্ঠীর নির্ণয়।।
ডুঙ্গুরের কুষ্ঠী মাঝে ছেদযোগ (২) হয়।
অনন্তের রাজযোগ (৩) দৈবজ্ঞে কহয়।।
তাহা শুনি নরপতি বিবেচনা করে।
ডুঙ্গুর ফাকে উড়ষ্যাতে পাঠাইতে সত্বরে।।
মুকুন্দ নামে ছিল উড়ষ্যা ভূপতি।
তাহান স্থানে পত্র লিখে বিজয় নৃপতি।।

---

(১) গোমতী নদীর উৎপত্তি স্থানকে ডুঙ্গু বা ডুম্বুর বলে। এই লহরের টীকায় বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(২) ছেদযোগ — গ্রহ নক্ষত্রাদির যে অশুভ যোগকালে জন্মগ্রহণ করিলে, জাত শিশুর অস্ত্রাদি দ্বারা অঙ্গচ্ছেদ হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহাকে ‘ছেদযোগ’ বলে।

(৩) রাজযোগ — গ্রহ নক্ষত্রাদির যে শুভ সংযোগ সময়ে জন্ম পরিগ্রহ করিলে ভূমিষ্ঠ শিশু ভবিষ্যতে রাজা হইবে বলিয়া সূচিত হয়, সেই যোগকে ‘রাজযোগ’ বলে। শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনে ‘স রাজযোগের শুভে মুহূর্ত্তে’ বাক্যের উল্লেখ আছে। আপ্তের অভিধানে অভিধানে ‘রাজযোগ’ শব্দের নিম্নোক্তরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, — “a configuration of planets, asterisms etc. at the birth of a man, which indicates that he is destined to be a king.”

অষ্ট গ্রাম জমি কত দিয়া উড়ষ্যাতে।
ডুঙ্গুর ফা পুত্রকে দিয়া রাখিবা যে প্রীতে।।
ডুঙ্গুর পুত্রের সঙ্গে রাজ-পত্র যায়।
অনেক সুবর্ণ দিল জন্মাবধি খায়।।
জগন্নাথ সেবিবারে শিখায়ে তাহারে।
পুত্র স্নেহ ছাড়ি রাজা পাঠাইল দূরে।।
জগন্নাথ সেবা করি হইবা অমর।
উড়ষ্যাতে ডুঙ্গুর পুত্র পাঠায় সত্বর।।
অনন্ত পুত্রকে রাজ্য দিবেক নৃপতি।
সর্ব্বক্ষণ খেলে সে যে কুৎসিত প্রকৃতি।।
লুকালুকি খেলে সে যে শিশুগণ সঙ্গে।
পণ রাখি খেলা করে কৌতূহল রঙ্গে।।
শুইয়া শয্যাতে সে যে কাপড় বেড়ায়।
মৃত মনুষ্য মত দাহিতে লইয়া যায়।।
কদলির গাছ কান্ধে সঙ্গে যত জন।
আগে পাছে কত জন পথেতে গমন।।
ধাবমান গিয়া তাকে যেবা করে মানা।
বহু গালি দিয়া তাকে করয়ে তর্জ্জনা।।
এই মত কুচরিত্র কতেক কহিব।
ভয় নাহি মনে তার রাজায় শুনিব।।
কুপ্রকৃতি রাজপুত্র দেখিয়া রাজায়।
গোপীপ্রসাদের কন্যা বিবাহ করায়।।
রাজা বলে গোপীপ্রসাদ তোমার হৈল ভালা।
আজি হতে তুমি আমার বেয়াই হইলা।।
প্রথমে আছিলা তুমি বাছার দফাতে।
ধর্ম্মপুরে গিয়াছিলা রাজার কর্ম্মেতে।।
এক দ্বিজ বদরী বৃক্ষে লোভে উঠিছিলা।
বাঁশ খুচি দিয়া তোকে ভূমিতে ফেলিলা।।
দাও দিয়া বলি বিপ্রে তোকে গালি দিল। (১)
বাঁশের বাড়িয়ে তোমা শরীর ক্ষত হইল।।

(১) দাও দ্বারা বলি দিবে বলিয়া বিপ্রে গালি দিয়াছিল।

পরে আমি তোকে দিল বড়ুয়া (১) পদবী।
আমার রন্ধন ঘরে মহামুন্‌সুবি (২)।।
আমা অন্ন দিতে তোর হস্তেতে দেখিল।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন (৩) তোর হস্তে ছিল।।
তার পরে মহল দ্বারে রাখিল সমুখে।
পরে গোপীপ্রসাদনারায়ণ (৪) করিলাম তোকে।।
শালগ্রাম হরিবংশ নৃপতি সাক্ষাত।
পরসায়ে গোপীপ্রসাদ সেনাপতি তাত।।
নৃপে কহিল তুমি এমত সেনাপতি।
পুত্র তোমা সমর্পিলাম তোমা কন্যা পতি।।
সেনাপতি দণ্ডবতে কহিল কথন।
সেবকেরে এত দয়া করিছ রাজন।।
সেই কালে নৃপে পাত্রে পুত্র সমর্পিল (৫)।
সাতচল্লিশ বর্ষ নৃপের বয়স হৈয়াছিল।। ⎫
সাতচল্লিশ বর্ষ রাজা রাজ্য ভোগ করে। ⎬ (৬)
দৈবগতি বসন্ত নৃপের হৈল শরীরে।। ⎭
মহাকষ্ট পায়ে রাজা যন্ত্রণা বিস্তর।
তাহার আঘাতে দেহ হৈল বহু জ্বর।।
ধন্বন্তরিনারায়ণ পিতা যাদু বৈদ্য।
প্রয়োগ করায়ে বহু কালে নহে সাধ্য।।

---

(১) বড়ুয়া — সেনাপতিগণের উপাধি।

(২) মহামুন্‌সবি — মহামুন্সী। মহারাজের পাচকগণ 'মহামুন্সী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(৩) ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন — ধ্বজাকার, বজ্রাকার ও অঙ্কুশাকার চিহ্ন। ভগবান্ বিষ্ণুর চরণে এই চিহ্ন অঙ্কিত আছে। মনুষ্যের হস্তে বা পদে এইরূপ চিহ্ন থাকিলে, তাহা রাজযোগ বলিয়া কথিত হয়।

(৪) নারায়ণ — রাজদত্ত উপাধি। ইহার বিবরণ পরবর্ত্তী টীকায় দ্রষ্টব্য।

(৫) সেইকালে নৃপ, পাত্রকে (সেনাপতিকে) পুত্র সমর্পণ করিলেন। সেকালে সেনাপতিগণই পাত্রের (মন্ত্রীর) কার্য্য করিতেন।

(৬) পাঠান্তর — "বেয়াল্লিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ কৈল।।
সাতচল্লিশ বৎসর বয়স হইল যবে।
দৈবগতি রাজার শীতলা হইল তবে।।"

এই পাঠই বিশুদ্ধ। নকলকারীর ভ্রমে পাঠ বিকৃতি ঘটিয়াছে।

কালে ধরিল যবে ঔষধে কিবা কাজ।
তথাপি জীবার ইচ্ছা মনে মহারাজ।।
রাজা বলে যাদুরায় আমা সাহ্য (১) কর।
সর্ব্বাঙ্গে সুবর্ণ জড়িত করিব তোমার।।
ইচ্ছায়ে না হয় কিছু কাল বলবান।
শালগ্রাম ক্ষেত্রে রাজা স্বর্গে গেল প্রাণ।।
বড় গৃহে অগ্নি লাগি নির্ব্বাপণ পায়। } (২)
তেমত বিজয় নৃপের রাজ্য ভোগ তায়।।
মহা কোলাহল হৈল রাজ অন্তঃপুরে।
রাজ পুত্র অনন্তমাণিক্য নাম পরে।।
রাজ শ্বশুর গোপীপ্রসাদ নারায়ণ।
জামাতাকে বসাইল রাজ সিংহাসন।।
বিজয়মাণিক্য মৃত স্নান করাইয়া।
রাজ আভরণ বস্ত্র সব পরাইয়া।।
বাদ্য ভাণ্ড দুন্দুভি কর্ণাল মৃদঙ্গ।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য চলে চতুর্দ্দোল সঙ্গ।।
মহাদেবী আগে করি যত নৃপ-ভার্য্যা।
শ্মশানে গমন করে স্বামী করি পূজা।।
বৈকুণ্ঠপুর স্থানে নৃপ দাহ হৈল।
অন্য মন্বন্তর (৩) যেন তেমত ঘটিল।।
শ্রাদ্ধ সাঙ্গ পরে মঠ শ্মশানেতে দিল।
মুক্তিশিলা (৪) প্রস্তরেতে নির্ম্মাইয়া ছিল।।

---

(১) সাহ্য — আরোগ্য।

(২) এই দুই পংক্তির ভাব দুর্ব্বোধ্য। এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে, বড় গৃহ ভস্মসাৎ হইলে যেমন অশান্তি ও অভাব ঘটে, বিজয় মাণিক্যের ন্যায় সুযোগ্য রাজার অভাবে রাজ্যের তদ্রূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

(৩) মন্বন্তর — এক এক রাজার শাসনকালকে এক এক মন্বন্তর গণ্য করা হইয়াছে।

(৪) মুক্তিশিলা — শ্মশানক্ষেত্রের মঠ।

অনন্তমাণিক্য খণ্ড।

বিজয়মাণিক্য রাজার পরলোক হৈল।
অনন্তমাণিক্য রাজা মগদে (১) শুনিল।।
গোপীপ্রসাদ নারায়ণ কার্য্যের প্রধান।
ভোজন করয়ে রাজা শ্বশুরের স্থান।।
যেই দিনে তার ঘরে রাজা নাহি আইসে।
ডাকিয়া আনিয়া রাজা খাওয়ায়ে বিশেষে।।
নিত্য গিয়া রাজায় শ্বশুর গৃহে খায়।
সদাকাল মহারাণী রাজাকে বুঝায়।।
রাজা হইয়া শ্বশুর গৃহে নিত্য কেনে খাও।
ভাল মন্দ নাহি বুঝ মরিবারে চাও।।
এ কথা শুনিয়া রাজা কহন্ত (২) আপনে।
শ্বশুরে ডাকিয়া নিতে রহিব কেমনে।।
পিতা সমর্পিয়া গিছে তাহার নিকট।
তার আজ্ঞা লঙ্ঘি আমি রহিতে সঙ্কট।।
হেন শুনি মহাদেবী নিঃশব্দে রহিল।
রাজারে ধরিল কালে মানা না শুনিল।।
সপ্ত বৎসরের রাণী হৈল বুদ্ধিমতী।
না ধরে কাহার বাক্য অবোধ নৃপতি।।
হেন রূপে কত কাল গেল এই মতে।
বিধি নিয়োজিত রাজা না পারে বুঝিতে।।
গোপীপ্রসাদ মহামন্ত্রী সে যে রাজ্যলোভী হৈল।
জামাতা বধিতে মন্ত্রী মন্ত্রণা করিল।।
গদাভীম স্থানে মল্ল শিখয়ে রাজায়ে।
গোপনে মল্লের স্থানে মন্ত্রীয়ে শিখায়ে।।
যেই কালে মল্ল বিদ্যা রাজারে শিখাইবা।
নৃপ গলে বদ্ধ করি পরাণে মারিবা।।

---

(১) মগদ — মঘ।
(২) কহন্ত — কহেন, বলেন।

তাহা শুনি গদা ভীমে কহিল সত্বর।
পুরুষানুক্রমে আমি তাহার চাকর।।
শতাধিক পুরুষাবধি বিজয় নৃপতি।
তার বংশ মারি আমা নাহি অব্যাহতি।।
দশ দ্বিজ সম যেন এক রাজা হয়।
রাজবংশ বধে হয় নরক নিশ্চয়।।
ছত্রধারী সিংহাসন যেই রাজা হয়।
তার বধে মহা পাপ ধর্ম্ম শাস্ত্রে কয়।।
বিশেষ আমার বংশ পালিলে নৃপবরে।
কিবা ধর্ম্ম হয়ে আমি তাকে মারিবারে।।
এ কথা শুনিয়া মন্ত্রী নিঃশব্দে রহিল।
পান দিয়া গদাভীম বিদায় করিল।।
তাহার ভাগিনা বীর মর্দ্দন নারায়ণ।
তাহাকে শিখায়ে মন্ত্রী বধিতে রাজন।।
অঙ্গীকার কৈল মন্ত্রী রাজাকে বধিতে (১)।
গোপনে রহিল সে যে কোঠার মধ্যেতে।।
যে পথে নৃপতি যাইব করিতে ভোজন।
সেই পথে লুকি দিয়া (২) রহিছে সে জন।।
শ্বশুর বাড়িতে রাজা আইসে অন্ন খাইতে।
কোঠা ঘর পথে রাজা তখনে যাইতে।।
গলে ত বান্ধিয়া বস্ত্র ফাঁসী লাগাইল।
অনন্তমাণিক্য রাজা ফাঁসীতে মরিল।।
বৎসর দেড়েক রাজা রাজ্যের শাসন।
পরলোক গেল রাজা শ্বশুর কারণ।।

---

(১) পাঠান্তর — "অঙ্গীকার কৈল সেই রাজাকে মারিতে।"
ইহার বিশুদ্ধ পাঠ, মন্ত্রী (সেনাপতি) অঙ্গীকার করেন নাই, তিনি অঙ্গীকার করাইয়াছিলেন।

(২) লুকি দিয়া — গুপ্তভাবে।

উদয়মাণিক্য খণ্ড।

রাজার শ্বশুর গোপীপ্রসাদ তুষ্ট হইয়া।
উদয়মাণিক্য নাম ধরে প্রকাশিয়া।।
রাজার বাড়ীতে গিয়া সিংহাসনে বসে।
তাহার কন্যায় তাকে গালি দিতে আইসে।।
রাজবংশ নাশ কৈলে অতি পাপমতি।
ক্ষুরধার নরকেতে তোমার বসতি।।
বৃদ্ধ কালে কলঙ্ক নরকে বাস কৈলা।
নৃপ বধ করি তুমি পাতকী হইলা।।
এই মতে গালি তাকে বলিলেক যত।
পুস্তক বাড়য়ে দেখি না লিখিল তত।।
অষ্টম বৎসর আমি যাইব রাজ সঙ্গে।
নির্ব্বংশ হইবে তুমি দেখ লোকে রঙ্গে।।
তাহা শুনি উদয়মাণিক্য ক্রোধ হৈল।
সহগামী যাইতে কন্যা ধরিয়া রাখিল (১)।।
মহল দ্বারেতে রাজা মরা পড়িয়াছে।
ধূলায় ধূসর রাজা যেন শুইয়াছে।।
রাজ আজ্ঞা মৃত রাজা চারি পাইকে নিল।
বিজয়মাণিক্য নিকট অনন্ত দহিল।।
অনন্ত মাণিক্য-রাণী জয়া মহাদেবী।
কহিতে লাগিল পুনঃ মনে উষ্মা ভাবি।।
রাজা সঙ্গে যাইবারে না দিলা পাপিষ্ঠ।
অনন্ত মাণিক্য বধি তুমি হৈলা তুষ্ট।।
স্বামী মারি রাজ্য নিলা স্ত্রী মাত্র সার। }
এ বলিয়া রাণী যায় পাটে উঠিবার।। } (২)

---

(১) কন্যাকে সহগামিনী হইতে দিলেন না, ধরিয়া রাখিলেন।

(২) মহারাণী জয়া মহাদেবী পিতাকে বলিলেন, তুমি স্বামীকে হত্যা করিয়া রাজ্য নিয়াছ, স্ত্রী মাত্র আছে, তাহাও গ্রহণ কর, ইহা বলিয়া ক্রোধভরে পিতার সহিত সিংহাসনে বসিতে গেলেন।

রাম নাম লৈয়া রাজা পাট হনে লামে।
সিংহাসন তুলি নিল চন্দ্রপুর গ্রামে।।
রাজা বলে তোমা স্বামী পাটে তুমি থাক।
চন্দ্রপুর গ্রামে আমি পাট করিবেক।।
উদয়মাণিক্য নামে হৈল নরপতি।
রাজবংশ মারিয়া সে করিল অখ্যাতি।।
রাঙ্গামাটী নাম রাজ্য পূর্ব্বাবধি ছিল।
উদয় মাণিক্যাবধি উদয়পুর হৈল।।
বহুল করিয়া যত্ন এক মঠ দিল।
চন্দ্র গোপীনাথ নাম শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিল।।
উদয়মাণিক্য পুরী চন্দ্রপুর গ্রাম।
তাতে দীঘী দিল রাজা চন্দ্রসাগর নাম (১)।।
দুই শ চল্লিশ নারী মহলে তাহার।
যোগ্যাযোগ্য তদন্তর না করে বিচার।।
গৃহস্থের কন্যা তাকে আনে বলাৎকারে।
ভুগিয়া অন্যেরে দেয় মনে ধরে যারে।।
সেই সব নারী কত যুবতী হইল।
উদয়মাণিক্য পুত্রে সতীত্ব না রাখিল।।
অরিভীমের পুত্র গরুড়ধ্বজ ছিল।
সেই সব স্ত্রী সঙ্গে ব্যভিচার কৈল।।
সেই সব স্ত্রী রক্ষক যত সেনাগণ।
ভয়াতুর হৈয়া করে রাজায় নিবেদন।।
উদয়মাণিক্য রাজা অতি উগ্রমতি।
কর পদ নাশা কর্ণ কাটে শীঘ্রগতি।।
লোকেরে বান্ধিয়া রাখি কুকুরে খাওয়ায়ে।
হস্তী দিয়া বধে কত স্ব হস্তে খাড়ায়ে।।
অল্প অপরাধে প্রাণী বধে সে দুরন্ত।
প্রতি সংক্রমণে সে যে হয় মতিমন্ত।।

---

(১) উদয়পুরে, উত্তর চন্দ্রপুর গ্রামে অদ্যাপি 'চন্দ্রসাগর' বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সরোবর দীর্ঘে ৫০৫ গজ ও প্রস্থে ২৬১ গজ। ইহার গর্ত্তে ৪।০ চারি দ্রোণ চারি কাণি ভূমি পতিত হইয়াছে।

মহারাজ উদয়মাণিক্যের ভগ্ন প্রাসাদ।
(চন্দ্রপুর - উদয়পুর)।

গ্রাম্য শূকর খায়ে কুৎসিত ব্যবহার।
সেবিতে না পারে সবে বড় দুরাচার (১)।।
এ সব ভাবিয়া রক্ষক মনে ভয় পায়।
গরুড়ধ্বজ পলাইয়া পিতা স্থানে যায়।।
গৌড় সৈন্য সঙ্গে তার বহু ছিল রণ।
গরুড়ধ্বজ খ্যাতি তার হইল তখন।।
অমরমাণিক্য রাজা পুনঃ জিজ্ঞাসিল।
পরে উদয়মাণিক্য কি কর্ম্ম করিল।।
রণচতুর নারায়ণ কহে শুনহ রাজন।
নির্ব্বংশ হইল উদয়মাণিক্য যেমন।।
গৌড়েশ্বরে শুনে বিজয়মাণিক্য মরণ।
চৌদ্দ শ চৌরানব্বই শকে উদয় রাজন।।
রাজ বংশ নাহি কেহ অন্য হেল রাজা।
চাটিগ্রামে পাঠাইল সৈন্য মহাতেজা।।
ডরা নাম (২) পথ হৈয়া গৌড় সৈন্য যাইতে।
রণাগণ নারায়ণ পাঠাইল ত্বরিতে।।
রাজ ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ।
সেনাপতি করে তাকে সৈন্যের রক্ষণ।।
বায়ান্ন হাজার সৈন্য তার সঙ্গে দিল।
তিন হাজার সেনাপতি তার সঙ্গে ছিল।।
চন্দ্রদর্প নাম চন্দ্র সিংহ নারায়ণ।
উড়িয়া নারায়ণ ছিল অরি ভীম তখন।।
আগুয়ান নারায়ণ আর গজ ভীম।
চলিল এ সব সৈন্য পরাক্রমে সীম।।

---

(১) দুর্ব্বৃত্ত রাজার সেবা করা, সেবকের পক্ষে নিয়তই বিপজ্জনক। শাস্ত্রকারগণও তাহাই বলিয়াছেন। মৎস্যপুরাণে পাওয়া যায় ; —

"শৌণ্ডীরস্য নরেন্দ্রস্য নিত্যমুদ্রিক্ত চেতসঃ।।
জনা বিরাগমায়ান্তি সদা দুঃসেব্য ভাবতঃ।"

মৎস্যপুরাণ — ২২০ অঃ, ২৬-২৭ শ্লোকার্দ্ধ।

(২) পাঠান্তর — 'দাঁড়রার পথ দিয়া গৌড় সৈন্য যাইতে।"

"দাঁড়রার" শব্দকে বিকৃত করিয়া 'ডড়া নাম' করা হইয়াছে। 'ডরা' কোন স্থানের নাম ছিল, এমন প্রকাশ পায় না।

খণ্ডলে ত গিয়া তারা গড় করি রৈল।
পাঠান আইসে বলি সাবহিতে ছিল।।
ঘাটলার পথ দিয়া পাঠান গমন।
চাটিগ্রাম যাইব হেন বুঝিয়া লক্ষণ।।
হেন যুক্তি সবে করে রণাগণ বুড়া।
চট্টলের পথে রাখে সৈন্য হস্তী ঘোড়া।।
পূর্ব্বকালে রণাগণে জিনিয়া পাঠান।
সেই হেতু বুড়িয়ার বড়হি গুমান (১)।।
মারিব পাঠান সৈন্য কুকুরের প্রায়।
অহঙ্কারে রণাগণ রাত্রে যুদ্ধে যায়।।
শৃগাল সকলে চারিদিগে ডাক ছাড়ে (২)।
গৃধিনীয়ে বৃক্ষে বসি পথে পাখা ঝাড়ে।।
আকাশে ত উল্কাপাত (৩) সাচান ভ্রমে মাথে।
এইরূপ অমঙ্গল দেখিলেক পথে।।

---

(১) গুমান — অহঙ্কার।

(২) শৃগালের শুভাশুভ রব সম্বন্ধীয় অনেক কথা শাস্ত্র গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় ; তাহার একটী এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে ; —

"সর্ব্বদিক্ষ শুভাদীপ্তা বিশেষেণাহ্ন্য শোভনা।
পুরে সৈন্যেহপসব্যা চ কষ্টা সূর্য্যোমুখী শিবা।।"
বৃহৎ সংহিতা — ৮৯ অঃ, ৪ শ্লোক।

এই বাক্যে সৈন্য সম্বন্ধীয় অশুভের কথা উল্লেখ আছে। শিবার দীপ্তস্বরকে অমঙ্গলজনক বলা হইয়াছে। দীপ্তস্বর কাহাকে বলে তাহাও শাস্ত্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; —

"শ্বভি শৃগালাঃ সদৃশাঃ ফলেন বিশেষ এষাং শিশিরে মদাপ্তিঃ।
হূ হূরুতান্তে পরতশ্চ টা টা পূর্ণঃ স্বরোহর্ন্যেকথিতাঃ প্রদীপ্তাঃ।।
লোমাশিকায়াঃ খলু কক্ক শব্দঃ পূর্ণঃ স্বভাব প্রভবঃ স তস্যাঃ।
যেহন্যেস্বরান্তে প্রকৃতেরপেতাঃ সর্ব্বে চ দীপ্তা ইতি সম্প্রদিষ্টাঃ।।
পূর্ব্বোদীচ্যোঃ শিবা শস্তা শান্তা সর্ব্বত্র পূজিতা।
ধূমিতাভিমুখী হন্তি স্বর দীপ্তা দিগীশ্বরান।।"
বৃহৎ সংহিতা — ৯০ অঃ, ১-৩ শ্লোক।

(৩) উল্কাপাত বিষয়ে শাস্ত্র গ্রন্থসমূহে অনেক কথা আছে। তাহার একটী এই ; —

"অম্বরমধ্যাদ্বহ্যো নিপতন্ত্যো রাজরাষ্ট্র নাশায়।
বংভ্রমতী গগনোপরি বিভ্রমমাখ্যাতি লোকস্য।।
সংস্পৃতী চন্দ্রার্কো তদ্বিসৃভাবা স ভূপ্রকম্পা চ।
পরচক্রাগমনৃপবধ দুর্ভিক্ষা বৃষ্টি ভয় জননী।।" ইত্যাদি।
বৃহৎ সংহিতা — ৩৩ অঃ, ১১-১২ শ্লোক।

রাজমালা—২২

দ্বিতীয় লহর—৭০ পৃষ্ঠা।

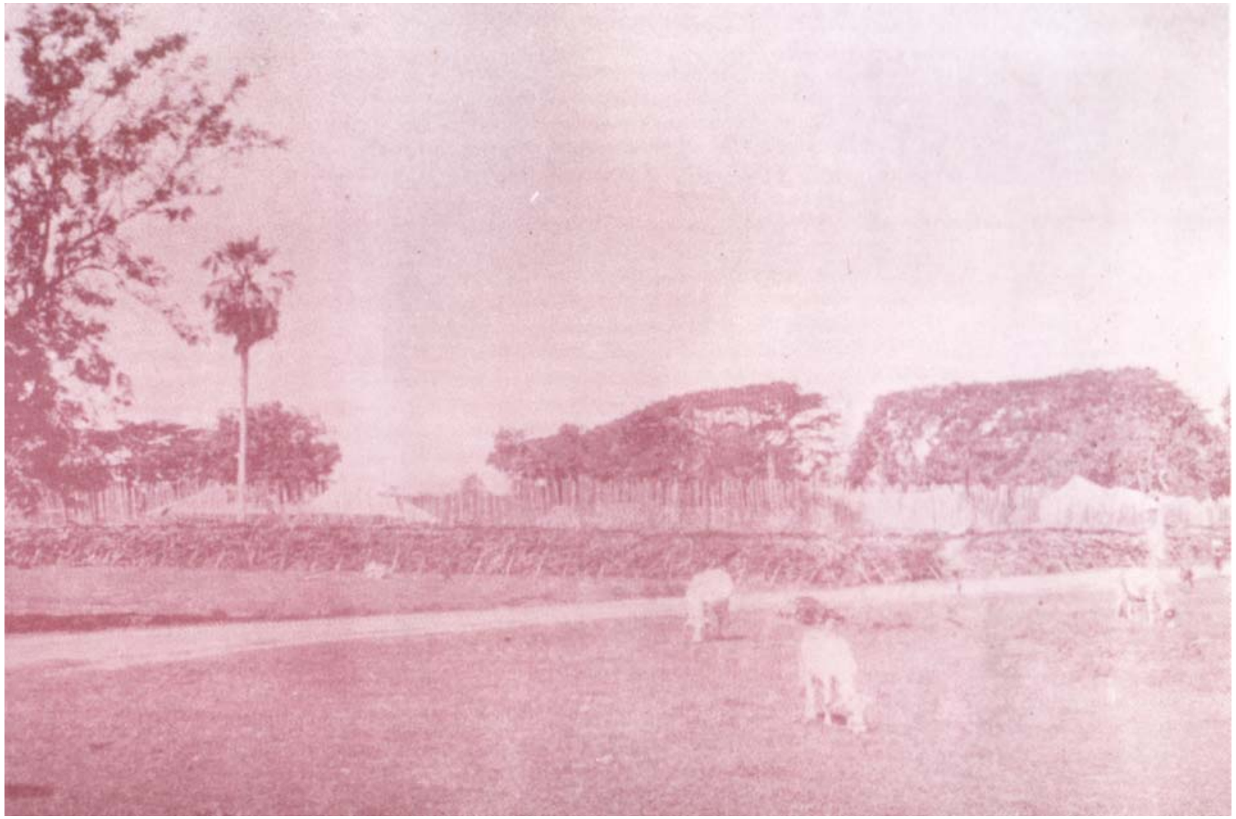

কর্ণফুলী বাঁশের প্রাকার বিশিষ্ট অস্থায়ী সেনানিবাসের (শিবিরের) আদর্শ।

সেনাপতি সবে বলে না হয় উচিত।
পৃষ্ঠে রাখিয়া শত্রু রণ অবিহিত (১)।।
এমত কহিল সব সেনাপতিগণ।
সেই কালে ত্রিপুর গড়ে পাঠান আগমন।।
গড় লৈল পাঠানে ত্রিপুর হৈল দূর।
রণাগণ নারায়ণের গর্ব্ব হৈল চূর।।
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য আপনা বাঁচায়।
হস্তিনী শোয়ার বৃদ্ধ রণাগণ পলায়।।
দূরেতে থাকিয়া বলে পাঠান সকল।
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া যায় ত্রিপুরার বল।।
হর্ষিত পাঠান সৈন্য পাছে পাছে যায়।
ত্রিপুরার সৈন্য যত পাঠানে খেদায়।।
মহা যোদ্ধা বলবান ত্রিপুরার সেনা।
পাঠান ত্রিপুর যুদ্ধে পড়ে বহু জনা।।
পঞ্চ সহস্র পাঠান পড়িল সেই রণে।
চল্লিশ হাজার পড়ে ত্রিপুরার গণে।।
পদাতি ধরিয়া অন্য পদাতিকে হানে (২)।
এমত বিক্রমী যোদ্ধা সব ছিল রণে।।
রণে ভঙ্গ ত্রিপুর সেনা রাজ্যেত তৎপর।
চট্টলের গড়ে গেল পাঠান সত্বর।।
গৌড়েশ্বরে শুনিলেক এসব বৃত্তান্ত।
হরষিতে বহু সৈন্য পাঠায় সামন্ত।।
পীরোজ খাঁ আন্নি আর জামাল খাঁ পন্নি।
চট্টলে পাঠাইল গৌড়ে তারা যোদ্ধা জানি।।
দ্বাদশ বাঙ্গলা দিল তাহার সহিত।
মেহারকুল গড়ে যুদ্ধ হয়ে বিপরীত।।
ভালিঙ্গ ফা নামেতে উড়িয়া নারায়ণ।
কামানের গোলাঘাতে তাহার মরণ।।

(১) পাঠান্তর — "সেনাপতি সবে বোলে না হয়ে উচিত।
পৃষ্ঠে শত্রুকরি মারণ অবিহিত।।"

(২) মনুষ্য ধরিয়া, তদ্বারা অন্য মানুষকে (পদাতিকে) আঘাত করে।

তার পরে সেই যুদ্ধে তুমি সেনাপতি।
তুমি পরে অরি ভীম পাঠায় নৃপতি।।
সেই যুদ্ধে তথাতে করিলা বহু দিনে।
পঞ্চ বৎসর যুদ্ধ ছিল জামাল পন্নি সনে।।
চৌদ্দ শ আটানব্বই শকেতে তখন।
পারার গুটিকা রাজা করিল ভক্ষণ।।
স্ত্রী লোভে (১) গুটিকা রাজা ভক্ষে অকস্মাৎ।
অণ্ডকোষ ফাটি রাজা মরিল পশ্চাৎ।।
পঞ্চ বৎসর রাজত্ব করিয়া শাসন।
এই মতে মরিল উদয়মাণিক্য রাজন।।
সেই কালে অন্ধকার দিবা জ্ঞান হয়।
রাত্রি হেন জ্ঞান দিবা ত্রিপুর লোকে কয় (২)।।
সেই বৎসরেতে রাজ্যে হৈল মহামারী।
অস্থি পূর্ণ হৈল সব দেখি সারি সারি।।
অন্ন কষ্টে প্রাণ গেল বহুতর নর।
তার পর সনে শস্য হৈল বহুতর।।

জয়মাণিক্য খণ্ড।

উদয়মাণিক্য পুত্র লোকতর ফা পরে।
জয়মাণিক্য রাজা নাম ধরে অভ্যন্তরে।।
নৃপতির পিসা নাম রণাগণনারায়ণ।
গৌড় যুদ্ধ হৈতে তোমা আনায় সেই ক্ষণ।।
তোমার যে রাজ যোগ আছিল কারণ।
রণাগণ যুদ্ধে তুমি বধিছ তখন।।

(১) উদয়মাণিক্য অতিশয় কামুক ছিলেন। বাজীকরণ জন্য পারদ ভক্ষণ করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(২) দিবাভাগে অন্ধকার দর্শন কু-লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। শাস্ত্রে আছে ; —

"রজসা বাথ ধূমেন দিশো যত্র সমাকুলাঃ।
আদিত্য চন্দ্র তারাশ্চ বিবর্ণা ভয় বৃদ্ধয়ে।।"

মৎস্য পুরাণ — ২৩৮ অঃ, ২ শ্লোক।

এ কথা শুনিয়া অমরমাণিক্য রাজন।
কহিতে লাগিল রাজা তাহার কারণ।।
আমি কিছু নাহি জানি কহিল তোমাতে।
রণাগণে চক্র করে আমাকে বধিতে।।
মেহারকুলের গড় ছাড়িছি তৎপর।
কলমি গড়ে সৈন্য সমে ছিলাম তদন্তর।।
রাজার আদেশ পাইয়া আসি রাজধানী।
রণাগণে কুমন্ত্রণা করিল তখনি।।
হরিবংশ শালগ্রাম পরশি দুই জন।
রণাগণে আমা সনে শপথ তখন।।
রণাগণ নারায়ণ নৃপতির পিসা।
জয়মাণিক্য নাম ধরে সবে মাত্র মিছা।।
রাজত্বের সুখ ভোগ রণাগণে করে।
তার মতে করে কার্য্য যেবা মনে ধরে।।
সৈন্য সেনাপতি সব তাহার যোগান।
চতুর্দ্দোল শোয়ার চলে বড়ই গুমান (১)।।
অগ্র পশ্চাৎ না জানিয়া কুকর্ম্ম সদায়।
তুলা পুরুষ করে সে যে রাজা হৈতে চায়।।
এক দীঘি বিজয়মাণিক্য খনে অর্দ্ধেক।
বকচর খনি রাজা স্বর্গেতে গেলেক।।
রণাগণে পরে তাকে খনায়ে কতেক।
উৎসর্গিয়া বুড়া দীঘি (২) নাম রাখিলেক।।
রাজা হৈতে রণাগণের ইচ্ছা অতিশয়।
তার পত্নী মানা করে এই মাত্র ভয়।।
আর নারী সংগ্রহ করিল রণাগণ।
সে নারী পঠয়ে পুস্তক শুনিয়া পাগল।।

---

(১) গুমান — অহঙ্কার।

(২) এই দীঘি উদয়পুরে, ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর বাড়ীর উত্তরদিকে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৫৫০ গজ ও প্রস্থ ২০০ গজ। ইহা বুড়ার দীঘি নামে পরিচিত। রণাগণকে প্রাচীনত্বহেতু সাধারণতঃ 'বুড়া' বলা হইত, যথা ; —

"পূর্ব্বকালে রণাগণ জিনিয়া পাঠান।
সেই হেতু বুড়িয়ার বড়হি গুমান।।"

পাঁচালী পঠয়ে স্ত্রীয়ে অর্থ করে আপন।
দুই প্রহর রাজা হৈলে বসে ইন্দ্রাসন।।
এমত শুনিয়া বুড়া লোভ হৈল তায়।
আমা মারি রণাগণ রাজা হৈতে চায়।।
আমা ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে।
মদ্য পান করাইয়া চাহিল মারিতে।।
তাহা না জানিয়া আমি গেলাম তখনে।
পান বটু ছেদি আমা দেখায় অন্য জনে (১)।।
উদরেত ব্যাম হৈছে ফাঁকি দিল তাকে।
বাহ্য ভূমি যাইবার ইচ্ছা হৈল মোকে।।
রণাগণে কহে তার বাহ্য স্থানে যাইতে।
আমি কহি না যাইব সেই ত স্থানেতে।।
সেই স্থান হ'তে আমি চলিল ত্বরিত।
আমা অশ্ব তার দ্বারে না দেখি বিদিত।।
এক কায়েস্থের ঘোড়া সেই স্থানে ছিল।
তাহাতে চড়িতে চাহি সে জন না দিল।।
তাহা হতে অশ্ব কাড়ি লইলাম বলে।
গৃহে আসি ইষ্ট মিত্র ডাকিছি সকলে।।
হস্তী ঘোড়া সাজাইয়া সেনা লোকগণ।
রণাগণ সঙ্গে যুদ্ধ করিতে কারণ।।
রাজ পক্ষে রণাগণ যুদ্ধে সাজিয়াছে।
ছয় ছয় হাত বস্ত্র সেনা প্রতি দিছে।।
আমাকে পাইলে সে যে গেল ফাঁসী দিতে।
রণাগণ সাজি রহে রাজার দ্বারেতে।।
আমা পুত্র তারা সব সসৈন্যে সাজিয়া।
অশ্বারোহে শীঘ্র গতি আসিল চলিয়া।।
চৌহাটিয়া গ্রামে যাইতে গেল দিবাকর।
তার সৈন্য আমা পুত্রে কাটিল বিস্তর।।

(১) অমর দেবকে বধ করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র হইতেছে, এক ব্যক্তি পানের বোটা ছেদন করিয়া, ইঙ্গিতে তাহা জানাইয়াছিল।

চৌহাটা আমার গড় নদীর সহিত।
রণাগণ গড় কচুয়া ছড়াতে বিহিত।।
থুনাই লামপাড়া পথে তার সৈন্য ছিল।
সেইক্ষণে আমা বুদ্ধি ত্বরিতে জন্মিল।।
রণাগণ ভাই সমরজিত নারায়ণ।
শীঘ্র এক দূত পাঠাই তাহার সদন।।
রণাগণ নামে এক পত্র লিখাইয়া।
সমরজিত নিকট পত্র দিলাম পাঠাইয়া।।
ভাইর পত্র পাইয়া পঠয়ে সমরজিত।
রণাগণ ভাইয়ের পত্র জানিল নিশ্চিত।।
পত্র পাইয়া সমরজিত প্রণাম করিল (১)।
আমা দূতে তখন তার মস্তক ছেদিল।।
পরে রণাগণ দূত সমর নিকট।
সমরের বধে দূতে বুঝিল প্রকট (২)।।
গড়ে থাকি রণাগণে বলে বারে বারে।
সমরজিত ভাই আসে মারিবা সমরে।।
সেইক্ষণে সমর মুণ্ড গড়েতে ফেলিল।
ভাইয়ের মস্তক দেখি মনে ভয় পাইল।।
গড় ছাড়ি রণাগণ ভঙ্গ দিয়া যায়।
খাটি পুষ্করিণীর (৩) জলে রণাগণ পলায়।।

---

(১) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্রজ্ঞানে, অমর দেবের পত্র হস্তে লইয়া, সমরজিৎ নত মস্তকে প্রণাম করিবার কালে দূতে মস্তক ছেদন করিয়াছিল।

পত্র গ্রহণের প্রাচীন নিয়ম এই ;—

"রাজপত্রং নয়েন্মূর্দ্ধি ব্রাহ্মণানাং তথৈবচ।
যতি সন্ন্যাসিনাঞ্চৈব স্বামিনশ্চ তথৈবচ।।
সাদরে নৈব যত্নেন তথা মূর্দ্ধানি ধারয়েৎ।
ভার্য্যা পুত্রস্য মিত্রস্য হৃদয়ে ধারয়েৎ সুধীঃ।।
প্রবীণানাং কণ্ঠদেশে পত্র ধারণমীরিতম্।
এতেষাঞ্চৈব পত্রাণামুক্তং ধারণ লক্ষণম্।।"

পত্রকৌমুদী।

(২) প্রকট — স্পষ্ট।

(৩) খাটি পুষ্করিণী — মৎস্য একস্থানে জড় করিবার নিমিত্ত যে গর্ত্ত খনন করা হয়, তাহাকে খাটি বলে।

মাথায় পাতিল দিয়া রণাগণ জলে।
তার পুত্র হিরাপুর গ্রামে ধরা গেলে।।
ঢেঁকি ঘরে লুকাইছে বান্ধিয়া আনিল।
আমার নিকটে তার মস্তক ছেদিল।।
তিন দিন গড় মধ্যে ছিল রণাগণে।
দুই দিন লুকাইল পুষ্করিণীর জলে।।
জলে থাকি কম্পমান শরীর তাহার।
কুলে থাকি দেখি লোকে করিল প্রচার।।
সেই জনে কহে গিয়া আমা দূত স্থানে।
জল মধ্যে মনুষ্য এক দেখিল এখানে।।
আমার নিকটে দূতে তখনে জানাইল।
সসৈন্যে সাজিয়া তারে ধরিবারে গেল।।
জল হতে ধরি আনে আমা বিদ্যমান।
রণাগণ মস্তক কাটিলাম সেই স্থান।।
রণাগণ মস্তক কাটিল যে পাইকে।
সাহস নারায়ণ খ্যাতি করিলাম তাকে।।
পরে আমি এই বার্ত্তা রাজাতে কহিল।
তোমা শত্রু রণাগণকে কাটিয়া ফেলিল।।
আমা বাক্য শুনি রাজা নিঃশব্দে রহিল।
আমার কুটুম্ব রাজা সে হেতু বধিল।।
সৈন্য সমে গেল আমি রাজা প্রবোধিতে।
কোন অপরাধে আমা বন্ধু বধ তাতে।।
আমা সৈন্য দেখি রাজা মনে ভয় পায়।
হস্তিনী চড়িয়া রাজা দক্ষিণ দিকে ধায়।।
তবে বুঝিলাম রাজার চিত্তে কুমন্ত্রণ।
আমা পুত্র সব রাজার পশ্চাতে গমন।।
কালিকা দেবীর যে মন্দির সন্নিহিত।
সেই স্থানে জয়মাণিক্য ধরিল ত্বরিত।।
আমা জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ নারায়ণ।
নৃপতিকে মল্ল যুদ্ধ শিখাইছে আপন।।
রাজবল্লভে ত রাজা বলিল তখন।
তুমি মল্ল বিদ্যা গুরু রাখহ জীবন।।

রাজবল্লভে কহে আমি রাখিবারে নারি।
সৈন্য সবে মারে তোমা কি করিতে পারি।।
রাজা গলে ধনুর্গুণ দিয়া লামাইল।
সেই স্থানে জয়মাণিক্য প্রাণেতে বধিল।।
অমরমাণিক্য রণচতুর নারায়ণ।
দুয়েতে এ সব কথা ছিল আলাপন।।
অমরমাণিক্য রাজা পুন জিজ্ঞাসিল।
রাজ ঔরসে আমা জন্ম কি মতে হইল।।
রণচতুরে বোলেন শুন মহারাজ।
তোমা জন্ম যেই মতে বলি সভা মাঝ।।
এক দিন দেবমাণিক্য নৌকা আরোহণে।
কলুয়া ছড়া (১) পূর্ব্বভাগে গিয়াছে তখনে।।
সেই দিন আমি ছিলাম নৃপতির সঙ্গে।
কলুয়া ছড়া উজাইয়া চলে রাজা রঙ্গে।।
কলুয়া ছড়াতে এক মাচাঙ্গ তথায়।
মুক্তকেশে তোমা মাতা কেশ যে সুখায়।।
সেই কালে তোমা মাকে দেখিল রাজায়।
সেই দিন ঋতু স্নান করে তোমা মায়।।
তোমা মাতা দেখি রাজা কামেতে পীড়িত।
এই কার ঘর বলি জিজ্ঞাসে ত্বরিত।।
তথা গিয়া জিজ্ঞাসিল অনুচর জন।
হাজরার ঘর কহে সব স্থানিগণ।।
রাজার সাক্ষাতে আসি কহে সেই জন।
হাজরার ঘর এই শুনহ রাজন।।
ফৌজের হাজরার ঘর চাটিগ্রাম গিছে।
রসাঙ্গ মর্দ্দন নারায়ণের সঙ্গেতে রহিছে।।
কামেতে পীড়িত রাজা দেখিয়া সুন্দরী।
কি মতে হাজরার গৃহে যাইব শীঘ্র করি।।
যতেক সঙ্গের নৌকা আদ্যে (২) চালাইল।
গুপ্তভাবে নৃপতি হাজরার গৃহে গেল।।

(১) ইহার অন্য নাম কচুয়া ছড়া।　　(২) আদ্যে — অগ্রে।

সে ঔরসে দশ মাসে জন্ম যে তোমার।
শকুন্তলা গর্ব্ভে যেন ভরত কুমার (১)।।
পঞ্চ বর্ষ অন্তে গৃহে হাজরা আসিল।
রাজ ঔরসে পুত্র দেখি হরিষ হৈল।।
বীর দর্পে খেলা করে অতি সুলক্ষণ।
রামদাস নাম তোমার আছিল তখন।।
দেবমাণিক্য পুত্র বিজয়দেব রাজা।
সম্পর্কেতে ভাই বলি ডাকে মহাতেজা।।
ষোড়শ বৎসর যখন বয়স তোমার।
ধ্বজ হস্তে বনে গিছ পক্ষী ধরিবার।।
সেই অরণ্য মাঝে অপূর্ব্ব দেখিলা।
মনুষ্যের মুণ্ডমত পিষ্টক পাইলা।।
ক্ষুধাতে পীড়িত তাহা খাইছ তখন।
তোমার জন্মের কথা কহিল যেমন।।
রাজ বংশাবলী অমরমাণিক্য জিজ্ঞাসন।
রণচতুর নারায়ণ কহে সমাপন।।

ইতি অমরমাণিক্য নৃপতি জিজ্ঞাসায়াং রণচতুর
নারায়ণ কথনং দ্বিতীয় কাণ্ডং সমাপ্তং।

---

(১) মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগের অনুসরণ করিয়া কণ্ব মুনির আশ্রমে উপনীত হয়েন, তৎকালে মুনিবর তপোবনে ছিলেন না। রাজা, মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলার অলৌকিক রূপলাবণ্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গন্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করেন এবং নব পরিণিতা মহিষীকে আশ্রমে রাখিয়াই রাজধানীতে গমন করেন। রাজার সহযোগে শকুন্তলা গর্ব্ভবতী হইয়াছিলেন, তিনি রাজা কর্ত্তৃক গৃহীত না হওয়ায়, তপোবনেই এক সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করেন; সেই পুত্র কালক্রমে ভরত নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারই নামানুসারে ‘ভারতবর্ষ’ নামকরণ হইয়াছে।

শ্রীরাজমালা

দ্বিতীয় লহরের মধ্যমণি

(টীকা)

দ্বিতীয় লহরের মধ্য-মণি

(টীকা)

বেদে রামায়ণে চৈত্র পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে।।

গ্রন্থভাগে লিখিত অনেক বিষয়ের বিবৃতি পাদটীকায় সন্নিবেশ করা যাইতে পারে নাই। অনুল্লেখিত যেসকল বিবরণ একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহা এই টীকায় সন্নিবিষ্ট হলি।

রাজমালা দ্বিতীয় লহর ও তাহার রচয়িতা।

রাজমালার প্রথম লহর

রাজমালার প্রথম লহর মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে, পণ্ডিত বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই লহরে মহারাজ দৈত্য হইতে আরম্ভ করিয়া, ধর্ম্মমাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, মহারাজ মহামাণিক্যের শাসনকাল পর্য্যন্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

রাজমালার দ্বিতীয় লহরের রচয়িতা

অতঃপর মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে, তাঁহার আদেশমতে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হন। এই লহরে ধর্ম্মমাণিক্য হইতে জয়মাণিক্য পর্য্যন্ত ১০ জন ভূপতির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বৃদ্ধ সেনাপতি রণচতুরনারায়ণ এই লহরের বক্তা। দ্বিতীয় লহরের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে ;—

"অমরমাণিক্য ছিল ধর্ম্ম মহারাজ।
সিংহাসনে বসিলেক মন্ত্রীর সমাজ।।
সেইতো সভাতে ছিল বৃদ্ধ সেনাপতি।
রণচতুর নারায়ণ ছিল তার খ্যাতি।।
অমরমাণিক্য রাজা তাকে জিজ্ঞাসিল।
মহামাণিক্যের পরে যত রাজা হইল।।
শ্রেণী ক্রমে কহ তুমি সে সব কথন।
যে মতে শাসিল রাজ্য প্রজার পালন।।"

রাজবাবুর বাড়ীতে * রক্ষিত রাজমালায় এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে বর্ণিত আছে। তাহা এই ; —

"অমরমাণিক্য নাম নৃপতি আছিল।
ত্রিপুর বংশের কথা তৎপর শুনিল।।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য ছিল ত্রিপুর সন্ততি।
রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুথি।। †
পুস্তক লিখাইছে তিনি পূর্ব্ব রাজার কথা।
তার পরে রাজা সব না হইছে গাঁথা।।
অমরমাণিক্য রাজা স্থির করি মন।
জিজ্ঞাসা উচিত রণচতুর নারায়ণ।।
একশত পঞ্চ বর্ষ বয়স উহার।
স্থির মতি গুণবন্ত ধৈর্য্যতা অপার।।
শুন শুন বলি রণচতুর নারায়ণ।
রাজবংশ কথা কিছু কহত আপন।।
বয়সে বিশিষ্ট বট ত্রিপুর সন্ততি।
তুমি জান ভাল পূর্ব্ব রাজগণ রীতি।।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্যাবধি যত রাজা হৈল।
যেরূপে সে রাজা সবে প্রজাকে পালিল।।
কোন রাজা কিবা কর্ম্ম করিল তখন।
কহত সে সব কথা শুনিব এখন।।
নৃপতির বচনে কহেন্ত সেনাপতি।
পূর্ব্বের প্রসঙ্গ বলি শুন মহামতি।।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্যাবধি যত রাজা হৈল।
অনুক্রমে সেনাপতি সকল কহিল।।"

সেনাপতি বিবরণ কহিলেন, এ কথা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই লহরের রচয়িতা কে, তাহা পাওয়া যায় না। সেনাপতি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন, রাজমালার উক্তি দ্বারা এরূপ বুঝা যায় না। শতাধিক বৎসর বয়স্ক স্থবির, সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী দ্বারা গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভাব্যও নহে। রণচতুরের বর্ণনানুসারে নিশ্চয়ই কোন সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক রাজমালার এই অংশ রচিত হইয়াছিল, সেই পণ্ডিতের নামোদ্ধারে অকৃতকার্য্য হেতু নিতান্তই দুঃখিত আছি।

---

* এই বাড়ীর রাজা ভৃগুরাম রায় ও রাজা মুকুন্দরাম রায় অল্পকাল পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন। ইঁহারা মহারাজ কল্যাণমাণিক্যের বংশসম্ভূত। ইঁহাদের এক শাখা ঢাকায় রাজার দেউড়ীতে বাস করিতেছেন।

† ইহা মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে বিরচিত রাজমালার প্রথম লহর।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকাল নির্ণয় করা আবশ্যক। রাজমালায় এই সময় নির্দ্ধারক স্পষ্ট উক্তি থাকা সত্ত্বেও মতান্তর দেখা যায়। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন — "১০০৭ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে) অমরমাণিক্য সিংহাসনে আরোহণ করেন।" * মিঃ সেন্ডিস্ সাহেব (E. F. Sandys) তাঁহার রচিত "History of Tripura" নামক গ্রন্থে কৈলাসবাবুর মতই সমর্থন করিয়াছেন। † চাক্‌লে রোসনাবাদের সেটেলমেন্ট্ অফিসার মিঃ কামিং সাহেবও (J. G. Comming I.C.S.) এই মতের সমর্থক। রেভারেন্ড্ জেম্‌স্ লঙ্ সাহেব (Rev. James Long) অমরমাণিক্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সিংহাসনারোহণের কাল নির্ণয় করেন নাই। ‡ কৈলাসবাবু প্রভৃতি কোন্ সূত্র অবলম্বনে অমরমাণিক্যের রাজ্যারোহণের কাল ১৫৯৭ খৃঃ (১৫১৯ শক) নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা সে কথা বলেন নাই। এই নির্দ্ধারণ রাজমালার মতবিরুদ্ধ, সুতরাং ইহা সমর্থনযোগ্য বলা যাইতে পারে না। রাজমালায় পাওয়া যায়, —

"চৌদ্দশ উনশত শকে অমরদেব রাজা।
পনরশ শকে ভুলুয়া আমল করে মহাতেজা।।'

রাজমালা — অমরমাণিক্য খণ্ড।

প্রাচীন রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"চৌদ্দশত উনশত শকে অমরদেব হৈল।
পনরশত পূরা বর্ষে ভুলুয়া লুটিল।।"

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালার মতে ;—

"চৌদ্দশ উনশত শকে অমরদেব হৈল।
পোনরশ পূরা শকে ভুলুয়া লুটিল।।"

উদ্ধৃত লিপিতে পরস্পর ভাষাগত সামান্য পার্থক্য থাকিলেও সকল রাজমালায়ই অমরমাণিক্যের রাজ্যাভিষেকের কাল ১৪৯৯ শক (১৫৭৭ খৃঃ) একবাক্যে ঘোষিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় এই প্রামাণিক বাক্য উপেক্ষা করিয়া, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মত সমর্থন করা যাইতে পারে না। নিম্নোক্ত ঘটনার দ্বারাও ইঁহাদের মত অমূলক বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে।

মহারাজ অমরমামিক্য, অমরসাগর খননকালে তাঁহার অধিকারস্থ জমিদারগণ হইতে দাঁড়ি (কুলি) গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরপের জমিদার

* কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৬৮ পৃঃ।

† History of Tripura — Mohammadan period, Page 18.

‡ J. A. S. B. — Vol. XIX.

কুলি প্রদান না করায়, তাঁহার বিরুদ্ধে বিপুল ত্রিপুর-বাহিনী প্রেরণ করা হয়। উক্ত জমিদার, আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া শ্রীহট্টের মুসলমান শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সূত্রে মুসলমানগণের সহিত ত্রিপুরার তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। ১৫০৪ শকে এই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। যুদ্ধাবসানে, প্রধান সেনাপতি রাজধর দেব (অমরমাণিক্যের পুত্র) যে পথে যেরূপভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণন উপলক্ষে রাজমালা বলিয়াছেন ;—

> "পনরশ চারি শকে পৌষ মাস শেষে।
> মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁ লইয়া আছে।।
> রাজধর চলিল দুলালী গ্রাম পথে।
> ইটাগ্রাম হৈয়া চলে ঊনকোটী তীর্থে।।" ইত্যাদি।

রাজাবাবুর বাড়ীতে রক্ষিত রাজমালায় উদ্ধৃত বাক্যের সহিত ভাষাগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থেরই একমত। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

> "পনরশ চারি শকে পৌষ শেষে রহিয়া।
> মাঘের পনর দিনে ফতে খাঁকে লৈয়া।
> রাজধর নারায়ণ দুলালীর পথে।
> ইটালী হইয়া গেল ঊনকোটী তীর্থে।।" ইত্যাদি।

রেভারেন্ড্ লঙ্ সাহেবের মতে ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। * ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে ও ১৫০৪ শকে পার্থক্য নাই, সুতরাং লঙ্ সাহেব রাজমালার সহিত ঐক্যমত হইয়াছেন। কৈলাসবাবু বলেন — "সম্ভবতঃ ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে এই ঘটনা হইয়াছিল।" † সেন্ডিস্ সাহেব তরপের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া থাকিলেও,

---

* "Amar Manik resolved on virtuous deeds by digging tanks; he ordered all the landlords of his kingdom to send coolies for this purpose, accordingly nine Zemindars sent 7300 coolies. The Zemindar of Taraf in Sylhet refused, an army of 22,000 men was sent against him, his son was taken prisoner, put into a cage, and brought to Udaypur. The Raja, next (A. D. 1582) marched an army against the Mohammadan Commander of Sylhet whom he defeated. The order of the troops in battle resembled in figure the sacred bird *Gaduda*, the two generals in the van represented the beak, the troops on the flanks the wing, and the main army the body; during the fight both parties became fatigued when a suspension of arms took place by mutual agreement; they afterwards resumed the battle, when the Musalmans were defeated."

J. A. S. B. — Vol. XIX.

† কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ অঃ, ৭০ পৃষ্ঠা।

এই যুদ্ধের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। কৈলাসবাবুর কথিত ১০০৯ ত্রিপুরাব্দে ১৫২১ শক হয়, সুতরাং তাঁহার এই নির্দ্ধারণ বিশুদ্ধ বলা যাইতে পারে না।

উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হইবে, যিনি রাজা হইবার পর ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খৃঃ) তরপ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহার অভিষেক কাল ১৫১৯ শক (১৫৯৭ খৃঃ) হইতে পারে না। সুতরাং অমরমাণিক্য পূর্ব্ব কথিত ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খৃঃ) রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকৃত নির্দ্ধারণ বলিয়া অতর্কিতভাবে ধরা যাইতে পারে। ইনি চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১৩ শকে (১৫৯১ খৃঃ) পরলোক গমন করেন।

উক্ত ১৫৭৭ খৃঃ হইতে ১৫৯১ খৃঃ অব্দের কোন এক সময়ে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছিল, সুতরাং এই অংশ সার্দ্ধ ত্রিশত বৎসরের প্রাচীন গ্রন্থ।

এই লহরের রচয়িতার নাম বা পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

রাজমালার ভাষা সম্বন্ধীয় আলোচনা

পরিচয় না পাইলেও লেখক ত্রিপুরা কিম্বা নোয়াখালী জেলাবাসী ছিলেন, রাজমালার ভাষা দ্বারা এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। যথা ;—

১। "সর্পেতে ধরিছে পট সন্ন্যাসীর মাথে।" — গ্রন্থারম্ভ

২। "মাচাঙ্গের নিচ হইতে ধন্যকে আনিছে।" — ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড

৩। "আদ্যে বসাইব তারে মান্যে মিত্রাধিক।" — ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড

৪। "দুই দুই বুন্দা দিল পুতুলের হাতে।" — ধন্যমাণিক্য খণ্ড

৫। "মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভালা।" — বিজয়মাণিক্য খণ্ড

৬। "রাজা বলে যাদুরায় আনা সাহ্য কর।" — অনন্তমাণিক্য খণ্ড

এই প্রকারের আরও অনেক শব্দ আছে। পট (ফণা), মাচাঙ্গ (বংশ-মঞ্চ), আদ্যে (আগে),

রাজমালার রচয়িতা ত্রিপুরা জেলার লোক

বুন্দা (মশাল), ভালা (ভাল), সাহ্য (আরোগ্য) ইত্যাদি শব্দ ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এজন্যই রচয়িতাকে ত্রিপুরা অথবা নোয়াখালী জেলার লোক বলিয়া মনে করা যাইতেছে। পূর্ব্বকালে (শ্রীহট্ট অঞ্চলের রাজধানী পরিত্যাগের পর), নোয়াখালী অপেক্ষা ত্রিপুরা জেলার পণ্ডিতগণের রাজ-দরবারে অধিক প্রতিপত্তি ছিল। সুতরাং লেখক ত্রিপুরা জেলাবাসী হইবার সম্ভাবনাই অধিক বলিয়া মনে হয়।

রাজমালা প্রথম লহরের ন্যায় দ্বিতীয় লহরেও স্থানে স্থানে ভাষা অতিরঞ্জিত এবং দৃঢ়

রাজমালার ঐতিহাসিক মূল্য

বিশ্বাসমূলক। তাহা বাদ দিলে, ঐতিহাসিক উপাদানের হিসাবে ইহা অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। প্রথম লহরের ন্যায় এই লহরেও রাজগণের রাজ্যলাভ, রাজ্যচ্যুতি, সমর-কাহিনী, শাসন-বিবরণী ও রাজ-পরিবার সংসৃষ্ট প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ইহা আলোচনায় ত্রিপুরার অনেক প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক

প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকেরই রাজমালার এই অংশ প্রীতিপ্রদ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজমালার দ্বিতীয় লহর ষোড়শ শতাব্দীর রচিত। এই সময় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমোত্থানের যুগ আসিয়াছিল। এই লহর রচনার সমকালে এবং তাহার অল্পকাল পূর্ব্বে ও পরে যে সকল খ্যাতনামা ধর্ম্মানুরাগী অসাধারণ ব্যক্তি সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস ও যদুনন্দনদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য। ভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত, যদুনন্দনদাসের কৃষ্ণকর্ণামৃত, দ্বিজবংশীবদন প্রভৃতির মনসামঙ্গল, কবিকঙ্কণ ও মাধবাচার্য্য প্রভৃতির চণ্ডীকাব্য, কাশীরামদাসের মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ এই যুগের সমুজ্জ্বল রত্ন। এতদ্ব্যতীত এই সময় মাণিক গাঙ্গুলী, দ্বিজ হরিরাম প্রভৃতি বহুসংখ্যক কৃতীব্যক্তি বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে যে অতুল সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তদানীন্তন কালস্রোত যে বঙ্গ সাহিত্যের বিশেষ অনুকূল ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। এই অনুকূল স্রোতের সাহায্যে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছে।

পারিবারিক কথা।

রাজমালায় পারিবারিক কথা খুব কমই পাওয়া যায়। দ্বিতীয় লহরে এতদ্বিষয়ক যেসকল বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা হইল।

বৈবাহিক বিবরণ।

রাজগণের বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা

এই লহর সংসৃষ্ট মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য ও প্রতাপমাণিক্য কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন, কোন গ্রন্থেই সে কথার উল্লেখ নাই; বর্ত্তমান কালে তাহা নির্ণয় করিবারও উপায় নাই। প্রতাপের ভ্রাতা মহারাজ ধন্যমাণিক্য প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কমলা মহাদেবী। একথা রাজমালায়ই পাওয়া যায় ;—

> "বড় সেনাপতি দিল আপনার কন্যা।
> মহারাণী কমলা নাম পৃথিবীতে ধন্যা।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ৮ পৃঃ।

শ্রেণীমালা গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"কমলা নামেতে হৈল তান মহারাণী।
নানাস্থানে দিল দীঘি আর পুষ্করিণী।।" — ইত্যাদি।

ধন্যমাণিক্যের পুত্র দেবমাণিক্যের দুই মহিষীর মধ্যে প্রধানা মহিষী চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক চন্তাইয়ের দুহিতা ছিলেন, দ্বিতীয়া মহিষীর পরিচয় বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যাইতেছে না। দেবমাণিক্যের পুত্র ইন্দ্রমাণিক্য নিতান্ত বাল্যাবস্থায় সিংহাসন লাভ করিয়া অল্পকাল রাজ্যভোগ করিবার পর, সেনাপতি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন; সম্ভবতঃ তিনি বিবাহ করেন নাই। ইন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিজয়মাণিক্যের মহিষীর নাম রাজমালায় 'পুণ্যবতী' লিখিত আছে। যথা ;—

"বিজয়মাণিক্য নাম হৈল নরপতি।
তাহান মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৩৯ পৃঃ।

এই 'পুণ্যবতী' নাম বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না; সম্ভবতঃ ইহা মহাদেবীর বিশেষণ। এরূপ ধারণা ভিত্তিহীন নহে। রাজমালায় অন্যত্র লিখিত আছে ;—

"হিরাপুরে লক্ষ্মীরাণী বনবাস সেবী।
পরে রাজা বিভা করে আর মহাদেবী।।
প্রধানস্থ পাত্র মিত্র রাজাতে কহিল।
কতদিন পরে রাজা লক্ষ্মীরাণী নিল।।
বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৪৩ পৃঃ।

এতদ্দ্বারা জানা যায়, মহারাণীর নাম লক্ষ্মীদেবী ছিল। শ্রেণীমালায় রাণীর নাম আরও স্পষ্টতররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা ;—

"বিজয়মাণিক্য পত্নী নাম লক্ষ্মীবালা।
পুণ্যবতী মহারাণী ছিলেন অবলা।।" শ্রেণীমালা।

এ স্থলে মহারাণীর নাম 'লক্ষ্মীবালা' পাওয়া যাইতেছে। 'পুণ্যবতী' শব্দটী মহারাণীর বিশেষণ না হইয়া নামান্তর হওয়াও বিচিত্র নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "তাহান মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী", এই বাক্য ব্যতীত রাজমালার নিম্নোক্ত উক্তি দ্বারাও এই সন্দেহ জন্মিতেছে।

"ত্রিপুর কুলেতে সে যে শুভ জন্মা কন্যা।
পুণ্যবতী নামে হৈল পৃথিবীতে ধন্যা।।
* * *
তাম্রপত্রে লিখি দিল পুণ্যবতীর নামে।
পুণ্যমতী বতী সতী শ্লোক অনুক্রমে।।
বিধিমতে ভূমি কত উৎসর্গিয়া দিল।
যেন মত নাম দেবী তেন কার্য্য কৈল।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৩৯ পৃঃ।

এই মহারাণী লক্ষ্মীবালা বা পুণ্যবতী, প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যা ছিলেন। ইঁহাকে বসবাস দিয়া বিজয়মাণিক্য দ্বিতীয় পরিণয় করিয়াছিলেন, সেই মহারাণীর পরিচয় আমরা জ্ঞাত নহি।

বিজয়মাণিক্যের পুত্র অনন্তমাণিক্য, প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম ছিল জয়াবতী মহাদেবী। * এই মহারাণী আট বৎসর বয়ঃ ক্রমকালে যে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা "মহিলা মাহাত্ম্য" প্রসঙ্গে বর্ণিত হইবে।

অনন্তমাণিক্যের শ্বশুর গোপীপ্রসাদ, জামাতাকে বধ করিয়া স্বয়ং উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। ইনি ২৪০টী মহিষী করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই ব্যভিচারিণী ছিলেন। ইঁহার প্রধানা মহিষীর নাম ছিল হীরাবতী। ইঁহার নামানুসারে লক্ষ্মীপুর গ্রামের নাম 'হীরাপুর' করা হয়। বিজয়মাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যাইতেছে ;—

'হীরাপুর নাম পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুর ছিল।
উদয়মাণিক্য রাণী হীরাপুর কৈল।।"

উদয়মাণিক্যের অন্যান্য মহিষীগণের নাম বা পরিচয় পাইবার উপায় নাই।

উদয়মাণিক্যের পুত্র লোকতর ফা, জয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হন। ইনি কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন, জানা যায় না। উদয় ও জয়মাণিক্য ভিন্ন বংশীয় হইয়াও অসদুপায় অবলম্বনে ত্রিপুর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া, পুনঃ রাজবংশীয় মহারাজ অমরমাণিক্য পৈর্তৃক সিংহাসনের উদ্ধার সাধন করেন।

বহুবিবাহ

বহুবিবাহ অল্প-বিস্তর পরিমাণে সকল রাজাই করিয়াছিলেন, কিন্তু উদয়মাণিক্যের বিবাহ সংখ্যাই সর্ব্বোর্দ্ধ বলিয়া জানা যায়। মহারাজ ত্রিলোচনও উদয়মাণিক্যের ন্যায় ২৪০টী মহিষী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই কার্য্য-মূলে একটী সদিচ্ছা নিহিত থাকিবার কথা জানা যাইতেছে। রাজ্যমধ্যে শিল্পকলার উন্নতি এবং বিস্তার সাধনই তাঁহার বহুবিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; এ বিষয় প্রথম লহরের টীকায় বিবৃত হইয়াছে।

---

* (১) "অনন্তমাণিক্য রাণী জয়া মহাদেবী।
কহিতে লাগিল পুনঃ মনে উষ্মা ভাবি।।"
উদয়মাণিক্য খণ্ড।

(২) "অনন্ত তাহার পুত্র হইল নৃপতি।
জয়া নাম্নী তাহার রাণীর ছিল খ্যাতি।।"
শ্রেণীমালা।

শিক্ষা।

রাজগণের শিক্ষা ও সাহিত্যের পোষকতা বিষয়ক বিবরণ

নিতান্তই দুঃখের সহিত উল্লেখ করিতে হইল যে, রাজমালা দ্বিতীয় লহরে রাজা কিম্বা রাজপরিবারের শিক্ষা সম্বন্ধীয় কোন কথা উল্লেখ নাই। রাজমালায় সন্নিবিষ্ট বিবরণ আলোচনায় বুঝা যায়, মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিত, ধার্ম্মিক এবং উদারচেতা ছিলেন। সাহিত্য চর্চ্চায়ও ইঁহার বিশেষ উৎসাহ থাকা প্রকাশ পাইতেছে। ইনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের পুরাবৃত্ত (রাজমালা) লিখিবার সূত্রপাত করিয়া, চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী ভূপতিবৃন্দ ইঁহারই পদাঙ্কানুসরণে ক্রমশঃ রাজমালার কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন।

ধর্ম্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপমাণিক্য শৈশবে রাজা হইয়া, অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় শিক্ষালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন না। প্রতাপের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধন্যমাণিক্য সিংহাসন লাভ করেন। ইনি সুশিক্ষিত, রাজনীতি কুশল, প্রবলপরাক্রান্ত, সাহিত্যানুরাগী এবং সঙ্গীতকলার উন্নতিকামী ছিলেন। ইঁহার শাসনকালে কয়েকখানা শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। তিনি ত্রিহুত (মিথিলা) হইতে নৃত্য ও সঙ্গীতপারদর্শী লোক আনিয়া দেশীয় লোকদিগকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

মহারাজ দেবমাণিক্যের প্রতিভার কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি নিতান্ত সরল বিশ্বাসী ছিলেন। উপাস্য দেবীর দর্শন লাভের নিমিত্ত লক্ষ্মীনারায়ণ নামক আগমী বিপ্রের প্ররোচনায়, ক্রমান্বয়ে আট জন সেনাপতিকে বধ করাই এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পরিশেষে, তিনিও সেই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্য বাল্যবয়সে রাজ্যলাভ করিয়া অল্পকাল পরেই নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য শিক্ষিত এবং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন; * তাঁহার শূরত্বও অতুলনীয়। শিল্পকলার উন্নতিকল্পে ইঁহার বিশেষ যত্ন ছিল।

অনন্তমাণিক্য বাল্যকালে নিতান্ত অনাবিষ্ট এবং অশিক্ষিত ছিলেন। রাজা হইয়াও তিনি স্বীয় শ্বশুর গোপীপ্রসাদের ক্রীড়া-পুত্তলী হইলেন। যে শ্বশুরের প্রতি তিনি আত্মনির্ভর করিয়াছিলেন, সেই শ্বশুরই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠিলেন। গোপীপ্রসাদ রাজ্যলোভে জামাতাকে বধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

---

* "গৌরবর্ণ পণ্ডিত রাজা পুরুষ প্রধান।।

*   *   *   *

রাজসিক ভাব নিত্য থাকয়ে অন্তর।।"

— বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

সেনাপতি গোপীপ্রসাদ উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। ইনি সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী। উদয় অশিক্ষিত, গোঁয়াড় প্রকৃতিবিশিষ্ট, বিশ্বাসঘাতক এবং অত্যন্ত ব্যভিচারী ছিলেন। অবিচার, অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং মুসলমানের আক্রমণ ইত্যাদি নানাবিধ বিপ্লবে ইঁহার শাসনকাল কলঙ্কিত হইয়াছিল। মোটের উপর ইনি যুদ্ধবিদ্যা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে শিক্ষিত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায় না।

উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যের শিক্ষাসম্বন্ধীয় কোন বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না। এই সময় জয়মাণিক্যের পিসা সেনাপতি রণাগণনারায়ণের (রঙ্গনারায়ণ) প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল; জয়মাণিক্য, তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক হইলেন। লোভপরতন্ত্র রণাগণ রাজ্যলাভের প্রয়াসী ছিলেন, অমরমাণিক্য তাঁহাকে বধ করায়, বৃদ্ধের সেই উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে নাই।

মল্লবিদ্যার চর্চ্চা

মল্লবিদ্যা শিক্ষা করা পূর্ব্বকালের ন্যায় এই কালেও রাজগণের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ধন্যমাণিক্য দুদ্ধর্য সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে, পীড়ার ভাণ করিয়া অন্তঃপুরে অবস্থানপূর্ব্বক মল্লবিদ্যার চর্চ্চা করিয়াছিলেন। গদাভীম নামক ব্যক্তি মহারাজ অনন্তমাণিক্যের মল্লবিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। অমরমাণিক্যের পুত্র রাজবল্লভের নিকট জয়মাণিক্য মল্লবিদ্যা শিক্ষা করিবার নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যায়। স্থূল কথা, অন্যবিধ বিদ্যার সহিত মল্লবিদ্যার চর্চ্চা সেকালে ত্রিপুর রাজ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

স্ত্রীশিক্ষা

এই সময় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলের প্রমাণ পাওয়া যায়। উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের প্রধান সেনাপতি রণাগণনারায়ণের পত্নী, তাঁহাকে পাঁচালী পাঠ করিয়া শুনাইতেন। কোন কোন রাজমহিষীর প্রতিভার বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, তাঁহারা সুশিক্ষিতা ছিলেন। এ বিষয়ে রাজমালার বর্ণনা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত, তদ্দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়।

নৃত্যগীত-বিষয়ক চর্চ্চা

ধন্যমাণিক্য ত্রিহূত হইতে সুশিক্ষিত লোক আনাইয়া রাজ্য মধ্যে নৃত্যগীত প্রচলনের ব্যবস্থা করিবার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তদবধি ত্রিপুরাবাসিগণ নৃত্যগীতবিশারদ হইয়াছিল। মহারাজের এই অনুষ্ঠানের সুফল অদ্যাপি ত্রিপুরায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

সাহিত্য সেবা।

বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টি বিধান

বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রাচীনকাল হইতেই নানাবিধ যত্ন করিয়া আসিয়াছেন; তাঁহাদের প্রযত্নে রচিত রাজমালাই এ বিষয়ে প্রধান প্রমাণ। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য রাজমালা রচনার প্রথম সূত্রপাত করেন। এই মূল্যবান গ্রন্থের প্রথম লহর তাঁহার শাসন কালে রচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি সমগ্র

মহাভারতের অনুবাদ করাইবার কথা প্রচলিত আছে। দুঃখের বিষয়, সেই গ্রন্থের অস্তিত্ব বর্ত্তমান কালে নাই। মহারাজ ধন্যমাণিক্য বঙ্গ ভাষায় 'উৎকল খণ্ড পাঁচালী' এবং 'যাত্রা রত্নাকরনিধি' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। 'প্রেত চতুর্দ্দশীর গীত' তাঁহার সময়েই রচিত হয়। এতদ্ব্যতীত বঙ্গ ভাষায় রাজকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করায় এই ভাষার বিস্তর উন্নতি হইয়াছিল।

পারিবারিক বিশেষ নিয়ম।

মৃত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিয়ম

কোন রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎক্ষণাৎ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া মৃত রাজার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ অনুমতি প্রদান করিতেন। এরূপ অনুমতি পাইবার পর, রাজার মৃতদেহ শ্মশানে নেওয়ার নিয়ম ছিল।

সহমরণ-প্রথা

এই সময় রাজপরিবারে সহমরণ-প্রথা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল; রাজমালার দ্বিতীয় লহরে এ বিষয়ের বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মহিষী কমলা মহাদেবী, মহারাজ দেবমাণিক্যের প্রধানা মহিষী (বিজয়মাণিক্যের মাতা) এবং বিজয়মাণিক্যের মহিষীগণ আগ্রহের সহিত পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন। অনন্তমাণিক্যের আট বৎসর বয়স্কা মহিষী পতির সহমৃতা হইবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতা বাধা প্রদান করায় সেই সঙ্কল্প পূর্ণ হইতে পারে নাই। প্রজাসাধারণের মধ্যেও সহমরণ প্রথার সমধিক প্রচলন ছিল।

রাজমহিষীর বনবাস দণ্ড

রাজমহিষীগণের দণ্ডের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বনবাসে প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য স্বীয় প্রধানা মহিষীকে বনে দিয়াছিলেন।

গুপ্ত কথা বুঝাইবার ইঙ্গিত

অন্যের অলক্ষিতে কথা বুঝাইবার নিমিত্ত নানাবিধ ইঙ্গিত প্রচলিত ছিল। সেনাপতি রণাগণ, অমরমাণিক্যকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আপন আলয়ে নিয়াছিলেন। অমরমাণিক্যের হিতাকাঙ্ক্ষী এক ব্যক্তি তরবারিদ্বারা পানের বোটা ছেদন করিয়া তাঁহাকে দেখাইল। এই ইঙ্গিতদ্বারা অবস্থা বুঝিতে পারিয়া, অমরমাণিক্য আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মমত।

ধর্ম্মানুরাগ

ধর্ম্ম রক্ষণ এবং ধর্ম্ম পালন ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের কুলাগত বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ। দেবতা স্থাপন, দেবালয় গঠন, ধর্ম্মোদ্দেশ্যে ভূমি ও অর্থদান, জলাশয় খনন, ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস ইত্যাদি সদ্‌গুণের নিমিত্ত ত্রিপুর রাজবংশ চির-প্রসিদ্ধ। প্রথম লহরে এতদ্বিষয়ক অনেক বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় লহর সংসৃষ্ট সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা গেল।

রাজকুমারের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ

মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য রাজ্যলাভের পূর্ব্বে সন্ন্যাসীবেশে দীর্ঘকাল নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বিস্তর পুণ্য ও জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহামাণিক্যের পরলোকগমনের পর, তিনি সিংহাসনারূঢ় হইয়া ধর্ম্মকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ইনি কৌতুকাদি আটজন ব্রাহ্মণকে বারাণসী ধাম হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সমাগত বিপ্রাষ্টকের মধ্যে কৌতুক কান্যকুব্জ দেশীয় ছিলেন। অপর সাতজন ব্রাহ্মণের পরিচয় বর্ত্তমান কালে দুষ্প্রাপ্য।

জলাশয় খনন ও ভূমিদান

ধর্ম্মমাণিক্য ধর্ম্মভাব প্রণোদিত হইয়া কুমিল্লায়, কৈলারগড়ে (কসবায়) এবং উদয়পুরে ‘ধর্ম্মসাগর’ নামক তিনটী সরোবর খনন করাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কুমিল্লা নগরীতে অবস্থিত সুবিশাল বাপীই বিশেষ বিখ্যাত। এই সরোবর প্রতিষ্ঠাকালে মহারাজ ব্রাহ্মণদিগকে শস্যপূর্ণা ঊনত্রিংশ দ্রোণ ভূমি * তাম্রশাসন দ্বারা দান করিয়াছিলেন। এই দান সম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“পরকাল চিন্তি রাজা চিত্ত শান্তাইল।
ভূমি দান করিবারে ব্রাহ্মণ আনিল।।
ধর্ম্মসাগর নামেতে জলাশয় দিয়া।
তার চারি পারে সব দ্বিজ বসাইয়া।।
মহাবিষুবেতে দিল ভূমি উৎসর্গিয়া।
কৌতুকাদি বাণেশ্বর ব্রাহ্মণ অর্চ্চিয়া।।
কৌতুকাদি ব্রাহ্মণেতে করে ভূমি দান।
তাম্রপত্রে লিখি দিল বচন প্রমাণ।।”

ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড, — ৫ পৃঃ

ধর্ম্মমাণিক্যের তাম্রশাসন

সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে, আটজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে কৌতুক ও বাণেশ্বরের নাম রাজমালায় পাওয়া যায়। কৌতুক কান্যকুব্জবাসী, ইনি বারাণসী ধাম হইতে ধর্ম্মমাণিক্যের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাণেশ্বর রাজমালার প্রথম লহরের রচয়িতা, ইনি ত্রিপুর দরবারের রাজপণ্ডিত ও রাজপুরোহিত ছিলেন, রাজমালা প্রথম লহরের টীকায় ইঁহার বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। দান প্রতিগ্রাহী অপর ছয় জন বিপ্রের নাম পাওয়া যাইতেছে না। তাম্রফলকেও সকল বিপ্রের

---

* আট হস্ত পরিমিত নলকে চারি পণ ধরিয়া ত্রিপুর রাজ্যে ভূমি পরিমাপ হইয়া থাকে। ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধীয় আর্য্যা এই ;— ২০ ধুরে — ১ ক্রান্তি। ৩ ক্রান্তিতে — ১ কড়া। ৪ কড়ায় — ১ গণ্ডা। ২০ গণ্ডায় — ১ কাণি। ১৬ কাণিতে — ১ দ্রোণ।

ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারী বিভাগেও এই নিয়মে ভূমি পরিমাপ হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে পরিমিত কাণিকে ‘তিপ্রাই কাণি’ বলে।

নামোল্লেখ নাই, "কৌতুকাদি" শব্দ মাত্র পাওয়া যায়। তাম্রশাসনের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ;---

"চন্দ্রবংশোদ্ভবঃ স্বাপ মহামাণিক্যজ্যঃ সুধীঃ।
শ্রীশ্রীমদ্ধর্ম্মমাণিক্য ভূপশ্চন্দ্র কলোদ্ভবঃ।।
শাকে শূন্যাষ্ট বিশ্বাব্দে বর্ষে সোমদিনে তিথৌ।
ত্রয়োদশ্যাং সিতেপক্ষে মেষে সূর্য্যস্য সংক্রমে।।
কৌতুকাদি দ্বিজাগ্র্যেষু পূজিতেষু চ চাষ্টসূ।
ভূমিংদদৌ শস্যপূর্ণাং দ্রোণ বিংশ নবাধিকাং।।
জলাশয়ং দ্বিজায়ে মং ধর্ম্মসাগরমাখ্যয়া।
সভূমি ফল বৃক্ষাদি ভূমিতং দত্তবানহং।।
মমবংশ পরিক্ষীণে যঃ কশ্চিদ্ভূপতিভবেৎ।
তস্য দাসস্যদাসোহং ব্রহ্মবৃত্তিং ন লোপয়ৎ।।"

মর্ম্ম ঃ— চন্দ্রবংশোদ্ভব মহামাণিক্যের সুধীপুত্র, শশধর সদৃশ শ্রীশ্রীমদ্ধর্ম্মমাণিক্য, ১৩৮০ শকের মেষ সংক্রমণে (চৈত্র মাসের শেষ তারিখে) সোমবার, শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে কৌতুকাদি অষ্ট বিপ্রকে শস্যসমন্বিত এবং ফল ও বৃক্ষাদি পূর্ণ ঊনত্রিশ দ্রোণ ভূমি দান করিলেন। আমার বংশ বিলুপ্ত হইলে যদি এই রাজ্য অন্য কোন ভূপতির হস্তগত হয়, তিনি এই ব্রহ্মবৃত্তি লোপ না করিলে, আমি তাঁহার দাসানুদাস হইব।

একের প্রদত্ত দান অন্যে বিলোপ না করিবার অনুরোধ প্রাচীন অনেক তাম্রশাসনে আছে। শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসনের শেষভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

"ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্নাতি যশ্ছ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্য কর্ম্মানৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ।।
যষ্টিম্বর্ষ সহস্রাণি স্বগ্র্গেমোদতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং বসেৎ।।
স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে।।
বহুভির্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদাফলম্।।
ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য জীবিতঞ্চ।
সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা ন হি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ।।" *

---

* সাহিত্য পত্রিকা — ভাদ্র, ১৩২০ সন

পরকীর্ত্তি লোপ (প্রদত্ত ভূমির প্রতি হস্তক্ষেপ) না করিবার নিমিত্ত ভাবী নৃপতিদিগের প্রতি নিষেধসূচক ধর্ম্মানুশাসনসম্মত উপরিউক্ত মর্ম্মাত্মক শ্লোক অনেক প্রাচীন তাম্রশাসনেই পাওয়া যায়; ইহা অশেষ মহত্ত্বের পরিচায়ক। তাম্রশাসন সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিবরণ অতঃপর প্রদান করা হইবে।

কুমিল্লানগরীস্থিত ধর্ম্মসাগরের প্রাচীনত্ব

১৩৮০ শকে ভূমি দান করা হইয়াছিল। এটি সার্দ্ধ চারিশত বৎসরেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বের কথা। ধর্ম্মসাগর উৎসর্গোপলক্ষে এ দান করা হইয়াছিল, সুতরাং এই জলাশয়ের প্রাচীনত্ব সার্দ্ধ চারি শতাব্দী নির্ণীত হইতেছে। খননের পর, কখনও এই বিশাল বাপীর সংস্কার হয় নাই; শীঘ্র সংস্কারের প্রয়োজন হইবে বলিয়াও মনে হয় না। অদ্যাপি এই সরোবরের জল উৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত।

দেবতা প্রতিষ্ঠা।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য যেমন বীর, তেমনি ধার্ম্মিক ছিলেন। রাজমালায় লিখিত আছে, তিনি এক মণ সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজমালার উক্তি এই ;—

"শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা ধর্ম্মে চিত্ত দিল।
প্রতিমা ভুবনেশ্বরী সুবর্ণে নির্ম্মাইল।।
এক মণ সুবর্ণের প্রতিমা নির্ম্মাইয়া।
জীবন্যাস * করাইল সাধক আনিয়া।।
প্রতিমা নাসায় তুলা লাগাইয়া রাখে।
শ্বাসে তুলা উড়ি যায় † পূজা কালে দেখে।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২৯ পৃঃ।

---

* বিগ্রহ স্থাপন কালে তাঁহার জীবন্যাস বা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত কোন দেবতারই পূজা হইতে পারে না। শাস্ত্রে আছে ;—

"অকৃতায়াম প্রতিষ্ঠায়াং প্রাণনাং প্রতিমাসু চ।
যথা পূর্ব্বং তথা ভাবঃ স্বর্ণাদীনাং ন বিষ্ণুতা।।
অন্যেষামপি দেবানাং প্রতিমাসু চ পার্থিব।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা তস্মাৎ দেবত্ব সিদ্ধয়ে।।" দেবপ্রতিষ্ঠা তত্ত্ব।

পূজা পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গ-দেবতার পূজাদি সমাপনান্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

"আঁং হ্রীং ক্রোঁং যং রং লং বং শং ষং সং হোং হং সঃ অমুষ্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ আমিত্যাদি অমুষ্য জীব ইহ স্থিত, আমিত্যাদি অমুষ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, আমিত্যাদি অমুষ্য বাঙ্মনশ্চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্যৈ প্রাণা ক্ষরন্তু চ। অস্যৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা তে যজুরীরয়ন্।।"

ইহাই প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র। যে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেই দেবতার নাম যষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত করিয়া উচ্চারণ করা আবশ্যক।

দেবতার বক্ষদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং মন্ত্রে যে-সকল স্থানের কথা লিখিত আছে, সেই সকল স্থানে হস্ত দিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির উজ্জীবন করিতে হইবে। এই নিয়মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার পর, দেবতার দেবত্ব হইয়া থাকে।

† প্রতিমার নাসারন্ধ্রে স্থাপিত তুলা উড়িয়া যাইবার সম্বন্ধে জেম্‌স লঙ্‌ সাহেব (Rev. James Long) এক অদ্ভুত কথার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন ;— "He made

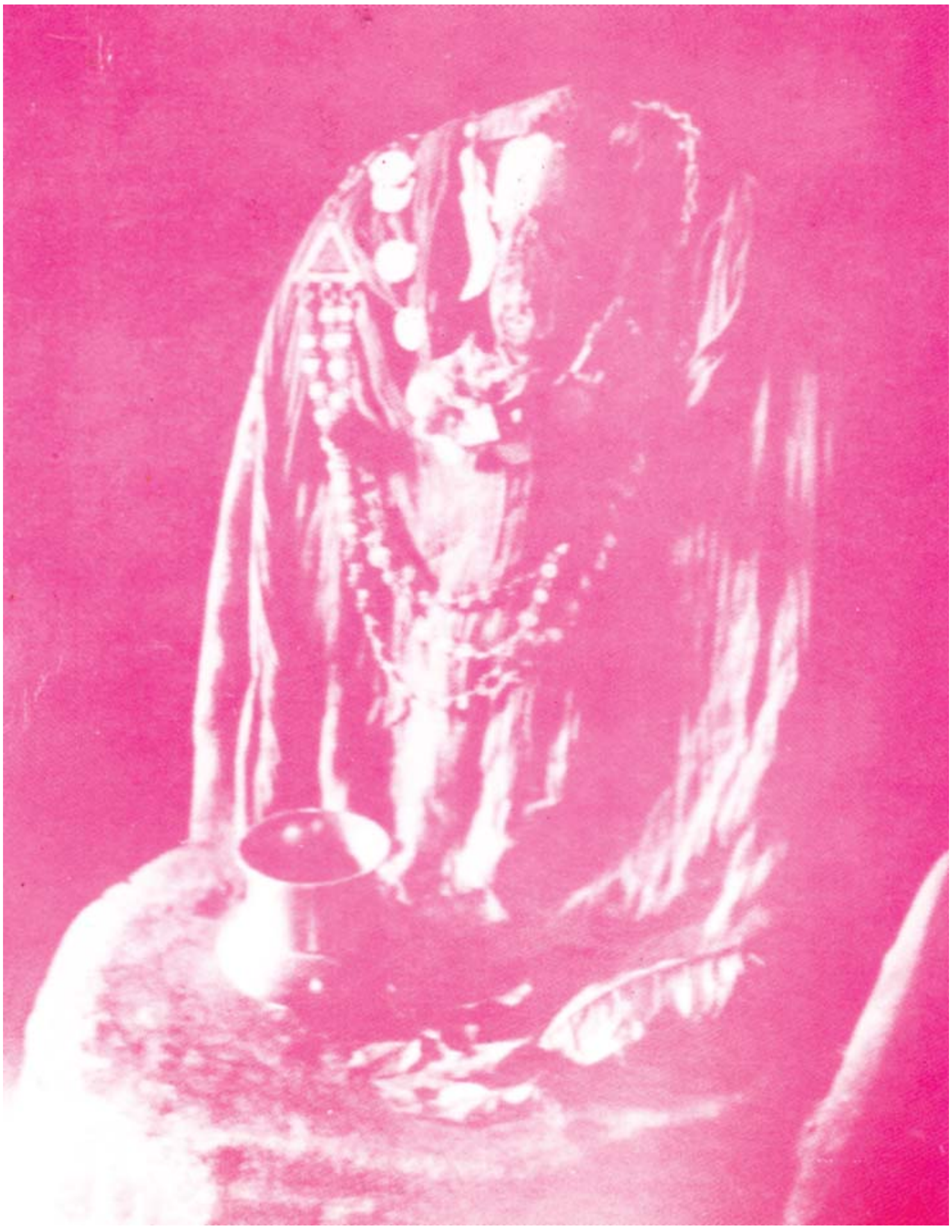

"ছোট মা" বিগ্রহ।
(এই মূর্ত্তি পীঠদেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর সহিত একই মন্দিরে পূজিত হইতেছেন।
প্রবাদানুসারে এই মূর্ত্তি দেবালয়ের সন্নিহিত নির্হহিণী গর্ত্তে পাওয়া গিয়াছে। অনেকে বলে,
চট্টগ্রাম হইতে ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তি আনিয়া মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক স্থাপিতা হইবার
পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি পীঠস্থানে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন।)

এই বিগ্রহ এত গোপনে রাখা হইত যে, — "রাজার পুত্রে মূর্ত্তি দেখিতে না পারে।"

ভুবনেশ্বরী বিগ্রহের অবস্থা

এই আদরের ও যত্নের বিগ্রহ এখন নাই। কোন সময়ে কি অবস্থায় এই মূর্ত্তির অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে, তাহা জানিবারও উপায় নাই। উদয়পুর রাজধানী মঘ এবং মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহাদের কোন জাতিই উক্ত বিগ্রহ লুণ্ঠন করিয়া থাকিবে; এতদ্ব্যতীত এই বিগ্রহের বিলোপযোগ্য অন্য কোন ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়া প্রকাশ পায় না।

ধন্যমাণিক্যের ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠানের আরও অনেক নিদর্শন আছে। তিনি পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মূর্ত্তি চট্টগ্রাম হইতে আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন, এ বিষয় প্রথম লহরের টীকায় বিবৃত হইয়াছে। ত্রিপুরাসুন্দরীর বর্ত্তমান মন্দিরও তাঁহার নির্ম্মিত। এই মন্দির বিষ্ণু বিগ্রহ স্থাপনার্থ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প ছিল, দৈব ঘটনায় বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে শক্তি মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হইল। এতদ্বিষয়ে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"আর এক মঠ দিতে আরম্ভ করিল।
বাস্তুপূজা সঙ্কল্প বিষ্ণু প্রীতে কৈল।।
ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে।
এই মঠে আমা স্থাপ রাজা মহাসত্ত্বে।।
চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।
প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট।।
তথা হইতে আনি আমা এই মঠে পূজ।
পাইবা বহুল বর যেই মতে ভজ।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ৩০ পৃঃ।

এই স্বপ্ন দর্শনের পর, যে ভাবে পাষাণময়ী মূর্ত্তি চট্টগ্রাম হইতে আনা হইয়াছিল, তাহা প্রথম লহরের টীকায় দ্রষ্টব্য।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, বিষ্ণুর জন্য নির্ম্মিত মঠেই দেবীকে স্থাপন করিলেন। এই মঠের সম্মুখভাগে একখণ্ড শিলালিপি ছিল, অনেক কাল পূর্ব্বেই তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা মন্দিরটী প্রথম দর্শনকালে (১৩০২ ত্রিপুরাব্দে) মন্দির দ্বারে উপরিভাগে একটী গভীর দাগ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, সেই স্থানেই

ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর মন্দির

---

an image of Bhubaneswari of Small gold, weighing a maund, he placed cotton in her nostrils so that at the Puja time when the Prana Pratista ceremony is performed, her breath might blow it away, the people all cried out that a miracle had been performed, though a pipe perforating the body and in contact with the mouth of a priest accounts for the whole, we have many instances of similar tricks in Europe in the Middle ages."
J. A. S. B. — Vol. XIX.

ভারতীয় সাধকগণ কর্ত্তৃক দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা যে ইউরোপীয় ইন্দ্রজাল নহে, লঙ্ সাহেবের তাহা জানা থাকিলে বোধ হয় এবম্বিধ প্রস্তরের অবতারণা করিতেন না।

শিলালিপি সংস্থাপিত ছিল। পরবর্ত্তী সংস্কার কালে সেই দাগ বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, সম্মুখস্থ শিলালিপিতে নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি উৎকীর্ণ ছিল।

"মায়া মুরারেরিয়মম্বিকা যা।
মুঞ্চত্য মুষ্যা নিকটং ন কুত্র।।
প্রান্তে ভবান্যা ধ্রুবমাস কেশব।
শ্রীধন্যমাণিক্য বিনিশ্চতিস্তিয়ম্।।"

মর্ম্ম ঃ— "এই যে অম্বিকা, ইনি নারায়ণের মায়া। কেশব সর্ব্বদা ইঁহার নিকট থাকেন, কখনও দূরে যান না। শ্রীধন্যমাণিক্য, আপনার বিস্মিত হইবার কারণ কি?"

উক্ত শিলালিপিদ্বারা ইহাই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অম্বিকা ও বিষ্ণুতে প্রভেদ নাই; অম্বিকা বিষ্ণুরই মায়া। সুতরাং বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে যে মঠ নির্ম্মিত হইতেছিল, সেই মন্দিরে বিষ্ণুর পরিবর্ত্তে অম্বিকাকে স্থাপন করিবার দরুণ বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপিসমূহ

উক্ত শিলাপট্ট ব্যতীত বর্ত্তমান কালে মন্দির গাত্রে আরও পাঁচ খণ্ড শিলালিপি সংযোজিত আছে। তাহার দুইখানা পূর্ব্বদিকে, দুইখানা দক্ষিণদিকে এবং একখানা উত্তরদিকে অবস্থিত। পূর্ব্বদিকস্থ শিলাখণ্ডদ্বয়ে ক্রমান্বয়ে একই বিবরণ উৎকীর্ণ হইয়াছে, এক খণ্ড প্রস্তরে সমগ্র বিষয়ের সমাবেশ না হওয়ায়, দুই খণ্ড প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিদ্বয় পাঠ করিলে মন্দিরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। তাহা এই ;—

।। প্রথম খণ্ডে উৎকীর্ণ শ্লোক।।

"আসীৎ পূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকলগুণযুতো ধন্যমাণিক্য দেবো
যাগে যস্যাম্বরেশঃ ক্ষিতিতলমগমৎ কর্ণ তুল্যস্য দানৈঃ।
শাকে বহ্ন্যক্ষিবেধোমুখধরণীযুতে লোকমাত্রেহ স্বিকায়ৈ
প্রাদাৎ প্রাসাদ রাজং গগনপরিগতং সেবিতায়ৈ স দেবৈঃ।
তৎপশ্চাদ্ ভূমিপালস্ত্রিপুর নরপতির্ধীর কল্যাণদেবঃ
খিন্নাং (১) পৃথ্বীং শশাস প্রবলরিপুগণৈঃ কেবলং স্বীয় শক্ত্যা।
তৎপুত্রো ভূপমসিংহঃ সমরপতিবরো ধীর গোবিন্দদেবো
দানৈর্ভূদেব যোষিৎ কনকময়কৃতঃ সাম্বরাজ্যে (২) বিরেজে।।"

---

(১) শিলালিপিতে 'ক্ষিন্নাং' উৎকীর্ণ হইয়াছে।

(২) সাম্বরাজ্যে — ত্রিপুর রাজ্যের এই নাম অন্য কোন স্থানে পাওয়া যায় না। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ত্রিপুরাকে 'সুহ্মদেশ' বলা হয়েছে। শিলালিপিতে প্রমাদবশতঃ 'সুহ্ম' স্থলে 'সাম্ব' খোদিত হওয়া অসম্ভব নহে।

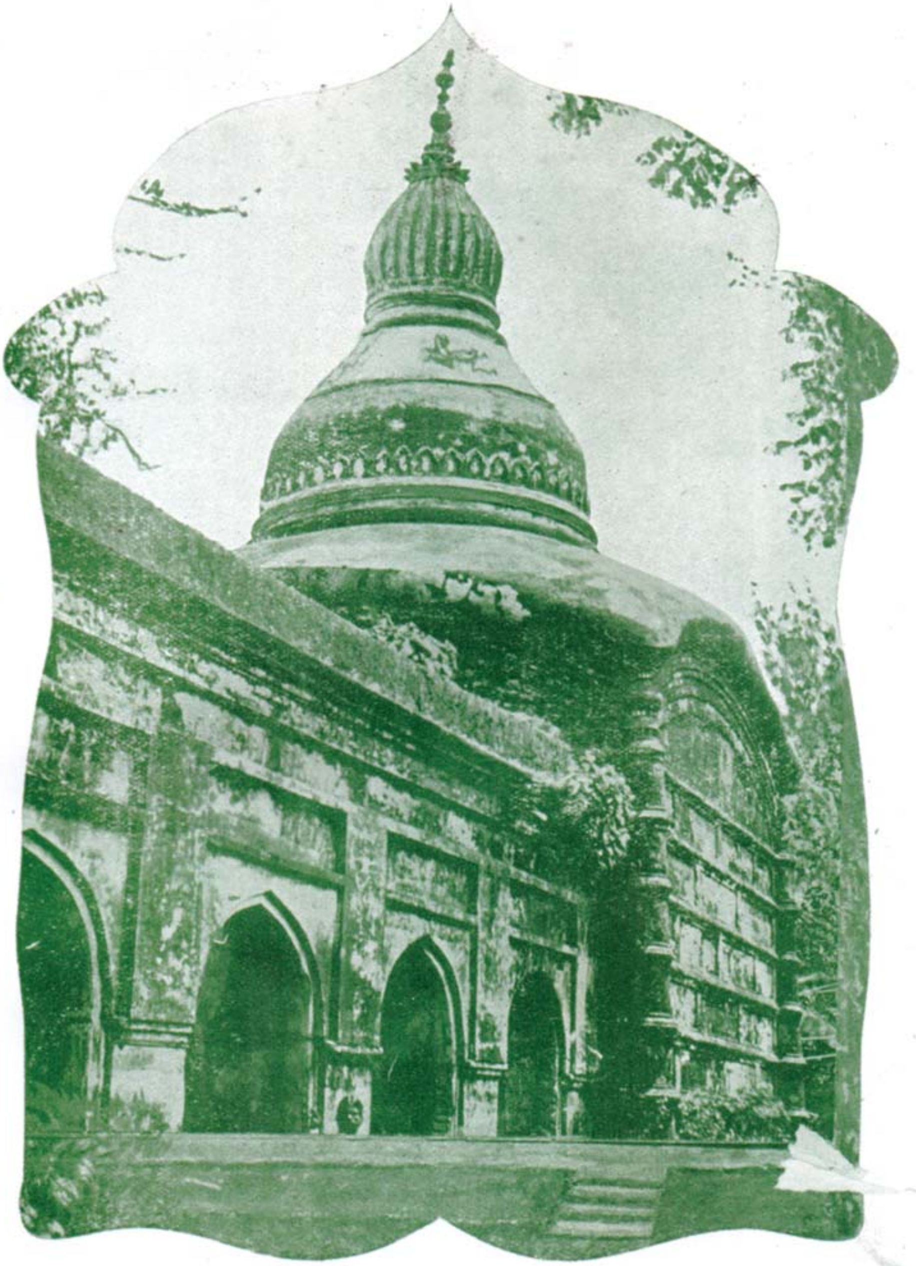

পীঠদেবী শ্রীশ্রীত্রিপুরাসন্দরীর মন্দির, উদয়পুর।

(৩০ পৃষ্ঠায় বিবরণ দ্রষ্টব্য)

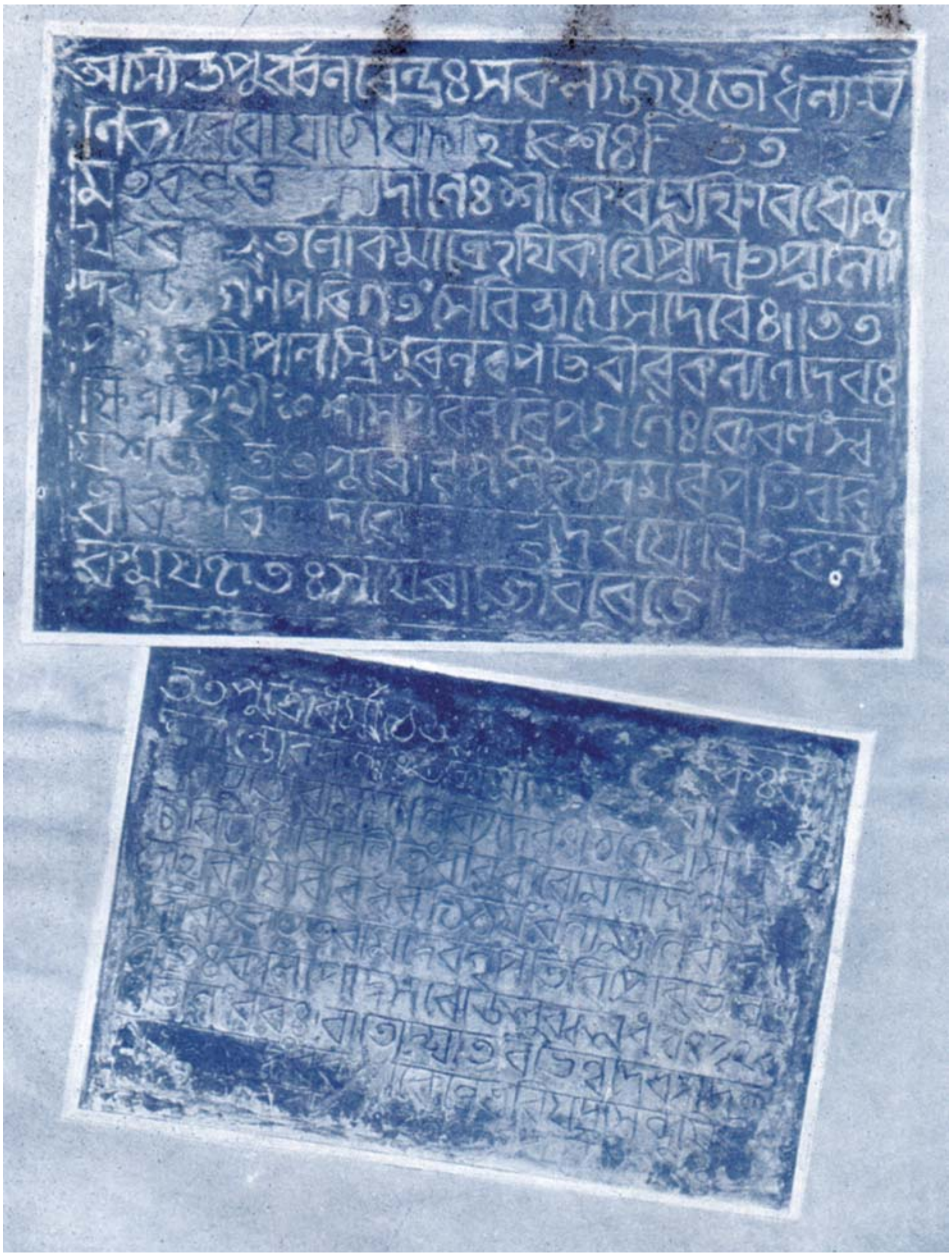

শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির গাত্রস্থ শিলালিপি।
(প্রথম ও দ্বিতীয়াংশ।)

।। দ্বিতীয় খণ্ডে উৎকীর্ণ শ্লোক।।

"তৎপুত্রো ধর্ম্মচেতাঃ ক্ষিতিপতিতিলকঃ কান্তদান্তো বদান্যঃ
শ্রীশ্রীমান সত্যবাদী নিখিলগুণযুতো রামমাণিক্য দেবঃ।
চক্রে প্রাসাদরাজং বিটপিবিদলিতং বীর ধীরো মনোজ্ঞং
পূর্ব্বন্মাদম্বিকায়ৈ বিবিধ রুচিচয়ং ধন্যমাণিক্য দত্তং।।
বীর শ্রীযুত রামদেব নৃপতির্বিপ্রোহজ্জ ভানুঃ কৃতিঃ
কালীপাদসরোজলুব্ধমধুপঃ পৃথ্বীপতীনাং বরঃ।
বাতোদ্ঘাতবিভিন্ন দেবসদনং চক্রে মনোজ্ঞং বরং
শাকে নেত্রবিয়দ্রসেন্দুমিলিতে পীঠে ভবান্যাঃ পুনঃ।।
শকাব্দা ১৬০৩"

(প্রথম খণ্ডের অনুবাদ।)

"পূর্ব্বকালে সমগ্র গুমসম্পন্ন ধন্যমাণিক্য নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি দানে কর্ণ তুল্য ছিলেন, তাঁহার যাগে স্বর্গাধিপতি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। তিনি ১৪২৩ শকাব্দে গগনভেদী এই প্রাসাদ দেবগণ সেবিতা লোকৃজননী অম্বিকাকে দান করেন। তাঁহার পর, ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ কল্যাণদেব প্রবল রিপুগণ পীড়িতা পৃথিবীকে একমাত্র নিজ শক্তি দ্বারা শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ, ধীর প্রকৃতি গোবিন্দদেব রাজাদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাঁহার দানে ব্রাহ্মণ রমণীগণ, স্বর্ণময় হইয়াছিলেন। তিনি সাম্বরাজ্যে বিরাজ করিয়াছিলেন।" *

(দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ)

"তাঁহার পুত্র মহারাজ রামমাণিক্য ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, নিখিল-গুণসম্পন্ন, কমনীয় মূর্ত্তি, জিতেন্দ্রিয় এবং বদান্য ছিলেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য অম্বিকার উদ্দেশ্যে যে মন্দির দান করিয়াছিলেন, তাহার উপরে বৃক্ষাদি জন্মিয়া ফাটিয়া গিয়াছিল, বীরবর ও ধীর প্রকৃতি মহারাজ রামদেব ঐ মন্দির মনোজ্ঞ করেন। দ্বিজ পঙ্কজ সেবিতা কালীপদ-পদ্মলুব্ধ-মধুপ ভূপতি শ্রীযুত রামমাণিক্য ১৬০৩ শকে বাতাঘাত বিদারিত দেবমন্দির মনোজ্ঞ করেন। শকাব্দ ১৬০৩।"

উক্ত লিপিদ্বয় আলোচনায় জানা যায়, ১৪২৩ শকে মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হইবার পর, ১৬০৩ শকে মহারাজ রামমাণিক্য কর্ত্তৃক তাহার সংস্কার হইয়াছিল। মন্দির নির্ম্মাণের কিঞ্চিন্ন্যূন দুই শতাব্দী পরে এই সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আরও দুইবার মন্দিরটী সংস্কৃত হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু উদ্ধৃত শিলালিপিদ্বয়ে তদ্বিষয়ক কোন কথার উল্লেখ নাই। রামমাণিক্যের সময় ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী

* এই অনুবাদ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'শিলালিপি সংগ্রহ' পুস্তিকা হইতে গ্রহণ করা হইল।

কালের সংস্কার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে একখণ্ড শিলালিপি সংযোজিত থাকিবার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা বঙ্গভাষায় লিখিত। এই প্রস্তর ফলকের ভাষা নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট; এবং মধ্যে মধ্যে অক্ষর বিনষ্ট হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বিলুপ্ত অক্ষরগুলি যথাশক্তি উদ্ধার ও তাহা বন্ধনীয় অভ্যন্তরে সন্নিবেশ করিয়া নিম্নলিখিতরূপ পাঠ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এএতু	মাম	
শ্রীবলিভিম		না
রা (য়) ণ	ত্রিপুরা	
শ্রী (হরি) ব	(ল্লভ)	না
রায় (ণ)	বিশ্বা (স)	
	শক ১৬ ৩	

এ স্থলে অঙ্কিত শকাঙ্ক বিশুদ্ধ নহে। ১৪২৩ শকে নির্ম্মিত মন্দিরের গাত্রে ১৬৩ শকের শিলালিপি সংযোজিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। এই প্রস্তরফলকে বলিভীম নারায়ণের নামোল্লেখ আছে। ইনি মহারাজ রামমাণিক্যের শ্যালক এবং তাঁহার সমসাময়িক লোক। রামমাণিক্য ইঁহাকে যুবরাজ উপাধি প্রদানদ্বারা শ্যালক-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন! এই সময় বলিভীমের প্রভাব যে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যুবরাজ উপাধিই ইহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। রামমাণিক্যের শাসনকাল ১৫৯২ হইতে ১৬০৪ শক পর্য্যন্ত। তাঁহার অনুজ্ঞায়, বলিভীমের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই শিলাপট্ট সংযোজিত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। শিলালিপিতে অঙ্কিত '১৬ ৩' স্থলে "১৬০৩" হইবে, এরূপ নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

বলিভীম নারায়ণ

উপরিউক্ত অঙ্ক নির্দ্ধারণ অযথা করা হইতেছে না। সেকালে একাধিক অঙ্কের মধ্যবর্ত্তী (০) শূন্য না লিখিয়া তৎস্থলে ফাঁক রাখিবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আগরতলা উজীর বাড়ির গ্রন্থাগারে ত্রিপুরেশ্বরগণের শাসনকাল নির্দ্দেশক একখানা অতি জীর্ণ কাগজ আছে। তাহাতে '১৫০২' স্থলে '১৫ ২' — '১৬০৭' স্থলে '১৬ ৭' — '১৬০৫' স্থলে '১৬ ৫' লিখিত আছে। প্রথম লহরের পূর্ব্বভাষে ইহার বিবরণ পাওয়া যাইবে। ত্রিপুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব সার্ভে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পরলোকগত চন্দ্রকান্ত বসু মহাশয় ধর্ম্মনগর হইতে একখানা প্রাচীন ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতেও শকাঙ্কের মধ্যবর্ত্তী (০) শূন্য লিখিত নাই, শূন্যের স্থলে কিঞ্চিৎ ফাঁক রাখা হইয়াছে মাত্র। কাছাড় জেলার অন্তর্গত

অঙ্ক পাতের প্রাচীন প্রণালী

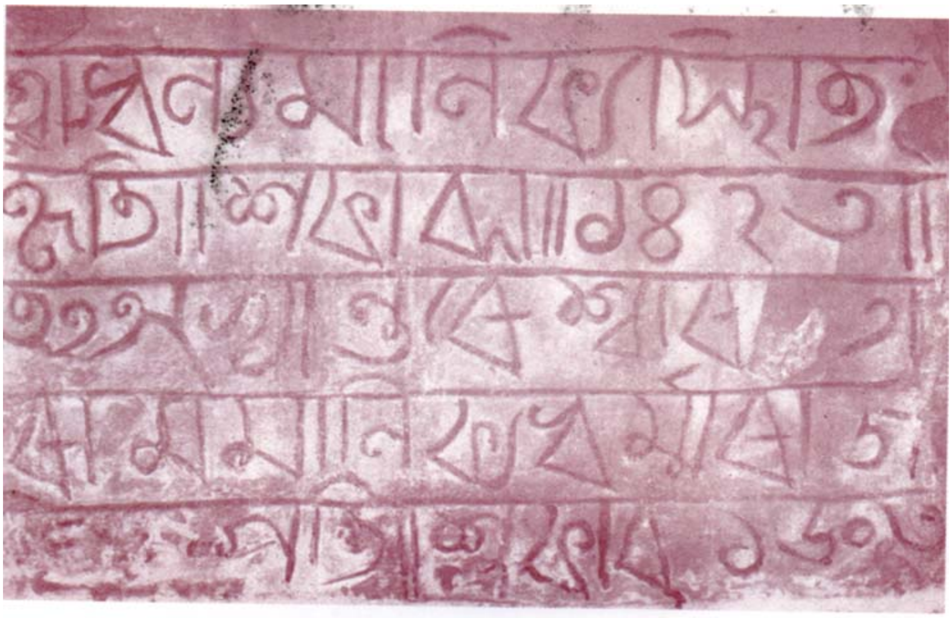

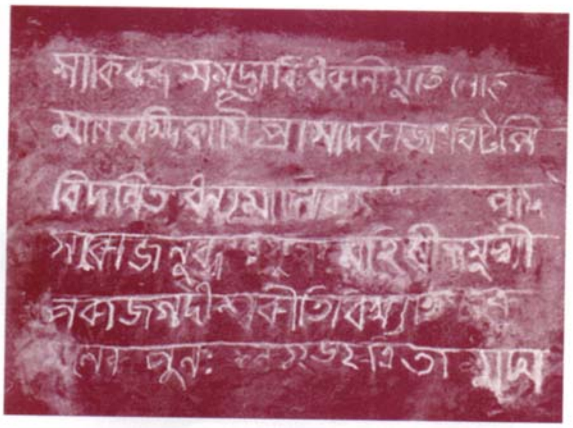

শ্রীশ্রীত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর মন্দির গাত্রস্থ
শিলা লিপি
(৯৯-১০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

হালিয়াকান্দির সন্নিহিত স্থানে যে ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে “শুভমস্তু শকাব্দা ১৪ ৯” অঙ্কিত আছে। ইহা ত্রৈপুর ভূপতির কীর্ত্তি বলিয়া সাধারণের ধারণা। এই ইষ্টকে ১৪০৯ স্থলে শূন্যের স্থান ফাঁক রাখিয়া ১৪ ৯ লিখিত হইয়াছে। * এই সকল অবস্থা, পূর্ব্বোক্ত বিবরণসহ আলোচনা করিলে শকসংখ্যা ‘১৬ ৩’ স্থলে ‘১৬০৩’ হইবে ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থির করা যাইতে পারে। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ শিলালিপি আলোচনাদ্বারাও এই বাক্যের দৃঢ়তা প্রমাণিত হইবে। পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ দ্বিতীয় খণ্ড শিলালিপিতেও রামমাণিক্য কর্ত্তৃক ১৬০৩ শকে মন্দিরের সংস্কার হইবার কথা উল্লেখ আছে; এই লিপির বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদান করা গিয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে সংলগ্ন একখণ্ড শিলালিপির আদর্শ এই ;—

শ্রীধন্যমাণিক্য স্থিতে
কৃতি।। শকাব্দ ১৪২৩।।
তত অভ্যান্তরে শ্রীরণাগণ
রামমাণিক্য ধর্ম্মরাজ
পতি। শকাব্দা ১৬০৩

মন্দিরের প্রথম সংস্কারক রণাগণ নারায়ণ

এবম্বিধ অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট ভাষাদ্বারা কোনরূপ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। শিলাখণ্ডে ধন্যমাণিক্য, রণাগণ, রামমাণিক্য, এই তিনটি নামসহ, ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মাণের কাল ১৪২৩ শকাব্দ, এবং রামমাণিক্য কর্ত্তৃক সংস্কারের কাল ১৬০৩ শকাঙ্ক উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই প্রস্তর ফলক কোন্ সময়ে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই লিপিতে উল্লেখিত রণাগণ নারায়ণ (রঙ্গনারায়ণ) মন্দির নির্ম্মাতা ধন্যমাণিক্যের পরবর্ত্তী, এবং তাহার সংস্কারক রামমাণিক্যের পূর্ববর্ত্তী কালের লোক। ইনি প্রথম উদয়মাণিক্যের (সুবা গোপীপ্রসাদের) ভগিনীপতি ও সেনাপতি ছিলেন। উদয়মাণিক্য ১৪৯৮ শকে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহার পরে, জয়মাণিক্যের সময়ও রণাগণ কিয়ৎকাল জীবিত এবং সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক নিহত হন। শিলালিপিতে রণাগণের নাম সংযোজিত হওয়ায় প্রচীয়মান হয় যে, উদয়মাণিক্যের শাসনকালে, রণাগণ কর্ত্তৃক এই মন্দিরের সংস্কার কার্য্য সমাহিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রস্তরফলকে ইঁহার নাম অঙ্কিত হইবার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। মন্দির নির্ম্মাণের ৭০/৭৫ বৎসর পরে, এই সময় একবার সংস্কার হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ইহাই মন্দিরের প্রথম সংস্কার বলিয়া জানা যাইতেছে।

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — পূর্ব্বাংশ, উপসংহার, ৯৯ পৃষ্ঠা।

মহারাজ কল্যাণমাণিক্য কর্ত্তৃক দ্বিতীয়াবার এই মন্দির সংস্কৃত হইয়াছিল। রাজমালায় কল্যাণমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;—

দ্বিতীয় বারের সংস্কার বিবরণ

"কালিকার মঠ চূড়া মঘে ভাঙ্গি ছিল।
পুনর্ব্বার মহারাজা নির্ম্মাণ করিল।।"

এই সংস্কারের পরিচায়ক কোন শিলালিপি মন্দির গাত্রে নাই। কল্যাণমাণিক্য ১৫৪৭ শকে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ৩৪ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই কাল মধ্যে কোন এক সময়ে, মন্দিরের সংস্কার হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ণিত রণাগণের সংস্কারের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে, কল্যাণমাণিক্য কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কার হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। ইহার অর্দ্ধ শতাব্দী পরে, ১৬০৩ শকে রামমাণিক্য পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়াছিলেন, তদ্বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদান করা হইয়াছে। ইহা তৃতীয় বারের সংস্কার বলিয়া জানা যায়।

তৃতীয় বারের সংস্কার বিবরণ

১৬০৩ শকের পরে ১৭৭৮ শক পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক দেড় শত বৎসরের মধ্যে এই মন্দিরের গাত্রে কাহারও হস্তক্ষেপ হইবার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দে (১৭৭৯ শকে) মহারাণী সুমিত্রা জগদীশ্বরী * কর্ত্তৃক এই মন্দির পুনঃ সংস্কৃত হইবার প্রমাণ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ দ্বিতীয় লিপালিপি আলোচনায় পাওয়া যায়। উক্ত লিপি নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

মহারাণী সুমিত্রা মহাদেবী কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কার

শাকে র × সমুদ্রারি ধরণিযুতে লোক
মাত্রেহম্বিকায়ৈ প্রাসাদরাজং বিটপি
বিদলিতং ধন্যমাণিক্য পাদ
সরোদজ লুব্ধ মধুপা মহিষীন্দুমুখী
পরা জগদীশ্বরীতি বিখ্যাত চক্রে
মনোজ্ঞং পুনঃ সন ১২৬৭ ত্রি তা মাঘ †

মর্ম্ম ঃ— ১৬ ৭ (?) শকে, বৃক্ষদ্বারা বিদারিত ধন্যমাণিক্য (দত্ত ?) এই উৎকৃষ্ট প্রাসাদ (কালী ?) পাদপদ্মে লুব্ধ মধুপ স্বরূপা অন্য ইন্দুমতী তুল্যা জগদীশ্বরী উপাধি ভূষিতা রাজমহিষী লোক মাতা অম্বিকার প্রীতির জন্য পুনর্ব্বার মনোজ্ঞ করেন।

এই লিপির শকাঙ্ক বুঝা যায় না। ১২৬৭ ত্রিপুরাব্দের স্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, শকাঙ্ক ১৭৭৯ নির্দ্ধারণ করিবার সুবিধা ঘটিয়াছে।

---

* ইনি মহারাজ দুর্গামাণিক্যের মহিষী। ত্রিপুরার মহারাণীগণ সাধারণতঃ 'মহারাণী' ও 'ঈশ্বরী' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। ইনি 'জগদীশ্বরী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

† এই লিপি বিশুদ্ধ নহে। রচয়িতা সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন না।

ইহার পর ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৮২৬ শকে) মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য পুনর্ব্বার মন্দিরের সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই সংস্কারের নিদর্শনস্বরূপ কোন শিলালিপি রক্ষিত হয় নাই, সুতরাং ভবিষ্যৎকালে এই সংস্কারের কথা বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কার

এই মন্দির ১৪২৩ শকে নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা চারি শত বৎসরের কিছু অধিক কালের প্রাচীনকীর্ত্তি।

মন্দিরের প্রাচীনত্ব

ধন্যমাণিক্য এই মহাপীঠের ভৈরব লিঙ্গ এবং তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালক্রমে সেই মন্দির বিনষ্ট হওয়ায়, কল্যাণমাণিক্য পুনর্ব্বার নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করেন; ইহার বিবরণ যথাস্থানে পাওয়া যাইবে।

ভৈরবের মন্দির

উদয়পুরস্থ সুবিশাল ধন্যসাগর মহারাজ ধন্যমাণিক্যের ধর্ম্মশীলতার অন্যতম পরিচায়ক। এই বিশাল বাপী দৈর্ঘ্যে ১০০০ গজ ও প্রস্থে ২৭০ গজ। ইহার গর্ভে ৮ ৮৩ কাণি ভূমি পতিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মঠ ব্যতীত উদয়পুরে ধন্যমাণিক্যের নির্ম্মিত আরও কতিপয় মঠ এবং মন্দির আছে। তিনি স্বীয় পিতার এবং ভ্রাতার শ্মশানে মঠ নির্ম্মাণ করাইবারও প্রমাণ পাওয়া যায়। * বরদাখাত পরগণায় ইঁহার এক দীর্ঘিকা আছে।

ধন্যমাণিক্যের অন্যান্য কীর্ত্তি

ধন্যমাণিক্যের মহিষী মহারাণী কমলা মহাদেবী পুণ্যবতী এবং দানশীলা ছিলেন। তাঁহার খনিত কমলাসাগর, কসবার সন্নিহিত কালিকা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে বিরাজমান থাকিয়া অদ্যাপি মহারাণীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। এই সরোবরের জল সুনির্ম্মল এবং স্বাস্থ্যকর বলিয়া বিখ্যাত। এতদ্ব্যতীত উদয়পুরেও দ্বিতীয় কমলাসাগরের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

মহারাণী কমলা মহাদেবীর কীর্ত্তি

মহারাজ দেবমাণিক্য লক্ষ্মীনারায়ণ নামক জনৈক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া, তন্ত্রসম্মত শ্মশান-সাধন ইত্যাদি কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, এবং সেই অন্ধ বিশ্বাসই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ইনি স্বীয় গুরুর নামানুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র স্থাপিত করেন। এই বিগ্রহ অদ্যাপি ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতারূপে সযত্নে পূজিত হইতেছেন। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে ত্রিপুর বংশাবলীতে লিখিত আছে, —

দেবমাণিক্যের ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

"লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র স্থাপন করিল।
আপনার ইষ্টসাধন মহারাজ করিল।।" ইত্যাদি।

---

* "আর এক মঠ দিল অতি মনোহর।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধর্ম্মমাণিক্য উপর।।
আর এক মঠ দিল পিতার উপর।
লিখিলেক শ্লোক তাথে দিয়া শ্বেত পাথর।।"
ত্রিপুর বংশাবলী।

ইনি পুরীধামে যাইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন এবং জগন্নাথকে বহু মূল্যবান এক চূড়া অর্পন করিয়াছিলেন।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও পঞ্চদ্রোণা

মহারাজ বিজয়মাণিক্য পুণ্য সঞ্চয়কল্পে, ব্রহ্মপুত্র তীর্থে স্নান, দান ও তথায় ধ্বজা রোপণ করিয়াছিলেন। ইনি বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণায় ব্রাহ্মণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান করেন; এই দান হইতে উক্ত স্থানের নাম 'পঞ্চদ্রোণা' বা 'পাঁচদোণা' হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি ভূমি দান, তুলাপুরুষ, কল্পতরু, জলাশয় খনন, দেবতা স্থাপন ইত্যাদি বহুবিধ কর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। উদয়পুরস্থ বিজয়সাগর ইঁহার সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। এই দীর্ঘিকার দৈর্ঘ্য ৩৮২ গজ ও প্রস্থ ২৩৭ গজ। কিঞ্চিদধিক ২।। কাণি ভূমি লইয়া এই জলাশয় খনিত হইয়াছে। ইনি হীরাপুরে (উদয়পুরের সন্নিকটে) এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া হীরা গোপীনাথ নামক শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিজয়মাণিক্যের তাম্রশাসন

বিজয়মাণিক্য বিশেষ ধার্ম্মিক, ততোধিক বীর ছিলেন। তিনি ধর্ম্মসাধনকালেও শূরত্বের গৌরব বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এই মহাপুরুষ পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাম্রফলকদ্বারা ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন। সেই তাম্রশাসনের ভাষাই তাঁহার বীর-দর্পের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। উক্ত শাসনের কিয়দংশ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"ধন্যমাণিক্য ভূপালো বহুভির্ভুবি দুর্ল্লভঃ।
তৎসুতো দেবমাণিক্যস্তৎসুতো বিজয়স্মৃতঃ।।
রাজা রাজ শিরোরত্ন নিঘৃষ্ট চরণাম্বুজঃ।
শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্যোরাজা রাজভি রাজতে।।"

এই শ্লোক আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, ধর্ম্মোদ্দেশ্যে ভূমি দানকালেও মহারাজ বিজয়, নৃপতিবৃন্দের শিরোরত্ন চরণে ঘর্ষণ করিবার গর্ব্ব পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন নাই। এ স্থলে শূরত্বের ছায়াপাতে, ধর্ম্মভাব কথঞ্চিৎ ম্লান হইয়া থাকিলেও সেকালে ধর্ম্মসাধন অপেক্ষা ক্ষাত্রবীর্য্যের মর্য্যাদা কম ছিল না, তাম্রফলক আলোচনায় ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে, তাহা পরে বলা হইবে।

উদয়মাণিক্যের ধর্ম্ম কার্য্যানুষ্ঠান

বিজয়মাণিক্যের পুত্র অনন্তমাণিক্যের ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কোন্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইঁহার শ্বশুর ও সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক গোপীপ্রসাদ রাজ্যলোভে জামাতাকে বধ করিয়া, উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া সেই মঠে "চন্দ্র গোপীনাথ" মূর্ত্তি স্থাপন করেন। উদয়পুরের "চন্দ্রসাগর" নামক সুবিস্তীর্ণ সরোবর ইঁহারই কীর্ত্তি। এই সরোবর দীর্ঘে ৫০৫ গজ, প্রস্থে ২৬১ গজ। কিঞ্চিদধিক ৪।০ কাণি ভূমি জুড়িয়া এই বৃহৎ জলাশয় বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইনি ধর্ম্মোদ্দেশ্যে নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকিলেও ধার্ম্মিক ছিলেন না ;

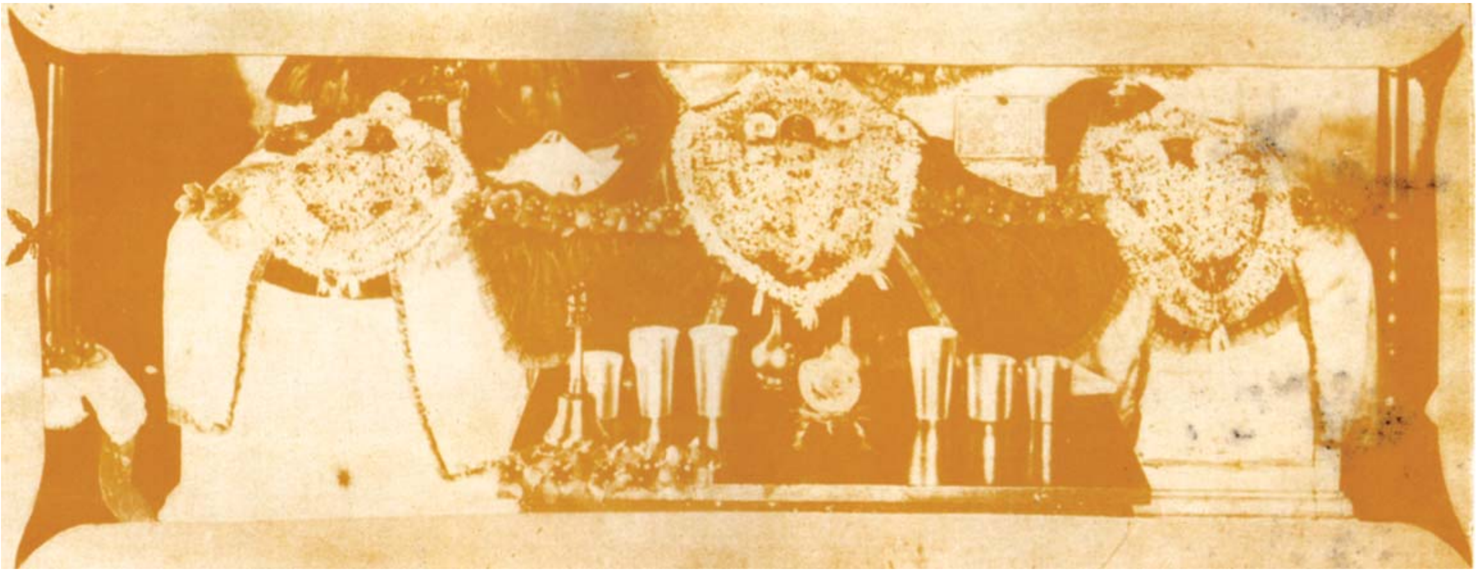

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ।

বরং অধার্ম্মিক, কদাচারী এবং বিশ্বাসঘাতক ছিলেন বলিয়াই রাজমালা আলোচনায় জানা যায়।

উদয়মাণিক্যের পরলোকগমনের পর, তৎপুত্র লোকতরফা, জয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক কিয়ৎকাল রাজ্যশাসন করিয়া, অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক নিহত হন। ইনি কোনরূপ ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

ধর্ম্মমতের সারতত্ত্ব

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে বর্ণিত ভূপতিবৃন্দ কুলাগত প্রথানুসারে শিব, শক্তি এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। কোন কোন নরপতি তান্ত্রিক মতে আস্থাবান ছিলেন। ধন্যমাণিক্য, পাঠান বিজয় কামনায় স্বীয় গুরুদ্বারা তান্ত্রিক অভিচার কার্য্য করাইয়াছিলেন। ইনি ভক্তি-প্রণোদিত চিত্তে সুবর্ণময়ী ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা এবং পীঠস্থানে ত্রিপুরাসুন্দরী বিগ্রহ ও ভৈরবলিঙ্গ স্থাপনদ্বারা শাক্ত এবং শৈবমতে আস্তিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দেবমাণিক্য লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মিথিলাবাসী জনৈক সিদ্ধপুরুষের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বীরভাবে চক্র-সাধন ও শ্মশান-সাধন ইত্যাদি যোগানুষ্ঠান করিবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইনি স্বীয় গুরুর নামানুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এই বিগ্রহ ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। * মোটের উপর এই সময় ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ শিব, শক্তি এবং বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন, কিন্তু শৈব মতই অধিকতর প্রবল ছিল ; রাজমালা আলোচনায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

বলিদানের প্রথা

দেবার্চ্চনায় বলিদান, ত্রিপুর রাজবংশের চিরাচরিত প্রথা। শাস্ত্রানুসারে দেবতার নামে যাহা উৎসর্গ করা হয়, তাহাই বলি পদবাচ্য। এতদ্ব্যতীত, মনুষ্য, পশু, যক্ষ, প্রেত, পিশাচ, পিপীলিকা, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যে আহার্য্য প্রদান করা হয়, তাহাও বলি মধ্যে পরিগণিত। জীব বলির ব্যবস্থাও শাস্ত্রে আছে। কালিকাপুরাণের মতে, পক্ষী, কচ্ছপ, মৎস্য, মৃগ, মহিষ, ছাগ, মেষ, শূকর, কৃষ্ণসার, গোধিকা, শরভ, সিংহ, শার্দ্দুল, মনুষ্য ইত্যাদি প্রাণী

---

* 'ত্রিপুর বংশাবলী' পুস্তিকায় দেবমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

"মিথিলা নগরবাসী দ্বিজ একজন।
ত্রিপুর রাজ্যেতে আসি উপস্থিত হন।।
লক্ষ্মীনারায়ণ দ্বিজের নামকরণ ছিল।
দেবমাণিক্য স্থানে উপস্থিত হইল।।
* * * *
মহাজ্ঞান শিখিবারে রাজার ইচ্ছা হৈল।
গুরু স্বীকার করি রাজা দীক্ষিত হৈল।।
* * * *
গুরু নামে বিগ্রহ স্থাপন করিয়া।।
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র স্থাপন করিল।
আপনার ইষ্ট সাধন রাজায় করিল।।"

এবং স্বীয় গাত্রের রুধির বলিদান প্রশস্ত। এতদ্ব্যতীত কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু এবং মদ্যও বলি মধ্যে পরিগণিত। উক্ত পুরাণের মত নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

"পক্ষিণঃ কচ্ছপগ্রাহা বরাহাশ্ছাগলাস্তথা।
মহিষো গোধিকা শাল্লস্তথা নববিধা মৃগাঃ।।
চামরঃ কৃষ্ণসারশ্চ যমঃ পঞ্চানন স্তথা।
মৎস্যাঃ স্বগাত্র রুধিরং চোষ্টকা বলয়ো মতাঃ।।
অভাবে চ তথৈ বৈষাং কদাচিদ্ধয়হস্তিনৌ।
ছাগলঃ শরভশ্চৈব নরশ্চৈব যথাক্রমাৎ।।
বলির্মহাবলিরতিবলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।" ইত্যাদি।

কালিকাপুরাণ, — ৫৬ অঃ।

নরবলি

ত্রিপুর রাজ্যে সাধারণতঃ ছাগ, মেষ, মহিষ, গবয়, কচ্ছপ, হংস, পারাবত এবং হংস ডিম্ব বলি প্রদান করা হয়। উক্ত রাজ্যে যত নরবলি হইয়াছে, এত অধিক সংখ্যক বলি ভারতের অন্য কোন স্থানে হয় নাই। * এই রাজ্যে নরবলি সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান সকল স্থলেই যথাযথ প্রতিপালিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কি রকমের মনুষ্য বলির যোগ্য, শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা ;—

"পিতৃ মাতৃ বিহীনঞ্চ যুবকং ব্যাধি বর্জ্জিতম্।
বিবাহিতং দীক্ষিতঞ্চ পরদার বিহীনকম্।।
অজারিকং বিশুদ্ধঞ্চ সচ্ছুদ্রং মূলকং বরম্।
তদ্বন্ধুভ্যো ধনং দত্ত্বা ক্রীতং মূল্যাতিরেকতঃ।।"

দুর্গোৎসব তত্ত্ব।

বলির নিমিত্ত মনুষ্য সংগ্রহ ও 'মৈছিলী' সম্প্রদায়

এ স্থলে পিতৃমাতৃহীন ব্যাধি বর্জ্জিত, দীক্ষিত ও বিবাহিত শূদ্র-যুবক বলির যোগ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাকে অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে হইবে। ত্রিপুরায়, মনুষ্য ক্রয় করিয়া বলি দেওয়ার প্রথা না ছিল এমন নহে, কিন্তু জাতির বিচার করা হইত বলিয়া মনে হয় না। মহারাজ ধন্যমাণিক্য চণ্ডাল বলিদ্বারা অভিচার কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন। এক সম্প্রদায়ের লোক, বলির মনুষ্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত ছিল, তাহারা স্থানীয় ভাষায় 'মৈছিলী' বা 'মছ্লু' নামে অভিহিত হইত। এই উপায়ে সংগৃহীত লোক ব্যতীত যুদ্ধে ধৃত প্রতিপক্ষ এবং স্বপক্ষের বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে দেবতা সমক্ষে বলি প্রদানের ব্যবস্থা ছিল ; এই স্থলে জাতি বিচার করা হইত না। মহারাজ বিজয়মাণিক্য,

* ত্রিপুর রাজ্যের নরবলি সম্বন্ধে Rev. James Long সাহেব বলিয়াছেন ;—

"Human Sacrifices prevailed at an early period in Tripura, and even of the late years strong suspicions have been entertained of the practice being occasionally observed at the shrine of Kamakhya in Assam, and at Kalighat in Calcutta. But in no part of India were more human victims offered than in Tripura which appears to have been one of the strongest holds of Hinduism."

J. A. S. B. — Vol. XIX.

স্বীয় সৈনিক বিভাগের এক সহস্র বিদ্রোহী পাঠান অশ্বারোহীসহ বিস্তর পাঠান সৈন্য চতুর্দ্দশ দেবতার সমক্ষে বলিদান করিয়াছিলেন। * এবং গৌড়ের পরাজিত পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁ লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধাবস্থায় রাজদরবারে নীত হইলে, তাঁহাকেও চতুর্দ্দশ দেবতার সদনে বলি দেওয়া হইয়াছিল। বিজিত শত্রু ধরা পড়িলেই তাহার উত্তপ্ত শোণিতে চতুর্দ্দশ দেবতার এবং ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির-প্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইত।

শত্রু বলি

শাস্ত্রে শত্রু বলির বিধান আছে, তাহা জীবন্ত শত্রু নহে ; ক্ষীরদ্বারা নির্ম্মিত পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া সেই পুতুলকে বলি প্রদান করা হয়। † ত্রিপুরেশ্বরগণ জীবন্ত শত্রু বলিদ্বারা শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। সমরক্ষেত্রে ধৃত প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু হস্তগত থাকা অবস্থায় ক্ষীরের পুতুল ছেদন করিয়া শত্রু বলির ক্ষোভ মিটাইবেন কেন? শব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কেহ কুশ-পুত্তল দাহের ব্যবস্থা করে না।

নরবলির সংখ্যা নির্দ্ধারণ

ত্রিপুর রাজ্যে নরবলির সীমা সংখ্যা ছিল না। মহারাজ ধন্যমাণিক্য তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া, লোকসমাজের বিস্তর হিত সাধন করিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"পূর্ব্বেতে ত্রিপুর রাজা নরবলি দিত।
সহস্রে সহস্রে বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত।।
শ্রীধন্যমাণিক্য মানা তাহাকে করিল।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল।।
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দ্দশদেবে।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে।।
দৌচা পাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয়।
গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময়।।
ইহাতে অধিক বলি মানা কর রাজা।
তদবধি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য প্রজা।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড, — ২৯ পৃঃ।

---

* "সহস্র সোয়ার কর্ত্তা পাঠান বিস্তর।
চতুর্দ্দশ দেবতারে দিল নরেশ্বর।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

† শত্রু বলি সম্বন্ধীয় শাস্ত্রের ব্যবস্থা নিম্নে প্রদান করা হইল ;—
"ততঃ শত্রু বলিং রাজা দদ্যাৎ ক্ষীরেন নির্ম্মিতম্।
স্বয়ং বিন্দ্যাৎ ক্রোধ দৃষ্টা প্রহার জনকেন চ।।
কোপেন বধকৃদ্দেবি সত্যং সত্যং মহেশ্বরি।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃত্বা বৈ শত্রুনাম্না মহেশ্বরি।।
শত্রুক্ষয়ো মহেশানি ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।।"
বৃহন্নীল তন্ত্র।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক রাজার অন্ধ-বিশ্বাস ছিল। মহারাজ দেবমাণিক্য স্বীয় গুরু লক্ষ্মীনারায়ণের প্ররোচনায় দেবতার দর্শন লাভের প্রত্যাশায় ক্রমান্বয়ে আট জন সেনাপতিকে শ্মশানে নিয়া বলিদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে এই অন্ধ-বিশ্বাসই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

ধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাস

ত্রিপুরেশ্বরগণের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে, তাহার সম্যক আলোচনা এ স্থলে অসম্ভব। এক কথায় বলিতে গেলে রাজগণ চিরকালই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের পোষক এবং সংরক্ষক ছিলেন। রাজমহিষীগণ ধর্ম্মোদ্দেশ্যে জীবন দান করিতেও কুণ্ঠিতা ছিলেন না, সহমরণের আধিক্যই এ কথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। রাজাই প্রকৃতিপুঞ্জের আদর্শ, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রজাগণ রাজার আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান কালেও তাহাই করিয়া থাকে। সে কালে ত্রিপুর রাজ্যে, রাজানুশাসনের ফলে ধার্ম্মিকের সংখ্যা অধিক ছিল, এবং ধর্ম্মসাধন তাহাদের জীবনের প্রধান ব্রত বলিয়া গণ্য হইত, রাজমালায় এ কথার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

রাজানুশাসনে ধর্ম্মের পুষ্টি বিধান

এইরূপ অবস্থায়ও সে কালে দেশে অধার্ম্মিক লোক না ছিল এমন নহে। রাজমালায় পাওয়া যায়, সে কালে কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার সময় হরিবংশ গ্রন্থ, এবং শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করা হইত। ইহা ধর্ম্মের প্রতি অটল বিশ্বাসের পরিচায়ক। কোন কোন পাপাশয় ব্যক্তি এরূপভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও সেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সেনাপতি গোপীপ্রসাদই এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। তিনি জামাতার মঙ্গল সাধনার্থ শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াও, পরিশেষে রাজ্যলোভে জামাতার বধ সাধন এবং স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গের পাপ অর্জ্জন এবং ধর্ম্মের গ্লানি করিয়াছিলেন।

তীর্থস্থানের বিবরণ।

ত্রিপুর রাজ্যে কতিপয় তীর্থস্থান আছে ; তন্মধ্যে উদয়পুরস্থ (মহাপীঠ), ঊনকোটী তীর্থ, ডম্বুর বা ডুঙ্গু তীর্থ এবং ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাপীঠের বিবরণ প্রথম লহরের টীকায় বর্ণিত হইয়াছে। রাজমালা দ্বিতীয় লহরে যে সকল তীর্থের নামোল্লেখ আছে, তাহার বিবরণ নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

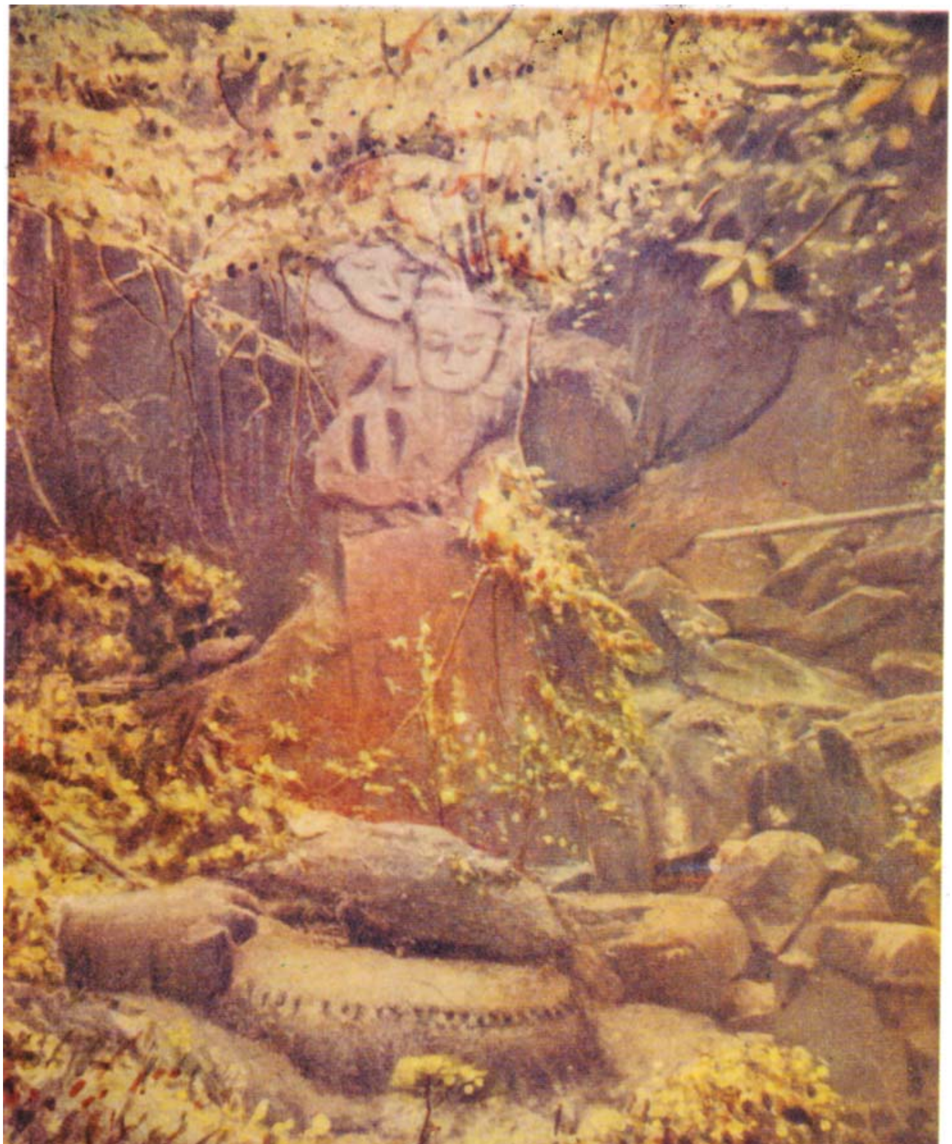

(পর্ব্বত গাত্রস্থ প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ)
ঊনকোটী তীর্থ-কৈলাসহর।

তীর্থমুখ।
ঊনকোটী তীর্থ-কৈলাসহর।

ঊনকোটী তীর্থ।

এই স্থান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত এবং কৈলাসহর বিভাগীয় অফিস হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত। এই পর্ব্বত ঊনকোটী শৈলের একটী শৃঙ্গ। এই স্থানে যাইবার পথ দুর্গম হইলেও অতি মনোরম। অধিকাংশ স্থলে ক্ষীণ-সলিলা পর্ব্বত-নির্ঝরিণীর মধ্য দিয়া চলিতে হয়, মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতে আরোহণ এবং অবরোহণেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই নির্ঝরিণীর উপরিভাগ বৃক্ষ এবং পর্ব্বতজাত বাঁশের পাতায় সমাচ্ছন্ন থাকায়, সমগ্র পথ প্রকৃতির নিভৃত রম্যকুঞ্জে পরিণত হইয়াছে! এই রাস্তাটী আমাদের পরিচিত। কৈলাসহরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর স্বর্গীয় হেমকুমার চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সুগম আর একটী রাস্তা নির্ম্মিত হইবার কথা শুনিয়াছি, সেই পথ অদ্যাপি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ঊনকোটি তীর্থের পথ

ঊনকোটী একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। কতকাল যাবত এই স্থান পবিত্রক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, বহু প্রাচীনকালে বিমারের পুত্র মহারাজ কুমার এই তীর্থে যাইয়া শিবারাধনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বিজয়মাণিক্য ঊনকোটী তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। * তৎপর মহারাজ অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর দেবের ঊনকোটীতে যাইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাও কিঞ্চিদধিক তিন শত বৎসরের কথা। † ‘ঊনকোটী মহাত্ম্য’ নামক হস্তলিখিত পুস্তিকা আলোচনা করিলে এই তীর্থের প্রাচীনত্বের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

ঊনকোটি তীর্থের প্রাচীনত্ব

“বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভূতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।
দক্ষিণস্যাং নদস্যাস্য পুণ্যা মনুনদীস্মৃতা।।

---

* “কতদিন পরে রাজা ঊনকোটী গেল
এক ঊনকোটি লিঙ্গ তথাতে দেখিল।।”
বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

† “রাজধর চলিল দুলালীগ্রাম পথে।
ইটাগ্রাম হৈয়া চলে ঊনকোটি তীর্থে।।
স্নান দান করে তথা রাজধর নারায়ণ।
উদয়পুর চলিলেক করি শুভক্ষণ।।”
অমরমাণিক্য খণ্ড।

অতঃপর মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দে এই তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, তাহা ২০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। অল্পকাল পূর্ব্বে, পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরও এই তীর্থ দর্শন করিয়াছেন।

অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটিগিরির্মহান্।
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলোমুনিঃ।।
তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।।"

— ঊনকোটি তীর্থমাহাত্ম্য।

উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা জানা যায়, বিন্ধ্যশৈলের পাদদেশোৎপন্ন পুণ্যপ্রদ বরবক্র (বরাক) নদের দক্ষিণে পুণ্য-সলিলা মনুনদী প্রবাহিতা হইতেছে। এই বরবক্র ও মনুনদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঊনকোটী পর্ব্বত অবস্থিত। পূর্ব্বে মহর্ষি কপিল উক্ত পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। কপিল তীর্থ তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে এবং মানবগণের সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক কপিল স্থাপিত শিবলিঙ্গ সেই স্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন। কথিত ঊনকোটি তীর্থ, বরবক্র এবং মনুনদীর মধ্যবর্ত্তী ঊনকোটি পর্ব্বতেরই অংশ বিশেষ। এই স্থান মনুনদীর অতি সন্নিহিত ছিল, কালক্রমে এই নদী পথান্তর অবলম্বন করায়, বর্ত্তমান সময়ে কিছু দূরবর্ত্তী হইয়াছে।

কপিল মুনির বিবরণ

এই তীর্থের প্রকাশক বা সংস্থাপক মহর্ষি কপিল অতি প্রাচীন কালের যোগীপুরুষ। উপনিষদে ইঁহার নাম পাওয়া যায় ; যথা ;—

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈবিভর্ত্তি।"

শ্বেতাশ্বতর — ৫। ২।

মর্ম্ম ঃ— "প্রসূত কপিল ঋষিকে যিনি সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞান দ্বারা পোষণ করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়ও ইঁহার নাম আছে। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, — আমি, —

"গন্ধর্ব্বানাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ।"

গীতা — ১০। ২৬।

মর্ম্ম ঃ— "আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলমুনি।"

শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতার, মহামুনি কর্দ্দমের ঔরসে, দেবহুতির গর্ব্তে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সাঙ্খ্য দর্শন প্রণেতা ; এবং ইঁহারই কোপানলে সগরবংশ ধ্বংস হইয়াছিল। ইঁহার দ্বারা সংস্থাপিত ঊনকোটি তীর্থ যে অতি প্রাচীন, তদ্বিষয়ে কোন কথা বলিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না; তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, স্থানের অবস্থা, প্রস্তরময় পর্ব্বতগাত্রে অঙ্কিত অসংখ্য দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং পর্ব্বতের সানুদেশে অবস্থিত প্রস্তর-মূর্ত্তি সমূহের বিষয় আলোচনা করিলে এই তীর্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কপিলাশ্রম

কপিল মুনি এক স্থানে বসিয়া তপস্যা করেন নাই। হরিদ্বারে, গঙ্গার সাগরসঙ্গম স্থানের সন্নিহিত সাগর দ্বীপে এবং আসামে, বদরপুরের নিকটবর্ত্তী বরবক্র নদীর তীরে কপিলাশ্রম থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালেও আসামের কপিলাশ্রমে সিদ্ধেশ্বর শিব বিরাজমান রহিয়াছেন। এই স্থানও ঊনকোটি পর্ব্বতের অন্তর্ভুক্ত এবং

'কপিল-তীর্থ' নামে পরিচিত। * শাস্ত্র গ্রন্থেও এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় ;—

"যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিল মুনিঃ।
যত্র বৈ কপিল তীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরো হরিঃ।।"

বায়ু পুরাণ।

মহর্ষি মনু

অতঃপর এখানে আর এক মহর্ষির আবির্ভাব হইয়াছিল। সংস্কৃত রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"পুরাকৃত যুগে রাজন্ মনুনা পূজিত শিবঃ।
তত্রৈব বিরলে স্থানে মনু নাম নদীতটে।।"

সংস্কৃত রাজমালাধৃত যোগীনীতন্ত্র বচনং।

রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি।
মনুরাজ সত্যযুগে পূজিছিল অতি।।
মনু নদী তীরে মনু বহু তপ কৈল।
তদবধি মনু নদী পুণ্যনদী হৈল।।"

মহর্ষি মনু, মনু নদীর তীরে শিব আরাধনায় নিযুক্ত থাকিবার কথা উদ্ধৃত বচনদ্বারা জানা যাইতেছে। উক্ত নদীর তীরে, ঊনকোটি তীর্থ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত নাই এবং পুরাকালে থাকিবার কথাও জানা যায় না। সুতরাং এই ঊনকোটীতেই কপিল মুনির স্থাপিত শিবলিঙ্গ মহর্ষি মনু কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছিল, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। 'মনু' নামের সহিত 'রাজন' বা 'রাজ' শব্দ সংযোজিত হওয়ায় কেহ কেহ অনুমান করেন, ইনি মহর্ষি মনু নহেন, মনু নামক কোন রাজা ছিলেন। চতুর্দ্দশ মনুর প্রত্যেকেই প্রজাপতি এবং

---

* ইতিপূর্ব্বে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে ;—

"বিন্ধ্যাদ্রেঃ পাদসম্ভুতো বরবক্রঃ সুপুণ্যদঃ।
দক্ষিণস্যাং নদস্যাস্য পুণ্যা মনু নদীস্মৃতা।।
অনয়োরন্তরা রাজন্ ঊনকোটি গিরিমহান্।
যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলোমুনিঃ।।
তত্র বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম্।
লিঙ্গঞ্চ কপিলং তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্।।"

ঊনকোটী তীর্থমাহাত্ম্য।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, কৈলাসহর হইতে কাছাড়ের পশ্চিম ভাগস্থ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত ঊনকোটি শৈলের অন্তর্গত, এবং এই সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশ কপিল তীর্থ নামে অভিহিত। আমাদের কথিত ঊনকোটি তীর্থ এবং আসামের কপিলাশ্রম, এতদুভয় স্থান এই সীমা মধ্যে অবস্থিত।

মন্বন্তরের প্রথম রাজা, এ কথা বোধহয় তাঁহারা ভাবেন নাই। মনু একাধারে রাজা এবং মহর্ষি এ জন্যই মনু নামের সহিত 'রাজন্' বিশেষণ যুক্ত হইয়াছে।

বরবক্র ও মনু নদীর মাহাত্ম্য

শাস্ত্রালোচনায় জানা যায়, কপিল এবং মনু ঊনকোটী শৈলকে পবিত্র স্থান জানিয়াই সেই স্থানে আশ্রম করিয়াছিলেন। এই শৈলের পার্শ্ববর্ত্তী বরবক্র নদ ও তাহার দক্ষিণদিকে প্রবাহিতা মনু নদী পুণ্যপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বরবক্র সম্বন্ধে পাওয়া যায় ;—

"বিন্ধ্যপাদ সমুদ্ভূতো বরবক্র সুপুণ্যদঃ।
যত্র স্নাত্বা জলং পিত্বা নরঃ সদগতিমাপ্নুয়াৎ।।
যজ্জলে মনুজব্যাঘ্র মনুজো মৃত এ বহি।
তৎক্ষণাদেব স স্বর্গং যাতি সূর্য্যপথেন চ।।
প্রাচ্যদেশে মৃতোজন্তু নরকং প্রতিপদ্যতে।
যাবদ্বর্ষ সহস্রানি যজ্জলেত্বমৃতো ভবেৎ।।
যস্যৈবং নদরাজস্য বক্রে বক্রে চ পুণ্যদঃ।
তীর্থঃ প্রসস্তঃ বিখ্যাতঃ বরবক্রস্ততঃ স্মৃতঃ।।"
বায়ু পুরাণ।

মনু নদী সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

"সমুদ্রস্যোত্তরে দেশে ততো মনু নদী স্মৃতঃ।
যং গত্বাপি মহারাজন্ পিত্বা পানীয়মুত্তমং।।
মনু নদ্যাং মহারাজ বরবক্রেন সঙ্গমং।
তত্র স্নাত্বা নরোযাতি চন্দ্রলোকং মনুত্তমং।।"
বায়ু পুরাণ।

মনু নদী এবং মনু ও বরবক্রের সঙ্গম স্থান বিশেষ পুণ্যপদ বলিয়া শাস্ত্রকার উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা ঘোষণা করিয়াছেন।

ঊনকোটী তীর্থ মাহাত্ম্য

অতঃপর ঊনকোটী মাহাত্ম্য বিষয়ক দুই একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। বারাহীতন্ত্রে, পীঠ নির্ণয় প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে ;—

"ঊনকোটী পীঠ মধ্যে প্রধানং তানি শঙ্কর।
একান্ত দেবতাঃ সর্ব্বাঃ এবান্ত দশ ভৈরবাঃ।।
মনোরমোত্তর ভাগে উচ্চ ভূমিং প্রদৃশ্যতে।
তত্র কোটীশ্বরং লিঙ্গং একোনং স্বর্গমাপ্নুয়াৎ।।
তত্রা মৃতঞ্চ কুণ্ডঞ্চ নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা।
স্নাত্বা পিত্বা চ যো ভক্ত্যা তুল্যং বৈ মণিকর্ণিকা।।
শ্রাদ্ধঞ্চ তর্পণঞ্চৈব দর্শনং স্পর্শমেব চ।
তত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবানাং সর্ব্বতীর্থ ফলং লভেৎ।।
* * * *
তত্রোনকোটী সংলিঙ্গং লিঙ্গ কাশীং বিরাজতে।।

মাঘাদি মাসষট্‌কেষু অক্ষয়া যদি লভ্যতে।
তদ্দিনে চ মহাদেব সর্ব্বতীর্থং ফলং লভেৎ।।"
বারাহীতন্ত্র।

বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

"চৈত্র মাসি সিতাষ্টম্যাং অক্ষয়া যদি লভ্যতে।
তদ্দিনে চ মহাপুণ্যং পুণ্যাৎপুণ্যতরৌ স্মৃতৌ।।
অমৃতস্য প্রুতির্যত্র সাক্ষাৎ দেব জনার্দ্দন।
সর্ব্বপাপ হরেৎ স্নাত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।।"　　ইত্যাদি।

এই তীর্থের মাহাত্ম্য সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা আছে, এ স্থলে সম্যক আলোচনা করিবার সুবিধা ঘটিল না। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথিতে এবং অশোকাষ্টমীতে এই তীর্থে মহামেলা হইয়া থাকে; এবং নানাস্থান হইতে সমাগত যাত্রিগণ উক্ত মেলাদ্বয়ে সমবেত হইয়া স্নানাদি করে। তৎকালে এই তীর্থে চারি পাঁচ সহস্র লোকের সমাগম হয়। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বদাই সাধু সন্ন্যাসিগণ এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

ক্রমান্বয়ে চারিবার এই তীর্থদর্শন ভাগ্যে ঘটিয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের গমনকালে তাঁহার সঙ্গেই প্রথম দর্শন লাভ হয়। তৎপর যে তিনবার গিয়াছি, তখন দেখিয়াছি, এই অল্পকালের মধ্যেই তথাকার অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্রমশঃ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে এই সকল মূর্ত্তির বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মূর্ত্তিগুলির কতক প্রস্তরময় পর্ব্বত গাত্রে খোদিত এবং কতক প্রস্তর ফলক কর্ত্তনদ্বারা নির্ম্মিত। ত্রিপুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর মহোদয়, ১৩০২ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯২ খৃঃ) এই স্থানে ঊনকোটীশ্বর শিব, হরগৌরী, বিষ্ণুপদ, কালভৈরব, বাসুদেব, রাক্ষস ও রাক্ষসী মূর্ত্তি, হনুমান, পঞ্চমুখ শিব, গণপতি, লক্ষ্মী, রাবণ, রাম-লক্ষ্মণ, শিবলিঙ্গ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। অস্পষ্ট অঙ্কন দৃষ্টে অধিকাংশ মূর্ত্তির পরিচয় সংগ্রহ পক্ষে তিনি অসমর্থ হইয়াছিলেন।

ঊনকোটী তীর্থ দর্শন

আমাদের প্রথম দর্শনকালে এই সকল মূর্ত্তির অধিকাংশই বিদ্যমান ছিল, পরবর্ত্তী কালে দেখা গিয়াছে, তাহার অনেকটা ধ্বংস হইয়াছে। পর্ব্বতশৃঙ্গে অবস্থিত প্রস্তর মূর্ত্তিগুলির কতক ভগ্ন হইয়াছে এবং পর্ব্বত গাত্রে খোদিত মূর্ত্তির কোনটী সম্পূর্ণ এবং কোনটী আংশিক ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। অবশিষ্টগুলিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয় না, ক্রমশঃ ধ্বসিয়া বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক। এই সকল মূর্ত্তিতে শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচয় না থাকিলেও প্রাচীনত্বের অনেক নিদর্শন আছে। সুদীর্ঘকাল অনাবৃত স্থানে থাকিবার দরুণ নানারূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে, বিশেষতঃ বর্ষার

ঊনকোটী তীর্থে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসমূহ

বারিধারায় ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, অধিকাংশ মূর্ত্তিই পরিচয়ের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। ঊনকোটী শৃঙ্গের পশ্চিম পার্শ্বে খোদিত মূর্ত্তিসমূহের অস্পষ্ট এবং ভগ্নাবস্থা হইতে, এখনও দশমহাবিদ্যা, রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং পূতনা বধ ইত্যাদি কতিপয় মূর্ত্তি অতি কষ্টে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিনষ্ট মূর্ত্তিগুলি কেবল প্রাকৃতিক নিয়মে ধ্বংস হয় নাই; খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কালাপাহাড় কর্ত্তৃকও এই তীর্থের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী ভুবনেশ্বর তীর্থ ও তুঙ্গেশ্বর শিব তৎকর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, এত অধিক সংখ্যক দেবদেবীর মূর্ত্তি সমন্বিত ঊনকোটী তীর্থে তাহার আগমন বিশেষ সম্ভবপর বলিয়াই মনে হয়।

ঊনকোটীশ্বর শিব বিগ্রহ

এক স্থানে এত অধিক সংখ্যক বিগ্রহ দুই একটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোথাও আছে কি না, জানি না। ইহার মধ্যে পর্ব্বতগাত্রস্থ ঊনকোটীশ্বর শিবের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিরাট মূর্ত্তির নিম্নভাগ ধ্বসিয়া গিয়াছে। উর্দ্ধভাগ এখনও পর্ব্বতগাত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই মূর্ত্তির এক কর্ণ হইতে অপর কর্ণ পর্য্যন্তের পরিসর চতুর্দ্দশ হস্ত, কপাটকল্প দুইটী কর্ণে বৃহৎ ঢালের ন্যায় দুইটী কুণ্ডল শোভা পাইতেছে। গোঁফের একদিক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অপরদিকে দেড় হস্ত পরিমিত গুম্ফ বিদ্যমান রহিয়াছে। হস্তে ত্রিশূল এবং পদতলে দুইটী বৃষ বিরাজমান। বৃষ দুইটী পর্ব্বতগাত্রচ্যুত হইয়া সম্মুখস্থ সমভূমিতে পতিত রহিয়াছে। এরূপ বিরাট মূর্ত্তি পূর্ব্বে কখনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অনেকে মনে করেন, এই সকল প্রতিমূর্ত্তি ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রাচীন কীর্ত্তি; এই ধারণার সমর্থনযোগ্য কোনও প্রমাণ নাই। বরং ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সূত্র বিদ্যমান আছে, তাহা নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাচীন মন্দিরের লুপ্তপ্রায় নিদর্শন।

এই তীর্থস্থানে একটি মন্দির ছিল। তাহার লুপ্তপ্রায় চিহ্ন এবং ইষ্টক ও প্রস্তরাদি সরঞ্জাম এখনও পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দির কাহার নির্ম্মিত ছিল, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিয়াছেন ;—

"শৃঙ্গাগ্রে প্রস্তর ও ইষ্টকরাশি প্রকীর্ণাবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। কোন কালে ঐ স্থানে যে প্রস্তর ও ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির ছিল, তাহা বেশ অনুমিত হয়। একটী মন্দির যে অতি অল্পদিন পূর্ব্বে নষ্ট হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। এই সকল মন্দির কে কখন নির্ম্মাণ করেছিলেন, কোথাও উল্লেখ নেই। তবে, অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, তাহা ত্রিপুর নরপতিগণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কারণ, ত্রিপুরাধীশ্বরদিগের মধ্যে অনেকেই পুণ্যবৃদ্ধিতে ঊনকোটী তীর্থে গমন করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

— শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর পরিভ্রমণ পুস্তিকা।

দ্বিতীয় লহর—১১২ পৃষ্ঠা।

ঊনকোটীশ্বর শিব
ঊনকোটী তীর্থ-কৈলাসহর।

শ্রীহট্টের ইতিহাস প্রণেতা এ বিষয়ে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের কথাই উদ্ধৃত করিয়াছেন, স্বীয় অভিমত প্রদান করেন নাই। *

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন; —

"যখন স্বর্গীয় রাধাকিশোর মাণিক্য ঊনকোটীতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি অল্পদিন পূর্ব্বে নষ্ট একটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। এই মন্দিরগুলি কে কখন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিবার যো নাই।"

ইঁহারা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে জানিতে পারিতেন, রাজমালায়ই মন্দির নির্ম্মাতার নামোল্লেখ আছে।

সংস্কৃত রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"বিমারস্য সুতো জাতঃ কুমারঃ পৃথিবীপতিঃ।
স রাজা ভুবনখ্যাতঃ শিবভক্তি পরায়ণঃ।।
কিরাত রাজ্যে স নৃপশ্ছাম্বুল নগরান্তরে।
শিবলিঙ্গং সমদ্রাক্ষীৎ সুবড়াই কৃতে মঠে।।"

রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"বিমার হইল রাজা তাহার তনয়।
তার পুত্র কুমার পরেতে রাজা হয়।।
কিরাত আলয়ে আছে ছাম্বুলনগর।
সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিবভক্তি তর।।
সুবড়াই খুঙ্গ নামে মহাদেব স্থান।
করিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্যবান্।।
* * * *
গুপ্তভাবে আছে তথা অখিলের পতি।
মনুরাজ সত্যযুগে পূজিছিল অতি।।
মনুনদী তীরে মনু বহু তপ কৈল।
তদবধি মনু নদী পুণ্য নদী হৈল।।"

এই 'ছাম্বুল নগর' ঊনকোটী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কৈলাসহর প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন নাম। বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা চন্দ্রশেখর পর্ব্বতকে ছাম্বুল-নগর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার গুরুতর ভুল। উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা জানা যায়, এই স্থান মনু নদীর তীরবর্ত্তী কিরাত প্রদেশে অবস্থিত, এবং তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন, রাজা সুবড়াই তথায় মঠ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সুবড়াই, মহারাজ ত্রিলোচনের নামান্তর। আমাদের কথিত ঊনকোটী তীর্থ মনু নদীর সন্নিহিত কিরাত প্রদেশে অবস্থিত, বর্ত্তমান কালেও ইহার অদূরবর্ত্তী স্থানে কিরাত (কুকি) গণ বাস করিতেছে। এখানে অদ্যাপি ঊনকোটিশ্বর শিব

ছাম্বুল নগরের অবস্থান নির্ণয়

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — ১ম ভাগ, ৯ম অধ্যায়।

বিরাজ করিতেছেন ; এবং প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল অবস্থা পূর্ব্বোদ্ধৃত রাজমালার বাক্যের সহিত রেখায় রেখায় মিলিতেছে। মনু নদীর সন্নিহিত এরূপ অবস্থাপন্ন অন্য কোন স্থান নাই। সুতরাং ছাম্বুলনগর ঊনকোটীরই নামান্তর এবং তথাকার-মন্দির মহারাজ ত্রিলোচন (সুবড়াই) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোনরূপ মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। এই স্থানে অবস্থিত ইষ্টকরাশির গঠন দৃষ্টেও তাহার প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিগ্রহসমূহের প্রাচীনত্ব

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঊনকোটীর বিগ্রহসমূহ ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। উপরোক্ত অবস্থা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে, মহারাজ ত্রিলোচন কর্ত্তৃক মন্দির নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেও এই স্থান তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য ছিল, এবং ত্রিলোচন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন মাত্র ; তৎকর্ত্তৃক বিগ্রহ স্থাপনের কথা রাজমালায় বা অন্য কোনও গ্রন্থে নাই। ত্রিলোচনের পূর্ব্বে, কৈলাসহর অঞ্চলে ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রভুত্ব স্থাপনের প্রমাণাভাব, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের দ্বারা ঊনকোটীর মূর্ত্তিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনাও দৃষ্ট হয় না। সম্যক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা মহর্ষি কপিল এবং মনুর কীর্ত্তি বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। * মূর্ত্তিসমূহ এক সময়ের নির্ম্মিত ও খোদিত নহে, অবয়ব দৃষ্টে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ সিদ্ধান্ত করেন। উক্ত ঋষিদ্বয়ের মধ্যে একের কার্য্য অন্যের কার্য্যের পরবর্ত্তী কালে সাধিত হইয়াছিল, ইহা সুনিশ্চিত; সুতরাং বিশেষজ্ঞগণের উক্তরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক বলিয়া মনে হয় না। ঋষিদ্বয়ের পরবর্ত্তী কালেও কোন কোন মূর্ত্তি ত্রিপুরেশ্বরগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়া বিচিত্র নহে।

এই স্থান যেমন নির্জ্জন, তেমনি মনোরম। ঊনকোটী ছড়া যে স্থানে প্রস্তরের ফাঁক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানটী অতি সুন্দর।

ঊনকোটী তীর্থের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা

পুরাকালে ঊনকোটী বিশেষ জাগ্রত তীর্থ ছিল ; স্থানের অবস্থা দৃষ্টে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পরবর্ত্তীকালে এই তীর্থে যাত্রী সমাগম হ্রাস হইবার বিশেষ কোন হেতু ছিল, এরূপ অনুমান করা অস্বাভাবিক নহে। অভিনিবেশ চিত্তে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, সে কালে এই স্থান নিতান্ত দুর্গম ছিল, এবং ইহার আশে-পাশে বিস্তর

---

* ভবিষ্য পুরাণস্থ ব্রহ্মখণ্ডের ১৯শ অধ্যায়ে লিখিত আছে ;—
"মেঘ্নানদ্যা পূর্ব্বকচ্ছে দ্বিসহস্র ব্যতীক্রমে।
কপিল লিঙ্গ সন্নিধৌ গ্রামোহি নব পালকঃ।" — ৪২ শ্লোক।
অনেকে মনে করেন, এই শ্লোকোক্ত মেঘ্না নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কপিল লিঙ্গ ও ঊনকোটী তীর্থস্থিত শিবলিঙ্গ অভিন্ন। এই ধারণা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। আসামস্থ কপিলাশ্রমে স্থাপিত লিঙ্গের নাম "সিদ্ধেশ্বর শিব"। ঊনকোটী তীর্থ ব্যতীত তদঞ্চলে অন্য কোন স্থানে কপিল মুনি স্থাপিত অন্য শিব নাই। সুতরাং এই তীর্থের শিবই "কপিল লিঙ্গ" নামে অভিহিত হওয়া সম্ভবপর।

ডম্বুর জল-প্রপাত।
(উর্দ্ধস্তর)।

নরখাদক ও উগ্র স্বভাব কুকির আবাস ছিল ; সুতরাং পথকষ্ট এবং কুকিভীতি, এতদুভয় কারণে এই তীর্থের অবনতি ঘটিয়াছে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না। এই স্থানের অধিষ্ঠাতা মহর্ষিগণের তিরোধানের পর, এই তীর্থের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত কোনরূপ যত্ন হইবার অথবা সমাগত যাত্রীবৃন্দের সুবিধার প্রতি কাহারও দৃষ্টি থাকিবার প্রমাণ নাই। এই সকল কারণেই ক্রমশঃ তীর্থটী শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে।

অধুনা আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রসাদে এই তীর্থে যাত্রী সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু এতদ্দ্বারা ইহার অতীত গৌরব পুনরাগত হইবার আশা করা যাইতে পারে না। ভবিষ্যকালে আবার কখনও যদি কপিল অথবা মনুর ন্যায় কোনও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তবে তাঁহার পবিত্র চরণ স্পর্শে, লুপ্ত তীর্থ-মাহাত্ম্য পুনর্ব্বার জাগ্রত হইলেও হইতে পারে ; কিন্তু সে দিন সুদূর পরাহত বলিয়াই মনে হয়।

ডম্বুর বা ডুঙ্গু তীর্থ।

বিজয়মাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ; —

> "নরপতির দুই পুত্র জন্মে ক্রমে ক্রম।
> ডুঙ্গু তীর্থে জন্ম জ্যেষ্ঠ ডুঙ্গুর নাম উত্তম।।"

ডম্বুর তীর্থের অবস্থান নির্ণয়

ডুঙ্গু তীর্থে জন্মহেতু বিজয়মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম "ডুঙ্গুর ফা" হইয়াছিল। এই ডুঙ্গু তীর্থ সাধারণতঃ 'ডম্বুর' নামে অভিহিত। ইয়ুরোপীয়গণ ইহাকে ডুমরি-ফল (Dumeria-Fall) বলে ; ইহা একটী সুদৃশ্য জলপ্রপাত। এই প্রপাত হইতে গোমতী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। আঠারমুড়া পর্ব্বত জাত ছাইমা নদী এবং লংতরাই পর্ব্বতোৎপন্ন রাইমা নদী গোমতীর আদি মাতা, তাহার নিম্ন দেশস্থ আরও অনেক নদী এবং ছড়া আত্মসমর্পণদ্বারা গোমতীর পুষ্টিবিধান করিয়াছে। যেই জলপ্রপাত হইতে গোমতী বহির্গত হইয়াছে, সেই প্রপাতের নাম ডম্বুর। অনেকে বলে, প্রপাতের আকৃতি মহাদেবের হস্তস্থিত ডম্বুরের আকারবিশিষ্ট বলিয়া ইহার নাম ডম্বুর হইয়াছে ; "ডুঙ্গু" শব্দ 'ডম্বুর' শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।

ডম্বুর তীর্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

স্থানটী অতি নির্জ্জন ; এই স্থানের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইয়াছেন। প্রস্তরময় স্থানের নানাদিক হইতে আগত প্রপাতের জলদ্বারা সর্ব্ব নিম্নে মণ্ডলাকার, শত হস্ত পরিমিত ব্যাসের একটি কুণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। এই কুণ্ডের গভীরতা বিশ হস্ত হইবে। ইহার উপরে, ক্রমাগত আরও কয়েকটী কুণ্ড আছে ; এবং প্রত্যেক কুণ্ডের বিশেষ বিশেষ নাম আছে। সাধারণতঃ প্রথমোক্ত কুণ্ডকে 'রাণী কুণ্ড', চতুর্থ কুণ্ডকে 'কাছুয়া কুণ্ড' এবং আর একটী কুণ্ডকে 'কমলা কুণ্ড' বলা হয়। এই

সুদৃশ্য জলপ্রপাত পূর্ব্বকালে তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এ স্থানে অনেক যাত্রী সমাগম হইত এবং ত্রিপুরেশ্বরগণ অনেক সময় পরিবারবর্গসহ এই স্থানে যাইয়া স্নান দানাদি করিতেন। এই সময় মহারাণীগণ যেই কুণ্ডে স্নান করিতেন তাহা 'রাণী কুণ্ড' এবং কাছুয়া রাণীগণের স্নানের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট কুণ্ড 'কাছুয়া কুণ্ড' নামে অভিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মহিষী, মহারাণী কমলা মহাদেবী হইতে 'কমলা কুণ্ড' নাম হইয়া থাকিবে।

এই স্থানে ক্রমান্বয়ে সাতটি কুণ্ড অবস্থিত থাকায় অনেকে ইহাকে 'সাত ডম্বুর' বা 'সাততালা' বলে। ক্রমে নিম্ন সাতটী স্তরবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের উপর দিয়ে রজতনিভ জলরাশি অনুচ্চ শব্দে গড়াইয়া পড়ায়, স্থানটী বিশেষ মনোজ্ঞ হইয়াছে।

কালপ্রভাবে, এই সুরম্য ও বিজন স্থানের তীর্থ-জনিত সম্মান বিনষ্ট হইয়া থাকিলেও, মনোহারিত্বের নিমিত্ত এখনও ইহা সর্ব্বজন সমাদৃত। কবি এবং চিত্রকরগণের এই স্থান অবশ্য দর্শনীয় বলিয়া মনে হয়।

সামরিক বল ও সমর ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ।

সামরিক বল।

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরার সৈন্যবল অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি বার কোটী সৈন্য লইয়া মুসলমানগণের সৈনিক বিভাগের প্রণালী অবলম্বনে সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন। *

বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযান।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সামরিক বলও বিশেষ দৃঢ় ছিল। বঙ্গাভিযান কালে তাঁহার সঙ্গীয় নৌ-বহরে পঞ্চ সহস্র নৌকা ছিল। এতদ্ব্যতীত সহস্র অশ্বারোহী, বহুসংখ্যক গোলন্দাজ ও তীরন্দাজ সহ ছাব্বিশ হাজার পদাতি সৈন্য গমন করিয়াছিল। তাঁহার অশ্বারোহী দলের এক সহস্র জলপথে গমন করিয়াছিল, ইহারা

---

* "গৌড়েশ্বর সৈন্য মত সৈন্য যে রাজার।
বার কোটি পদাতি নৃপ করয়ে প্রচার।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

এই সময় ত্রিপুর রাজ্যবাসী পুরুষ মাত্রই যোদ্ধা এবং ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। সে কালে রাজ্যের সীমাও বহু বিস্তৃত ছিল। সৈন্যগণের সকলকে সর্ব্বদা কার্য্যে উপস্থিত থাকিতে হইত না, কিন্তু প্রয়োজন-কালে সমরার্থ উপস্থিত হইতে সকলেই বাধ্য ছিল।

ডম্বুর জল-প্রপাত।
(মধ্যস্তর)।

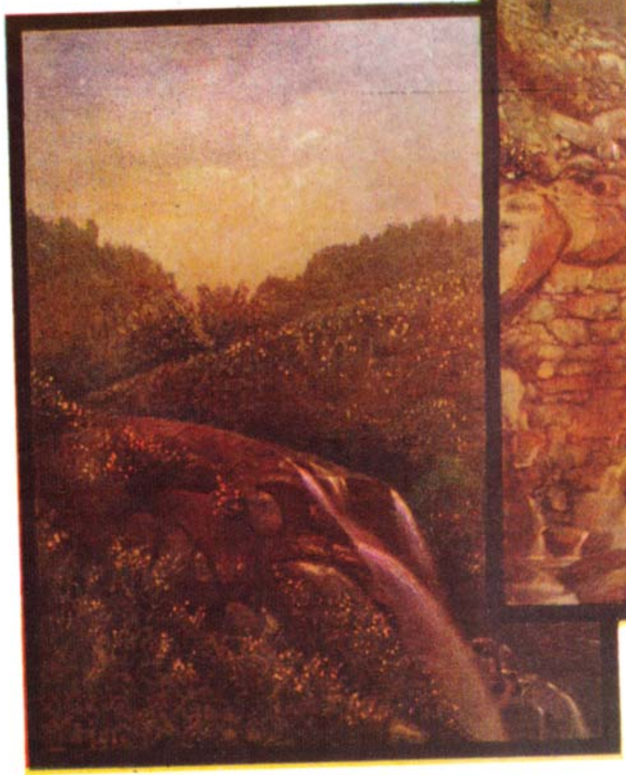

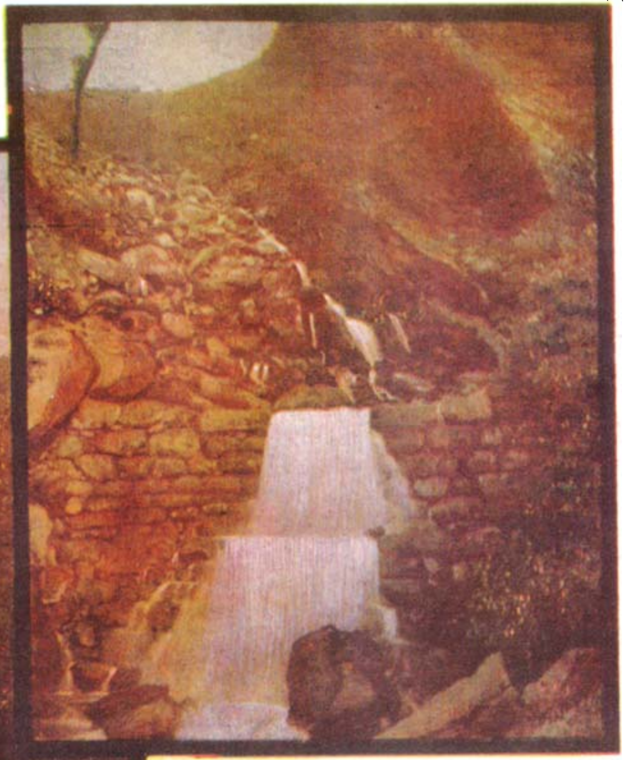

ডম্বুর জল-প্রপাত।
(নিম্নস্তর)।

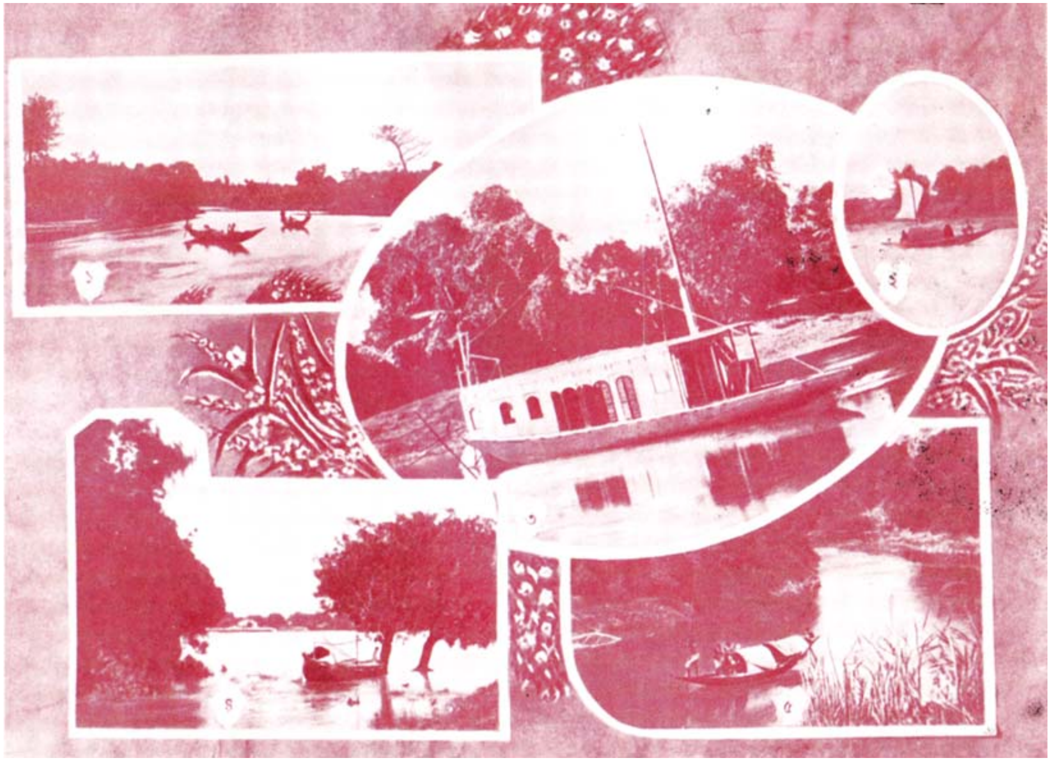

ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বিজয় মাণিক্যের নৌ-বিতানের আদর্শ

(প্রথম চিত্র)।

(১) ওথার নৌকা (২) ডিঙ্গি নৌকা (৩) পিনিশ্ (কোষ) নৌকা, (৪) লাখাই নৌকা, (৫) পান্‌সী নৌকা।

রাজার শরীর রক্ষক। এতৎসম্বন্ধে রাজমালা বলেন ; —

"এই অবকাশেতে বিজয়মাণিক্য রাজা।
বঙ্গদেশে চলিলেক লৈয়া সৈন্য প্রজা।।
পঞ্চ সহস্র নৌকার করিল সাজন।
এক সহস্র অশ্ব রাখে নৌকাতে আপন।।
নৌকা প্রতি পঞ্চ বন্দুক পঞ্চ তীরন্দাজ।
আর নৌকায় রাখিলেন পদাতি সমাজ।।" *

মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল স্বকৃত "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন; —

"ভাটী প্রদেশের † সহিত সংলগ্ন একটি স্বাধীন রাজ্য আছে, সেই রাজ্যের নাম তিপ্রা (ত্রিপুরা)। আর তাহার অধিপতির নাম বিজয়মাণিক্য (মাণিক্য)। * * * এই রাজার দুই লক্ষ পদাতি ও এক সহস্র হস্তী আছে ; কিন্তু অশ্ব অতি বিরল।" ‡

ত্রিপুর বংশাবলী আলোচনায় জানা যায়, বিজয়মাণিক্যের সঙ্গে যে পাঁচ সহস্র রণ-তরী গিয়াছিল, তন্মধ্যে পিনিশ (কোষনৌকা), পান্‌সী, কোন্দা (১),

---

* এই অভিযান সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেব বলিয়াছেন ;—

"At this time Bijoya Raja of Tripura marched to Bengal with an army composed of 26,000 infantry, and five thousand horses besides artillery ; he went by 5,000 boats along the streams Brahmaputra and Lakhi to the Padma."

J. A. S. B. — V. - XUX.

† হুগলী নদীর তীর হইতে মেঘনা নদের তীর পর্য্যন্ত নিম্নভূমিকে মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ 'ভাটী' নামে পরিচিত করিয়াছেন। আধুনিক জেলা চব্বিশ পরগণা, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশ ভাটী প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

‡ আবুলফজল 'অশ্ব অতি বিরল' বলিয়াছেন। বিজয়মাণিক্যের অভিযান কালে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সঙ্গে থাকিবার কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ত্রিপুর বংশাবলী আলোচনায় জানা যায়, বিজয়মাণিক্য দশ হাজার পাঠান দ্বারা অশ্বারোহী দল গঠন করিয়াছিলেন, যথা ;—

"তৎপরে দশ হাজার পাঠান আনিয়া।
অশ্বারোহী পদে রাখে নিযুক্ত করিয়া।।"

এরূপ অবস্থায় 'অশ্ব বিরল' বলা যাইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত যিনি এক সহস্র হস্তী সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে সক্ষম, তিনি যে বঙ্গেশ্বর অপেক্ষাও অধিক পরাক্রান্ত ছিলেন, এ কথা স্বীকার্য্য।

(১) কোন্দা ; — এই নৌকা বৃহদাকারের বৃক্ষ খোদাই করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে কাষ্ঠের জোড়া নাই এবং লোহার পেড়াগ বা পাতাম ব্যবহার করা হয় না।

মরকোষ (১), লাখাই (২), সরঙ্গা (৩), পলোয়ার (৪) এবং ওথার (৫) ইত্যাদি নানা জাতীয় নৌকা ছিল।

উদয়মাণিক্যের শাসনকালের সৈনিক বল

উদয়মাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগ কিয়ৎ পরিমাণে দুর্ব্বল ছিল। এই দৌর্ব্বল্যের সময়ও পাঠানের আক্রমণ হইতে চট্টগ্রাম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বায়ান্ন হাজার সৈন্য ও তিন হাজার সেনাপতি সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"রাজার ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ।
সেনাপতি করে তাকে, সৈন্যের রক্ষণ।।
বায়ান্ন হাজার সৈন্য তার সঙ্গে দিল।
তিন হাজার সেনাপতি তার সঙ্গে ছিল।।"

দ্বিতীয় লহর, — উদয়মাণিক্য খণ্ড, ৬৯ পৃঃ।

যিনি বায়ান্ন হাজার সৈন্য এবং তিন হাজার সেনাপতি যুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারেন, তাঁহার সামরিক বল তুচ্ছ নহে, এ কথা অতি সহজবোধ্য। প্রাচীনকালে ত্রিপুরবাহিনী যে বিশেষ দৃঢ় এবং পরাক্রান্ত ছিল, এ কথার বিশিষ্ট প্রমাণ অতঃপর পাওয়া যাইবে।

সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের বিবরণ

ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় লোক নিযুক্ত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ত্রিপুর এবং কুকিগণই রাজ্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে পাঠান জাতীয় একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিযুক্ত করা হয়। এই সময় বিস্তর বঙ্গদেশীয় লোকও সৈনিক বিভাগে স্থান পাইয়াছিল। * ইহার পর,

(১) মরকোষ ঃ— ইহা চেপ্টাতলী বিশিষ্ট এবং সুপ্রশস্ত নৌকা। ক্ষীণতোয়া পার্ব্বত্য নদীতে চলাচল পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

(২) লাখাই ঃ— এই নৌকারও তলদেশ চেপ্টা (সমতল), এই জাতীয় নৌকার সম্মুখের গলই কিয়ৎ পরিমাণে ঘোড়ার মস্তকের আকৃতি বিশিষ্ট।

(৩) সরঙ্গা ঃ— ইহা অতি বৃহদাকারের নৌকা। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই জাতীয় নৌকার অধিক প্রচলন দেখা যায়।

(৪) পলোয়ার ঃ— ইহা বৃহদাকারের সুপ্রশস্ত নৌকা। ঢাকার পলোয়ার নৌকা পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ খ্যাত।

(৫) ওথার ঃ— ইহা জেলেদের ব্যবহার্য্য সুদীর্ঘ এবং স্বল্প পাশবিশিষ্ট নৌকা। এই জাতীয় নৌকা খুব দ্রুতগামী।

* "চাটিগ্রামে চলিল বিজয় মহারাজা।
দুই সহস্র চলিলেক সৈন্য মহাতেজা।।
চাটিগ্রাম রাজা সঙ্গে সহস্র পাঠান।
প্রচণ্ড উজির সঙ্গে সহস্র বঙ্গ যান।।"

দ্বিতীয় লহর, — বিজয়মাণিক্য খণ্ড, ৪৫ পৃঃ।

সে কালের বাঙ্গালী যে হীনবীর্য্য ছিল না, ইতিহাসে তাহার বিস্তর নিদর্শন আছে।

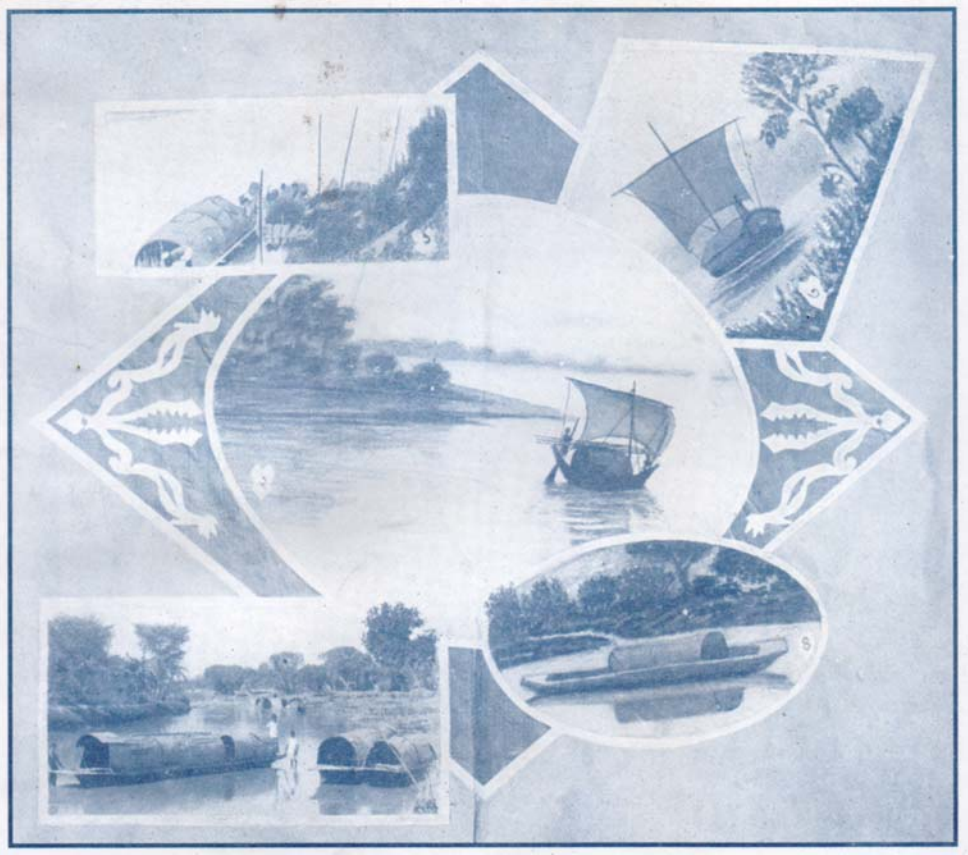

মহারাজ বিজয় মাণিক্যর নৌ-বিতানের আদর্শ
(দ্বিতীয় চিত্র)
(১) মরকোষ নৌকা, (২) পলার নৌকা, (৩) সরঙ্গা নৌকা, (৪) লং নৌকা, (৫) কোন্দা নৌকা।

মিথিলাবাসী, ব্রাহ্মণ জাতীয় লক্ষ্মীনারায়ণ নামক ব্যক্তি — ইন্দ্রমাণিক্যকে সাক্ষীগোপাল রাজা করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি আড়াই শত মৈথিল যোদ্ধা ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। *

জয়ন্তিয়া অভিযানে হাড়ি সৈন্য

মহারাজ বিজয়ের আর এক অদ্ভুত কার্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি জয়ন্তিয়াপতির প্রতি রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে দ্বাদশ সহস্র হাড়ি জাতীয় লোকদ্বারা এক সৈনিক দল গঠন করিয়া জয়ন্তিয়া রাজ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। † তদবধি হাড়িগণও সৈনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহারা লাঠিয়াল শ্রেণীর লোক ছিল। এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ অতঃপর বর্ণিত হইবে।

সেনানায়ক।

সেনানায়ক নির্ব্বাচন প্রণালী

পূর্ব্বকালের ন্যায় এই সময় ভ্রাতা অথবা জামাতাকে সেনাপতি করিবার বাঁধাবাঁধি নিয়ম না থাকিলেও, সাধারণতঃ রাজার আত্মীয়কে প্রধান সেনাপতি করা হইত। ধন্যমাণিক্য স্বীয় শ্বশুর দৈত্য নারায়ণকে প্রধান সেনাপতির পদ প্রদান করেন। অনন্তমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদ নারায়ণ তাঁহার শ্বশুর ছিলেন। উদয়মাণিক্য স্বীয় ভগ্নিপতি রণাগণ নারায়ণকে প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করিবার প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায়। জয়মাণিক্যের কালেও তিনিই প্রদান সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার পরবর্ত্তী কালে রাজপুত্রদিগকে সেনাপতি করিবারও প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

* "এই মতে বৎসরেক ব্রাহ্মণে শাসয়।
আড়াই শত যোদ্ধা আনি মিথিলা রাখয়।।"
ইন্দ্রমাণিক্য খণ্ড, — ৩৭ পৃঃ।

† হাড়িগণের যুদ্ধ যাত্রার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—
"দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া।
হাড়িতে ডগর বাদ্য চলে বাজাইয়া।।
চারি মাস হাড়ি সৈন্যে পাইয়া বেতন।
মদ্য শূকর খাইয়া করিলেক রণ।।
ঘুর ঘুরি শব্দ করি ডগর বাজায়।
সাজনি সাজিয়া সব হাড়ি সৈন্য যায়।।
*　*　*　*
ঢেমস ডগর বাজে নাচে ঊর্দ্ধ হাতে।
শূকর খেদান লাঠি পাকাইয়া সাথে।।" ইত্যাদি।
বিজয়মাণিক্য খণ্ড, — ৪৪ পৃঃ।

দুঃখের কথা এই যে, রাজ-আত্মীয়গণ সেনাপতি হইয়া কোন কোন ব্যক্তি যেরূপ প্রাধান্য-প্রয়াসী এবং বিশ্বাসঘাতক হইয়াছিলেন, নিঃসংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ তদ্রূপ করেন নাই। ইঁহাদের দুষ্কার্য্যের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

সেনাপতিগণের উপাধি

সেনাপতিগণের পদমর্য্যাদানুসারে, সরদার, হাজারী বা হাজরা, বড়ুয়া ও নারায়ণ ইত্যাদি উপাধি প্রচলিত ছিল। কোন কোন সেনাপতির খাঁ উপাধি থাকিবার প্রমাণও আছে; ইঁহারা পার্ব্বত্য জাতীয় ছিলেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে সরদার ও হাজারী উপাধির প্রচলন হয়। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"সরদার করিলেক অর্দ্ধ সৈন্য দিয়া।
হাজারী করিয়াছিল কত সৈন্য লৈয়া।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড, — ১২ পৃঃ।

এক হাজার সৈন্য যাঁহার অধীনে থাকিত, তিনি হাজারী উপাধি লাভ করিতেন। ইঁহাদিগকে হাজরাও বলা হইত। জয়মাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;—

"ফৌজের হাজরা—র ঘর, চাটিগ্রাম গিছে।
রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণের সঙ্গেতে রহিছে।।"

বড়ুয়া উপাধিও ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে রাজমালা বলেন ;—

"শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা তদবধি সেনা।
বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড, — ১২ পৃঃ।

পার্ব্বত্য প্রদেশে সৈন্য রক্ষার প্রণালী

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীন কালে রাজ্যময় সকলেই যোদ্ধা এবং সৈনিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেকালে পার্ব্বত্য প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাগণের নায়করূপে নির্ব্বাচিত হইতেন, এবং তাঁহাদিগকে সরদার, হাজারী ও বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হইত। কালক্রমে পার্ব্বত্য জাতিসমূহ সৈনিক বিভাগ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিলেও প্রধান ব্যক্তিদিগকে সৈনিক বিভাগের প্রচলিত উপাধি প্রদানের প্রথা বন্ধ হয় নাই। তাঁহাদিগকে সরদার, হাজারী, সেনাপতি ও বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে। এই সকল উপাধি বর্ত্তমানকালে কেবল পূর্ব্ব স্মৃতি উদ্বোধক রাজদত্ত সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিনন্দিয়া সৈন্য ও নাজির উপাধি

রাজধানীতে পার্ব্বত্য সিপাহীদ্বারা সংস্থাপিত গারদের এবং পার্ব্বত্য প্রদেশস্থ সৈনিকগণের পরিচালনের ভার যাহার হস্তে অর্পিত হইত, তিনি 'নাজির' উপাধি লাভ করতেন। মহারাজের নিকট-সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের প্রতি এই ভার অর্পিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর সৈন্যগণ সাধারণতঃ

"বিনন্দিয়া সৈন্য" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে বিনন্দিয়াগণ পার্ব্বত্য অঞ্চলে, কিয়ৎ পরিমাণে পুলিশের কার্য্যও করিয়া থাকে। *

নারায়ণ উপাধি

প্রধান সেনাপতিগণের 'নারায়ণ' উপাধি ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই উপাধি ধন্যমাণিক্যের সময়ে আরম্ভ হইয়া সুদীর্ঘ কাল প্রচলিত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়। মোগল সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ;—

"ভাটি রাজ্যের সহিত সংলগ্ন একটী স্বাধীন রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের নাম তিপ্রা (ত্রিপুরা)। * * * * সেই রাজ্যের আমীর ওমরাহগণ 'নারায়ণ' উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

আবুল ফজলের এই উক্তি অভ্রান্ত নহে ; কিন্তু তাঁহার ভ্রম জন্মিবার একটী কারণ ছিল। সেকালে নারায়ণ উপাধি বিশিষ্ট প্রধান সেনাপতিগণই রাজ্যশাসন এবং মন্ত্রিত্ব করিতেন। রাজপুত্রগণ সেনাপতি পদে বরিত হইয়া "নারায়ণ" উপাধি লাভ করিবার দৃষ্টান্তও অনেক আছে। এই সকল অবস্থা দর্শন করিয়াই আবুল ফজল উক্ত উপাধি "আমীর ওমরাহ"গণের লভ্য বলে বিশ্বাস করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রধান সেনাপতিগণের উপাধি। রাজমালা দ্বিতীয় লহরে রণচতুর নারায়ণ, রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ, দৈত্য নারায়ণ, গজভীম নারায়ণ, বিজয়দুর্ল্লভ নারায়ণ, গোপীপ্রসাদ নারায়ণ, রণাগণ (রঙ্গ) নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, উড়িয়া নারায়ণ (ইঁহার নাম ছিল ভাঙ্গিল ফা), † আগুয়ান নারায়ণ, অরিভীম নারায়ণ, গরুড়ধ্বজ নারায়ণ, সমরজিৎ নারায়ণ ও রাজবল্লভ নারায়ণ প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়, ইঁহারা সকলেই সেনাপতি ছিলেন এবং তন্মধ্যে অনেকের হস্তে শাসনভারও ছিল। রাজমালা তৃতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, অমরমাণিক্য তাঁহার পুত্র চতুষ্টয়কে সেনা নেতৃত্বে বরণ করিয়া 'নারায়ণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, যথা ;—

"অমরাবতী মহাদেবী সতী পতি মতি।
তান গর্ব্বে চারি পুত্র যোগ্যবান্ অতি।।
রাজদুর্ল্লভ নারায়ণ, রাজধর ধীর।
অমরদুর্ল্লভ নারায়ণ, যুঝার সিংহবীর।।
চারি পুত্র নৃপতির পদবী নারায়ণ।
সিংহাসনে বসে রাজা অতি সুশোভন।।"

— অমরমাণিক্য খণ্ড।

---

* এতৎসম্বন্ধে কৈলাসবাবু লিখিয়াছেন, — "গভর্ণমেণ্টের পুলিশ পদাতিগণের ন্যায় "বিনন্দিয়া" আখ্যা বিশিষ্ট ত্রিপুরাপতির এক প্রকার সৈন্য বা পেয়াদা ছিল। ইহাদের সরদার নাজির উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। মহারাজের সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ এই নাজির পদ লাভ করিয়াছেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ১ম ভাগ, ৪র্থ অঃ, ৪৯ পৃঃ।

† "ভাঙ্গিল ফা নামেতে উড়িয়া নারায়ণ।
কামানের গোলাঘাতে তাহার মরণ।।"

— জয়মাণিক্য খণ্ড।

তৃতীয় লহরে 'নারায়ণ' উপাধিধারী আরও অনেক সেনাপতির নাম সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে। 'নারায়ণ' উপাধি সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ অতঃপর প্রদান করা যাইবে।

খাড়াইত উপাধি

এতদ্ব্যতীত এক শ্রেণীর সৈনিকের 'খাড়াইত' উপাধি ছিল, ইহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযান কালে তাঁহার সঙ্গে দুই সহস্র খাড়াইত থাকিবার কথা রাজমালায় উল্লেখ আছে। সেই বলশালী ব্যক্তি উদয়পুরস্থিত সুবিশাল ধন্যসাগর * সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে সমর্থ হইত, তাহার উপাধি হইত 'খাড়াইত'। নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ দ্বারা খাড়াইত শ্রেণীর পরিচয় পাওয়া যাইবে ;—

"মহা খাড়াইত তারা দুই সহস্র পাইক।
খড়্গ চর্ম্ম জাঠী হাতে দেখি ভয়ানক।
সাতবার ধন্যসাগর ফিরিতে যে পারে।
সেই জনা তার নাম খাড়াতাইয়া ধরে।
দিবারাত্র থাকে রাজদ্বারেতে প্রহরী।
বড় বড় অঙ্গ তারার বিক্রমে কেশরী।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

সৈনিক বিভাগে গৌরবসূচক উপাধি

সেকালে সেনাপতিগণ যুদ্ধ জয় কিম্বা সাহসের পরিচায়ক কোন কার্য্য করিলে তাহা চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে এক একটী উপাধি প্রদানদ্বারা গৌরবান্বিত করা হইত। এ স্থলে তদ্রূপ দুই একটী উপাধির কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে, রসাঙ্গ (আরাকান) প্রদেশের কিয়দংশ বিজেতা 'রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ; —

"রাস্বু ছত্রশিক রাজা আমল করিল।
রসাঙ্গ জিনিয়া কিল্লা পুষ্কর্ণী খনিল।।
নিজ রসাঙ্গ লইতে না পারে সেনাপতি।
রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ তার হৈল খ্যাতি।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড, — ২৪ পৃঃ।

আর এক সেনাপতি গৌড়ের সহিত বারম্বার সংগ্রাম করিয়া 'গরুড়ধ্বজ' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন ; যথা ;—

"গৌড় সৈন্যে সঙ্গে তার বহু ছিল রণ।
গরুড়ধ্বজ খ্যাতি তার হইল তখন।।"

উদয়মাণিক্য খণ্ড।

---

* এই সাগরের দৈর্ঘ্য ১০০০ হাজার গজ এবং প্রস্থ ২৭০ গজ।

যে ব্যক্তি সেনাপতি রণাগণ নারায়ণের মস্তক ছেদন করিয়া সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি 'সাহস নারায়ণ' উপাধি পাইয়াছিলেন। * এক সেনাপতি বিশেষ দক্ষতার সহিত হস্তী খেদার কার্য্য সম্পাদন ও হস্তী ধৃত করায় "গজভীম নারায়ণ" উপাধি লাভ করেন। এবম্বিধ অনেক উপাধির উল্লেখ রাজমালায় পাওয়া যায়; ইহার কোন উপাধিই নিরর্থক নহে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে বিজয়ের নিদর্শনস্বরূপ নানাবিধ উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন, ত্রিপুর রাজ্যে প্রচলিত উপাধি বৃটিশ শাসনের অনেক পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত ছিল।

যুদ্ধাস্ত্র।

যুদ্ধাস্ত্রের প্রকারভেদ

রাজমালা দ্বিতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, সেকালে সৈনিক বিভাগে ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম (ঢাল), জাঠা, বন্দুক এবং কামান প্রভৃতি অস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ঃ—

(১) "দুই সহস্র পদাতি আসিল ধনুঃসরে।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড, — ১৫ পৃঃ।

(২) "দুই সৈন্য আগু হৈয়া সংগ্রাম মাঝার।
তীর বন্দুকের যুদ্ধ পাছে খড়্গ ধার।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড, — ৪৭ পৃঃ।

(৩) "তিন সহস্র ত্রিপুরগণ খড়্গ চর্ম্ম লৈয়া।
কাটয়ে পাঠান সৈন্য কোঠে প্রবেশিয়া।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড, — ৪৮ পৃঃ।

(৪) "নৌকা প্রতি পঞ্চ বন্দুক পঞ্চ তীরন্দাজ।
আর নৌকায় রাখিলেক পদাতি সমাজ।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড, — ৫৪ পৃঃ।

(৫) "খড়্গ চর্ম্ম জাঠি হাতে দেখি ভয়ানক।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড, — ৫৮ পৃঃ।

(৬) "ভাঙ্গিল ফা নামেতে উড়িয়া নারায়ণ।
কামানের গোলাঘাতে তাহার মরণ।।"

জয়মাণিক্য খণ্ড, — ৭১ পৃঃ।

ইহা সম্পূর্ণ কামান বন্দুকের যুগ নহে ; ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ চর্ম্মের সহিত কামান বন্দুক ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এই সময় কোন শক্তিরই আগ্নেয় অস্ত্রের সংখ্যা অধিক ছিল

* "রণাগণ মস্তক কাটিল যেই পাইকে।
সাহস নারায়ণ খ্যাতি করিলাম তাকে।।"

জয়মাণিক্য খণ্ড, — ৭৬ পৃঃ।

বলিয়া মনে হয় না; তাহা থাকিলে ধনুর্ব্বাণ বা জাঠা, শূল লইয়া রণক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা রক্ষা এবং যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব হইত। সেকালে কেবল ত্রিপুর রাজ্যেরই এরূপ অবস্থা ছিল না; ত্রিপুরার প্রবল-প্রতিযোগী মুসলমানগণও কামান, বন্দুকের সঙ্গে ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ চর্ম্মাদি ব্যবহার করিতেন। গৌড়েশ্বর হোসেন সাহ, ধন্যমাণিক্যের বিরুদ্ধে ১৪৩৭ শকে যে বিপুলবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে "লক্ষৈক পদাতি চলে, ধানুকী কটক।" * মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে, পাঠানবাহিনী চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। মমারক খাঁ নামক পাঠান সেনাপতি এই বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"মমারক খাঁ নামে ত গৌড়েশ্বর শালা।
মহাবীর পরাক্রম যুদ্ধে অতি ভালা।।
তিন সহস্র অশ্ব চলে তাহার সঙ্গতি।
দশ সহস্র ঢালি চলে ধানুকি পদাতি।।"

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, পাঠান শাসনকালেও ধনুর্ব্বাণের প্রচলন কম ছিল না। মোগল সম্রাট শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে পরস্পর সময় কালেও তীরের ব্যবহার ছিল। ইংরেজ শাসনকালেই এ দেশে আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহাদের উপর সংহরণ ভার অর্পণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সেকালের অক্ষয় কবচরূপী বর্ম্ম এবং চর্ম্মও ধনুর্ব্বাণের সহগামী হইয়াছে।

যুদ্ধ যান

এই সময় হস্তী, ঘোড়া এবং নৌকা যুদ্ধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। অন্য কোন জাতীয় প্রাণী বা অন্যবিধ যান ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অভিযান ও সমর।

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য যেমন ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার শাসনকাল তেমনি শান্তিময় হইয়াছিল। তাঁহার বত্রিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকাল মধ্যে কোনরূপ অশান্তি বা যুদ্ধ বিগ্রহাদি সঙ্ঘটিত হয় নাই। †

ধর্ম্মমাণিক্যের পর, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অতিক্রম করিয়া সেনাপতিগণ কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় প্রতাপমাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। প্রতাপ অধার্ম্মিক এবং অত্যাচারী

---

* রাজমালা — ধন্যমাণিক্য খণ্ড, — ২৫ পৃঃ।

† "চিরকাল রাজ্য পালিলেক মহারাজা।
শত্রু নাহি ছিল তার বঞ্চিলেক প্রজা।।"
ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড, — ৪ পৃঃ।

বলিয়া, অল্পকাল পরে সেই সেনাপতিগণ দ্বারাই রাত্রিকালে গোপনে নিহত হইলেন। সুতরাং তিনি যুদ্ধাদি সঙ্ঘটন করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই।

ধন্যমাণিক্যের বঙ্গবিজয়

অতঃপর প্রতাপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যমাণিক্য একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহাসন লাভ করেন। ইনি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজ্য লাভের কিয়ৎকাল পরে মহারাজ ধন্য, বঙ্গদেশ বিজয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং ক্রমান্বয়ে বঙ্গাধীপের অধীনস্থ মেহেরকুল(১), পাটিকারা(২), গঙ্গামণ্ডল(৩), বগাসারি(৪), বেজুরা(৫), কৈলা(৬), ভানুগাছ(৭), বিষ্ণাউড়ি(৮), লঙ্গলা(৯), বরদাখাত(১০) প্রভৃতি স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন।

খণ্ডুলবাসিগণের ব্যবহার

খণ্ডুল পরগণা অধিকার করিতে যাইয়া মহারাজ ধন্যকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইয়াছিল, খণ্ডুলবাসিগণ ত্রিপুরেশ্বরের নিয়োজিত লস্করকে ধৃত করিয়া গৌড়াধিপতির দরবারে উপস্থিত করিয়াছিল। উক্ত লস্কর গৌড়েশ্বরের আদেশে হস্তী পদতলে পিষ্ট হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। এই কার্য্যের প্রতিশোধ যেভাবে প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা অতঃপর বর্ণিত হইবে।

থানাংচি বিজয় ও শ্বেতহস্তী লাভ

ইহার অল্পকাল পরে, থানাংচি নামক কুকি প্রদেশে একটী শ্বেতহস্তী ধৃত হইয়াছিল। ত্রিপুরেশ্বর এই হস্তী লইবার অভিলাষী হইলেন, কিন্তু কুকিরাজ তাহা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। এই সূত্রে তাঁহার সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। ত্রিপুর সেনাপতি রায় কাচাগের কৌশলময় বীরত্ব প্রভাবে, আট মাসের চেষ্টায়

---

(১) মেহেরকুল ; — গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী পরগণা। কুমিল্লা নগরী এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকালে মেহেরকুল ও পাটিকারা স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল।

(২) পাটিকারা ; — মেহেরকুল পরগণার পশ্চিম সীমায় ময়নামতী পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত, ইহা একটী বিস্তীর্ণ পরগণা।

(৩) গঙ্গামণ্ডল ; — পাটিকারা পরগণার সংলগ্ন দক্ষিণ ভাগে এই পরগণা অবস্থিত।

(৪) বগাসারি ; — মেহেরকুল পরগণার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত পরগণা বিশেষ। কুমিল্লা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যে রাজবর্ত্ম আছে, তাহা এই পরগণার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

(৫) বেজুরা ; — শ্রীহট্ট জেলাস্থ মাধবপুর থানার এলাকাভুক্ত একটী পরগণা।

(৬) কৈলা ; — কৈলাসহর। এই স্থানে বর্ত্তমান কালে ত্রিপুর রাজ্যের বিভাগীয় আফিস ইত্যাদি আছে। এই স্থান মনু নদীর তীরবর্ত্তী।

(৭) ভানু গাছ ; — ইহা শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত, কুলাউড়া থানার অধীনস্থ একটী পরগণা।

(৮) বিষ্ণাউড়ি ; — ইহা একটী গ্রাম। এই স্থান কসবার পূর্ব্বদিকে ও বিশালগণের উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত।

(৯) লঙ্গলা ; — ইহা শ্রীহট্ট জেলার একটী পরগণা। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের টিলাগাও ষ্টেশন এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত।

(১০) বরদাখাত ; — ইহা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। এই স্থান মেঘনা ও গোমতী নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বরদেশ্বরী বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সেই যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব হইয়াছিল। অতঃপর ক্রমান্বয়ে সমগ্র কুকি প্রদেশ ত্রিপুরেশ্বরের হস্তগত হয়। এই সময় ত্রিপুর রাজ্যের পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মদেশের সহিত সংলগ্ন হইয়াছিল।

চট্টগ্রাম অভিযান ও বিজয়

মহারাজ ধন্য, ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ খৃঃ) সেনাপতি রায় কাচাগের (চয়চাগের) অধিনায়কত্বে বিস্তর সৈন্য লইয়া স্বয়ং চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। তিনি এই যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া গৌড় সৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"তারপরে শ্রীধন্যমাণিক্য নৃপবর।
চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর।।
চৌদ্দশ পাঁচত্রিশ শকে সমর জিনিল।
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল।।
গৌড়ের যতেক সৈন্য চট্টলেতে ছিল।
শ্রীধন্যমাণিক্য তাকে দূর করি দিল।।"

— ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

হোসেন সাহের ত্রিপুরা আক্রমণ

'কামরূপ কোপতা বিজয়ী' গৌড়েশ্বর হোসেন সাহ পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং গৌড়াইমল্লিক নামক সেনাপতির অধীনে বিস্তর সৈন্য ও হস্তী, ঘোড়াসহ বিপুল নৌ-বহর ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাহারা গোমতী নদী পথে কুমিল্লায় আসিয়া মেহেরকুল দুর্গ আক্রমণ ও জয় করিল। ত্রিপুর সৈন্য পশ্চাৎপদ হইয়া চণ্ডীগড় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। মোগল বাহিনী তাহাদের অনুসরণ না করিয়া রাজধানী আক্রমণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইল।

এই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ কৌশলক্রমে পাঠান সৈন্যদিগকে যেভাবে নদীস্রোতে ডুবাইয়া মারিয়াছিল, তদ্বিবরণ অতঃপর বর্ণিত হইবে। এ যাত্রায় গৌড়াই-মল্লিক হতাবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া কোনমতে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ধন্যমাণিক্যের আরাকন বিজয়

ইত্যবসরে চট্টগ্রামে পুনর্ব্বার গৌড় সৈন্য আগমন করায়, ধন্যমাণিক্য তথায় যাইয়া উক্ত প্রদেশ সম্যকরূপে হস্তগত এবং পাঠানদিগকে বিতাড়িত করিয়া এক সৈন্যবাস স্থাপন করিলেন। অতঃপর রসাঙ্গ (আরাকান) রাজ্য আক্রমণ ও কিয়দংশ অধিকার করিয়া বিজিত প্রদেশে এক কিল্লা স্থাপন ও পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে বিজয়ী সেনাপতিকে পূর্ব্বকথিত "রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই সেনাপতি রসাঙ্গের অবশিষ্টাংশ জয় করিতে অসমর্থ হওয়ায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্য তাঁহার সাহায্যার্থ রায়কাচাগ (চয়চাগ) ও রায়কছম নামক প্রবল পরাক্রান্ত সেনাপতিদ্বয়কে পাঠাইলেন। কিন্তু ইতেমধ্যে হোসেন সাহ পুনর্ব্বার ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত বিস্তর

সৈন্য প্রেরণ করায়, ত্রিপুরেশ্বরকে এ যাত্রায় আরাকান বিজয়ের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহা ১৪৩৭ শকের (১৫১৫ খৃঃ) কথা।

হোসেন সাহের পুনরাক্রমণ

হোসেন সাহ এবার বিপুল-বাহিনীসহ হৈতন খাঁ ও করা খাঁ নামক সেনাপতিদ্বয়কে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই অভিযানে পাঠানের এক শত হস্তী, পঞ্চ সহস্র ঘোটক এবং এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল।

এই সময় ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগ (চয়চাগ) চট্টগ্রাম রক্ষার নিমিত্ত তথাকার সেনানিবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। পাঠান বাহিনীর আগমন বার্ত্তা শ্রবণে তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য চট্টগ্রামে রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্যসহ হৈতন খাঁয়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

এবার পাঠান সৈন্য গোমতী পথে না আসিয়া সরাইল, কৈলারগড় (কসবা) ও বিশালগড়ের পথে অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ জামির খাঁ গড় আক্রমণ করিল। এই গড়ের অধিনায়ক খড়্গ রায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও দুর্গ রক্ষণে সমর্থ হইলেন না। হৈতন খাঁ দুর্গ অধিকার করিলেন, পরাজিত ত্রিপুর সেনানী ছয়ঘরিয়া দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। হৈতন খাঁ প্রবল বিক্রমে এই দুর্গও আক্রমণ করায় দুর্গরক্ষক সেনাপতি গগন খাঁ তৃতীয় প্রহরকাল ভীষণ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, পরিশেষে পাঠানের প্রবলবেগ সহ্য করিতে অপারগ হইয়া শ্রান্ত সৈন্যদলসহ রাঙ্গামাটী (উদয়পুর) অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে বিজয়ী হৈতন খাঁ রাজধানী আক্রমণে উদ্যত হইলেন এবং ডোমঘাটির পথে শিবির সন্নিবেশিত করিয়া আক্রমণের সুযোগ প্রতীক্ষায় রহিলেন।

বিনাযুদ্ধে পাঠান বাহিনীর পরাজয়

এবারও ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগ (চয়চাগ) পূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি পাঠানদিগকে গোমতীর স্রোতে ভাসাইয়া দিয়া, সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছিলেন। এই সময় পলায়নপর হৈতন খাঁ-এর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। তিনি —

“ছকড়িয়ার ঘাটে গিয়া সতা করি কৈল।
এত সৈন্য সঙ্গে আনি জিনিতে না পাইল।।
এহার অধিক সৈন্য যাহার যে হয়।
সে পুনি আসুক এথা পরম নির্ভয়।।
তা হইতে অল্প সৈন্য না আসুক হেথা।
শপথ করিল আমি এই সত্য কথা।।
যে সব পাঠান হয় যেই যোদ্ধা সব।
অল্প সৈন্যে যে বা আসে সে সব গর্দ্দভ।।”

ধন্যমাণিক্য খণ্ড, — ২৮ পৃঃ।

হোসেন শাহ কর্ত্তৃক তৃতীয়বার ত্রিপুরা আক্রান্ত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইবার মুসলমানগণ কৈলারগড় (জাজিনগর বা কসবা) দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। কৈলারগড়ের পশ্চিম দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী এক মাইল দূরে, বিজয় নদীর তীরে পাঠান-শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু রাজমালায় এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। * এই সময় কৈলারগড়ের সন্নিহিত স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে ত্রিপুর বাহিনী পরাজিত ও ত্রিপুরার কিয়দংশ হোসেন সাহের কুক্ষিগত হইয়াছিল, এরূপ বুঝা যায় ; এবম্বিধ অনুমানের প্রকৃষ্ট কারণও বিদ্যমান আছে। সুবর্ণগ্রামে অবস্থিত মস্‌জিদের শিলালিপি পাঠে জানা যায়, সুলতান হোসেন সাহের শাসনকালে ইক্লাম মোজমাবাদের উজীর এবং ত্রিপুরা ভূমির শাসনকর্ত্তা খওয়াস খাঁ ৯১৯ হিজরী (১৪২২ শকে) সেই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। † এই "ত্রিপুরা ভূমির শাসনকর্ত্তা" বাক্যদ্বারাই ত্রিপুরার কিয়দংশ মুসলমানগণের হস্তগত হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ‡

হোসেন শাহের তৃতীয় আক্রমণ ও জয়লাভ

তৃতীয়বারের যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বর পরাস্ত হইয়া থাকিলেও তদ্দরুণ ত্রিপুরার বিশেষ কিছু ক্ষতি হয়নি এবং যে সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল না এবং যে সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা উদ্ধার করিতে অধিক বিলম্ব ঘটে নাই।

পাঠান সেনাপতি ছুটি খাঁ-এর অনুজ্ঞায় কবি শ্রীকর নন্দী ১৫৮৬ শকে অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ "ছুটিখাঁনের মহাভারত" নামে অভিহিত হইয়াছে। হোসেন সাহের পূর্ব্বোক্ত অকিঞ্চিৎকর বিজয়ের সূত্র ধরিয়া, শ্রীকর নন্দী তাঁহার রচিত গ্রন্থের পুরোভাগে লিখিয়াছেন ;—

শ্রীকর নন্দীর তোষামোদ-প্রিয়তা

"তান এ সেনাপতি লস্কর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান।।

---

* স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন ;—

"কৈলারগড় সন্নিকটে হোসেন শাহের সহিত মহারাজ ধন্যমাণিক্যের যে সংগ্রাম হইয়াছিল, রাজমালা লেখক তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। বোধ হয় ইহার পরিণাম ত্রিপুরেশ্বরের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক হয় নাই, এ জন্যই রাজমালা লেখক তাহা গোপন করিয়াছেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাঃ, ৩য় অঃ।

† This Mosque was built in the reign of the Sultan of the age, the heir of the Kingdom of Soloman, Allauddungawaddin Abil Muzaffar Hussain Shah — * * * * by the great and noble Khan, namely Khawac Khan, Governor of the land of Tipperah and Vazir of the District Muazzamabad, — may God preserve him in both worlds. Dated 2nd Robi II, 919 (7-6-1513).

J. A S. B. — Vol. XII, I., — P. P. 333-334.

এই খৃষ্টাব্দের অঙ্ক বিশুদ্ধ নহে। ৯১৯ হিজরীতে ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে না, ১৫০১ খৃষ্টাব্দ হইবে।

‡ এই শিলালিপির বিবরণ অতঃপর প্রদান করা হইবে।

ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বত গহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।।
গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহা বন মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ।।
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি।।" ইত্যাদি।

ইহা কবির আশ্রয়দাতাকে বীরেন্দ্র সমাজে উচ্চ আসন প্রদান করিবার ব্যর্থ প্রয়াস ব্যতীত আর কিছু নহে। হোসেন সাহ ত্রিপুরেশ্বরের হস্তে বারম্বার পরাজিত হইবার কথা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে ; তাঁহার দুর্গতি ভোগের আরও অনেক কথা আছে, তাহা অতঃপর বলা হইবে। তৎসমুদয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা তোষামোদকারী কবির স্তাবকতা মাত্র।

ধন্যমাণিক্যের পুত্র দেবমাণিক্য ভুলুয়া প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন।

দেবমাণিক্যের ভুলুয়া ও চট্টগ্রাম বিজয়

ধন্যমাণিক্য পাঠান আহবে লিপ্ত থাকা কালে, মঘগণ চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিল, দেবমাণিক্য তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া হৃত-প্রদেশের পুনরুদ্ধার ও তথায় একটী থানা (সেনানিবাস) সংস্থাপন করেন।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য উত্তরদিকে শ্রীহট্ট এবং খাসিয়া (জয়ন্তা) রাজ্যের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন এবং শ্রীহট্টে এক সৈন্যাবাস স্থাপন পূর্ব্বক, সৈন্যাধ্যক্ষ কালানাজিরকে সেই দেশ রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বিজয়মাণিক্যের শ্রীহট্ট বিজয় বিবরণ।

গৌড়েশ্বর সুলতান সুলেমান কররাণি, * ত্রিপুরা জয় করিবার নিমিত্ত তাঁহার শ্যালক ও সেনানায়ক মমারক খাঁকে (মতান্তরে মহম্মদ খাঁ), তিন সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক সৈন্যসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে মমারক খাঁয়ের সহিত যে যুদ্ধ হয় তাহাতে প্রথমতঃ ত্রিপুর সৈন্যগণ পরাস্ত ও পলায়নপর হইয়াছিল, পরে নব-বল সঞ্চয় করিয়া প্রবল পরাক্রমে

সুলতান সুলেমান কররাণির চট্টগ্রাম আক্রমণ ও পরাজয়

* রাজমালার রচয়িতা গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই। কৈলাসবাবু বলিয়াছেন ;— "কররাণি বংশীয় উড়িষ্যা বিজয়ী সুলতান সুলেমান চট্টগ্রাম অধিকার জন্য মহম্মদ খাঁ নামক জনৈক সেনাপতির অধীনে তিন সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতি পেররণ করেন।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৩য় অঃ, ৫৭ পৃঃ।

এতৎসম্বন্ধে ত্রিপুর বংশাবলী পুথিতে পাওয়া যায় ;—

"বঙ্গদেশের অধিকারী সোলেমান ছিল।
চট্টগ্রামের থানা আসি আক্রমণ করিল।।
মহম্মদ খাঁ সোলেমানের সেনাপতি।
তের হাজার সৈন্যসহ হৈল উপস্থিতি।।" ইত্যাদি।

পুনর্ব্বার মোগলদিগকে আক্রমণ করিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে আট মাস যুদ্ধ করিয়াও পাঠানদিগকে পরাজয় করিতে সক্ষম না হওয়ায়, মহারাজ বিজয় ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাপতিগণের দণ্ডবিধান করতঃ শ্রীহট্ট থানা হইতে কালানাজিরকে আনাইয়া বিস্তর সৈন্যসহ চট্টগ্রামে প্রেরণ করিলেন। এই সেনাপতি প্রত্যুষে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রবল পরাক্রমের সহিত সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা কর্ত্তৃক অপমানিত সৈন্যাধ্যক্ষগণ কেহই তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর না হওয়ায়, নাজির একাকী যুদ্ধহেতু ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া চারিদণ্ড বেলা থাকিতে সমরানলে স্বীয় জীবন আহুতি প্রদান করিলেন।

পাঠানগণ যুদ্ধ জয় করিয়া বিজয়োল্লাসে গড়ে প্রবেশ করিল। রাত্রিকালে কেহ নিশ্চিন্ত মনে আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে, কেহ শ্রান্ত হস্তী ও ঘোড়াকে জলপান করাইতেছে, কেহ বা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ অকস্মাৎ গড়ে প্রবেশ করিয়া, পাঠানদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা অপ্রস্তুত ছিল, সুতরাং অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইল এবং অল্প সংখ্যক পাঠান অতিকষ্টে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। সেনাপতি মমারক খাঁ ধৃত হইয়া লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধাবস্থায় রাজদরবারে নীত হইবার পর, তাঁহাকে চতুর্দ্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল।

বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযান

অতঃপর বিজয়মাণিক্য, মুসলমানগণের বারম্বার আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত বঙ্গদেশ আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় পাঠান ও মোগলের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হওয়ায়, পাঠানগণ বিশেষ বিব্রত ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়াছিল। সুলেমান কররাণির পুত্র দায়ুদ এই সময় বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ বিজয় পঞ্চ সহস্র রণতরী, পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী এবং চব্বিশ সহস্র পদাতিক ও বহুসংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমেই সুবর্ণগ্রামের মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে পরাজয় করিয়া, সেই প্রদেশ লুণ্ঠন করিলেন। তৎপর ক্রমান্বয়ে লক্ষ্যা নদী অতিক্রম করিয়া পদ্মাবতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি যে পথ অনুসরণ করিয়া যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, ত্রিপুর বংশাবলীতে তাহা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"বিজয়মাণিক্য রাজা, এমত করিয়া সজ্জা,
দিগ্বিজয়ে গমন করিল।
গোমতী নদী দিয়া, চলে নৌকা ভাটি বাইয়া,
মেঘনা নদেতে উত্তরিল।।
তাহে স্নানদান করি, চলিলেন বরাবরি,
ব্রহ্মপুত্র কুলে উত্তরিল।
তাহাতে করিয়া স্নান, ব্রাহ্মণে করিয়া দান,
ধলেশ্বরী উজাইয়া চলিল।।

বিক্রমপুরের মধ্যে গিয়া,　　　　　　　　কীর্ত্তিনাশা * পাড়ি দিয়া,
কলাকোপার গড়ে উত্তরিল।
কতদিন সেইখানে,　　　　　　　　রহিল আনন্দ মনে,
যমুনা পাড় হৈয়ে শেষে গেল।।
ব্রহ্মপুত্র ভাটি বাইয়া,　　　　　　　　নসিরাবাদ গড় হৈয়া,
মেঘনা নদী উজাইয়া গমন।
শ্রীহট্ট নগর মাঝে,　　　　　　　　উত্তরিল মহারাজে,
দেখি লোক চমকিত মন।।"　　ইত্যাদি।

ত্রিপুর বংশাবলী।

রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, মহারাজ বিজয় সুবর্ণগ্রাম বিজয়ের পর, লক্ষ্যা ও ইছামতী অতিক্রম করিয়া পদ্মা নদীতে গিয়াছিলেন। ইছামতীর তীরবর্ত্তী যাত্রাপুর নামক স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিবার কথাও রাজমালায় পাওয়া যায়। তৎপর মহারাজ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়া † কৈলারগড়ে গমন করেন। তথা হইতে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট হইতে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া, রাজধানী রাঙ্গামাটী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই যাত্রায় তিনি যে সকল স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান অল্পায়াসেই তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

মঘ জাতির সহিত সঙ্ঘর্ষ

শেষ জীবনে বিজয়মাণিক্যের কিয়ৎ পরিমাণে দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পাইয়াছিল। এই সময় তিনি মঘদিগের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম রক্ষা লইয়া বিশেষ বিব্রত ছিলেন। রাক্ষিয়াং (আরাকান) ও রাম্বুবাসী মঘগণের সমবেত চেষ্টার ফলে চট্টগ্রাম কখনও ত্রিপুরেশ্বরের এবং কখনও বা মঘদিগের হস্তগত হইতেছিল। বিজয়লক্ষ্মী কাহার অঙ্কশায়িনী হইবেন, তাহা অনিশ্চিত অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল।

মহারাজ বিজয় যে বৎসর মানবলীলা সম্বরণ করেন, সেই বৎসর খ্যাতনামা ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারী রল্‌ফ্ ফিছ্ চট্টগ্রামে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ;— "সাতগাঁও হইতে আমি ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যের মধ্য দিয় চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলাম। এই সময়

---

* 'কীর্ত্তিনাশা' পদ্মানদীর অংশবিশেষের নাম। বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্তর্ভুক্ত চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের কীর্ত্তি চিহ্নগুলি উদরসাৎ করিয়া 'কীর্ত্তিনাশা' নাম লাভ করিয়াছে। ইঁহাদের শেষ কীর্ত্তি রাজাবাড়ির মঠ ১৯২৩ খৃঃ অব্দে এই নদীগর্ত্তে লীন হইয়াছে। সলরজঙ্গ মহারাজ রাজবল্লভ সেন রায় রাইয়া বাহাদুরের বাসভবন সহ অতুলনীয় কীর্ত্তিকলাপও এই নদীগর্ত্তে নিমজ্জিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উভয় তীরবর্ত্তী কত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কীর্ত্তি যে এই সর্ব্বগ্রাসিণী নদীর গর্ত্তে বিলীন হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই।

† লোহিত্যের (ব্রহ্মপুত্র নদের) পশ্চিমভাগস্থ গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত মহারাজ বিজয় গমন করিয়াছিলেন, রাজমালায় এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা ;—

"লোহিত পশ্চিমভাগে বসতি জাহ্নবী।
পূর্ব্বভাগে যমুনা যে সরস্বতী দেবী।।"
— বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

রাক্ষিয়াং ও রাম্বুবাসী মঘদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বর অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ত্রিপুরা পতির দুর্ব্বলতায় চট্টগ্রাম বা পোর্টগ্রেণ্ডা বারংবার রাক্ষিয়াং রাজার হস্তগত হয়।" *

অনন্তমাণিক্যের হত্যা বিবরণ

বিজয়মাণিক্যের পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র অনন্তমাণিক্য ত্রিপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেড় বৎসর রাজত্ব করিবার পর অনন্তের শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদ নারায়ণ তাঁহাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। অনন্তমাণিক্যের অল্পকাল ব্যাপী শাসন সময়ে কোন সংগ্রাম উপস্থিত হয় নাই।

উদয়মাণিক্য ও দায়ুদ শাহ্

সেনাপতি গোপীপ্রসাদ উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন (১৪৯৪ শক — ১৫৭২ খৃঃ)। গৌড়েশ্বর শুনিলেন, ত্রিপুরার রাজবংশ বিনাশ করিয়া ভিন্ন বংশীয় ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। ইহাই চট্টগ্রাম বিজয়ের উত্তম সুযোগ মনে করিয়া, ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিলেন। এই যুদ্ধ সঙ্ঘটনের শকাঙ্ক রাজমালায় নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, উদয়মাণিক্য ১৫৭২ খৃঃ-অব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস আলোচনায় জানা যায়, এই কালে সুলেমান কররাণির পুত্র, শেষ পাঠান শাসনকর্ত্তা দায়ুদ বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি ১৫৭৫ খৃঃ-অব্দে সম্রাট আকবরের প্রভুত্ব উপেক্ষা করিয়া বিহার প্রদেশ আক্রমণ করেন। এবং এই যুদ্ধে পরাভূত হইয়া দিল্লীর আনুগত্য স্বীকারে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই দায়ুদকেই চট্টগ্রাম আক্রমণকারী বলিয়া মনে হয়। পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন, উদয়মাণিক্য ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। মিঃ জে, জি, কামিং, সি-আই-ই, এবং মিঃ ই, এফ্, সেণ্ডিস্ কৈলাসবাবুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন ; কিন্তু এই মত অভ্রান্ত নহে। রাজমালায় স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ আছে, মহারাজা উদয় ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খৃঃ অব্দে) রাজা হইয়াছিলেন। † কৈলাসবাবু আরও বলেন, —

"এই সময় মোগলেরা চট্টগ্রাম অধিকার করিতে অগ্রসর হয়। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ উদয়মাণিক্য তাহাদিগকে পথিমধ্যে অবরোধ করিবার জন্য বৃহৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন।" ‡

---

* From Satagan I travelled by the country of the King of Tippera, with whom the Mogen have almost continual wars. The Mogen which be of the Kingdom of Recon and Rame, be stronger than the King of Tippera. So that Chatigan, or Portogrando, is often times under the King of Recon. —— (Rolph Fitch.)

† "গৌড়েশ্বরে শুনে বিজয়মাণিক্য মরণ।
চৌদ্দশ চৌরানব্বই শকে উদয় রাজন।।"

উদয়মাণিক্য খণ্ড, — ৫৯ পৃঃ।

‡ কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৫ম অঃ, ৬৫ পৃঃ।

কৈলাসবাবুর কথিত ১৫৮৫ খৃঃ-অব্দে উদয়মাণিক্য রাজ্যলাভ করিলে, তাঁহার শাসনকালের প্রথম ভাগে মোগলগণ কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম আক্রমণ সম্ভবপর হইত। তাঁহার এই উক্তিও ভ্রমসঙ্কুল। মোগল কর্ত্তৃক উদয়মাণিক্য আক্রান্ত হন নাই, পাঠান কর্ত্তৃক আক্রমণের কথা রাজমালায়ই পাওয়া যায়। * রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেবও তাহাই বলিয়াছেন। † সুতরাং কৈলাসবাবুর নির্দ্ধারণ যে প্রমাদপূর্ণ, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

উদয়মাণিক্যের পরাজয়

এই যুদ্ধে উদয়মাণিক্য, স্বীয় ভগিনীপতি ও প্রধান সেনানায়ক রণাগণ নারায়ণের অধীনে তিন হাজার সেনাপতিসহ বায়ান্ন হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ‡ সেনাপতিগণের মধ্যে চন্দ্রদর্প নারায়ণ, চন্দ্রসিংহ নারায়ণ, উড়িয়া নারায়ণ, অরিভীম নারায়ণ, আগুয়ান নারায়ণ, গজভীম নারায়ণ প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা বীরপুরুষ গিয়াছিলেন; হস্তী, ঘোড়াও অনেক ছিল। বৃদ্ধ রণাগণ একবার পাঠানদিগকে জয় করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। তাই তিনি গর্ব্বোন্নত শিরে, রাত্রিকালেই পাঠান শিবির আক্রমণ জন্য যাত্রা করিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিকে শৃগাল দল উচ্চরব করিয়া নিস্তব্ধ দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছিল, বৃক্ষ ডালে গৃধ্রসমূহ পাখা ঝাড়িতেছিল এবং মুহুর্ম্মুহুঃ উল্কাপাত হইতেছিল। এই সকল অমঙ্গলসূচক ঘটনা দর্শনে সেনাপতিগণ, রাত্রিকালে শত্রু সম্মুখীন হইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু গর্ব্বিত রণাগণ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

পাঠানগণ প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া ত্রিপুর সেনাবাহিনীর অজ্ঞাতসারে পথিমধ্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। ত্রিপুর সৈন্যগণ এই অভাবনীয় আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইল না, তাহাদের অধিকাংশ পাঠান হস্তে নিহত হইল এবং কতক পলায়ন করিল। রণাগণ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অরণ্যপথে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে ত্রিপুরার চল্লিশ সহস্র সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল, পাঠানের নিহত

---

* "খণ্ডলে ত গিয়া তারা গড় করি রৈল।
পাঠান আইসে বলি সাবহিতে ছিল।।"
উদয়মাণিক্য খণ্ড, — ৭০ পৃঃ।

† As the Pathans were marching on Cittagong.
J. A. S. B. — Vol. XIX.

‡ "রাজার ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ।
সেনাপতি করে তাকে সৈন্যের রক্ষণ।।
বায়ান্ন হাজার সৈন্য তার সঙ্গে দিল।
তিন হাজার সেনাপতি তার সঙ্গে ছিল।।"
উদয়মাণিক্য খণ্ড — ৬৯ পৃঃ।

সৈন্যের সংখ্যা পঞ্চ সহস্র। * ত্রিপুরার এরূপ গুরুতর ক্ষতি পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই।

এই যুদ্ধের পর গৌড়েশ্বর চট্টগ্রামের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে পিরোজ খাঁ আন্নি ও জামাল খাঁ পন্নি নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে আরও বিস্তর সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরেশ্বর চট্টগ্রাম পুনর্ব্বার আক্রমণ করিয়া, বিপুল বিক্রমে ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর কাল মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এবারও বিজয়লক্ষ্মী পাঠানের অঙ্কশায়িনী হইলেন। এই যুদ্ধেই উদয়মাণিক্যের চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধারের আশা নির্ম্মূল হইয়াছিল।

রাজার যুদ্ধে গমন।

রাজগণের শৌর্য্য

পূর্ব্বকালের ন্যায় এই সময়ও রাজগণের স্বয়ং যুদ্ধ যাত্রার নিয়ম ছিল। পূর্ব্ব কথিত বিবরণসমূহ আলোচনায় জানা যাইবে, মহারাজ ধন্য বারম্বার সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধন্যমাণিক্যের পুত্র দেবমাণিক্য স্বয়ং ভুলুয়া হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত জয় করেন। বিজয়মাণিক্যের সময়ে পাঠান সৈন্যগণ বিদ্রোহী হওয়ায়, মহারাজ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইয়া পশ্চিমে পদ্মাবতীর পর্য্যন্ত এবং উত্তরে শ্রীহট্ট জেলা জয় করিয়াছেন। কেউ কেউ বলেন, মহারাজ বিজয় এই অভিযানকালে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাজকুমারগণের সেনাপতিরূপে যুদ্ধযাত্রার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। স্থূলকথা, সেকালে রাজগণ রাজ্যভোগ-বিলাসী মোমের পুতুল ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই সাহসী এবং বলবীর্য্যশালী বীরপুরুষ ছিলেন। দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা অপেক্ষা সমরক্ষেত্রে শয়ন তাঁহাদের অধিকতর স্পৃহনীয় ছিল। সেকালে ত্রিপুরার ক্ষাত্রবীর্য্য মূর্ত্তভাবে আবির্ভূত হইবার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। বারম্বার ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও ত্রিপুরেশ্বরগণ যেভাবে রাজ্যের স্বার্থ ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

সেকালে বিজিত প্রদেশ লুণ্ঠন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজমালায় এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

---

* "পঞ্চ সহস্র পাঠান পড়িল সে রণে।
চল্লিশ হাজার পড়ে ত্রিপুরার গণে।।"

উদয়মাণিক্য খণ্ড, — ৭১ পৃঃ।

এই ক্ষতি সম্বন্ধে রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেব বলেন ;—

"The Tripura troops were routed with a loss of 40,000 men while the Pathans lost only 5,000."

J. A. S. B. — Vol. XIX.

রণ-কৌশল।

ত্রিপুর বাহিনী কোন কোন সময় অদ্ভূত রণ-কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি রায়কাচাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৌশলী ছিলেন। তিনি আট মাসের চেষ্টায়ও থানাংছি নামক উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গস্থিত কুকিগণের সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিতে অসমর্থ হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। সেই দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতারোহণের উপায় উদ্ভাবন অসম্ভব মনে করিয়া তিনি দিন দিন ভগ্নোৎসাহ হইতেছিলেন। এই সময় একটী সুবৃহৎ (গো-সাপ) গোধিকা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, এবং সেই গো-সর্পই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিলেন। গোধিকার কটিদেশে বেত্র বন্ধন করিয়া তাহাকে পর্ব্বতে চড়াইয়া দিলেন। গোসাপটী ক্রমে পর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিল, এদিকে ক্রমান্বয়ে সুদীর্ঘ বেত্র যোজনা করা হইতেছিল। গোধিকা পর্ব্বতের সানুদেশে আরোহণ করিবার পর হস্তস্থিত বেত্র টানিয়া দেখা হইল, তাহা বিশেষ দৃঢ় হইয়াছে। অতঃপর রাত্রিকালে, সেই বেত্র অবলম্বন করিয়া সৈন্যগণ একে একে পর্ব্বতারোহণ করিল এবং অকস্মাৎ কুকিদিগকে আক্রমণ করিয়া অল্পায়াসেই দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইল।

থানাংচি দুর্গ জয়

ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত হোসেন সাহ, গৌরমল্লিক নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যদল গোমতী নদীপথে আগমন পূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্যের মেহেরকুল গড় আক্রমণ ও জয় করিয়া রাজধানী আক্রমণের নিমিত্ত বিজয়োল্লাসে যাত্রা করিল, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহাদের নৌ-বাহিনী গোমতীর বক্ষ আচ্ছাদন করিয়া রাঙ্গামাটির (উদয়পুর) দিকে চলিল। ত্রিপুর সেনানায়ক রায়কাচাগ উপায়ান্তর না দেখিয়া, স্বীয় উদ্ভাবনী কৌশল অবলম্বনে, গোমতী নদীর উপরিভাগে (উজানে) সুদৃঢ় বাঁধ প্রস্তুত করিলেন। পার্ব্বত্য নদী একমাত্র পর্ব্বত নিঃসৃত জলধারা দ্বারা একটানা স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। নদীতে বাঁধ দেওয়ায় স্রোত বন্ধ হইয়া বাঁধের নিম্নভাগ শুষ্ক হইয়া থাকে। নদীতে বাঁধ দেওয়ায় স্রোত বন্ধ হইয়া বাঁধের নিম্নভাগ শুষ্ক হইয়া গেল এবং উপরিভাগের জল স্ফীত হইয়া উঠিল। পাঠানগণের অগণিত নৌকা গোমতীর বালুকাময় বক্ষে আবদ্ধ হওয়ায়, সৈন্যগণ মধ্যে অনেকে নৌকা ছাড়িয়া চড়ায় শিবির স্থাপন করিল। এইভাবে তিন দিবস অতীত হইয়া গেল। চতুর্থ দিবস রাত্রিতে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় আবদ্ধ জলরাশি সশব্দে প্রবলবেগে আসিয়া মুসলমানগণের উপর পড়িল। তাহারা নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছিল, — আত্মরক্ষার অবসর ঘটিল না। তাহাদের নৌ-বহর, সৈন্যদল, যুদ্ধ-সরঞ্জাম সমস্তই প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল। এই ঘটনায় আত্মরক্ষা করাই সেনাপতি গৌরমল্লিকের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পরিত্যক্ত হস্তী, ঘোড়া এবং নানাবিধ বস্তু ত্রিপুর সৈন্যগণের হস্তগত হইল।

হোসেন শাহের পরাজয় বিবরণ

গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের এই পরাজয়-কলঙ্ক অসহনীয় হইল, তিনি পুনর্ব্বার হৈতন খাঁ ও করা খাঁ নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধিনায়কত্বে বিপুল-বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। এই অভিযানে একশত হস্তী, পঞ্চ সহস্র ঘোটক ও এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। এতদ্ব্যতীত দ্বাদশ বাঙ্গালার (বার ভুঞাগণের) প্রদত্ত সৈন্যগণও এই অভিযান যোগদান করিয়াছিল। *

হোসেন শাহের দ্বিতীয়বার পরাজয়

পাঠান সেনানী, জামির খাঁ গড় ও ছয়ঘরিয়া গড় জয় করিয়া ডোমঘাটিতে যাইয়া ছাউনী রচনা করিলেন। এই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ, পর্ব্বতজাত বিষলতা ফেলিয়া গোমতীর জল বিষাক্ত করিয়াছিল। † সেই জল পান করিয়া মুসলমানগণের মধ্যে দুই চারিজনের মৃত্যু হইবার পরেই তাহারা ত্রিপুর সৈন্যের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিল। এবং জলপানের নিমিত্ত দুই প্রহরের মধ্যে এক দীর্ঘিকা খনন করিয়া লইল। এই জলাশয় মুসলমানগণের খনিত বলিয়া 'তুরুক দীঘি' নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহা দেবমাণিক্য কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল ; তাহার অস্তিত্ব অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

এইবারও ত্রিপুর সেনাপতি রায়কাচাগ পূর্ব্ব পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়া তাহার উপরিভাগে জল আবদ্ধ করিলেন ; এই বাঁধ সাত দিবস রাখা হইয়াছিল। পাঠানগণ পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া প্রথমতঃ নদীগর্ভে নামিতে সাহসী হইল না ; যখন দেখা গেল, দীর্ঘকাল নদীর অবস্থা একরূপই আছে, তখন পার্ব্বত্য উচ্চনীচ পথ অপেক্ষা, শুষ্ক নদীপথ সুগম ও বিশেষ সুবিধাজনক মনে করিয়া, তাহারা রাত্রিকালে গোপনে নদীপথ ধরিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে ত্রিপুর সৈন্য অন্তরালে থাকিয়া তাহাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছিল। মুসলমানগণ নদীগর্ভে নামিয়া আরামের সহিত উজানের দিকে যাইবার কালে, নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায়, এক সপ্তাহের সঞ্চিত বারিরাশি প্রবল বেগে আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল। সেই প্রবল স্রোতের সঙ্গে সহস্র সহস্র ভেলা ভাসিয়া আসিতেছিল, প্রত্যেক ভেলায় মনুষ্যাকৃতি তিনটী করিয়া পুতুল এবং প্রত্যেক পুতুলের হাতে প্রজ্বলিত মশাল ছিল। মুসলমানগণ নদীবেগ হইতে আত্মরক্ষা লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহার উপর আবার মশাল হস্তে

---

* "একশত হস্তী পঞ্চ সহস্র ঘোটক।
লক্ষৈক পদাতি চলে ধানুকী কটক।।
দ্বাদশ বাঙ্গালা চলে হৈতন খাঁ সহিতে।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড, — ২৫ পৃঃ।

† "বিষলতার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রবাদ বাক্য অতঃপর প্রদান করা হইবে।

অসংখ্য সৈন্য আসিতেছে মনে করিয়া, ভীত ও চিন্তিত হইল। ইত্যবসরে ত্রিপুর সৈন্য পশ্চাদ্ভাগস্থ নিবিড় অরণ্যে অগ্নি প্রজ্বলন দ্বারা পথ রুদ্ধ করিয়া, নদীর দুই পাড় হইতে মুসলমানদিগকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। সম্মুখে জল প্রবাহ, পশ্চাৎভাগে দাবানল এবং উভয় পার্শ্বে শত্রু সৈন্য, এ হেন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত সেনাপতি হৈতন খাঁ ও করা খাঁ প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক অশ্বারোহণে পলায়ন করিলেন। সৈন্যগণের মধ্যে অধিকাংশ নদীগর্ভে সমাহিত এবং ত্রিপুর সৈন্য কর্ত্তৃক নিহত হইল। * যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে চতুর্দ্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করা হইল।

রণক্ষেত্রে ধৃত সেনাপতিগণের অবস্থা

প্রাচীনকালে রণক্ষেত্রে পরাজিত সেনাপতি কিম্বা বিশেষ ব্যক্তি ধৃত হইলে তাঁহাকে পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় রাজদরবারে উপস্থিত করা হইত। পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

পুরস্কার ও দণ্ড।

পুরস্কার

রণ-জয়ী সৈন্যাধ্যক্ষগণ রাজদরবারে উপাধি লাভ করিয়া সম্মানিত ও স্মরণীয় হইতেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিচ্ছদ, পুষ্প, হস্তী এবং ভূসম্পত্তি পুরস্কার লাভের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। সেনাপতি রায়কাচাগ কুকিগণের থানাংছি দুর্গ ও কুকি প্রদেশ জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবার পর, মহারাজ ধন্যমাণিক্য তাঁহাকে নিম্নোক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন ;—

"হাসিয়া নৃপতি তাকে বহুমান্য কৈল।
বস্ত্র পুষ্প হস্তী দিয়া গৃহে পাঠাইল।।
বহুতর গ্রাম পাইল রাজপুত্র সম।
রায়কাচাগ রায় কছম যুদ্ধেতে উত্তম।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

---

* স্পেনীয়গণ কর্ত্তৃক লিডন্ (Leyden) আক্রান্ত হইবার পর, ওলন্দাজেরা এবম্বিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে Rev. James Long সাহেব বলিয়াছেন ;—

The Historical basis of this myth is probably that the Tripura troops adopted the same practice as was employed by the Dutch against the Spaniards at the siege of Leyden, Viz, breaking down embankments so that the hemmed in waters sweep away the enemy.

J. A. S. B. — Vol. XIX.

সৈনিক বিভাগে দণ্ডের ব্যবস্থা কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল। যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে অবমাননার নিদর্শনস্বরূপ চরকা উপহার দেওয়া হইত। থানাংছি দুর্গ অধিকারে অক্ষম ত্রিপুর সৈন্যদিগকে সেনাপতি চয়চাগ (কাচাগ) শাসাইয়া বলিয়াছিলেন ;—

দণ্ড

"কাপুরুষ হও তোরা চরখা হস্তে লবা।
রাজার সাক্ষাতে যাইয়া কি উত্তর দিবা।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিবার পর, ত্রিপুর বাহিনী আট মাস যুদ্ধ করিয়াও হৃত প্রদেশের উদ্ধার সাধন করিতে সমর্থ না হওয়ায়, মহারাজ বিজয়মাণিক্য সেই সময়ে নূতন সেনাপতি প্রেরণ করিয়া, পূর্ব্ব প্রেরিত সৈন্যাধক্ষদিগের নিম্নলিখিতরূপ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন ;—

"আট মাস যুদ্ধ করে পাঠানের সনে।
লইতে না পারে গড়, চাটিগ্রাম স্থানে।।
হেন শুনি বিজয়মাণিক্য ক্রোধ হৈল।
সেনাপতি সকলেরে চরখা পাঠাইল।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

যুদ্ধে অপারগতা হেতু, সূতা কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত রাজার ইঙ্গিত পাওয়া বীরপুরুষের পক্ষে কিরূপ অপমানজনক, তাহা একমাত্র বীরেরই হৃদয়ঙ্গমযোগ্য।

সেনাপতিগণের আধিপত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা।

প্রাচীনকালে প্রধান সেনাপতিগণের হস্তেই রাজ্য শাসনের ভার অর্পিত হইত, একথা অনেকবার বলা হইয়াছে। সৈন্যবল ও শাসনভার এক হস্তে পতিত হওয়ায়, সেনাপতিগণ রাজ্য এবং রাজার উপর প্রভাব বিস্তারের বিশেষ সুযোগ পাইতেন। ইঁহারা ক্ষমতাগর্ব্বে ক্রমশঃ এরূপ দুর্দ্দান্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছিলেন যে, রাজ্যেশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অপর ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের ইচ্ছাধীন হইয়া দাঁড়াইত। কোন কোন দুষ্ট সেনাপতি রাজ্যলোভে, অথবা আক্রোশমূলে রাজাকে বধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজমালায় এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে, নিম্নে এতদ্বিষয়ক আভাস প্রদান করা যাইতেছে।

সৈনিকবল ও শাসনভার এক হস্তে অর্পণের কুফল

মহামাণিক্যের পরলোকগমনের পর, সিংহাসন লইয়া বিষম গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় স্বর্গীয় মহারাজের জ্যেষ্ঠ কুমার ধর্ম্মদেব সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীবেশে বারাণসীধামে বাস করিতেছিলেন। তাঁর অনুজ চতুষ্টয় সিংহাসন লাভের নিমিত্ত পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। সেনাপতিগণও

সেনাপতিগণের প্রভাব

রাজকুমারদিগকে উপেক্ষা করিয়া, প্রত্যেকেই রাজ্যলাভের প্রয়াসী হইলেন ; অথচ একে অন্যের ভয়ে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতে ছিলেন না। পরিশেষে কুমার ধর্ম্মকে রাজা করাই সঙ্গত এবং নিরাপদ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই মীমাংসায় সেনাপতিগণেরই প্রাধান্য ছিল।

সেনাপতিগণের প্রাধান্য হেতু ধন্যমাণিক্যের অবস্থা

ধর্ম্মমাণিক্য, ধন্য ও প্রতাপ নামক দুই পুত্র বর্ত্তমান রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সময়ের অবস্থা আলোচনা করিলে জানা যায়, সেনাপতিগণ ষড়যন্ত্রমূলে জ্যেষ্ঠ ধন্যকে উপেক্ষা করিয়া রাজ্যের চিরন্তন বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় কনিষ্ঠ প্রতাপকে সিংহাসনে বসাইলেন। কিয়ৎকাল পরে আবার তাঁহারাই বালক প্রতাপের শিরে অধার্ম্মিকতার অভিযোগ চাপাইয়া রাত্রিকালে গোপনে তাঁহাকে নিহত করিলেন। প্রতাপের নিধন সাধনের পর সেনাপতিগণ একে অন্যকে অতিক্রম করিয়া সিংহাসন অধিকারের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। এই সময় উচ্ছৃঙ্খল সেনাপতিবৃন্দের অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্জ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল; তাহারা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল; কুমার ধন্য স্বীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন মনে করিয়া জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী পুরোহিতের গৃহে লুক্কায়িত ভাবে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইলেন। অনেক কাটাকাটি মারামারির পর, প্রধান সেনাপতি বুঝিলেন, রাজপুত্র ধন্যকে সিংহাসন অর্পণ করা ব্যতীত উপস্থিত রাষ্ট্রবিপ্লব নিবারণের উপায়ান্তর নাই। তাঁহার প্রস্তাবে অন্য সেনাপতিগণ সম্মত হইয়া, ধন্যের অনুসন্ধানার্থ ধাত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ধাত্রী দলবদ্ধ সেনানীদিগকে দেখিয়া মনে করিলেন, ধন্যের নিধন সাধনদ্বারা রাজ্যলাভের পথ নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সুতরাং তিনি প্রথমতঃ কিছুতেই ধন্যের সন্ধান বলিলেন না। ধাত্রীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রধান সেনাপতি শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথপূর্ব্বক বলিলেন, "ধন্যের কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করা হইবে।" তখন ধাত্রী আশ্বস্তা হইয়া ধন্যের পুরোহিত গৃহে অবিস্থিতির কথা বলিয়া দিলেন।

সেনাপতিগণ অশ্বগজাদি সমন্বিত বিপুল বাহিনীসহ পুরোহিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাজকুমার ধন্যের মনে ধাত্রীর ন্যায়ই সংশয় জন্মিয়াছিল। তিনি ভয়ার্ত্তচিত্তে জীবন রক্ষার নিমিত্ত গৃহকোণে একটী বাঁশের মাচার নীচে যাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। কিন্তু এই অবস্থায় অধিককাল অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না; অনুসন্ধান তৎপর সেনাপতিগণ তাঁহাকে মঞ্চের নিম্নদেশ হইতে টানিয়া বাহিরে আনিলেন। এই সময় ধন্য একাদশ বৎসর বয়স্ক বালক ছিলেন। বালক, সাক্ষাৎ কালস্বরূপ সেনাপতিগণের হস্তে পতিত হইয়া আপনাকে নিতান্তই নিঃসহায় এবং বিপন্ন মনে করিলেন। তিনি বালকোচিত বিনয়বাক্যে বলিলেন, "আমি রাজ্যলাভের অভিলাষী নহি, পুরোহিতের গৃহে

ভৃত্যভাবে থাকিয়া এক মুষ্টি অন্নদাবারা জীবন যাপন করিব। তোমরা আমাকে হত্যা করিয়া অনর্থক অপযশ অর্জ্জন করিও না।" পুরোহিত তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলিলেন, "ইঁহারা তোমাকে হত্যা করিবেন না, রাজা করিবার নিমিত্ত লইতে আসিয়াছেন।" এই অবস্থায় সেনাপতিগণ ধন্যকে আনিয়া সিংহাসনে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

সেনাপতিগণের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম

ধন্যমাণিক্য সেনাপতিগণের এবম্বিধ অসঙ্গত ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ প্রদান করিতে ছাড়েন নাই। তিনি সিংহাসন লাভ করিবার পর এক বৎসরকাল কূর্ম্মনীতি অনুসরণে, সেনাপতিগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, প্রমত্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণ দিন দিন তাঁহার প্রতি অকুণ্ঠিতভাবে অসঙ্গত আধিপত্য বিস্তার করিতে প্রয়াসী। তাঁহাদের এরূপ ব্যবহারে মহারাজ উত্তরোত্তর বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সেনাপতিগণ সৈনিক বলে বলীয়ান, শাসন যন্ত্র তাঁহাদের হস্তগত, ত্রিপুর রাজলক্ষ্মী তাঁহাদের অঙ্গুলী সঙ্কেতের বশবর্ত্তিনী; রাজার ধন ও প্রাণ সেনাপতিগণের কৃপা-ভিখারী। এই অবস্থায় বালক ধন্য, তাঁহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন না, অথচ উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণকল্পে ইঁহাদিগকে দমন করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন।

অতঃপর পূর্ব্বোক্ত পুরোহিতের মন্ত্রণানুসারে রাজা পীড়ার ভান করিয়া তিন মাসকাল অন্তঃপুরে রহিলেন। রাজকার্য্য পূর্ব্ববৎ সেনাপতিগণের দ্বারা সম্পাদিত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে সৈন্যাধ্যক্ষগণ, পুরোহিতের নিকট রাজদর্শনের আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলে তাঁহাদিগকে দমন করিবার ইহাই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া, পুরোহিত হৃষ্টচিত্তে সেই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং পর দিবস রাত্রিকালে সেনাপতিদিগকে রাজ-অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তাঁহারা রাজদর্শনের পর, বিদায়ের অভিবাদন করিবার কালে, মহারাজের শরীর-রক্ষকগণ পুরোহিতের ইঙ্গিত মতে তাঁহাদের মস্তক ছেদন করিল। এই উপায়ে দুষ্ট সেনাপতিদিগকে নিহত করিয়া মহারাজ ধন্য স্বীয় বিশ্বস্ত কতিপয় লোককে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন; তন্মধ্যে সেনাপতি রায়কাচাগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এরূপ পরাক্রান্ত এবং খ্যাতনামা ছিলেন যে, মেকেঞ্জি সাহেব ইঁহাকে ত্রিপুরাধীশ্বর চয়চাগ মাণিক্য বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।* এই সময় হইতে সৈনিক বিভাগ পরিচালনের ভার মহারাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম ছিল।

---

* North East Frontier of Bengal. —P. 270.

মহারাজ দেবমাণিক্যের দীক্ষাগুরু লক্ষ্মীনারায়ণ নামক কপটাচারী ব্রাহ্মণ রাজাকে বধ করিয়া, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রমাণিক্যকে রাজা করিলেন; এবং জ্যেষ্ঠ বিজয়কে হীরাপুর নামক স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইন্দ্রমাণিক্য শিশু ছিলেন; তাঁহার জননীর সহযোগে দুষ্ট ব্রাহ্মণ রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিপ্র মিথিলা নিবাসী ছিলেন; তিনি নিজেকে নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে আড়াইশত মৈথিলকে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অল্পকাল মধ্যেই প্রকৃতপুঞ্জ উত্যক্ত হইয়া উঠিল। প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ এই সময় গত্যন্তর না দেখিয়া সংহারক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি বেলা দুই প্রহরের সময় দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট চরদ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন, রাজমাতা অকস্মাৎ বেদনা-রোগে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকে শীঘ্র আসিয়া না দেখিলে আর দেখিবার আশা থাকিবে না। ব্রাহ্মণ এই সংবাদ পাইয়া ব্যস্তভাবে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিয়া রাজবাড়ীতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে দৈত্য নারায়ণের নিয়োজিত চরের হস্তে তিনি নিহত হইলেন। অতঃপর সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ সদলবলে রাজপুরীতে প্রবেশ ও জননীসহ শিশু ইন্দ্রমাণিক্যকে বধ করিয়া বিজয়মাণিক্যকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ নামক বিপ্রের ব্যবহার ও পরিণাম

এই সময় মহারাজ বিজয় অল্পবয়স্ক ছিলেন। রাজার শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি দৈত্য-নারায়ণ স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজাকে অগ্রাহ্য করিয়া, রাজভাণ্ডারের সমস্ত দ্রব্য, এমনকি হস্তী, ঘোড়া, বাদ্য-ভাণ্ড সমস্তই আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। রাজা চাহিয়াও কোন বস্তু পাইতেন না; দৈত্যনারায়ণ বলিতেন, — "আমার মৃত্যুর পরে রাজার সমস্ত বস্তু রাজা লইবেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না।" দৈত্যনারায়ণের ভ্রাতা দুর্ল্লভনারায়ণ অগ্রজের অমিত প্রভাবে বলীয়ান হইয়া, রাজ্যমধ্যে নানাবিধ উপদ্রব আরম্ভ করিল। তাঁহার বিরুদ্ধে উৎপীড়ন, পরস্ত্রীহরণ ইত্যাদি অভিযোগ রাজদরবারে আসিতে লাগিল, কিন্তু দৈত্যনারায়ণের প্রভাবে মহারাজ কোনরূপ প্রতিকার করিতে সমর্থ হইতেন না। এই অবস্থায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর, মহারাজ বয়ঃপ্রাপ্ত (ষোল বৎসর বয়স্ক) হইলেন। তখন তিনি শ্বশুরের আনুগত্যে রাজত্ব করা নিতান্তই অস্পৃহনীয় মনে করিলেন এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের শান্তিবিধানের নিমিত্তও তাঁহাকে দমন করা একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিলেন; কিন্তু এবম্বিধ শক্তিশালী ব্যক্তির হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক রাজকার্য্য অথবা রাজ-ভাণ্ডারের দ্রব্যজাত কাড়িয়া লওয়া নিতান্তই অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায়, তাঁহাকে নিহত করিয়া সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন উন্মোচন করাই মহারাজ সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি দৈত্যনারায়ণের জ্যেষ্ঠ কন্যার জামাতা মাধবকে ভূষণার লস্কর পদ প্রদানের আশ্বাসদ্বারা বশীভূত করিয়া, কার্য্যোদ্ধার করিলেন। মাধব, দৈত্যনারায়ণকে

সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের দুর্ব্যবহার ও তাহার পরিণাম

অতিরিক্ত মদ্য প্রদান দ্বারা সংজ্ঞাহীন করিয়া, পরিশেষে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়াছিল।

অতঃপর মহারাজ বিজয়, দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া যশস্বী ও দিগ্বিজয়ী হইয়াছিলেন। তিনি সেনাপতিগণের হস্ত হইতে শাসন ক্ষমতা উঠাইয়া লইয়া, "উজীর" পদবীধারী নবনিয়োজিত কর্ম্মচারীর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই পদবী মুসলমান শাসনের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে।

সেনাপতিগণের শাসন-ক্ষমতা রহিত ও উজীর পদের সৃষ্টি

এবার আর একটী বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির কথা বলা হইবে, তাঁহার নাম গোপীপ্রসাদ নারায়ণ। ইনি বাছাল সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। মহারাজ বিজয়মাণিক্য ইঁহাকে, প্রথমতঃ বড়ুয়া উপাধি প্রদান করেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহাকে স্বীয় সূপকার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ত্রিপুর রাজ্যে মহারাজ্যের পাচকগণ 'মহামুন্সী' পদবাচ্য হইয়া থাকে। ইহার পর মহারাজ, গোপীপ্রসাদকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত ও নারায়ণ উপাধি প্রদান দ্বারা সম্মানিত করেন। গোপীপ্রসাদ এই পদ প্রাপ্তিকালে, শালগ্রাম ও হরিবংশ স্পর্শ করিয়া, সর্ব্বদা রাজার হিতকামী হইবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

সেনাপতি গোপীপ্রসাদের পূর্ব্বাবস্থা

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের পুত্র অনন্ত দেব নিতান্ত কুরুচিসম্পন্ন ও অনাবিষ্ট ছিলেন। ইনি ভাবী রাজা, ইঁহার ভবিষ্যৎ নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে মহারাজ বিজয়, অনেক চিন্তার পর সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেন এবং সর্ব্বদা পুত্রের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার নিমিত্ত সেনাপতিকে সত্যপাশে আবদ্ধ করাইলেন।

বিজয়মাণিক্যের স্বর্গারোহণের পর, অনন্তমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, সেনাপতি গোপীপ্রসাদ রাজকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। মহারাজ অনন্ত সর্ব্বতোভাবে শ্বশুরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন; তিনি শ্বশুরের অভিপ্রায়ানুসারে প্রতিদিন তাঁহার আলয়ে যাইয়া ভোজন করিতেন। অনন্তমাণিক্যের মহিষী (গোপীপ্রসাদের কন্যা) পিতার ব্যবহারে সন্দেহান্বিতা হইয়া, মহারাজকে সর্ব্বদা শ্বশুরালয়ে যাইয়া ভোজানাদি করিতে বারণ করিতেছিলেন, কিন্তু মহারাজ এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতেন না। এই সূত্রে মহারাণী পতিকে বিস্তর ভর্ৎসনাও করিলেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্ববিধ চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল।

গোপীপ্রসাদের প্রাধান্য

এ দিকে গোপীপ্রসাদ অবাধ আধিপত্যের ফলে উত্তরোত্তর এরূপ প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, সিংহাসন লাভ ব্যতীত ইঁহার প্ভুত্বের পিপাসা মিটিতেছিল না। পরিশেষে ভোজনার্থ স্বীয় ভবনে আগত জামাতাকে গুপ্তচরদ্বারা নিহত করিয়া 'উদয়মাণিক্য' নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তিনি স্বীয় ভগিনীপতি

গোপীপ্রসাদের বিশ্বাসঘাতকতা

রণাগণ নারায়ণ (রঙ্গ নারায়ণ)-কে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রণাগণের প্রাধান্য ও পরিণাম

এই উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যের শাসনকালে, সেনাপতি রণাগণ সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন। তিনিও স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু সতী ও ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীর নিষেধ অমান্য করিয়া রাজাকে হত্যা করিতে সাহসী হইতেছিলেন না। অল্পকাল পরে স্ত্রীবিয়োগ ঘটিলে তিনি পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিলেন। নব পরিণিতা স্ত্রী এবার তাঁহাকে রাজ্যলাভের নিমিত্ত উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইনি লেখাপড়া জানিতেন, পাঁচালী পাঠ করিয়া স্বামীকে বুঝাইতেন — দুই প্রহর কাল রাজত্ব করিলেও অন্তিমে দেবরাজ বাসবের আসন লাভ হইয়া থাকে। রাজ্যলাভ স্পৃহা পূর্ব্বাবধিই বৃদ্ধের হৃদয়কে জাগরূক ছিল, ইহার উপর যুবতী ভার্য্যার উৎসাহ বাক্য এবং পাঁচালীর লোভনীয় উক্তি তাঁহাকে অধিকতর উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। এই সময়, অপর সেনাপতি (দেবমাণিক্যের পুত্র) অমরদেব বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ রণাগণ বুঝিলেন, রাজার নিধন সাধন দ্বারাও রাজ্যলাভের পথ নিষ্কণ্টক হইবে না। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অমরদেব, নিশ্চয়ই তাঁহার এই সঙ্কল্পের পরিপন্থী হইয়া সিংহাসন অধিকার করিবেন; এবং রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাচীন রাজবংশের হস্তগত হইবে। এজন্য তিনি অমরদেবের নিধন প্রয়াসী হইলেন। একদিবস রাত্রিকালে অমরকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে আনিলেন এবং তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিলেন। এই সময় অমরের জনৈক হিতৈষী ব্যক্তি তরবারি দ্বারা পানের বোটা ছেদন করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়াছিল। এই ইঙ্গিত দ্বারা অমর সমস্ত অবস্থা বুঝিলেন এবং অসুস্থতার ভাণ করিয়া স্বীয় ভবনে চলিয়া গেলেন। অতঃপর রণাগণসহ জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া, অমরমাণিক্য পিতৃ সিংহাসনের উদ্ধার-সাধন এবং বৃদ্ধ রণাগণের রাজ্যলাভের প্রবল পিপাসা নিবারণ করিয়াছিলেন।

সৈনিক বিভাগে উচ্ছৃঙ্খলতা

উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যগণ দলবদ্ধ হইয়া সামান্য কারণেও বিদ্রোহাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে পাঠান সৈন্যদলের দুই মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছিল। এই সামান্য অছিলায় তাহারা বিদ্রোহী হইয়া, উজীরকে বধ করিল। রাজাকে বধ করিয়া রাজধানী লুণ্ঠনের নিমিত্তও ষড়যন্ত্র করিতেছিল, মহারাজ বিজয় ইহা জানিতে পারিয়া অধিকাংশ পাঠানকে ধৃত করিলেন এবং কতক পলায়ন করিল। ধৃত পাঠানদিগকে চতুর্দ্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান দ্বারা তাহাদের কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা হইয়াছিল।

সেনাপতি বধ

সেনাপতিগণের পূর্ব্বোক্তরূপ ঔদ্ধত্যের ফলে, অনেক সময় তাঁহাদের জীবনান্ত হইবার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা আলোচনায় জানা যাইবে, মহারাজ ধন্য,

উচ্ছৃঙ্খল সেনাপতিবৃন্দকে নিধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিজয়মাণিক্য স্বীয় শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণকে বধ করিয়া, শাসনযন্ত্র নিরাপদ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি রণাগণের রাজ্যলাভের দারুণ পিপাসা অমরদেবের অস্ত্রমুখে প্রশমিত হইয়াছিল।

মহারাজ দেবমাণিক্য স্বীয় দীক্ষাগুরুর প্ররোচনায় তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধি লাভের অভিলাষে ক্রমান্বয়ে আটজন সেনাপতি বলি প্রদান করিয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ড সেনাপতিগণের দোষজনিত নহে, রাজার ধর্ম্মের প্রতি অন্ধবিশ্বাসের ফলেই এবম্বিধ বীভৎস অভিনয় হইয়াছিল।

উদ্ধত ও ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিগণের দুর্গতি ঘটিবার দৃষ্টান্ত অন্যত্রও বিরল নয়। ১৮২৬ খৃঃ-অব্দে তুরস্ক সাম্রাজ্যের জেনিজারি সৈন্যদলের এই অবস্থা ঘটিয়াছিল।*

দুর্গ ও সেনানিবাস

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্ভূত সময়ে অনেকগুলি দুর্গ ও সেনানিবাস ছিল। তন্মধ্যে মেহেরকুল দুর্গ, চণ্ডীগড়, কৈলারগড়, বিশালগড়, জামিরখাঁগড়, ছয়ঘরিয়া বা সুগরিয়াগড়, যশপুরগড়, গাম্ভারী বা গামারিয়াগড় ও সংরাইশগড়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল দুর্গের অবস্থানের বিবরণ অতঃপর প্রদান করা যাইবে; রাজধানীর সন্নিহিত চতুষ্পার্শ্বে দুর্গগুলি অবস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত দূরবর্ত্তী নানাস্থানেও সেনানিবাস থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়, এতদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

দুর্গসমূহের নাম

"যত সব সেনাপতি যুদ্ধের কারণ।
থানায় থানায় সবে করে নিয়োজন।।
দক্ষিণ দিকে চট্টগ্রাম এক থানা হয়।
দশ সেনাপতি তথা নিয়োগ করয়।।
শ্রীহট্টে উত্তর থানা বড়ই ভীষণ।
সেই থানায় সেনাপতি রহে বিশ জন।।
কলাকোপা পদ্মার পারে পশ্চিমের থানা।
সেই থানায় সেনাপতি রহে চল্লিশ জনা।।
নসিরাবাদ গড়ে বটে থানা চমৎকার।
ত্রিশ জন সেনাপতি কার্য্যে সে থানার।।

---

* এতৎসম্বন্ধে রেভারেণ্ড জেম্স্ লঙ্ সাহেব বলিয়াছেন ;—
"The fate of these Generals, in the penalty they suffered for their imperious and intriguing conduct, resembled that of the janizzaries of the Turkish Empire who were cut off at a stroke in 1826; like them and the Manalukes of Egypt, these Generals appear to have been always more or less involved in political intrigues."
J. A. S. B. — Vol. XIX.

বিশালগড়ে মেহেরকুলে দুই থানা আছে।
পনর জন সেনাপতি তাহাতে রৈয়াছে।।
বিশগাঁও বটে থানা পাহাড় নিকট।
সেনাপতি পাঁচ জন বড়ই বিকট।।
সুসঙ্গ আর এক থানা পঞ্চাশ সেনাপতি।
দশ হাজার সেনা তথা করয়ে বসতি।।”

ত্রিপুর বংশাবলী।

এই সকল থানা বা সেনানিসাব মহারাজ বিজয়মাণিক্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। এতদতিরিক্ত যে সকল দুর্গ ও সৈন্যাবাসের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, রাজমালায় তৎসমস্তের বিবরণ পাওয়া যায়।

নববিজিত প্রদেশে শাসন প্রণালী

কোনও নূতন প্রদেশ জয় করা হইলে, সেই স্থানের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত এক একটী সেনানিবাস বা থানা সংস্থাপন করিয়া, বিশ্বস্ত ও পরাক্রান্ত সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সেই স্থানে রাখা হইত। এই সকল সেনাপতি ‘থানাদার’ পদবী লাভ করিতেন; নববিজিত প্রদেশের শাসন কার্য্য ইঁহাদের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত।

সৈনিক বিভাগের ভোজ

মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রদত্ত ভোজ

পূর্ব্বকালে কোন কোন সময়, বিশেষতঃ যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে সৈন্যদিগকে রাজ সরকার হইতে ভোজ দেওয়া হইত। মহারাজ ছেংথুম্ ফা-এর মহিষী, মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরী, গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্ব দিবস স্বীয় তত্ত্বাবধানে রন্ধনাদি করাইয়া সৈন্যদলকে বিরাট ভোজদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

ধন্যমাণিক্যের প্রদত্ত ভোজ

মহারাজ ধন্যমাণিক্য সৈনিকদিগকে যে ভোজ দিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই সঙ্গে জ্ঞাতি এবং ব্রাহ্মণদিগেরও ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“দ্বিজ জ্ঞাতি ভোজন করায় নৃপবর।
আর খাওয়াইল সৈন্য সেনা বহুতর।।”

এই ভোজ ধন্যসাগরের তীরে হইয়াছিল এবং জাতি ও শ্রেণী অনুসারে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে রন্ধন ও ভোজনের ব্যবস্থা ছিল, এ কথাও রাজমালায়ই পাওয়া যায় ;—

“সাগরের চারি পাড়ে বৈসায় নানাজাতি।
রন্ধন ভোজন তথা যা যেই পংক্তি।।”

এই বিশেষ ভোজ উপলক্ষে ত্রিপুরা সমাজে "কাঠিছোঁয়া" নামে একটী সম্প্রদায় গঠিত হওয়ায়, ত্রিপুরা প্রদেশে এই ভোজ চিরস্মরণীয় হইয়াছে। 'কাঠিছোঁয়া' নামকরণ হইবার কারণ রাজমালায় নিম্নোক্তরূপ পাওয়া যায় ;—

কাঠিছোঁয়া সম্প্রদায়

"সেই স্থানেতে রাজা মঞ্চেতে বসিল।
কুকির সরদারে সেনা গণিতে বলিল।।
সেনাগণে রন্ধন ভোজন করে সুখে।
সরদার গণিবারে গেলেন সম্মুখে।।
সেনা অন্ন-যষ্টি লৈয়া স্পর্শিয়া গণিল।
খাইতে ছুইল যাকে কাঠিছোঁয়া হৈল।।
* * * *
এই মতে কাঠিছোঁয়া নাম কত সেনা।
শ্রীধন্যমাণিক্যাবধি হইল গণনা।।"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, সৈন্যগণের ভোজনকালে কুকির সরদার ভাতের কাঠিদ্বারা স্পর্শ করিয়া যে সকল সৈন্যকে গণনা করিয়াছিল, তাহারাই 'কাঠিছোঁয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে Rev. James Long সাহেব বলিয়াছেন ;—

"He once gave a great feast to the Brahmans and their relations, they had to cook their own food, he ordered the Commanders of the Kuki troops to count their men, they did so with a stick while they were eating, the kukis were required by their law to drop eating, but through fear of losing their lives they swallowed the food which was in their mouth, — they have had a nick name applied to them ever since on account of this." *

লঙ্-সাহেবের এই উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, কুকি জাতীয় কতক লোক 'কাঠিছোঁয়া' হইয়াছিল, ইহাই তাঁহার বিশ্বাস। কোন কুকির আহারকালে তাহাকে অন্য কুকিতে স্পর্শ করিলে তদ্দরুণ আহার্য্য বস্তু অপবিত্র, অথবা ভোক্তার জাতিচ্যুতি ঘটিবার কারণ হয় না। প্রকৃতপক্ষে যে সকল ত্রিপুরী ও বাঙ্গালী সৈন্যকে ভোজনকালে কাঠিদ্বারা স্পর্শ করা হইয়াছিল, তাহারাই জাতিভ্রষ্ট এবং 'কাঠিছোঁয়া' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সম্প্রদায় নানাজাতির সমবায়ে গঠিত এবং একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়া থাকিলেও ত্রিপুরী জাতির সঙ্গেই ইহাদের ঘনিষ্ঠতা বেশী। অদ্যাপি এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে।

সৈনিকগণের ভোজ সম্বন্ধে আর একটী উল্লেখযোগ্য কথা আছে। ত্রিপুরাজ্যে প্রাচীনকাল হইতে ইহা 'হসমভোজন' নামে বিখ্যাত। ইহা প্রকৃত সরকারী ভোজ (State Dinner)। ইহা প্রতি বৎসর বিজয়া দশমী দিবস রাত্রিকালে হইয়া থাকে। এই ভোজে সাধারণতঃ পার্ব্বত্য প্রজা ও সরদারগণ আমন্ত্রিত হয়।

হসমভোজন

* J. A. S. B — Vol. XIX.

হসমভোজনের অর্থ অনেকে অনেক রকম বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, অসম অর্থাৎ অপরিমিত ভোজন হয় বলিয়া ইহা 'হসমভোজন' নামে অভিহিত হইয়াছে। অনেকে বলেন, শূকরকে হসম বলা হয়, এই ভোজে বহুসংখ্যক শূকর বধ করিবার ব্যবস্থা ছিল, এই জন্য 'হসমভোজন' নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বহুসংখ্যক লোকের সাধারণ আখ্যা 'হসম'। এই ভোজে বিস্তর লোক উপস্থিত হয় বলিয়া ইহার নাম 'হসমভোজন' হইয়াছে। * আমরা দেখিতেছি, প্রাচীন রাজমালার ভাষা সংশোধন প্রয়াসী আধুনিক লিপিকারের দ্বারা এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। ত্রিপুররাজ্যে পূর্ব্বকালে সৈনিকদিগকে হসম বলা হইত। † রাজমালার ভাষা সংশোধক, 'হসম' শব্দের পরিবর্ত্তে 'সৈন্য', 'সেনা' ইত্যাদি পদ প্রয়োগ করায়, 'হসম' শব্দের অর্থ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। বর্ত্তমানকালে অনেকেই প্রাচীন রাজমালা আলোচনা করেন না, অথবা আলোচনার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেছেন না; কারণ উক্ত গ্রন্থ এখন বিলুপ্তপ্রায়। এই কারণেই অনেকে 'হসম' শব্দের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হইয়া, নানারূপ অর্থ করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে, সামরিক বিভাগের ভোজকেই 'হসমভোজন' আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সেকালে পার্ব্বত্য প্রজাগণ সকলেই

'হসমভোজন' বাক্যের অর্থ

---

* হালামগণ কুকির একটী শাখা। ইহাদের ভাষায়, বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইলে সেই জনসঙ্ঘকে 'হসম' বলে। ইহা অবলম্বনেই উক্তরূপ ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

† প্রাচীন রাজমালার অনেক স্থলেই 'হসম' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহার কতিপয় এ স্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

(১) "রাজা আইল গড়ে দেখিতে হসম।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

(২) "দশ সেনাপতি মধ্যে হসম বিস্তর।
রাজ সৈন্য আমি মাত্র হই একেশ্বর।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

(৩) "হসম দেখিয়া তারা আসিয়া মিলিল।
বিষকুণ্ড পয়োমুখ মতে মিত্র কৈল।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

(৪) গৌড়েশ্বরের গুপ্তচর, বিজয়মাণিক্যের শিবির দেখিতে আসিয়া ধৃত হয়। সে কি জন্য আসিয়াছে, জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রত্যুত্তরে বলিয়াছিল ;—

"তোমার হসম কত দেখিতে পাঠাইল।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

(৫) "দুই লক্ষ আসিলেক মঘের হসম।
পাঠান সকলে দেখি পাসরে বিক্রম।।"
অমরমাণিক্য খণ্ড।

যোদ্ধা ছিল, এবং প্রয়োজন মতে সকলেই মাতৃভূমির কল্যাণ কামনায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য ছিল, সুতরাং হসমভোজনে তাহাদের কোন শ্রেণীই বাদ পড়িত না। এই ভোজ কোন্ রাজার শাসন সময়ে, অথবা কতকাল যাবত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইহা যে বহু প্রাচীন প্রথা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

হসমভোজন প্রথার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য

এই ভোজের মধ্যে এক গভীর রাজনীতি নিহিত রহিয়াছে। রাজ্যের শান্তিবিধানের সহিত এই নীতি প্রবর্ত্তনের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। প্রাচীনকালে পার্ব্বত্য প্রজাগণ — বিশেষতঃ কুকি ও হালাম শ্রেণীর প্রজাবর্গ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ এবং উগ্র স্বভাবাপন্ন ছিল। বিজয়া দশমী দিনে যুদ্ধযাত্রা করা ইহারা বিশেষ পুণ্যকার্য্য এবং অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। এই যাত্রাকে হালামদিগের ভাষায় 'হাকুথুম্' বলে। তাহারা এই কৌলিক প্রথা রক্ষার নিমিত্ত এবং স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে দলবদ্ধ হইয়া, বিজয়া দশমীর রাত্রিতে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহে অকস্মাৎ পতিত হইয়া নরহত্যা এবং প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত। সেকালে ইহাদের অমানুষিক অত্যাচারে বহু জনপদ উচ্ছন্ন এবং অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। শারদীয় পূজার কালে ইহাদিগকে আবদ্ধ করা না হইলে সেই উপদ্রব নিবারণ করা অসম্ভব ছিল, এবং রাজানুকম্পাসূচক কৌশল অবলম্বন ব্যতীত এক সময়ে সকলকে এক স্থানে অবরুদ্ধ রাখিবার অন্য উপায় ছিল না। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই রাজনীতি-কুশল ত্রিপুরেশ্বর 'হসমভোজন' প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ; এবং অদ্যাপি সেই প্রথা অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে।

দুর্গোৎসবের বোধনের দিবস হইতেই দূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রজাগণের রাজধানীতে আগমন আরম্ভ হয়। প্রজাগণ সকলেই বিশেষতঃ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সরদারগণ এই সময় রাজদত্ত ভোজে যোগদান করিতে বাধ্য ছিল। সরদারগণই অনিষ্টপাতের মূল, সুতরাং তাহাদের উপস্থিতির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইত। যে সরদার বিশিষ্ট হেতু ব্যতীত অনুপস্থিত থাকিত, তাহাকে কঠোর দণ্ড প্রদানের বিধান ছিল। রাজার আমন্ত্রণে উপস্থিত হওয়া সকলেই গৌরবজনক এবং অবশ্য কর্ত্তব্যে মনে করিত, সুতরাং অনুপস্থিতির সংখ্যা অধিক হইত না। বর্ত্তমানকালে পার্ব্বত্য প্রজাগণ দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচারের আশঙ্কা নাই, এ জন্য তাহাদিগকে ভোজে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত রাজদরবার হইতে পীড়াপীড়ি করা হয় না। তথাপি প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক লোক এই বিরাট ভোজে উপস্থিত হইয়া থাকে।

অশিক্ষিত এবং উচ্ছৃঙ্খল পার্ব্বত্য প্রজাবর্গকে বৎসরে একবার রাজা-প্রজা সম্বন্ধের গুরুত্ব বুঝাইয়া দেওয়া এই ভোজের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই সময় উপস্থিত প্রজাগণ রাজার নজর প্রদান করে, এবং রাজসরকার হইতে তাহাদিগকে বস্ত্র, বিবিধ দ্রব্যজাত সামগ্রী ও মুদ্রা রাজপ্রসাদ স্বরূপ প্রদান করা হয়। সরদারদিগের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই সময় উপাধি প্রদানদ্বারা গৌরবান্বিত করিবার ব্যবস্থাও আছে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, বিজয়া দশমীর রাত্রিতে এই ভোজ হত। এতদুপলক্ষে কোন্ সম্প্রদায়ের লোকে কি কার্য্য করিবে, তাহার বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। হালাম সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিই এই ব্যাপারের কর্ত্তা, তিনি ভোজনে উপবেশনের পরে তাঁহার আদেশ গ্রহণান্তে অন্য সকলকে ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে হয়, এবং আহারান্তে পাত্র ত্যাগের জন্যও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

হসমভোজনে হালাম সরদারের প্রাধান্য

বিজয়া দশমীর পর দিবস রাত্রিতে, ইহাদিগকে লইয়া রাজকর্ম্মচারীবর্গের এক বৈঠক হয়। এই বৈঠকে প্রজাদিগকে মদ্য এবং বস্ত্রাদি উপহার প্রদানের ব্যবস্থা আছে। এই সময় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সরদারগণের সহিত আলোচনা করিয়া পর্ব্বতবাসী জনসাধারণের সাংসারিক অবস্থা, ধান্য ও কার্পাস ইত্যাদি জুমে উৎপন্ন শস্যের অবস্থা, সামাজিক বিবরণ, স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং তাহাদের সুখ-শান্তি ও অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। রাজধানিতে বসিয়া, সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশের যথাযথ বিবরণ ভুক্তভোগী ব্যক্তিগণ হইতে অবগত হইবার এরূপ সুযোগ রাজপুরুষগণ বৎসরে একবার মাত্র পাইয়া থাকেন। এই ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্যের যে সকল অবস্থা অনায়াসে জানা যাইতেছে, সমগ্র রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া প্রতি বৎসর তাহা সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে না। হসমভোজনের ইহাও একটী সুফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পার্ব্বত্য প্রদেশে রাজকর অবধারণ সম্বন্ধে কোনরূপ গোলমাল থাকিলে তদ্বিষয়ক তর্কও এই সময় মীমাংসিত হইয়া থাকে।

উপঢৌকন প্রদান প্রথা

সৈনিক বিভাগ সম্বন্ধীয় আরও অনেক কথা রহিয়া গেল। এ স্থলে তাহার সম্যক উল্লেখ করা অসম্ভব বিধায় নিরস্ত থাকিতে হইল।

রাজ্যের অবস্থা
রাজধানী

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে যে সকল রাজার বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে (ধর্ম্মমাণিক্য, প্রতাপমাণিক্য, ধন্যমাণিক্য, ধ্বজমাণিক্য, দেবমাণিক্য, ইন্দ্রমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য, অনন্তমাণিক্য, উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্য), তাঁহাদের শাসনকালে রাজধানী কখনও স্থানান্তরিত হয় নাই। রাঙ্গামাটিতে রাজপাট রাখিয়াই ইঁহারা রাজ্যশাসন করিয়াছেন। মহারাজ উদয়মাণিক্য রাজধানীর নাম পরিবর্ত্তন এবং স্বীয় নামানুসরে ‘উদয়পুর’ নামকরণ করিয়াছিলেন।

রাজধানীর অবস্থান

মুসলমান এবং মঘ কর্ত্তৃক ত্রিপুররাজ্য বারম্বার আক্রান্ত হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বরগণ কেবল সেই সকল আক্রমণ হইতে রাজ্য ও রাজধানী রক্ষা করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না, তাঁহারা অরাতিগণের রাজ্যের কিংদংশ অধিকার করিয়া আক্রমণের প্রতিশোধ প্রদান করিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

রাজ্য বিস্তার

মহারাজ ধন্যমাণিক্যের কার্য্য

মহারাজ ধন্যমাণিক্য রাজ্যের সীমা প্রসারিত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি মেহেরকুল, পাটিকারা, গঙ্গামণ্ডল, বগাসাইর, বেজুরা, ভানুগাছ, বিষ্ণাজুরি (বিষ্ণাউড়ি) লঙ্গলা এবং বরদাখাত প্রভৃতি রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী স্থানসমূহ বঙ্গের শাসনতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্বীয় অধিকারে আনিয়াছিলেন। এই সকল স্থানের মধ্যে কোন কোন স্থান পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের শাসনকালে ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, মহারাজ ধন্যমাণিক্য পুনর্ব্বার সেই ক্ষতি উদ্ধার করেন। খণ্ডল প্রদেশ অধিকার কালে মহারাজকে কিঞ্চিৎ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়া থাকিলেও পরিশেষে সেই প্রদেশ ত্রিপুরবাহিনী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। তদ্দেশবাসী জনসাধারণের এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, বৃক্ষপত্র ব্যতীত তাহাদের পরিধানের অন্য সম্বল ছিল না; তদ্বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

ইহার পর ধন্যমাণিক্য, থানাংচি রাজ্য এবং সমগ্র কুকি প্রদেশ জয় করিয়া রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা প্রসারিত করিয়াছিলেন। ১৪৩৫ শকে (১৫১৩ খৃঃ), গৌড়েশ্বর হোসেন সাহের সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিয়া ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ইঁহার শাসনকালে অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হোসেন সাহ বারম্বার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সেই ক্ষতি উদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। একবার কিয়ৎকালের নিমিত্ত চট্টগ্রাম হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলেও ১৪৩৭ শকে (১৫১৫ খৃঃ) ধন্যমাণিক্য আবার তাহা পাঠানের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৃতীয় বারের যুদ্ধে রাজ্যের কিয়দংশ হোসেন সাহের হস্তগত হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য।

মহারাজ দেবমাণিক্যের কার্য্য

ধন্যমাণিক্যের পুত্র দেবমাণিক্য ভুলুয়ারাজ্যসহ দক্ষিণে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তৎকালে চট্টগ্রাম, তাঁহারই হস্তগত ছিল।

মহারাজ বিজয়-মাণিক্যের কার্য্য

দেবমাণিক্যের পুত্র মহারাজ বিজয়মাণিক্য খাসিয়া রাজ্যের কিয়দংশ এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি রাজ্যের উত্তর প্রান্তস্থিত দেশসমূহ জয় করিয়াছিলেন। এই সময় পাঠানগণ পুনর্ব্বার চট্টগ্রাম আক্রমণ করায়, ক্রমান্বয়ে আট মাস যুদ্ধের পর মহারাজ বিজয়কর্ত্তৃক প্রতিপক্ষগণ বিশেষভাবে পরাজিত হত। এই যুদ্ধ গৌড়েশ্বর সুলতান সুলেমান কররাণির সঙ্গে হইয়াছিল।

বিজয়মাণিক্য মুসলমানগণের আক্রমণের প্রতিশোধ প্রদানের অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশ বিজয়ে বহির্গত হইবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই অভিযানকালে পাঠান বংশীয় শেষ নবাব দায়ুদ সাহ বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পাঠান ও মোগল সঙ্ঘর্ষের ফলে, এই সময় বঙ্গের শাসনতন্ত্র শিথিল হওয়ায়, মহারাজ বিজয় অনায়াসে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমেই সুবর্ণগ্রামের মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে জয় করিয়া, তথায় তীর্থ কার্য্য সমাপনান্তে ক্রমান্বয়ে পদ্মা অতিক্রম করিয়া গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিযান বর্ণনোপলক্ষে রাজমালা বলিয়াছেন ;—

বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযান

"লোহিত পশ্চিমভাগে বসতি জাহ্নবী।
পূর্ব্বভাগে যমুনা যে সরস্বতী দেবী।।" *

মহারাজ উদয়মাণিক্য জামাতাকে বধ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন সত্য, কিন্তু তিনি রাজ্যরক্ষার পক্ষে অযোগ্য ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে চট্টগ্রাম প্রদেশ ত্রিপুরার কুক্ষিচ্যুত হইয়াছে।

উদয়মাণিক্যের শাসনকাল

জয়মাণিক্যের শাসনকালে সেনাপতি রণাগণের দুর্ব্ব্যবহারের ফলে অন্তর্ব্বিপ্লব উপস্থিত হইয়া থাকিলেও এই সময় রাজ্যের সীমা সম্বন্ধীয় কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। জয়মাণিক্যেই দ্বিতীয় লহরের অন্তর্ভুক্ত শেষ নরপতি।

জয়মাণিক্যের শাসনকাল

প্রাকৃতিক উপদ্রব

ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারী প্রভৃতি উপদ্রবদ্বারা সময় সময় রাজ্যের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়াছে। বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে, তাঁহার প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত উদয়পুরস্থ জগন্নাথ দেবতার মন্দির প্রবল ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। † মহারাজ উদয়মাণিক্যের স্বর্গারোহণের বৎসর (১৪৯৮ শকে), রাজ্যমধ্যে এক সঙ্গে মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ

ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ

* বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৫৫ পৃষ্ঠা।

† "দৈত্যনারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান্।
জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া নির্ম্মাণ।।
*　*　*　*
কত দিনে সেই মঠ ভূমিকম্পে ফাটে।
হইল অনিষ্ট এক দেবের কপটে।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

উপস্থিত হওয়ায় বহু প্রজা বিনষ্ট হয়। * তৎপূর্ব্বে রাজ্যের উত্তরভাগে (কৈলাসহর প্রভৃতি অঞ্চলে) এরূপ ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল যে, পরিবারবর্গের মধ্যেও একে অন্যের সাহায্যে কুণ্ঠিত ও অপারগ হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে মুদ্রার বিনিময়ে শস্য পাওয়া অসম্ভব হওয়ায়, অনেক অর্থশালী ব্যক্তিকেও অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। রাজমালা প্রথম লহরে এতৎ সংসৃষ্ট কাতাল ও কাকচাঁদ সম্বন্ধীয় একটী প্রবাদ বাক্যের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। এই দুর্ভিক্ষের দরুণই কৈলাসহর হইতে ত্রিপুরার রাজধানী উঠাইয়া লইতে হইয়াছিল এবং উক্ত সমৃদ্ধিশালিনী নগরী সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের কবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

মহামারী

ত্রিপুরায় অনেক সময় রাজ্যময় সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটিবার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায় ; তন্মধ্যে বসন্তরোগের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজমালার দ্বিতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ধর্ম্মমাণিক্য, ধন্যমাণিক্য এবং বিজয়মাণিক্য --- এই তিনজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী ভূপতি বসন্তরোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ধন্যমাণিক্যের পরবর্ত্তী এবং বিজয়মাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজ দেবমাণিক্য ও ইন্দ্রমাণিক্য শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রোগে মৃত্যু হইলে বসন্তরোগের হাত এড়াইতে পারিতেন কি না, তাহা বলা কঠিন। সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাবকালে সর্ব্বাপেক্ষা রাজাকে নিরাপদে রাখিবার সুব্যবস্থা করা একান্ত স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায়ও উপর্য্যুপরি তিন জন রাজা বসন্তরোগে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সেকালে রাজ্যমধ্যে এই রোগের প্রকোপ বিশেষ তীব্র ছিল, এবং তদ্দরুণ ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইত।

বসন্তরোগের প্রাবল্যের কারণ

বসন্তরোগের প্রাবল্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়, সেকালে বসন্তের টিকা গ্রহণ করা হইত না। রাজ্যমধ্যে এই রোগ লাগিয়া থাকিবার ইহা এক প্রধান কারণ। এতদ্ব্যতীত নৈসর্গিক কোন কারণ ছিল কি না, বর্ত্তমানকালে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমানকালেও কুকি প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রজাগণ গো-বীজ টিকা গ্রহণ করিতে গুরুতর আপত্তি করিয়া থাকে। রাজসরকার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।

---

* "চৌদ্দশ আটানব্বই শকেতে তখন।
পারার গুটিকা রাজা করেন ভক্ষণ।।
* * * *
সেই বৎসরেতে রাজ্যে হৈল মহামারী।
অস্থি পূর্ণ হৈল সব দেখি সারি সারি।।
অন্ন কষ্টে প্রাণ গেল বহুতর নর।"
উদয়মাণিক্য খণ্ড।

বস্ত্র বয়ন রতা কুকি বালিকা

শিল্প

প্রথম লহরোক্ত শিল্প কার্য্যগুলি এই সময়ে ক্রমোন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মহারাজ বিজয়মাণিক্য ধ্বজঘাট হইতে অনেক কাংস্য বণিক আনিয়া রাজ্যমধ্যে কাঁসা-পিত্তলের শিল্প প্রচলন করেন। ইঁহাদিগকে ধ্বজঘাট হইতে আনা হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের বসতি স্থানের নাম 'ধ্বজনগর' হইয়াছে। এই স্থান বিশালগড় থানার এলাকায় অবস্থিত। এইসূত্রে রাজ্যমধ্যে বাঙ্গালী উপনিবেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

শিল্পকার্য্য ও শিল্পকার

বাঁশ, বেত, কাষ্ঠ ও লতা ইত্যাদি দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করা হইত। বর্ত্তমানকালে সেই সকল শিল্পের আদর কিয়ৎ-পরিমাণে কমিয়া থাকিলেও তাহার কোনটীই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সুবর্ণাদি ধাতু নির্ম্মিত নানাবিধ আভরণ, গজদন্তের পাটী ও উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যখচিত বিবিধ বস্তু এবং নানাপ্রকার খেলার সামগ্রীর কথা এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

বিবিধ শিল্প

বয়ন-শিল্পের স্থান সকলের উপরে। ত্রিপুরা রাজ্যে এই শিল্প অতিশয় উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিল। নানাশ্রেণীর পাছুড়ি, পরিধেয় বস্ত্র এবং চাদর ইত্যাদি সচরাচর সকল পরিবারের মধ্যেই বয়িত হইত এবং বর্ত্তমানকালেও অনেক পরিবারেই সেই শিল্প অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্ত্রীলোকের সর্ব্বদা পরিধানযোগ্য এক প্রকারের মোটা বস্ত্রের প্রচলন আছে, স্থানীয় ভাষায় তাহাকে 'দুবড়া' বলে। এই 'দুবড়া' শব্দ নিতান্ত আধুনিক নহে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। * দুই বেড়দ্বারা পরিধান করা হইত বলিয়া সম্ভবতঃ ইহার নাম 'দুবড়া' হইয়াছে। কুকিগণ কার্পাসদ্বারা একপ্রকার আসন প্রস্তুত করে, তাহার নাম 'পরী'। ইহা গালিচার প্রণালীতে বয়ন করা হয়। 'পরী' যেমন পুরু, তেমনি কোমল। ইহা কুকি-শিল্পের বিশেষত্ব। অন্য কোন জাতীয় শিল্পী ইহা বয়ন করিতে জানে না এবং শিক্ষার চেষ্টাও করে না। মণিপুরী স্ত্রীলোকদের পরিধেয় একপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুন্দর এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহার পাড়ের সূচিকার্য্য শিল্প-দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

বয়ন-শিল্প

ত্রিপুরার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বয়ন-শিল্প রিয়া বা কাঁচলির শিল্প-নৈপুণ্য এবং আদরের কথা প্রথম লহরে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাঁচলির ব্যবহার অতিশয় প্রাচীন। সংস্কৃত ও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ইহার বিস্তর উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা বিজয়ের পর, সীতাদেবীকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত

রিয়া বা কাঁচলি

* "শুনিলে শ্রাদ্ধের নাম যজমানের পাড়া।
বান্ধা দিয়া খায়্যা যায় স্ত্রীর দুবড়া।।"
দ্বিজবংশী দাস।

করিবার কালে যে বেশবিন্যাস করা হইয়াছিল তাহাতে পাওয়া যায় ;—

"হৃদিমাঝে শোভে তার বিচিত্র কাঁচলি।
মুকুতার হার উপরে করিছে ঝলমলি।।"

কৃত্তিবাস।

দ্বিজবংশী দাস প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবিই কাঁচলির উল্লেখ করিয়াছেন। সেকালে এই বস্ত্রের কারুকার্য্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, এবং শিল্পীগণ ইহাতে শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শন জন্য বিশেষ যত্নবান থাকিতেন। কবি রূপরামের ধর্ম্মরাজের গীত হইতে কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে ;—

"কাঁচলির সম্মুখেতে পূর্ণরাস লেখা।
মাধবের গোপিনী যেখানে দিল দেখা।।
সারি সারি শোভা পায় ষোল শ গোপিনী।
তার মধ্যে দণ্ডাএ আছেন চক্রপাণি।।
* * * *
পূর্ণরসে লিখিল সম্মুখে দান খণ্ড।
ভাঙ্গানায় রাধাকাণু তরঙ্গ নিখণ্ড।।" ইত্যাদি।

রূপরামের ধর্ম্মরাজের গীত।

এইরূপ অক্রুর সংবাদ, রাসলীলা, দানকেলী, দেবীযুদ্ধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ দেবদেবীর চিত্র এবং পশু-পক্ষী প্রভৃতির চিত্রদ্বারা কাঁচলির শোভা বর্দ্ধন করা হইত। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচলিত রিয়া বা কাঁচলি দেখিলে বুঝা যাইবে, এই রাজ্যেও কাঁচলির বয়ন কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে প্রাচীন আদর্শ রক্ষিত হইয়াছে। ইহার শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন জন্য কয়েকখানা কাঁচলির চিত্র দেওয়া যাইতেছে। উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ইহার সমস্তই রাজপরিবারস্থ মহিলাগণের দ্বারা বয়িত। শিল্প কার্য্যগুলি বুনটে করা হইয়াছে, ইহা ছুঁচের কাজ নহে।

ত্রিপুরার রেশমের কারখানা এবং রেশমী বস্ত্র একসময় প্রসিদ্ধ ছিল। তাহা প্রধানতঃ চীন দেশে রপ্তানী হইত। সেই দেশের সহিত ত্রিপুরার বিনিময় বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

শিল্পকার্য্য মহিলাগণের করণীয়

ত্রিপুরার বয়ন এবং সীবন শিল্প মহিলাগণের করণীয়। স্মরণাতীতকাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। রাজমালা আলোচনা করিলে জানা যাইবে, কলির প্রারম্ভকাল হইতে (ত্রিপুরায় শিল্প কলার প্রবর্ত্তক মহারাজ ত্রিলোচনের সময় হইতে) বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে নাই। কেবল ত্রিপুরায় নহে — সমগ্র ভারতেই বৈদিককাল হইতে সূত্র প্রস্তুত এবং বস্ত্র বয়ন মহিলাগণের কর্ত্তব্য ছিল। ঋগ্বেদের ২য়, ৬ষ্ঠ ও ১০ম মণ্ডলে এ বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ত্রিপুরার বয়ন-শিল্প।
১-২। বিবিধ প্রকারের 'রিয়া' (কাঁচলি)
৩। বক্ষে 'রিয়া' পরিহিত রমণীবৃন্দ।

রাজ্যের বিশেষত্ব

ত্রিপুর রাজ্যে সুবর্ণের খনি থাকিবার প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায়। ধন্যমাণিক্য খণ্ডে খনিজ পদার্থ লিখিত আছে ;—

"আর তত্ত্ব মহারাজা শুনিল তখন।
কুকি রাজ্যে সুবর্ণের হয়ে ত উৎপন্ন।।
* * * *
জামাতা হোপকলাউ মনে গর্ব্ব তার।
থাংচাঙ্গ চড়িয়া যায় সোণা আনিবার।।
কিরাত সকলে মিলে যুক্তি করে সার।
সোণা পাইলে থানা এথা থাকিব রাজার।।
মন্ত্রণাতে জামাতাকে মদ্যপান দিল।
মদ্যেতে বিহ্বল জামাই কুকিয়ে মারিল।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

বৈদেশিক পরিব্রাজকগণও এই রাজ্যের স্বর্ণখনির সংবাদ রাখিতেন। টেভার্নিয়ার-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে ত্রিপুর রাজ্যের অনেক কথা পাওয়া যায়, তিনি স্বর্ণখনির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই ভ্রমণকারীর গ্রন্থ হইতে কতিপয় পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

"There is nothing in *Tipra* which is fit for ftrangers (strangers). There is a Mine of Gold, but the Gold is very courfe (coarse). And there is a fort (sort) of very courfe (coarse) Silk, which is all the Revenue the King has. He exacts no Subfidies (Subsidies) from his Subjects; but only that they, who are not of the prime Nobility, fhould (should) work fix (six) days in a year in his Mine, or in his Silk-works. He fends (sends) his Gold and his Silk into *China*, for which they bring him back Silver, which he coins into pieces to the value of ten Sous, he alfo (also) makes thin pieces of Gold, like the *Afpers (Aspers)* of *Turky*; of which he has two forts (sorts), four of the one fort (sort) making a Crown, and twelve of the other."

— (Tavernier's Travells, by J. Phillips, Book III, Part II., Chap. XVI. of the Kingdom of Tipra.)

উদ্ধৃত বাক্য আলোচনায় জানা যায়, ত্রিপুরার উৎপন্ন স্বর্ণ চীন দেশে রপ্তানী হইত, এবং তদ্বিনিময়ে চীন হইতে রৌপ্য সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা ছিল।

এতদ্ব্যতীত লৌহ, কয়লা, কেরোসিন তৈল, লবণ ও কেওলিন (বাসন এবং পুতুল ইত্যাদি নির্ম্মাণের মাটী) প্রভৃতির খনি রাজ্যমধ্যে ছিল এবং বর্ত্তমানকালেও আছে।

ত্রিপুরার পার্বত্যাঞ্চলে পূর্ব্বে ঘোড়া ছিল। কুকিগণ অনেক সময় রাজাকে অন্যান্য বস্তুর সহিত ঘোড়া উপঢৌকন প্রদান করিত। *

বন্য ঘোটকের বিবরণ।

ত্রিপুরার পার্শ্ববর্ত্তী মণিপুরের জঙ্গলে অদ্যাপি ঘোটকের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় ত্রিপুর পর্ব্বতে ঘোড়া থাকা বিচিত্র নহে। কোনও আধিদৈবিক কারণে অথবা পার্ব্বত্য প্রদেশে জনবসতির আধিক্য হেতু ঘোটক বংশ বিলুপ্ত কিম্বা স্থানান্তরিত হইয়াছে, ইহাই অনুমতি হয়। বর্ত্তমান সময়ে এ রাজ্যের জঙ্গলে ঘোড়া পাওয়া যায় না।

ঘোড়া উৎপন্নের কথা

বন্য হস্তী ত্রিপুরার এক বিপুল সম্পদ। এই রাজ্যের হস্তী অতিশয় সুন্দর এবং দীর্ঘজীবী। প্রতি বৎসর শীত ঋতুতে খেদা করিয়া হস্তী ধরা হয়। জনবসতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হস্তীযূথ ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। এই কারণে, অশ্বের ন্যায় হস্তীও এ রাজ্যের জঙ্গলে ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইবে বলিয়া অনেকে অনুমান করে। এই হস্তী সম্বন্ধীয় স্থূল বিবরণ অতঃপর প্রদান করা হইবে।

বন্য হস্তীর বিবরণ

শাসনতন্ত্র

রাজমালা প্রথম লহরে দেখা গিয়াছে, সেনাপতিগণই শাসন বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। দ্বিতীয় লহর আলোচনায় জানা যায়, এই কালেও সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে নাই। সৈনিক ও শাসন-বিভাগ এক হস্তে পতিত হওয়ায়, অনেক সময় রাজ্যমধ্যে নানাবিধ অশান্তি ও বিপ্লব সঙ্ঘটিত হইয়াছে। দুর্দ্ধর্ষ ও প্রবল-পরাক্রান্ত সেনাপতিগণ স্বহস্তে শাসনভার পাইয়া নিজেকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিতেন, অনেক সময় রাজাকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াসী হইতেন, এমনকি তাঁহাদের সঙ্কল্পের পরিপন্থী রাজাকে বধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন সেনাপতি ক্ষমতাগর্ব্বে এত উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, রাজাকে অপসারিত করিয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। অনেক রাজা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াও ইঁহাদের প্রভাব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই।

সেনাপতিগণের ব্যবহার

মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকালে কালা খাঁ, গগন খাঁ ও খাঁ ছাম্‌থুম্ (ছাম্‌থুম্ খাঁ) নামক ব্যক্তিত্রয় অমাত্য হইয়াছিলেন, অথচ ইঁহারা সকলেই পরাক্রমশালী সেনাপতি ছিলেন। ধন্যমাণিক্য এবং বিজয়মাণিক্যের সময়ও ইঁহারা সেনাপতির সম্মানিত পদ হইতে বঞ্চিত হন নাই। রাজমালায় পাওয়া

খাঁ উপাধিধারী সেনাপতিগণ

---

* (১) "নানাবিধ বস্তু যত নানারঙ্গ ঘোড়া।
সহস্র সহস্র কুকি আসিল দিগম্বরা।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

(২) "পঞ্চ হস্তী দশ ঘোড়া তাকে দিল নৃপে।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

যায় মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে জামির খাঁ গড় পাঠানগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেনাপতি গগন খাঁ প্রবল পরাক্রমের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। * মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষ কালা খাঁ 'নাজির' উপাধি ও মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের পাঠান সমরে বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিয়া আত্মাহুতি প্রদান করেন। † খাঁ উপাধিধারী ব্যক্তিগণ পার্ব্বত্য রিয়াং জাতীয় ছিলেন। রিয়াংগণের মধ্যে 'চাপিয়া খাঁ' উপাধি বর্ত্তমানকালেও আছে। এই উপাধির ব্যক্তিগণ ভাবী রায় (রাজা)। ত্রিপুরার সৈনিক ও শাসন বিভাগে রিয়াং জাতির প্রাধান্য লাভের বিস্তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ; এ স্থলে রায় কাচাগ্ ও রায় কছমের নাম উল্লেখযোগ্য। খাঁ উপাধি বিশিষ্ট সেনাপতিদিগকে রিয়াং জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার ইহাও একটী প্রকৃষ্ট কারণ। ইঁহারা অপ্রতিহতভাবে এক হস্তে শাসন যন্ত্র এবং সামরিক বল পাইয়াও কোনরূপ বিচলিত হন নাই, ইহা বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। অন্যান্য উপাধিধারী সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তাগণের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে।

শাসন-প্রণালী

শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তনের চেষ্টা

মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময়ে মুসলমানগণের অনুকরণে যে শাসন পরিষদ গঠিত হইয়াছিল, রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্গত কালে সেই প্রণালীই অব্যাহত থাকিবার পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এই সময়ও সেনাপতিগণই শাসনের কর্ত্তা ছিলেন। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে 'উজির' পদের প্রতিষ্ঠা দ্বারা মন্ত্রণাদি কার্য্য সেনাপতিগণের হস্তচ্যুত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই।

লস্কর পদের প্রবর্ত্তনা

দূরবর্ত্তী অথবা নব বিজিত প্রদেশের শাসনভার যাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইত, তাঁহারা 'লস্কর' পদবীবাচ্য ছিলেন। খণ্ডল ও ছাম্বুলনগর (কৈলাসহর) ত্রিপুর রাজ্যের নিয়োজিত লস্কর দ্বারা শাসিত হইতেছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য, মাধবকে ভূষণার লস্করীপদের প্রলোভনে বাধ্য করিয়া, তদ্দ্বারা

---

* "গগন খাঁ নামেতে রাজার সেনাপতি।
তার সনে ঘোর যুদ্ধ হৈল হাতাহাতি।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২৫ পৃঃ।

† "প্রাতঃকালে কালা নাজির যুদ্ধ আরম্ভিল।
পূর্ব্ব প্রেরিত বাম বাজু পশ্চাতে রাখিল।।
* * * *
পৈশুন্যে না করে যুদ্ধ রাজ সেনাগণ।
যুদ্ধে পড়িল নাজির এই সে কারণ।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৪৭।৪৮ পৃঃ।

সেনাপতি দৈত্য নারায়ণকে বধ করাইবার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেকালে লস্করের পদ বিশেষ সম্মানিত ছিল এবং তাঁহারাই আপন আপন বিভাগের সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা ছিল। এই পদ মুসলমান শাসনের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছিল।

বিচার-প্রণালী

বিচার কার্য্যের নিমিত্ত তৎকালে লিখিত আইন, অথবা আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল না। শাসনকর্ত্তাগণ ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত যুক্তি অবলম্বনে স্বীয় বিবেকানুযায়ী বিচার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। সেকালে আইন ব্যবসায়ীর কুটবুদ্ধি ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ লাভের সুযোগ পাইত না। দোষী ব্যক্তি সরল চিত্তে বিচারক সমক্ষে আত্মদোষ স্বীকার করিত, মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করিয়া নির্দ্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করিবার প্রয়াস ছিল না। বিচারপ্রার্থীগণ বিচারককে পিতা, অভিভাবক অথবা দেবতার ন্যায় মনে করিত এবং কোন পক্ষই তাঁহার নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইত না, সুতরাং সেকালের বিচারে বর্ত্তমানকালের ন্যায় আইন-নজিরের 'মারপেঁচ' অথবা সওয়াল-জবাবের সোর হাঙ্গামা ছিল না ; এই কারণে বিচারের পথ অতিশয় সরল ছিল এবং সহজেই সত্যোদ্ঘাটিত হইত। অপিচ, অর্থী-প্রত্যর্থীকে রসুম, তলবানা, বারবরদারী ইত্যাদির চাপে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না।

প্রাণদণ্ডের নিয়ম

অপরাধিগণের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল কি না, বুঝিবার উপায় নাই। গুরুতর অপরাধের নিমিত্ত শিরচ্ছেদ, অথবা শূলে চড়াইয়া প্রাণদণ্ড করিবার ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন সময় দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে কুকুরদ্বারা খাওয়ান হইত। এতদ্ব্যতীত হস্তী পদতলে নিক্ষেপ এবং নাসা, কর্ণ ইত্যাদি ছেদনের ব্যবস্থা থাকাও জানা যাইতেছে। এই সকল দণ্ডাদেশ প্রান্তরে কিম্বা অন্য প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের সমক্ষে কার্য্যে পরিণত করিবার বিধান ছিল। ইহার কোন কোন দণ্ড বর্ত্তমানকালে কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে সময়োপযোগী ব্যবস্থা ছিল, সমসাময়িক বিভিন্ন দেশীয় দণ্ড পদ্ধতির সহিত তুলনা করিলে ইহা স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে। *

---

* অন্যান্য রাজ্যের আইনে যেরূপ সাম্প্রদায়িক ভেদ-ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, ত্রিপুরায় তদ্রূপ ব্যবস্থা কোন কালেই ছিল না। ত্রিপুর রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী হেড়ম্ব রাজ্যে মহারাজ গোবিন্দচন্দ্রের শাসনকালে যে দণ্ডবিধি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার নিম্নোদ্ধৃত ধারাগুলি লক্ষ্যযোগ্য ;—

"মারণে মারণং — মারণেতে যদি মারিত ব্যক্তি মৃত হয়, তবে তাহাকেও রাজা প্রতিবদল শূলাদিদ্বারা মারিতে হয়।"

"কৃতাপরাধোপি রাজনি কৃতপ্রহারং শূল মারোপ্যাগ্নেপচেৎ — কৃতাপরাধী যে রাজা, তাকেও যদি কোন ব্যক্তি প্রহার করে তবে তাকে শূল দিয়া গাথিয়া অগ্নিতে পাচনা করিবে।"

"ব্রাহ্মণেষু কোপাৎ পাণিং প্রহরণ শূদ্রঃ পাণি ছেদন দণ্ডঃ — শূদ্র যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণকে হস্তদ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয়।"

দরবারের বিশেষ নিয়ম

সে কালে দরবারের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল। রাজগণ প্রতিদিন দরবারকালে সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। এবং রাজাকে প্রণাম করিবার কালে বাদ্যদ্বারা ইঙ্গিত করা হইত, সেই ইঙ্গিত মতে সকলে সমকালে রাজাকে প্রণাম করিত। * বর্ত্তমানকালের বিগুল বা ব্যাণ্ড্ বাজাইয়া সেলামি প্রদান ইহারই অনুরূপ প্রথা। দরবারে সকলকেই দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিতে হইত। অতি অল্প সংখ্যক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি উপবেশনের অধিকার পাইতেন।

দরবারে পালনীয় পদ্ধতি

কূট-নীতি

রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেক সময় কূট-নীতি প্রয়োগের প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজ ধন্যমাণিক্য, ষড়যন্ত্রকারী সেনাপতিদিগকে কৌশলজালে আবদ্ধ ও নিহত করিবার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। † এতদ্ব্যতীত তিনি খণ্ডলের ভূম্যধিকারী (বসিক) দিগকে বিদ্রোহাচরণের প্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত আর এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বসিক (ভূম্যধিকারী) দিগকে মিত্রভাবে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রতি যথেষ্ট

কূটনীতির আশ্রয়

"সহাসনেবসন শূদ্রঃ কট্যাং কৃত চিহ্নঃ (ছিন্ন) অথবা নিতম্ব সমীপ মাংসখণ্ডং কর্ত্তয়েৎ — ব্রাহ্মণের একাসনেতে একাকী যদি শূদ্র বৈসে তবে তাহার নিতম্বের মাংস ছেদন করিতে হয়।" ইত্যাদি।

এই আইন বিবাদ-দর্পণ গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত এবং প্রচলিত হইয়া থাকলেও বর্ত্তমানকালে এবম্বিধ দণ্ডবিধি লোকে মানিয়া লইবে কি?

মুসলমান আমলের আইন আরও অদ্ভুত, তাহার বর্ণে বর্ণে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। নিম্নে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে ;—

"When the Collector of the Dewan asks them (the Hindoos) to pay the tax, they should pay it with all humility and submission : and if the Collector wishes to spit into their mouths, they should open their mouths without the slightest fear of contamination so that the Collector may do so. The object of such humiliation and spitting into their mouths is to prove the obedience of the infidel subjects under protection and promote, if possible, the glory of the Islam, — the true religion and to shew contempt to false religions." — (Von Neor's Akbar).

স্থূল মর্ম্ম ঃ "যদি কোন মুসলমান দেওয়ান হিন্দুর নিকট কর আদায় করিতে উপস্থিত হন, তবে সেই হিন্দুর সম্পূর্ণ অবনতি সহকারে তাহা দিতে হইবে ; অপিচ যদি মুসলমান দেওয়ান ইচ্ছা করেন যে কাফেরের মুখে থুথু প্রদান করিবেন, তবে তাহার তৎক্ষণাৎ মুখব্যাদান করিয়া তাহা লইতে হইবে। ইহাতে তাহাদের ঘৃণার বিন্দুমাত্রও কারণ নাই ; এই থুথু প্রদানের কয়েকটী নিগূঢ় অর্থ স্বীকার করিতে হইবে, ইহাদ্বারা সরকারের আশ্রিত কাফেরের সম্পূর্ণ বশ্যতার পরীক্ষা হইবে, এবং একমাত্র সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের গৌরব ও মিথ্যা ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইবে।"　বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, — ৩য় সংস্করণ, ৪২২ পৃঃ।

* "ইসারাতে কহে সেলাম বাদ্য বাজাইয়া।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

† ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ১১ পৃষ্ঠা।

সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। পরিশেষে রাজাজ্ঞানুসারে বসিকগণ একদিবস দরবারে উপস্থিত হইলে, মহারাজের ইঙ্গিতমতে সৈন্যগণ তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিল। অতঃপর মহারাজ ধন্য স্বয়ং খণ্ডলে যাইয়া সেই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়াছিলেন। *

বিজয়মাণিক্যের অবলম্বিত নীতি

মহারাজ বিজয়মাণিক্য যেমন বীর, তেমনি রাজনীতি-কুশল নরপতি ছিলেন। তাঁহার প্রগাঢ় কূটনীতির একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সন্দর্শনে অনেকেই বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়াছেন। তৎসম্বন্ধীয় স্থূল বিবরণ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

জয়ন্তিয়ারাজের অসত্য ব্যবহার

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, মহারাজ বিজয়ের শ্রীহট্ট জয় কালে, তৎপার্শ্ববর্ত্তী জয়ন্তিয়ারাজ ভীত হইয়া ত্রিপুরেশ্বরের সহিত প্রীতি স্থাপনার্থ নানাবিধ উপঢৌকনসহ তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মহারাজ বিজয়, জয়ন্তিয়াপতির এই ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে কতিপয় হস্তী উপহার প্রদান করেন। জয়ন্তিয়ারাজ স্বরাজ্যে যাইয়া প্রচার করিলেন — "ত্রিপুরেশ্বর ভীত হইয়া আমাকে হস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়াছেন।"

হাড়ি সৈন্যের জয়ন্তিয়া অভিযান

অল্পকাল মধ্যেই এই সংবাদ মহারাজ বিজয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি জয়ন্তিয়াপতির অসঙ্গত স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া কোপান্বিত হইলেন, এবং তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিবার নিমিত্ত দ্বাদশ সহস্র হাড়ি জাতীয় সৈন্য প্রেরণ করিলেন। দুর্ব্বলের প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ অথবা তাঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত সৈনিক বল প্রয়োগ করা মহারাজ বিজয় সঙ্গতবোধ করেন নাই, এজন্যই হাড়িদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। শূকর তাড়াইবার সুদীর্ঘ যষ্টি তাহাদের যুদ্ধাস্ত্র এবং ডগর রণবাদ্য ছিল। এই নববিধানের অভিযান নিশ্চয়ই আমোদজনক এবং হাস্যোদ্দীপক হইয়াছিল। জয়ন্তিয়ানাথ এই ঘটনায় লজ্জিত এবং ভীত হইয়া, হেড়ম্বেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময় নির্ভয়নারায়ণ হেড়ম্বের অধিপতি ছিলেন। †

---

* ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ১৫ পৃষ্ঠা।

† রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"এমত সাজিয়া সবে থানাতে যায়ন্ত।
শুনিল খাসিয়া রাজা এ সব বৃত্তান্ত।।
শীঘ্র গিয়া মিলিলেক হেড়ম্ব রাজাতে।
দূত এক পাঠাইল ত্রিপুরেশ্বরেতে।।
হেড়ম্বের নরপতি নির্ভয় নারায়ণ।
পত্র এক লিখিলেক ত্রিপুর সদন।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড, — ৪৫ পৃঃ।

রাজমালার এই উক্তিদ্বারা ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য ও হেড়ম্বেশ্বর নির্ভয় নারায়ণ সমসাময়িক নির্ণীত হইতেছেন। আসামের ইতিহাস প্রণেতা মিঃ গেইট সাহেবের মতে, শত্রুদমন বা প্রতাপ নারায়ণ ১৬১০ খৃঃ

তিনি জয়ন্তিয়াপতির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনার্থ মহারাজ বিজয়কে পত্রদ্বারা অনুরোধ করিলেন। বিজয়মাণিক্য জয়ন্তিয়া হইতে হাড়ি সৈন্য ফিরাইয়া আনিয়া হেড়ম্বেশ্বরের অনুরোধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। *

পরাজিত জয়ন্তিয়া-রাজ কে?

এই সময় জয়ন্তিয়ার (খাসিয়ার) রাজা কে ছিলেন, জানা আবশ্যক। পুরাবৃত্ত আলোচনায় জানা যায়, জয়ন্তিয়া নারীদেশ বলিয়া জৈমিনি ভারতে উক্ত হইয়াছে। এই প্রদেশের অধীশ্বরী বীরাঙ্গনা প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল। তদবধি সুদীর্ঘ কাল জয়ন্তিয়া রাজ্য হিন্দুরাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছে। তৎপর খস ও সিণ্টেঙ্গ প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিগণ কর্ত্তৃক হিন্দু রাজ্যের বিলোপ ঘটে ; এবং জনৈক পার্ব্বত্য সরদার জয়ন্তিয়া প্রদেশের শাসনদণ্ড ধারণ করেন, তাঁহার নাম পর্ব্বত রায়। গেইট সাহেবের মতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

পর্ব্বত রায়ের পরে, মাঝ গোসাঞি (১৫১৬ --- ১৫৩২ খৃঃ), বুড়া পর্ব্বত রায় (১৫৩২ --- ১৫৪৮ খৃঃ), বড় গোসাঞি (১৫৪৮ --- ১৫৬৪ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছেন।

অব্দে হেড়ম্বের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কোন্ সন হইতে কোন্ সন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন গেইট সাহেব তাহা বলেন নাই। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্ব্বাংশের উপসংহারে লিখিত আছে ; — "কেবল জয়ন্তিয়াপতি নহে, বীরবর শত্রুদমন আহোম নৃপতি প্রতাপ সিংহকে পরাজয় করেন, এবং স্বয়ং প্রতাপনারায়ণ নাম ধারণ পূর্ব্বক রাজধানী মাইবঙ্গকে কীর্ত্তিপুর নামে অভিহিত করেন। ইনিই কাছাড় রাজবংশাবলীতে নির্ভয়নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন।" এই উক্তিদ্বারা জানা যাইতেছে, গেইট সাহেবের কথিত শত্রুদমন বা প্রতাপনারায়ণ এবং রাজমালার নির্ভয়নারায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি। বিজয়মাণিক্য ১৫২৮ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। নির্ভয়নারায়ণ ১৬১০ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিবার কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; তিনি ইহার কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। সুতরাং ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য ও হেড়ম্বের অধিপতি নির্ভয়নারায়ণ সমসাময়িক ছিলেন, এরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

কৈলাসবাবুর রাজমালায় কাছাড় (হেড়ম্ব) রাজগণের যে বংশলতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে নির্ভয়নারায়ণ, পাণ্ডুপুত্র ভীমের অধস্তন ৫৩ স্থানীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দ্ধারণ নিতান্তই অযৌক্তিক। যিনি ১৬১০ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি মহাভারতোক্ত ভীমসেনের অধস্তন ৫৩ স্থানীয় হইতে পারেন না। ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য, মহারাজ ত্রিপুরের অধস্তন ১০৮ স্থানীয়। ত্রিপুর, যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা, সুতরাং নির্ভয় নারায়ণকে ভীমের অধস্তন ৫৩ স্থানীয় ধরা হইলে, তিনি বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক অথবা ১৬১০ খৃঃ অব্দের রাজা হইতে পারেন না। এই কারণে কৈলাসবাবুর নির্দ্ধারণ প্রমাদমূলক সাব্যস্ত হইতেছে।

* এতদ্বিষয়ক বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তের ২য় ভাগ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম অধ্যায়ে এবং কৈলাসবাবুর রাজমালার ২য় ভাগ, ৪র্থ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বড় গোসাঞির পর বিজয়মাণিক্য জয়ন্তিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। * ইনি ১৫৬৪ হইতে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য ১৫২৮ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; এতদ্দরুণ ইনি জয়ন্তিয়াপতি বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক নির্ণীত হইতেছেন এবং এতদুভয়ের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীহট্টের ইতিহাস-প্রণেতাও ইহাই বলিয়াছেন, যথা ;—

"বড় গোসাঞির পর বিজয়মাণিক্য (সম্ভবতঃ) ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার সময়ে ত্রৈপুর রাজবংশেও বিজয়মাণিক্য নামে প্রবলপরাক্রান্ত এক রাজা রাজত্ব করিতেন। এই বিজয়মাণিক্য প্রখ্যাতকীর্ত্তি রত্নমাণিক্যের ষষ্ঠ পুরুষ স্থানীয়। * * ইঁহার পরাক্রমের সংবাদ শ্রবণে জয়ন্তিয়াপতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তৎসহ মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন।" †

জয়ন্তিয়া রাজার প্রতিহিংসা-সাধনের চেষ্টা

এই 'মৈত্রী স্থাপন' ফলেই জয়ন্তিয়াপতি, ত্রিপুরেশ্বর হইতে হস্তী উপহার পাইয়াছিলেন এবং তন্মূলে উৎপন্ন মনোমালিন্য হেতু হাড়িসৈন্য দ্বারা জয়ন্তিয়া রাজ্য আক্রমণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। হেড়ম্বেশ্বরের মধ্যবর্ত্তীতায়, জয়ন্তিয়াপতি ত্রিপুরেশ্বরের ক্ষমা লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু এই দারুণ অপমানের কথা তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। প্রতিহিংসা পরতন্ত্র জয়ন্তী-নাথ ত্রিপুর রাজ্যস্থ পর্ব্বতবাসী কিরাতদিগকে বশীভূত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে বিজয়মাণিক্যের কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রয়াসী হইলেন।

বিজয়মাণিক্যের রাজনীতিক কৌশল

মহারাজ বিজয়ের ন্যায় রাজনীতি কুশল ও কূট-নীতিজ্ঞ ভূপতির নিকট এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা অধিককাল গোপন রহিল না। তিনি জয়ন্তিয়া রাজের কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া, আত্মবল দৃঢ় করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সে কালে জয়ন্তিয়া রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী, ত্রিপুরেশ্বরের প্রজা 'সাখাসেপ্' ও 'থাঙ্গাচেপ্' আখ্যাত হালাম সম্প্রদায়ের কুকিগণ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রমশালী ছিল। ইহাদের বাহুবলে ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের রাজ্যের সীমা ও রাজ সম্মান যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহারা ত্রিপুরেশ্বরের বিশেষ অনুরক্ত প্রজা হইলেও রাজনীতিকুশল মহারাজ বিজয় এই সময় তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। জয়ন্তিয়াপতির কুহকে ভুলিয়া কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

রাজদত্ত শাসন

অতঃপর মহারাজ কুকিদিগকে রাজধানীতে আহ্বান করিয়া, চির-বশ্যতাবিগর্হিত কোন কার্য্যে লিপ্ত না হইবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলেন ; এবং সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ ও চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে, তাহাদিগকে ধাতু নির্ম্মিত বিতস্তি পরিমিত একটী হস্তী ও একটী ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি

* রাজমালা প্রথম লহরের টীকায় 'রাজচিহ্ন' শীর্ষক অংশে জয়ন্তিয়ার তিন জন ভূপতি 'মাণিক' উপাধি গ্রহণ করিবার কথা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিজয়মাণিক্যের নাম পাওয়া যাইবে।

† শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — ২য় ভাগ, ৪র্থ খণ্ড, ১ম অধ্যায়।

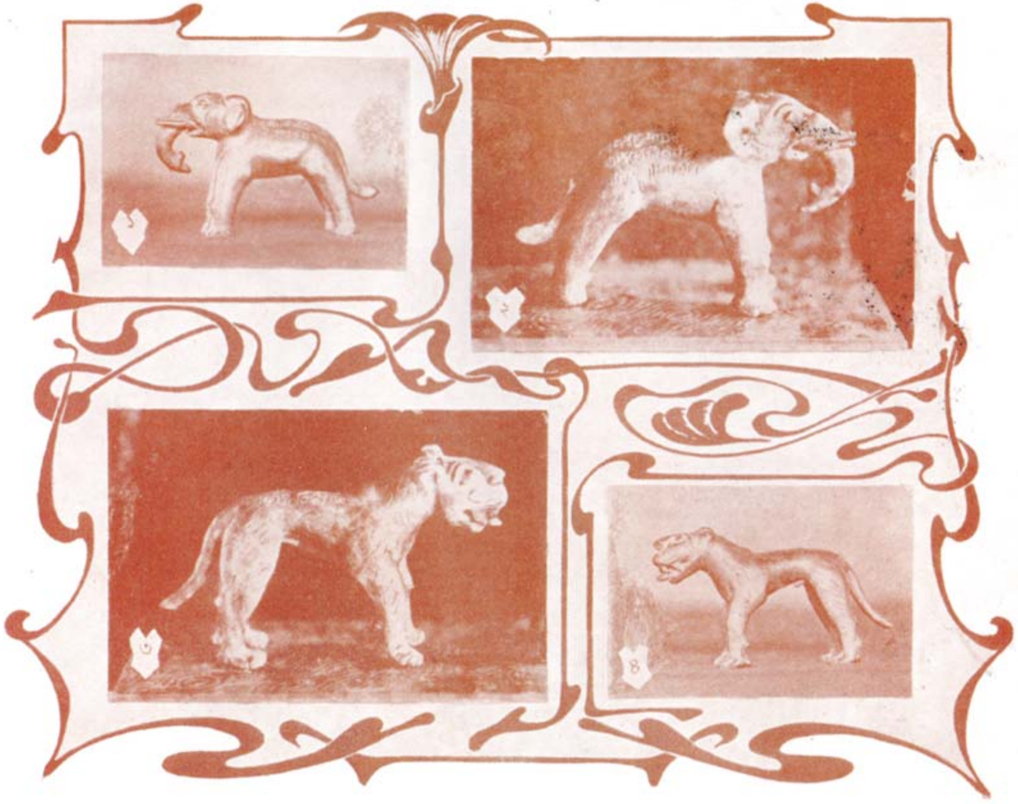

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসন।

(১) হস্তীর বামপার্শ্বের চিত্র, (২) দক্ষিণপার্শ্বের চিত্র, (৩) ব্যাঘ্রের দক্ষিণপার্শ্বের চিত্র, (৪) বামপার্শ্বের চিত্র।

উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশে বঙ্গাক্ষরে, নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত বাক্যাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

“পূর্ব্বাপৌর্য্য ক্রমাদ্ভবন্ত আত্মীয়া,
ইদানীং যদি বৈপরিত্যমাচরন্তি,
তদোপরি ধর্ম্মঃ শস্য নাশোভবি-*
ষ্যতি পশ্চাদগজ শার্দ্দূলৌ।।”

এই বাক্যাবলী বিশুদ্ধ এবং বিস্পষ্ট নহে; ইহা ইঙ্গিতবাণী মাত্র। লিপির কোন কোন অংশ ক্ষয় হেতু অস্পষ্ট হওয়ায়, আয়তনবর্দ্ধক কাঁচের (magnifying glass) সাহায্যে পাঠ করিতে হয়। আমরা অতি কষ্টে ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। এই সাঙ্কেতিক বাক্যের স্থূলমর্ম্ম নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“তোমাদের সহিত পূর্ব্বাপর যে আত্মীয়তা চলিয়া আসিতেছে, ইদানীং যদি তাহার বিপরীত আচরণ কর, তবে তোমাদের ধর্ম্ম ও শস্য বিনষ্ট হইবে, এবং পশ্চাৎ গজ ও শার্দ্দূল কর্ত্তৃক তোমরাও বিনষ্ট হইবা।” †

কুকি জাতির রাজভক্তি

কুকিগণ দুর্দ্ধর্ষ হইলেও সাধারণতঃ ধর্ম্মভীরু এবং রাজভক্ত ; রাজাকে তাহারা দেবতা বলিয়া জানে। ইহাদের স্বকৃত শস্যই জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র সম্বল। সর্ব্বদা অরণ্যে বাস করিতে হয়, সুতরাং প্রবল শত্রু হস্তী ও ব্যাঘ্র তাহাদের চির সহচর এবং এই সকল রিপুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। তাহারা প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত রাজ-শাসনে ধর্ম্ম ও শস্য নষ্ট এবং গজ ও শার্দ্দূল কর্ত্তৃক নিহত হইবার ভীতিসঙ্কুল অনুজ্ঞা থাকায়, কুকিগণ সেই আজ্ঞাকে দেবতার আদেশ জ্ঞানে বংশপরম্পরা বিশেষ সতর্কতার সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আসিতেছে ; এবং উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়কে দেবতা জ্ঞানে প্রতিদিন ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ওঝাইগণ ‡ এই পূজার অধিকার পাইয়াছে।

এই প্রতিমূর্ত্তিদ্বয় মহারাজ বিজয়ের রাজনীতিক গাম্ভীর্য্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উগ্রস্বভাব অসভ্য কুকিগণের কর্কশ হৃদয়ে রাজভক্তির বীজ চিরস্থায়ী করা যাইতে পারিত কি না, বর্ত্তমানকালে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজসাধ্য নহে।

---

* পাঠের প্রথমাবধি “শস্য নাশোভবি” পর্য্যন্ত গজ পৃষ্ঠে এবং পরবর্ত্তী অংশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

† এতদ্বিষয়ক বিস্তৃত বিবরণ উল্লিখিত “মহারাজ বিজয়মাণিক্য” শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।
(নব্যভারত — কার্ত্তিক সংখ্যা, ১৩০৪ বাং)।

‡ কুকির পৌরোহিত্য কার্য্যের ভার যাহাদের হস্তে অর্পিত হয়, তাহারা ‘ওঝাই’ আখ্যা পাইয়া থাকে।

রাজকর

সে কালে রাজকর কি নিয়মে নির্দ্ধারিত ও গৃহীত হইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। সমভূমির করের হার অতি অল্প ছিল, ইহা বুঝা যায়। পার্ব্বত্য কুকিগণ, পূর্ব্ব প্রথানুসারে নানাবিধ বস্তু এবং বন্য জন্তু বার্ষিক ভেট প্রদান করিত এবং তাহাই কর স্বরূপ গণ্য হইত। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে কুকিগণের প্রদত্ত ভেটের তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ;—

"গজদন্ত গবয় ছাগ কাংস্য বাদ্য ঘোঙ্গ।
রক্ত কৃষ্ণ শ্বেত বস্ত্র বিশাল সু-রঙ্গ।।
কাংস্য থালি পিকদানী তাম্রের কঙ্কণ।
উবা ফেরু জল পাত্র দেবদারু বন।।
কিরাতিয়া খড়্গ শক্তি পিত্তল কাংস্য ঝাড়ি।
রাজভেট পাঠাইল পূর্ব্ব অনুসারি।।
নানাবিধ বস্তু নানা রঙ্গ ঘোড়া।
সহস্র সহস্র কুকি আসিল দিগম্বরা।।"

এই তালিকা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, গজদন্ত, ঘোড়া ইত্যাদি মূল্যবান বস্তুর সহিত, রাজগণের অগ্রাহ্য তাম্রের কঙ্কণ ইত্যাদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তুও আছে। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, কুকিগণ যে সকল বস্তু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইত এবং তাহাদের ভক্তি প্রণোদিত হৃদয়ে যে বস্তু রাজাকে প্রদান করিতে প্রবৃত্তি জন্মিত, তাহাই রাজদরবারে উপস্থিত করা হইত। সেই বস্তু মূল্যবান হউক বা অকিঞ্চিৎকর হউক, ভক্ত প্রজার প্রদত্ত উপহার বলিয়া রাজা তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন।

এতদ্ব্যতীত পর্ব্বতবাসী অন্য শ্রেণীর প্রজা এবং কুকিগণ রাজকরের বিনিময়ে, বৎসরের মধ্যে ছয় দিবসের নিমিত্ত সোনার খনিতে এবং রেশমের কারখানায় কার্য্য করিতে বাধ্য ছিল। এবং সরকারী হস্তীখেদার কার্য্যকালে ইহারা উপস্থিত থাকিয়া, উক্ত কার্য্যে নিয়োজিত রাজকর্ম্মচারীর আদেশ ও উপদেশানুসারে খেদার কার্য্য সম্পাদন করিত। রাজ্য ও রাজ্যেশ্বরের স্বার্থ এবং সম্মানরক্ষার নিমিত্ত ইহারা যুদ্ধ করিত। পার্ব্বত্য প্রদেশে সরকারী সংবাদ প্রচার করা এবং রাজকর্ম্মচারিগণ পর্ব্বতে গেলে তাঁহাদের সঙ্গীয় জিনিসপত্র বহন করিয়া এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া ইহদের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই সকল কারণে ইহারা করের দায় হইতে মুক্ত ছিল। সমভূমির প্রজাগণ হইতে মুদ্রা কর গ্রহণ করা হইত, তাহার হার অতি সামান্য ছিল।

মুদ্রা

এই সময় ত্রিপুরায় সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল। এটি রাজদরবারের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইত। রাজগণ কোনও উল্লেখযোগ্য সৎকার্য্য করিলে অথবা স্বয়ং নূতন প্রদেশ জয় করিলে, তাহা স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে নূতন মুদ্রা প্রস্তুত এবং ঘটনার স্থূলমর্ম্ম তাহাতে উৎকীর্ণ হইত। সিংহাসনারোহণ, তীর্থ কার্য্য সম্পাদন এবং যুদ্ধে

জয়লাভ করিয়া সেই সকল ঘটনার উল্লেখ করতঃ মুদ্রা প্রস্তুতের নিদর্শন রাজমালায় অনেক পাওয়া যাইবে। * সে কালে মুদ্রার স্থলে কড়ির প্রচলন থাকিবারও নিদর্শন পাওয়া যায়। †

সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা রাজমালায় পাওয়া যায় না। প্রথম লহরের টীকায় বলা হইয়াছে, রাজমালায় কেবল রাজগণের বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অথচ রাজা সাধারণ সমাজের অন্তর্ভুক্ত নহেন। যে গ্রন্থে সাধারণের বিষয় আলোচিত না হয়, তাহাতে সমাজতত্ত্ব পাইবার আশা যে বিরল, এ কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। আনুষঙ্গিকভাবে যে দুই একটী কথার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে, তাহা এস্থলে বিবৃত হইবে।

সুরার প্রভাব

সে কালে রাজ্যমধ্যে মদ্যের প্রচলন অধিক ছিল। কুকি প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি জলের ন্যায় মদ্য ব্যবহার করিত, বর্ত্তমানকালেও তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। থানাংচির কুকিগণ ত্রিপুরবাহিনী কর্ত্তৃক সুদীর্ঘ আট মাস কাল দুর্গ মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়াও মদ্যপানে বিরত হয় নাই। ‡ রাজার ঘনিষ্ঠ কুটুম্বগণের মধ্যেও মদিরার আদর ছিল। ধন্যমাণিক্য স্বীয় জামাতা হোপাকলাউকে সুবর্ণ সংগ্রহের নিমিত্ত কুকি প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কুকিগণ বুঝিল, উক্ত প্রদেশে স্বর্ণখনি থাকিবার বিষয় প্রকাশ পাইলে ত্রিপুরেশ্বর তথায় থানা বসাইবেন। তদ্দরুণ তাহাদের নানাবিধ অসুবিধা ঘটিবে এবং সোণার খনিতে কাজ করিতে হইবে। তাহারা এই উপদ্রব নিবারণোদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করিয়া

---

* (১) "চৌদ্দশ পাঁচত্রিশ শকে সমর জিনিল।
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

(২) "ফলমতি তীর্থে স্থান করে মহামতি।
মোহর মারিল তথা দান ধর্ম্ম যদি।।"
দেবমাণিক্য খণ্ড।

(৩) "ব্রহ্মপুত্র স্নান করি জরপ মারিল।
ধ্বজ ঘাট বিজযী বলে মোহরে লিখিল।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

† "হেন মতে পঞ্চশত কুষ্মাণ্ড লইল।
রাজঘর হনে কড়ি শুড়িরে দেওয়াইল।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

‡ থানাংচির কুকিগণ সম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—
"গেড়ের উপরে সৈন্য মদে মত্ত হৈয়া।
ত্রিপুরাকে গালি দেয় পদ দেখাইয়া।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

রাজ-জামাতাকে সসম্মানে গ্রহণ করিল, পরিশেষে মিত্রভাগে অতিরিক্ত মদ্যদ্বারা বিহ্বল করিয়া, সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁহাকে সংহার করিয়াছিল। * মহারাজ বিজয়মাণিক্যের আদেশানুসারে মাধব নামক ব্যক্তি, প্রধান সেনাপতি দৈত্য নারায়ণকে অত্যধিক সুরা পান করাইয়া বিহ্বল অবস্থায় নিহত করিবার নিদর্শনও রাজমালায় পাওয়া যায়। † সৈনিক বিভাগে সুরার প্রাদুর্ভাব থাকিবার কথা প্রথম লহরে পাওয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় লহরেও এতদ্বিষয়ক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কথা উপরে বলা হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বরের পাঠান সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উজীরকে বধ করিয়াছিল, এবং বিজয়মাণিক্যকে নিহত করিয়া রাজধানী লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সুরামত্ত অবস্থায় তাহাদের মধেও কলহ হওয়ায়, গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া যায়। ‡ মহারাজ বিজয় তাহাদিগকে এই ষড়যন্ত্রের উপযুক্ত ফল প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ বিজয় চট্টগ্রাম জয় করিয়া যে সকল বস্তু পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি সুবর্ণকুষ্মাণ্ড § ছিল। জনৈক সৈন্য

---

* "মন্ত্রণাতে জামাতাকে মদ্য পান দিল।
মদ্যেতে বিহ্বল জামাই কুকিয়ে কাটিল।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

† "অন্ন খাইয়া মদ্য পান করিল বহুত।।
আর মদ্য না খাইব কহে সেনাপতি।
পিয় বলি মাধবে পিয়ায় মদ্য অতি।।
মদ্য পানে সেনাপতি পরিলেক খাটে।
খড়্গ লৈয়া তখনে মাধবে মাথা কাটে।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

‡ "মদ্য পানে পাঠানের কলহ জন্মিল।
পাঠানের কুমন্ত্রণা তাতে ব্যক্ত হৈল।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

§ সে কালে সোণাদ্বারা কুষ্মাণ্ডের আকারবিশিষ্ট ডেলা প্রস্তুত করিয়া তাহা রক্ষা করা হইত।

প্রাচীনকালে সকলেরই অবস্থা স্বচ্ছল ছিল এবং দেশময় সুবর্ণ-মণি-মাণিক্যের ছড়াছড়ি ছিল। সোনার ভাঁটা বালকগণের খেলার সামগ্রী ছিল। ইহা দূর দেশের কথা নহে, ত্রিপুর রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী (পরবর্ত্তীকালে রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট) মেহেরকুলেরই এবম্বিধ সমৃদ্ধি ছিল। এরূপ অবস্থার কালে কুষ্মাণ্ড আকারের স্বর্ণ ভাঁটার অস্তিত্ব অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। 'ময়নামতীর গানে' সে কালের অবস্থা পাওয়া যায় ;—

"কাহার বাটিতে কেহ উদার না চাইত।
সোণার ঢেলুয়া লৈয়া বাল্লকে খেলাইত।।
হাড়াইলে ঢেলুয়া পুনি না চাহিত য়ার।
এমতে গোআইল লোকে হরিষ অপার।।
মেহারকুল বেড়ি ছিল মুলিবাঁশের বেড়া।
গৃহস্তের পরিদান সোণার পাছুরা।।" ইত্যাদি।
(ভবানী দাস।)

গোপনে একটী কুষ্মাণ্ড শুঁড়িকে প্রদান করিয়া তদ্বিনিময়ে মদ্যপান করিয়াছিল। * রাজপরিবারের মধ্যেও মদ্যের প্রচলন না ছিল এমন নহে। অমরমাণিক্য, জয়মাণিক্যের সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকা কালে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতি রণাগণ, তাঁহাকে মদ্যপান করাইয়া নিহত করিবার নিমিত্ত চেষ্টিত হইয়াছিলেন। †

কেবল পুরুষগণের সুরাসক্তির কথা বলিলে চলিবে না। রমণী সমাজেও মদীরার প্রচলন থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মহিষী সৈন্যের রমণীদিগকে মদ্যপান করাইয়া তাহাদের অবস্থা দর্শনে আনন্দলাভ করিতেন। ‡

সেকালে মদ্য অতি সুলভ ছিল। সুবর্ণ কুষ্মাণ্ডের বিনিময়ে মদ্য পান করিবার কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে রাজমালা বলেন ;—

"পিতলের জানিয়া কুষ্মাণ্ড নিয়াছিল।
এক আনা মূল্য করি মদ্য পান কৈল।।
অবশিষ্ট লৈয়া গেল রাজার সাক্ষাত।
সুবর্ণ কুষ্মাণ্ড হেন জানিল পশ্চাত।।
দূত মুখে শুনি রাজা তদন্ত করিল।
শুঁড়ি ঘরে দিয়া পাইকে মদ্য পান কৈল।।
আষ্টসের মদ্য তাতে করিয়াছে পান।
এ সব বৃত্তান্ত কহে রাজা বিদ্যমান।।" §

রাজমালার এই উক্তিদ্বারা জানা যায়, এক আনা মূল্যে আট সের অর্থাৎ প্রতি পয়সায় দুই সের মদ্য পাওয়া যাইত। সেকালে প্রতি ঘরে ঘরে মদ্য চুঁয়াইবার অধিকার ছিল এবং বর্ত্তমান কালের ন্যায় সুরার উপর কোনরূপ শুল্ক ধার্য্য ছিল না। বিশেষতঃ

---

* "দেবে কুষ্মাণ্ড এক পাইকে লুকাইয়া।
মদ্য পান করিছিল শুঁড়ি ঘরে গিয়া।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

† অমরমাণিক্য স্বয়ং বলিয়াছেন ;—
"আমা ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে।
মদ্য পান করাইয়া চাহিল মারিতে।।"
জয়মাণিক্য খণ্ড।

‡ "সাগরের খনন দেখিতে মহারাণী।
সৈন্যের রমণী সনে রাত্রিতে আপনি।।
জ্যোৎস্নাকাল কোন রাত্রে নারিগণ সঙ্গে।
মদ্য মাংস খাওয়াইয়া চাহে বহু রঙ্গে।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

§ রাজমালা — বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

মদিরা প্রস্তুতের উপকরণ তৎকালে বিনামূল্যে অথবা অল্পমূল্যে পাওয়া যাইত। মদিরা এত সুলভ হইবার ইহাই কারণ।

পান প্রদান দ্বারা আমন্ত্রণ ও সম্মান প্রদর্শনের প্রথা

সমাজে আর একটী বিশেষ নিয়ম প্রচলিত থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহা কোন কার্য্য সম্পাদনার্থ ব্যক্তি বিশেষকে আহ্বান অথবা বিদায়কালে পান প্রদান করা। সেনাপতি ও মন্ত্রী গোপীপ্রসাদ নারায়ণ, স্বীয় জামাতা অনন্তমাণিক্যকে বধ করিবার নিমিত্ত রাজার মল্ল গুরু গদাভীমকে অনুরোধ করিলেন। গদাভীম এই প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলিয়াছিল ;—

"পুরুষানুক্রমে আমি তাহার চাকর।।
শতাধিক পুরুষাবধি বিজয় নৃপতি।
তার বংশ মারি আমা নাহি অব্যাহতি।।
দশ দ্বিজ সম যেন এক রাজা হয়।
রাজ বংশ বধে হয় নরক নিশ্চয়।।
ছত্রধারী সিংহাসন যেই রাজা হয়।
তার বধে মহাপাপ ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।।
বিশেষ আমার বংশ পালিল নৃপবরে।
কিবা ধর্ম্ম হয়ে আমি তাকে মারিবারে।।" *

মন্ত্রী বুঝিলেন, ইহার দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। তখন ;—

"একথা শুনিয়া মন্ত্রী নিঃশব্দে রহিল।
পান দিয়া গদাভীম বিদায় করিল।।" †

অন্যত্রও পান প্রদানদ্বারা আহ্বান বা বিদায় করিবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রত্নমাণিক্যের শাসনকালে তিনি, স্বীয় মাতুল বলিভীম নারায়ণ, অনুজ দুর্জ্জয় দেব এবং রাজবংশজাত গৌরীচরণ ও চম্পকরায় এই চারি জনকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া যুবরাজগণই রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই সময় ত্রিপুরেশ্বরের প্রতিশ্রুত হস্তী উপহার না পাওয়ায়, ঢাকার সুবা বাহাদুর খাঁ বহু সংখ্যক সৈন্যসহ কেশরলালকে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মোগল সেনাপতি কেশরলাল, স্বীয় অধীনস্থ সেনানায়রকদিগকে শিবিরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ত্রিপুরেশ্বর হস্তী প্রদান করিতেছেন না। বলিভীমই এই অনর্থের কারণ। তোমরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া আন। হস্তী না পাইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য। বলিভীমকে ধৃত করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি সাহসী

---

* রাজমালা — অনন্তমাণিক্য খণ্ড।

† এইরূপ পান প্রদানের প্রথা হিন্দু সমাজে আধুনিক নহে ; প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে এই প্রথা প্রচলিত থাকিবার বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

হও, সে দর্প সহকারে আমার হস্তের পান গ্রহণ কর।" *

কৃষ্ণমাণিক্যের শাসন সময়ে যুবরাজ হরিমণি দেব, ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাপ্তানের † সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহার শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যাগমন কালে সাহেব তাঁহাকে বিদায় উপহার স্বরূপ একটী উৎকৃষ্ট বন্দুক, একটি পিস্তল, একথান বনাত ও পান প্রদা নকরিয়াছিলেন। ‡

ত্রিপুর রাজ্যে পান প্রদানদ্বারা নিমন্ত্রণ করিবার প্রথা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কোন শুভ কার্য্য সম্পাদনার্থ রাজাজ্ঞা গ্রহণকালে এবং সেই কার্য্যোপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিবার কালে পান প্রদান করা হয়। ইহা ত্রিপুর সমাজের সুপ্রাচীন প্রথা।

রাজদরবারে পান ও গন্ধদ্রব্য প্রদান করা হিন্দু রাজত্বকালের নিয়ম। সেকালে পানের সহিত চন্দন দেওয়া হইত; সেই প্রাচীন প্রথা অনুসরণে অদ্যাপি হিন্দুগণের বিবাহ সভায় পান ও চন্দন দেওয়া হয়। মুসলমান শাসনকালে চন্দনের পরিবর্ত্তে আতর প্রচলিত হইয়াছে। তদবধি রাজদরবারে পান এবং আতর প্রদান করা হয়। ত্রিপুরার রাজদরবারেও এখন এখানের সহিত চন্দনের বিনিময়ে আতরই প্রদান করা হইতেছে।

মহিলা মাহাত্ম্য

এই কালের রাজ-মহিষীগণ ধর্ম্মপরায়ণা, সাধ্বী এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। ভূমিদান, জলাশয় খনন এবং দেবতা স্থাপন ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের পুণ্য-কার্য্যদ্বারা অনেকে চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন। অনেক রাজমহিষী সহাস্য বদনে পতির চিতারোহণ দ্বারা হিন্দুমহিলার সতীত্ব গরিমার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

রাজমহিষীগণের তেজস্বিতা ও বুদ্ধি প্রাখর্য্যের দৃষ্টান্ত অনেক আছে ; এস্থলে তাহার একটী মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে।

---

* 'চম্পকবিজয়' নামক হস্তলিখিত পুথিতে এতৎসম্বন্ধে লিখি আছে ;—

"কোন ব্যক্তি যাইবা যে হও আগুয়ান।
দর্প করি হস্ত হনে লও গুয়া পান।।"

† এই সাহেবের নাম কৃষ্ণমালায় 'কিংলাক' লিখিত হইয়াছে। এই নাম বিশুদ্ধ কি না, বুঝিবার উপায় নাই। রাজমালা ও কৃষ্ণমালা লেখকগণ অনেক ইংরেজের নাম বিকৃত করিয়া তাঁহাদিগকে ভূত বনাইয়াছেন।

‡ কৃষ্ণমালা নামক হস্তলিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায় ;—

"পিস্তল বন্দুক দুই ইস্পাত নির্ম্মাণ।
এই অস্ত্র আমরার যুদ্ধেতে প্রধান।।
এই বনায়ত যে অঙ্গের আভরণ।
তোমাকে দিলাম খাতিরজমার কারণ।।
পান দিয়া সাহেবে যে বহু আশ্বাসিয়া।
বাসা যাইতে যুবরাজ বিদায় করিয়া।" ইত্যাদি।

অনন্তমাণিক্য, তাঁহার শ্বশুর গোপীপ্রসাদের অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন এবং এই অতিরিক্ত বশ্যতাই তাঁহার বিনাশের কারণ হইয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। রাজমহিষী (গোপীপ্রসাদের কন্যা), পিতার ব্যবহারে সন্দিগ্ধা হইয়া রাজাকে সর্ব্বদা শ্বশুরালয়ে যাইতে নিষেধ করিতেন, কিন্তু রাজা তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। পরিশেষে গোপীপ্রসাদ রাজ্যলোভে রাজাকে নিধন করিলেন। মহারাণী পতিসহ চিতা আরোহণার্থ কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি শোকে এবং ক্ষোভে অভিভূতা হইয়া ক্ষিপ্তা বাঘিনীর ন্যায় দুষ্কর্ম্মান্বিত পিতাকে আক্রমণ করিলেন এবং তীব্র বাক্যবাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজ্যলোভান্ধ গোপীপ্রসাদ দুহিতার কর্কশ বাক্যে ও করুম রোদনে কর্ণপাত না করিয়া তাড়াতাড়ি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই দৃশ্য রাজমহিষীর অসহনীয় হওয়ায়, তিনি সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, — "তুমি রাজ্যলোভে রাজাকে হত্যা করে ক্ষুরধার নরকের পথ পরিষ্কার করিয়াছ ; আমাকে পতির সহগামিনী হইতে বাধা জন্মাইয়া ঘোর পাপজনক কার্য্য করিয়াছ। রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছ, রাণী বাকী থাকিবে কেন ?" ইহা বলিয়া মহারাণী পিতার বাম পার্শ্বে বসিবার নিমিত্ত সিংহাসনারোহণ করিলেন। পাপিষ্ঠ গোপীপ্রসাদ এবার কন্যার নিকট পরাজিত হইলেন, কন্যাকে বাম পার্শ্বে বসিতে উদ্যতা দেখিয়া তিনি রাম নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অতঃপর গোপীপ্রসাদ রাজধানীর সন্নিহিত চন্দ্রপুর গ্রামে সিংহাসন উঠাইয়া নিয়াছিলেন। *

রাজমহিষীর প্রাখর্য্য

এই সময় রাজ্যমধ্যে স্ত্রীশিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছিল। সেনাপতি গোপীপ্রসাদের (উদয়মাণিক্য) দ্বিতীয় পত্নীর পাঁচালী পাঠ করিয়া পতিকে শুনাইবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায়। প্রতিভাময়ী রাজ-মহিষীগণের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে তাঁহারা সুশিক্ষিতা ছিলেন, ইহাই প্রতীয়মান হয় ; কিন্তু রাজমালাকার তদ্বিষয়ক কোনও স্পষ্ট বিবরণ প্রদান করেন নাই।

স্ত্রীশিক্ষার নিদর্শন

ইঙ্গিত ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন

মনোগত ভাব অন্যকে বুঝাইবার নিমিত্ত ত্রিপুরায় নানাবিধ ইঙ্গিত প্রচলিত ছিল ; তদ্দ্বারা অনেক গুরুতর বিষয়ও সহজে বুঝান যাইত। জয়মাণিক্যের সেনাপতি অমরদেব স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

ইঙ্গিত

"আমা মারি রণাগণ রাজা হৈতে চায়।।
আমা ডাকে রণাগণ ভোজন করিতে।
মদ্যপান করাইয়া চাহিল মারিতে।।

---

* হস্তলিখিত 'ত্রিপুর বংশাবলী' গ্রন্থ আলোচনায় জানা যায়, উদয়মাণিক্য (গোপীপ্রসাদ) কন্যাকে চণ্ডীগড় নামক স্থান জায়গীর প্রদানপূর্ব্বক সেই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। চণ্ডীগড়, উদয়পুর ও সোণামুড়ার মধ্যবর্ত্তী, মোলাগড়ের সন্নিহিত স্থানে অবস্থিত।

কদ্‌বা-চিহ্ন।

তাহা না জানিয়া আমি গেলাম তখনে।
পান বটু ছেদি আমায় দেখায় অন্য জনে।।”

জয়মাণিক্য খণ্ড — ৭৪ পৃঃ।

পানের বোঁটা ছেদন করিতে দেখিয়াই অমরদেব সমস্ত অবস্থা বুঝিয়াছিলেন এবং অসুস্থতার ভাণ করিয়া সেই স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক আসন্ন বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই ইঙ্গিত না পাইলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল।

গোপনে অনুরাগ কিম্বা বিরাগ ভাব জানাইবার নানাবিধ ইঙ্গিত সমাজে প্রচলিত ছিল এবং বর্ত্তমান কালেও আছে। এ স্থলে তাহার একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। পার্ব্বত্য ত্রিপুরাগণের মধ্যে বিবাহ-প্রার্থী বরকে এক বৎসর কাল কন্যার বাড়ীতে থাকিয়া বিনাবেতনে কন্যার অভিভাবকগণের নির্দ্দেশমতে জুম ক্ষেত্রের ও সংসারের নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এবম্বিধ প্রথার মর্ম্ম এই যে, ভাবী জামাতা ও কন্যার মধ্যে পরস্পরের সদ্ভাব জন্মিবে কি না এবং বিবাহ-প্রার্থী ব্যক্তি কন্যাকে পালন ও সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে কি না, কন্যার অভিভাবকগণ এই সুযোগে তাহা বুঝিয়া লয়। এবং ভাবী জামাতাদ্বারা বিনা বেতনে কার্য্য করাইয়া, তাহা পণের বিনিময় বলিয়া মনে করে। কন্যা-পণ প্রদানে সমর্থ ব্যক্তিকে এরূপ খাটিতে হয় না। যদি কোন ভাবী বরকে কন্যা পছন্দ না করে, তবে সে কোন কথা না বলিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে বরের ভাতের মধ্যে অঙ্গার কিম্বা অন্যবিধ অখাদ্য বস্তু গুঁজিয়া দেয়, পানীয় জলে নুন কিম্বা বাটা লঙ্কা গুলিয়া দেয়। এইরূপ ব্যাপার দেখিলেই ভাবী বর বুঝিতে পারে, এখানে তাহার সুবিধা হইবে না ; তখন সে নীরবে সরিয়া পড়ে।

কদ্‌বা

অনেক সাঙ্কেতিক চিহ্ন রাজ কার্য্যেও গ্রহণ করা হইত। কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে, অথবা কোন স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইলে, লিখিত ক্রোকি পরওয়ানা কিম্বা নিষেধ আজ্ঞা প্রচারদ্বারা নিরক্ষর ও বর্ব্বর পার্ব্বত্য প্রজাদিগকে তাহা বুঝান কঠিন হইত ; একটী সাঙ্কেতিক চিহ্নদ্বারা সেই উদ্দেশ্য অনায়াসেই সিদ্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। স্থানীয় ভাষায় সেই চিহ্নকে ‘কদ্‌বা’ বলে। একখণ্ড বাঁশের মাথা চৌফলা করিয়া, চিড়া স্থানের ফাটলে আড়াআড়িভাবে (× ক্রশ্‌ভাবে) দুই টুকরা বাঁশের চটা বসাইয়া, সেই বংশদণ্ড যেই স্থানে বা যেই সম্পত্তির সান্নিধ্যে পুঁতিয়া দেওয়া হইত, সেই স্থানের আশেপাশে কেউ যাইত না এবং এরূপ চিহ্নদ্বারা ক্রোক করা সম্পত্তি কেহ স্পর্শ করিতে সাহসী হইত না। কালক্রমে সরকারের অগোচরে ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত যে সে ব্যক্তি এই চিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ করিল। এই কারণে, বিশেষতঃ আইনের বিধানানুযায়ী কার্য্য পরিচালনের কড়াকড়ি হেতু, সাঙ্কেতিক চিহ্ন কার্য্যক্ষেত্রে অকর্ম্মণ্য হওয়ায়, এই চিহ্ন ব্যবহারের প্রথা ক্রমশঃ রহিত হইয়াছে।

পার্ব্বত্য প্রদেশের নিমিত্ত আর একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রচলিত ছিল, তাহা বিশেষ গুরুতর। এই চিহ্ন লৌহনির্ম্মিত ছিল ; স্থানীয় ভাষায় ইহার নাম 'ফুরাই'। এই চিহ্নবাহক পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া বাচনিক যে আজ্ঞা জ্ঞাপন করিত, তাহা পার্ব্বত্য প্রজাগণ নিঃসঙ্কোচে রাজাজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ ও পালন করিত। রাজার আদেশ ব্যতীত এই চিহ্ন বাহির করা হইত না ; এবং যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিশেষ গুরুতর কারণ ব্যতীত সামান্য কারণে ইহা ব্যবহারের প্রথা ছিল না। এই চিহ্নটি লইয়া সরকারী 'বিনন্দিয়া' সিপাহী পার্ব্বত্য যে কোন পল্লীতে যাইয়া, যে আদেশ পালন করিতে হইবে তাহার মর্ম্ম জানাইত, এবং ফুরাইটী সেই পল্লীতে দিয়া আসিত। সেই পল্লীর লোক অবিলম্বে, তাঁহাদের সন্নিহিত অন্য পল্লীতে ফুরাই পৌঁছাইয়া রাজাজ্ঞা জানাইয়া দিত। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে ফুরাই চালিত এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজার আদেশ প্রচারিত হইত। ফুরাইটী হাতে হাতে সমস্ত পার্ব্বত্য পল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া যে স্থান হইতে বাহির হইয়াছে, সেই স্থানে ফিরিয়া আসিত।

ফুরাই

এই নিয়মে অতি সহজে এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশে রাজনির্দ্দেশ প্রচারিত হইত। সাধারণতঃ পার্ব্বত্য প্রজাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, নির্দ্ধারিত স্থানে সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত ফুরাই প্রেরণ করা হইত। ফুরাইতে কোন প্রাণীর রক্ত মাখাইয়া দিলে বুঝা যাইত — যুদ্ধকার্য্যে যোগদান করিতে হইবে। তাহার সঙ্গে লঙ্কা মরিচ বাঁধিয়া দিলে বুঝা যাইত, কার্য্য বিশেষ জরুরী। এরূপ স্থলে এক পল্লীতে ফুরাই উপস্থিত হওয়া মাত্র মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া সেই পল্লীর লোকেরা অন্য পল্লীতে তাহা পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য ছিল। দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে এই চিহ্ন চালাইতে হইত ; ঝড় বৃষ্টি বা কোন প্রকারের বাধা-বিঘ্নই এই কার্য্যের বাধা ঘটাইতে পারিত না। কোন পল্লীর লোক যথাসময়ে ফুরাই প্রেরণ পক্ষে শৈথিল্য করিলে তাহাদের গুরুতর দণ্ড হইত।

বাঁশের দ্বারাও অনেক সময় ফুরাই প্রস্তুত করা হইত, তাহাকে স্থানীয় ভাষায় 'ওয়াথ্লং' বলে। এতদ্দ্বারাও ফুরাইর উদ্দেশ্য সংসাধিত হইত। বংশ নির্ম্মিত ফুরাই বা 'ওয়াথ্লং'-এর গোড়াভাগ অগ্নিতে পোড়াইয়া দিলে তাহা জরুরী বলিয়া গণ্য হইত।

স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রথম আমল পর্য্যন্ত এই প্রথা সুশৃঙ্খলভাবে চলিয়া আসিতেছিল। কাল-মাহাত্ম্যে 'কদ্‌বার' ন্যায় 'ফুরাই' চালনার কার্য্যে ব্যভিচার আরম্ভ হইল। সরকারের অগোচরে সময় সময় পার্ব্বত্য পল্লীতে 'ফুরাই' প্রেরণ করা হইত। এই নিয়মের ব্যভিচারে রাজ্যে নানাবিধ অনিষ্টপাত ও অশান্তি উৎপাদনের আশঙ্কা থাকায়, মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের শাসনকালে খাস আপীল আদালতের (ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের হাইকোর্ট স্থানীয়) ১২৯৫ ত্রিপুরাব্দের ২২শে আশ্বিন তারিখের আদেশমূলে এই প্রথা রহিত

ত্রিপুরার সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

(১) ওয়াথূলং (২) ফুরই।

হইয়াছে। যে প্রস্তাব ও আদেশদ্বারা ফুরাই চালনার প্রথা নিবারণ করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

সোণামুড়া
ফৌজদারী আদালতের
মোহর।

৪১ নং সেহা।

মেমো

শ্রীলশ্রীযুত যুবরাজ বাহাদুর কুমিল্লা অঞ্চলে পদার্পণ উপলক্ষে সোণামুড়া টাউনের জঙ্গল পরিষ্কার হেতু ত্রিপুরাগণকে সংগ্রহ করার অনুমতি প্রচার হইলে, অত্র সোণামুড়া থানার আছাবদ্দীন কন্‌ষ্টেবল বড় নারায়ণ নিবাসী শ্যামরায় চৌধুরীর বাড়ীতে কুলী সংগ্রহ হেতু গমনপূর্ব্বক পীড়িত হওয়ায় নিজে যাইতে অক্ষম হইয়া অন্যান্য ত্রিপুরাগণকে সংবাদ দেওয়ার জন্য উক্ত শ্যামরায় চৌধুরী দ্বারা ফুরাই চালাইয়াছিল। শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাতের আদেশ ভিন্ন এই প্রকার ফুরাই সাধারণে চালাইবার প্রথা নাই।

অত্রত্য বিনন্দিয়া গারদের বরখাস্তী বিনন্দিয়া মুক্তাচরণ ত্রিপুরা তাহার নিজ কার্য্যে অত্র এলাকাস্থ রাঙ্গামুড়া বৈদ্যনাথ ত্রিপুরার বাড়ীতে যাইয়া উপরোক্ত ফুরাই প্রাপ্ত হইলে, তাহা এখানে উপস্থিত করার পর উক্ত শ্যামরায় চৌধুরী, বৈদ্যনাথ ত্রিপুরা এবং আছাবদ্দীন কন্‌ষ্টেবলকে তলব দিয়া জবানবন্দী লইলে দেখা গেল যে, আছাবদ্দীন কন্‌ষ্টেবলের অনুমতিমতে উক্ত শ্যামরায় চৌধুরী তাহার নিজ বাড়ীস্থিত ধনীরাম ত্রিপুরা নামক জনৈক ব্যক্তিদ্বারা ঐ ফুরাই প্রস্তুত করাইয়া বৈদ্যনাথ ত্রিপুরার বাড়ীতে প্রেরণ করিয়াছিল।

উপরোক্ত হেতুতে উক্ত আছাবদ্দীন কন্‌ষ্টেবল ও শ্যামরায় চৌধুরীকে রীতিমত ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ করিয়া জওয়াব গ্রহণান্তে বিবাদীর সাফাই সাক্ষী তলবে মোকদ্দমা শুনানির দিন আগামী ১লা আশ্বিন ধার্য্য হইয়াছে।

বর্ত্তমান ফুরাই চালনাতে সম্প্রতি যদিচ কোন অশান্তি বা অনিষ্টের কারণ না ঘটিয়া থাকুক, বাস্তবিক ফুরাই চালনা যে কতদূর ভয়ানক ব্যাপার ও তদ্ধেতু যে কত অনর্থ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে আইনতঃ কোন বিধান দেখা যাইতেছে না; এবং ফুরাই চালনা নিষেধ বলিয়া জানা আছে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন নিষেধ আজ্ঞা লিপিবদ্ধ থাকাও দৃষ্ট হয় না। এমতাবস্থায় উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কিরূপ প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য, সত্বর তদ্বিষয়ের বিহিতানুমতি পাওয়া এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সেমতে —

হুকুম হইল যে, —

উপরোক্ত বিষয়ের কিরূপ প্রতিবিধান করা যাইবেক, সত্বর বিহিতানুমতি পাওয়ার এবং ভবিষ্যতের জন্য একটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করার প্রার্থনায় অত্র মেমোর এক খণ্ড প্রতিলিপি মোং

রাজধানী মাননীয় আপীল আদালতের বিচারপতি সদনে প্রেরণ করা যায়। ইতি সন ১২৯৫ ত্রিং, তাং ২৮ শা ভাদ্র।

(Sd.) Kailash Chandra Sen,
Sheristadar.

(Sd.) Harimohan Das,
Deputy Magistrate.

ফুরাই একটী সাঙ্কেতিক চিহ্ন, যুদ্ধ ইত্যাদিতে কুকিগণ প্রতি ব্যবহার হইয়া থাকে। এই সাঙ্কেতিক চিহ্ন দর্শাইয়া পার্ব্বতীয় প্রজাগণকে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীযুতের সরকারী অনুমতি ব্যতীত উক্ত "ফুরাই" কেহ স্বেচ্ছাচারিতারূপে ব্যবহার করার নিয়ম নাই। প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণ কোন অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া না থাকিলেও সরকারী অনুমতি ভিন্ন উক্ত "ফুরাই" ব্যবহার করা অনুচিত হইয়াছে। সুতরাং বিবাদীগণের দণ্ড হওয়া সঙ্গত। সেমতে —

এই বিষয় বিহিতার্থে এই কাগজ মহামান্য খাস আপীল আদালতে পাঠান যায়। ইতি সন ১২৯৫ ত্রিং, ২১শে আশ্বিন।

(স্বাক্ষর) শ্রীকালীকমল সেন,
সেরেস্তাদার।

(স্বাক্ষর) **শ্রীগোপীকৃষ্ণ দেব,**
আপীলের বিচারপতি।

৯১ নং সেহা।

ফুরাই যদি কেহ অসদ অভিপ্রায়ে ব্যবহার করে, তবে রাজ-বিদ্রোহিতা ও রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন ও শান্তিভঙ্গাদির অপরাধে অপরাধী হইবে। যখন এই ব্যক্তিগণ অসরলভাবে কার্য্য করে নাই বলিয়া জানা যায়, তখন তাহাদিগকে ভালমত সতর্ক ও ভবিষ্যতে কেহ এমত করিলে শান্তিভঙ্গাদির দোষী হইবে বলিয়া মেমো প্রচার জন্য এই কাগজ আপীল আদালতের যোগে সোণামুড়া পাঠান যায়। ১২৯৫ ত্রিং, তারিখ ২২শে আশ্বিন।

(স্বাক্ষর) শ্রীগগনচন্দ্র বিশ্বাস,
পেস্কার।

(Sd.) M. R. Ray,
(স্বাক্ষর) **শ্রীব্রজমোহন দেব,**
খাস আপীল আদালতের
বিচারপতিগণ।

রাজগণের কাল নির্ণয়

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন রাজার শাসনকালের স্থূল বিবরণ প্রাসঙ্গিকরূপে পূর্ব্বে আলোচিত হইয়া থাকিলেও এ স্থলে তদ্বিষয়ক বিশদ বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্বকাল লইয়া রাজমালা দ্বিতীয় লহরের রচনা আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু রচয়িতা ইঁহার রাজ্য লাভের সময় কিম্বা শাসনকাল নির্দ্ধারণ করেন নাই। রাজমালার সমালোচক লঙ্ (Rev. James Long) সাহেবের মতে ধর্ম্মমাণিক্য ১৪০৭ খৃঃ অব্দে রাজা হইয়া, বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছে। * এই হিসাবে ১৪০৭ হইতে ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহারাজের রাজত্বকাল নির্ণীত হয়। পরলোকগত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন, — "১৩২৯ শকাব্দে মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য সিংহাসনারোহণ করেন।" † তাঁহার মতে মহারাজের রাজত্বকাল ১৩২৯ শক হইতে ১৪১২ শক পর্য্যন্ত তিরাশি বৎসর। চাক্‌লে রোসনাবাদের সেটেলমেন্ট অফিসার মিঃ কমিং সাহেব (J. G. Cummings, I.C.S.) কৈলাসবাবুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। 'History of Tripura' গ্রন্থের প্রণেতা মিঃ সেণ্ডিস্ সাহেব (E. F. Sandys) ১৪০৭ হইতে ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫১ বৎসর ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্বকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, মহারাজের রাজ্যলাভের শকাঙ্ক সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মতানৈক্য না থাকিলেও, রাজত্বকাল নির্দ্ধারণ সম্পর্কে তাঁহারা পরস্পর ঐক্যমত হইতে পারেন নাই। লঙ্ সাহেবের মতে মহারাজের রাজ্যভোগের কাল ৩২ বৎসর, কৈলাসবাবু ও কমিং সাহেবের মতে ৮৩ বৎসর, এবং সেণ্ডিস্ সাহেবের মতে ৫১ বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা কি সূত্র অবলম্বনে মহারাজের রাজ্যাভিষেকের সময় নির্ণয় করিয়াছেন, এবং শাসনকাল নির্দ্ধারণোপলক্ষে এবম্বিধ মত বৈষম্য ঘটিবার কারণ কি, কেহই তদ্বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই, অথবা আত্মমত সমর্থনের চেষ্টাও করেন নাই।

ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকাল

রাজমালা আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে, উপরিউক্ত নির্দ্ধারণ অভ্রান্ত এবং প্রমাণসহ নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ধর্ম্মমাণিক্য ১৩৮০ শকে তাম্র-শাসন দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। ‡ এবং তিনি বত্রিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছেন। § লঙ্ সাহেব প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের মতাবলম্বনে ১৩২৯ শক (১৪০৭ খৃঃ অব্দ) ধর্ম্মমাণিক্যের সিংহাসনারোহণের সময় ধরা হইলে, উক্ত শক হইতে ভূমিদানের কাল (১৩৮০ শক) পর্য্যন্ত একান্ন বৎসর হয়। সেণ্ডিস্ সাহেব বোধ হয় এই সূত্রই অবলম্বন

---

* He was appointed Raja, A. D. 1407, with the unanimous consent of the people. "He soon sought the road to heaven" by presenting lands to the Brahmans, the titles to which were registered on copper plates. After a peaceful reign of thirty-two years he died.
J. A. S. B. – Vol. XIX.

† কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাঃ, ৩য় অঃ, ৩৮ পৃঃ।

‡ ধর্ম্মমাণিক্যের প্রদত্ত তাম্র-শাসনে নিম্নলিখিত সময় নির্দ্দেশক বাক্যাবলী উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

"শাকে শূন্যাষ্ট বিশ্বাব্দে বর্ষে সোম দিনে তিথৌ
ত্রয়োদশ্যাং সিতে পক্ষে মেষে সূর্য্যস্য সংক্রমে।" ইত্যাদি।

§ "বত্রিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ।
সুমধুর বাক্যে রাজা প্রজাকে পালিল।।"
রাজমালা — ২য় লহর, ৬ পৃঃ।

করিয়াছেন। কিন্তু যিনি বত্রিশ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছেন এবং ১৩৮০ শকে যিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার রাজ্যাভিষেক ১৩২৯ শকে হইতে পারে না। অপিচ লঙ্ সাহেব রাজমালার মতানুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মমাণিক্যের রাজত্বকাল বত্রিশ বৎসর নির্দ্ধারণ করিয়া থাকিলেও তিনি ১৪৩৯ খৃষ্টাব্দে (১৩৬১ শক) রাজত্বকাল শেষ হইবার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত কারণে এই নির্ব্বাচন প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এ বিষয়ে রাজমালা ব্যতীত নির্ভরযোগ্য অন্য প্রমাণ নাই, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ রাজমালার মত উল্লঙ্ঘন করিয়া ভ্রমবর্ত্মে পাদবিক্ষেপ করিয়াছেন, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে, দ্বিজ বঙ্গচন্দ্রের রচিত 'ত্রিপুর বংশাবলী' নামক হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মমাণিক্য ৮৪১ হইতে ৮৭২ ত্রিপুরাবব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছেন। এতদনুসারে তাঁহার রাজত্বকাল ১৩৫৩ — ১৩৮৪ শক (১৪৩১ — ১৪৬২ খৃঃ) স্থিরীকৃত হইতেছে। এই নির্দ্ধারণ রাজমালার উক্তির সমর্থক বিধায় বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে ; এতদ্দ্বারা মহারাজের বত্রিশ বৎসর রাজ্যভোগ করা এবং ১৩৮০ শকে বিদ্যমান থাকা, — এতদুভয় বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতেছে। সুতরাং ধর্ম্মমাণিক্য ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকৃত এবং বিশুদ্ধ নির্দ্ধারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইল।

প্রতাপমাণিক্যের রাজত্বকাল

ধর্ম্মমাণিক্যের পরলোক গমনের পর, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপমাণিক্য, সেনাপতিগণের প্ররোচনায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, ১৩৮৫ শকে (১৪৬৩ খৃঃ) সিংহাসন লাভ করেন। পূর্ণ এক বৎসরকাল রাজত্ব করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। রাজ্যলাভের অল্পকাল পরেই সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। *

ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল

প্রতাপমাণিক্যের পর তদীয় জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধন্যমাণিক্য সেনাপতিগণের অনুকম্পায় সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। রাজমালায় ইঁহার রাজ্যারোহণের বা রাজত্বকালের উল্লেখ না থাকিলেও আনুসঙ্গিক প্রমাণদ্বারা তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। ইনি প্রতাপমাণিক্যের পরবর্ত্তী রাজা। ১৩৮৫ শক (১৪৬৩ খৃঃ) অবসানের পূর্ব্বেই প্রতাপের শাসনকাল অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং মহারাজ ধন্য ১৩৮৫ শকে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, ইহা পাওয়া যাইতেছে। 'ত্রিপুর বংশাবলী' পুথির বাক্যদ্বারাও এই নির্ব্বাচন সমর্থিত হয়। উক্ত পুথিতে ধন্যমাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত আছে ; — "আষ্ট শ তিহত্তর সনে রাজত্ব পাইল।" ত্রৈপুরী ৮৭৩ সন ও পূর্ব্বোক্ত ১৩৮৫ শক অভিন্ন ;

---

* "মহাবলবন্ত দেখি দিনে না মারিছে।
সেনাপতি সবে চক্রে রাত্রিতে বধিছে।।"
রাজমালা — ২য় লহর, ৬ পৃঃ।

সুতরাং ত্রিপুর বংশাবলীর নির্দ্ধারণ মতে মহারাজ ধন্যের রাজ্যলাভের এই শকাঙ্ক বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দৃষ্ট হয় না। উক্ত পুঁথিতে তাঁহার শাসনকাল নির্ণয়োপযোগী কথাও পাওয়া যায় ;—

"ক্রমান্বয়ে তিপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করিল।
নয়শ পঁচিশ সনে পরলোক হৈল।।"

ত্রৈপুরী ৯২৫ সনে এবং ১৪৩৭ শক বা ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে প্রভেদ নাই। সুতরাং মহারাজ ধন্য ১৩৮৫ শক (১৪৬৩ খৃঃ) হইতে ১৪৩৭ শক (১৫১৫ খৃঃ) পর্য্যন্ত ত্রিপুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ত্রিপুর বংশাবলীর বাক্যদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। রাজমালায় পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্য, ১৪২৩ শকে (১৫০১ খৃঃ) ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। * এবং ১৪৩৫ ও ১৪৩৭ শকে তিনি দুইবার চট্টগ্রামে মুসলমানগণের সহিত আহবে লিপ্ত হইয়াছিলেন। † তাঁহার শাসনকালের ১৪১৩, ১৪১৯ ও ১৪২৮ শকের কতিপয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত নির্দ্ধারণের সহিত এই সকল কার্য্যকালের সামঞ্জস্য থাকায়, উক্ত নির্দ্ধারণ উপেক্ষণীয় বলিয়া মনে হয় না।

কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের মতে ধন্যমাণিক্য ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে (১৪১২ শক) সিংহাসনারূঢ় হইয়া, ত্রিশ বৎসরকাল রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। কমিং সাহেব এবং সেণ্ডিস্ সাহেব, কৈলাসবাবুর মতাবলম্বন করিয়া, ১৪৯০ — ১৫২০ খৃষ্টাব্দ (১৪১২ — ১৪৪২ শক) ধন্যমাণিক্যের শাসনকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই নির্ব্বাচন মহারাজের পূর্ব্বোক্ত কার্য্যাবলীর বিরোধী না হইলেও নির্ব্বিবাদে গ্রহণীয় নহে, কারণ, ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকাল নির্দ্ধারণোপলক্ষে ইঁহারা যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা সংশোধন না হওয়ায়, ধন্যমাণিক্যের রাজ্যলাভের শকাঙ্ক ইঁহাদের মতে ১৩৮৫ স্থলে ১৪১২ শক (১৪৯০ খৃঃ) অবধারিত হইয়াছে। এই অবধারণ রাজ্যাভিষেকের প্রকৃত সময় অপেক্ষা সাতাইশ বৎসর অগ্রবর্ত্তী হওয়ায় এবং শাসনকাল অযথা হ্রস্ব (৫৩ বৎসর স্থলে ৩০ বৎসর) করায় মহারাজের পূর্ব্ব

---

* "শাকে বহ্ন্যক্ষিবেধোমুখ ধরণীযুতে লোকমাত্রেহম্বিকায়ৈ।
প্রাদাৎ প্রাসাদ রাজং গগনপরিগতং সেবিতায়ৈ স দেবৈঃ।।"
দেবী মন্দিরের শিলালিপি।

† (১) "চৌদ্দশ পাঁচত্রিশ শকে সমর জিনিল।
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২২ পৃঃ।

(২) "চৌদ্দশ সাত্রিশ শকে চাটিগ্রাম জিনে।
শুনিয়া হোসেন সাহা মহা ক্রোধ মনে।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২৫ পৃঃ।

কথিত কার্য্যাবলীর সময় এই নির্দ্ধারণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিঞ্চিদনুধাবন করিলে দেখা যাইবে, ত্রিপুর বংশাবলীর সহিত তুলনায় কৈলাসবাবু প্রভৃতির অবধারিত রাজ্যলাভের শকাঙ্ক সাতাইশ বৎসর অগ্রবর্ত্তী হইলেও মহারাজের স্বর্গারোহণের কাল উভয় মতে পরস্পর পাঁচ বৎসর মাত্র ব্যবধান, এই কারণেই মহারাজের কার্য্যাবলীর সহিত এই নির্দ্ধারণে সময়ের সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। ইঁহারা কি সূত্র অবলম্বনে সময়ের এবম্বিধ উলটপালট ঘটাইয়াছেন, তাহা কেহই বলেন নাই। ধন্যমাণিক্যের সময় অতিক্রম করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে; পরবর্ত্তী রাজগণের শাসনকালের সহিত ইঁহাদের মতের সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না। সমগ্র অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, সেণ্ডিস সাহেব অনবধানতা প্রযুক্ত অথবা পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মত-বিপ্লবে পতিত হইয়া, ধর্ম্মমাণিক্য ও ধন্যমাণিক্যের শাসনকালের পরস্পর অদল বদল করিয়াছেন ; অর্থাৎ ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকাল বত্রিশ বৎসর স্থলে একান্ন বৎসর ও ধন্যমাণিক্যের রাজত্বকাল তিপ্পান্ন বৎসর স্থলে ত্রিশ বৎসর অবধারণ করিয়াছেন, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কৈলাসবাবু প্রভৃতির মতের ভিত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুমান করাও দুঃসাধ্য হইয়াছে। এবম্বিধ মতবিরোধ স্থলে, ভিত্তিবিহীন মত পরিত্যাগ করিয়া, সামান্য সূত্রমূলক হইলেও সেই মত গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য বিধায়, ধন্যমাণিক্য ১৩৮৫ হইতে ১৪৩৭ শক পর্য্যন্ত (১৪৬৩ — ১৫১৫ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহাই অবধারণ করা হইল।

ধ্বজমাণিক্যের শাসনকাল

ধন্যমাণিক্যের পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ধ্বজমাণিক্য সিংহাসনারোহণ করেন। রাজমালা এবং শ্রেণীমালা গ্রন্থে ইঁহার বিবরণ পাওয়া যায় না। সেণ্ডিস্ সাহেবও এই নামটী বাদ দিয়াছেন। কৈলাসবাবু ধ্বজমাণিক্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সময় নির্দ্দেশোপযোগী কোন কথা বলেন নাই। কমিং সাহেবের মতে ইনি এক বৎসরেরও কম সময় রাজত্ব করিয়াছেন। ত্রিপুর বংশাবলীর মত অন্যরূপ ; উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় ;—

"ক্রমাগত ছয় বৎসর রাজত্ব করিল।
নয় শ একুত্রিশ সনে স্বর্গ প্রাপ্তি হৈল।।"

এই বাক্যে পাওয়া যাইতেছে, ধন্যমাণিক্যের শাসনকালের (১৪৩৭ শকের) পর, ১৪৩৮ শক হইতে ছয় বৎসরকাল (১৪৪৩ শক পর্য্যন্ত) ধ্বজমাণিক্য রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। ত্রৈপুরী ৯৩১ সন ও ১৪৪৩ শকাব্দায় পার্থক্য নাই। অবস্থানুসারে ত্রিপুর বংশাবলীর মতাবলম্বন করাই সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে।

দেবমাণিক্যের শাসনকাল

ধ্বজমাণিক্যের পরলোকগমনের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবমাণিক্য রাজ্যলাভ করেন। ইঁহার রাজ্যাভিষেকের সময় রাজমালায় পাওয়া যায় না। কৈলাসবাবুর মতে ইনি ১৪৪২ শকে (১৫২০ খৃঃ) সিংহাসনারূঢ়

হইয়াছিলেন ; সেণ্ডিস্ সাহেব এবং কমিং সাহেবেরও ইহাই মত। ত্রিপুর বংশাবলীতে লিখিত আছে, দেবমাণিক্য ৯৩২ ত্রিপুরাব্দে (১৪৪৪ শক — ১৫২২ খৃঃ) রাজা হইয়াছিলেন। * এই নির্দ্ধারণ কৈলাসবাবু প্রভৃতির নির্দ্ধারণ অপেক্ষা দুই বৎসর পশ্চাদ্বর্ত্তী ; কিন্তু মহারাজের রাজত্বের শেষ সময় সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। কৈলাসবাবু বলিয়াছেন, — "চন্তাই † দেবমাণিক্যকে ৯৪৫ ত্রিপুরাব্দে গোপনে হত্যা করেন।" কমিং সাহেবের মতে ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে দেবমাণিক্যের শাসনকাল শেষ হইয়াছে। এতদুভয় মতে প্রভেদ নাই ; ত্রিপুর বংশাবলী লেখকও ইহাই ঘোষণা করিয়াছেন। ‡

কৈলাসবাবু প্রভৃতি দেবমাণিক্যের রাজ্যলাভের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা ধ্বজমাণিক্যের রাজত্ব অবসানের সময়ের সহিত তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতেছে না, সুতরাং এই নির্দ্ধারণ বিশুদ্ধ হইতে পারে না। এ বিষয়ে ত্রিপুর বংশাবলীর নির্দ্দিষ্ট কালই অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৫৭ শক) মহারাজের রাজত্ব শেষ হইবার কথা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকিলেও এই উক্তি নির্ভরযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে, দেবমাণিক্যের পরবর্ত্তী রাজা ইন্দ্রমাণিক্য এক বৎসর, তৎপরবর্ত্তী বিজয়মাণিক্য বেয়াল্লিশ বৎসর এবং তদনন্তর অনন্তমাণিক্য দেড় বৎসর রাজ্যভোগ করিবার পর, চৌদ্দ শত চৌরানব্বই শকে উদয়মাণিক্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। উক্ত ১৪৯৪ হইতে পূর্ব্বোক্ত রাজাত্রয়ের (ইন্দ্রমাণিক্য, বিজয়মাণিক্য ও অনন্তমাণিক্য) শাসনকাল ৪৫ বৎসর বাদ দিলে, ১৪৪৯ শকে দেবমাণিক্যের রাজত্বের অবসান হইয়াছিল, ইহাই প্রতীয়মান হইবে। এই হিসাবে ১৫২২ হইতে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (১৪৪৪ — ১৪৪৯ শক) দেবমাণিক্যের শাসনকাল নির্দ্ধারণ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

ইন্দ্রমাণিক্যের শাসনকাল

দেবমাণিক্যের পর ইন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল। শিশু ইন্দ্রকে সিংহাসনে বসাইয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মিথিলা নিবাসী এক ব্রাহ্মণ রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায়, ইঁহার রাজত্ব এক বৎসর কাল মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। § সুতরাং ইন্দ্রমাণিক্য ১৪৪৯ হইতে ১৪৫০ শকের কিয়দংশ পর্য্যন্ত

* "নয় শ বত্রিশ সনে অভিষিক্ত হৈল।
মহাদর্পে রাজ্যশাসন আরম্ভ করিল।"
ত্রিপুর বংশাবলী।

† দেবমাণিক্যকে লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মৈথিল ব্রাহ্মণ বধ করিয়াছিলেন ; একথা রাজমালায় স্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে, এরূপ অবস্থায় এই হত্যা-অপবাদ চন্তাইর ঘাড়ে চাপাইবার কারণ বুঝা যাইতেছে না।

‡ "দেবমাণিক্যকে কাটিয়া ফেলিল।
নয় শ পঁয়তাল্লিশ সন ত্রিপুরা আছিল।।"
ত্রিপুর বংশাবলী।

§ "এই মতে বৎসরেক ব্রাহ্মণে শাসয়।"
রাজমালা — ২য় লহর, ৩৭ পৃঃ।

(১৫২৭ — ১৫২৮ খৃঃ) রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

বিজয়মাণিক্যের রাজ্যশাসন

ইন্দ্রমাণিক্যের পর বিজয়মাণিক্য ১৪৫০ শকে (১৫২৮ খৃঃ) সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে রাজমালায় এক ভ্রমাত্মক উক্তি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা এই ;—

"সাতচল্লিশ বর্ষ নৃপের বয়স হৈয়াছিল।।
সাতচল্লিশ বর্ষ রাজা রাজ্য ভোগ করে।
দৈবগতি বসন্ত নৃপের হইল শরীরে।।" ইত্যাদি।

রাজমালা — ২য় লহর, ৬৩ পৃঃ।

রাজার সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিবার কথা প্রকৃত নহে, তিনি বেয়াল্লিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন এবং সাতচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রাচীন রাজমালায় এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

"বেয়াল্লিশ বৎসর রাজা রাজ্য ভোগ কৈল।।
সাতচল্লিশ বৎসর বয়স হইল যবে।
দৈবগতি রাজার শীতলা হৈল তবে।।" ইত্যাদি।

রাজাবাবুর বাড়িতে রক্ষিত রাজমালায়ও অবিকল এই সকল বাক্য লিখিত আছে। সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্বের কথা যে লিপিকার প্রমাদমূলক, ইহা অতি সহজবোধ্য। আর একটী কথার দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অমূলকতা প্রমাণিত হইবে। মহারাজ সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া সাতচল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোকগমন করিবার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বুঝিতে হইবে, তিনি জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু এ কথা প্রকৃত নহে। মহারাজ বিজয়, দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দেবমাণিক্যের স্বর্গ প্রাপ্তির পর, বিজয়কে উল্লঙ্ঘন করিয়া, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রমাণিক্য এক বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎপর বিজয় সিংহাসন লাভ করেন। সুতরাং তিনি জন্মকাল হইতেই রাজত্ব পাইয়াছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। ইনি পাঁচ বৎসর বয়সে রাজা হইয়া ৪২ বৎসর রাজ্য শাসন করিবার পর, ৪৭ বৎসরের কালে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, ইহাই প্রকৃত কথা। লিপিকার প্রমাদে রাজত্বকাল ৪২ বৎসর স্থলে যে ৪৭ বৎসর লিখিত হইয়াছে, তাহা গ্রহণীয় নহে।

মহারাজ বিজয় সম্রাট আকবরের সমসাময়িক

মহারাজ বিজয়, ভারত সম্রাট মহামতি আকবরের সমসাময়িক ; তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী আবুল ফজলের লিখিত 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বিজয়মাণিক্যের নাম পাওয়া যায়, এ কথা পূর্ব্বেও একবার উল্লেখ করা হইয়াছে। * এতদ্ব্যতীত কাছাড়ের অধিপতি নির্ভয় নারায়ণ ও জয়ন্তিয়া-রাজ বিজয়মাণিক্য, বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। † বঙ্গেশ্বর দায়ুদ শাহের সহিত চট্টগ্রামের অধিকার

* "রাজমালা — ২য় লহর, ১১৭ পৃষ্ঠা।
† রাজমালা — ২য় লহর, ৪৫ পৃষ্ঠা।

লইয়া ইঁহার সংগ্রাম হইবার কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মহারাজ বিজয়ের শাসনকালের ১৪৮১ শকে (১৫৫৯ খৃঃ) মুদ্রিত রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। *

উক্ত বিবরণসমূহের সাহায্যে এবং রাজমালার উক্তিদ্বারা অবধারিত হইতেছে, মহারাজ বিজয় ১৪৫০ শক (১৫২৮ খৃঃ) হইতে ১৪৯২ শক (১৫৭০ খৃঃ) পর্য্যন্ত ৪২ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন মতের মীমাংসা

'History of Tripura' গ্রন্থের প্রণেতা সেণ্ডিস্ সাহেব এবং সেটেলমেন্ট অফিসার কমিং সাহেবের মতে বিজয়মাণিক্য ১৫৩৫ হইতে ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। কৈলাসবাবু বলেন — মহারাজের শাসনকাল ৯৪৫ হইতে ৯৯৩ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত ৪৮ বৎসর। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ কৈলাসবাবুর মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। ত্রিপুর বংশাবলীর রচয়িতাও এই মতেরই পক্ষপাতী। রেভারেণ্ড লঙ্ সাহেব, মহারাজের শাসনকালের শকাঙ্কের উল্লেখ না করিয়া থাকিলেও ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিবার কথা বলিয়াছেন। † ইঁহারা সম্ভবতঃ রাজমালার প্রমাদমূলক উক্তি (সাতচল্লিশ বৎসর রাজত্বের কথা) ধরিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইঁহারা যে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজের রাজ্যলাভের সময় অবধারণ করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী রাজার (ইন্দ্রমাণিক্যের) শাসনকালের সহিত তুলনা করিলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বিশেষতঃ রাজত্বকাল ৪২ বৎসর স্থলে ৪৮ বৎসর ধরে ইঁহারা আর একটী সাঙ্ঘাতিক ভুল করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের অবধারণ বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবার উপায় নাই।

অনন্তমাণিক্যের শাসনকাল

অতঃপর অনন্তমাণিক্য ১৪৯২ শকে (১৫৭০ খৃঃ) রাজা হইয়াছিলেন। রাজমালায় ইঁহার রাজ্যলাভের সময়ের উল্লেখ নাই ; রাজত্বকাল সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

"বৎসর দেড়েক রাজা রাজ্যের শাসন।
পরলোক গেল রাজা শ্বশুর কারণ।।"

ইনি দেড় বৎসর রাজত্ব করিবার পর, শ্বশুর (সেনাপতি গোপীপ্রসাদ) কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহার শাসনকাল ১৪৯২ শকের (১৫৭০ খৃঃ) মধ্যভাগ হইতে দেড় বৎসরকাল অবধারিত হইতেছে।

---

* বিজয়মাণিক্য হীরা গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাম্রপত্রদ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। সেই তাম্র ফলকের সময় জ্ঞাপক অংশ বিলুপ্ত হওয়া, তদ্দ্বারা ইঁহার শাসনকাল নির্দ্ধারণ পক্ষে অন্তরায় ঘটিয়াছে।

† অনন্তমাণিক্য সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গের প্রারম্ভে লঙ্ সাহেব বলিয়াছেন,—

"His father soon after died of small pox having reigned 47 years.

J. A. S. B.—Vol. XIX.

পূর্ব্বোক্ত ঐতিহাসিকগণ অন্যান্য রাজার শাসনকালের ন্যায় এ স্থলেও সময়ের গোলমাল ঘটাইয়াছেন। কৈলাসবাবু, সেণ্ডিস্ সাহেব এবং কমিং সাহেব একবাক্যে বলিয়াছেন, অনন্তমাণিক্য ১৫৮৩ হইতে ১৫৮৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছেন, ত্রিপুর বংশাবলীর মতে মহারাজ অনন্ত ৯৯৪ হইতে ৯৯৫ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত (১৫৮৪ — ৮৫ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের সময় হইতে গণনায় দেখা যাইবে, এই নির্দ্ধারণ ভ্রমসঙ্কুল। অনন্তের পরবর্ত্তী রাজা উদয়মাণিক্যের শাসনকালের সহিত তুলনা করিলেও এই সিদ্ধান্ত তিষ্ঠনীয় হইবে না। লঙ্ সাহেব অনন্তমাণিক্যের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু দেড় বৎসর রাজত্ব করিবার কথা বলিয়া রাজমালার মত সমর্থন করিয়াছেন। *

উদয়মাণিক্যের শাসনকাল

অনন্তমাণিক্যের শ্বশুর সেনাপতি গোপীপ্রসাদ জামাতাকে বধ করিয়া, উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার রাজ্য প্রাপ্তির সময় সম্বন্ধে রাজমালা বলেন ;—

“গৌড়েশ্বর শুনে বিজয়মাণিক্য মরণ।
চৌদ্দ শ চৌরানব্বই শকে উদয় রাজন।।”

এতদ্দ্বারা পাওয়া যাইতেছে, উদয়মাণিক্য ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খৃঃ) রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের অবসান কালও রাজমালায় লিখিত আছে ;—

“চৌদ্দ শ আটানব্বই শকেতে তখন।
পারার গুটিকা রাজা করিল ভক্ষণ।।”

বাজীকরণোদ্দেশ্যে পারদঘটিত বটীকা ভক্ষণের দরুন ১৪৯৮ শকে উদয়মাণিক্য পরলোকগত হইয়াছিলেন। ইনি ১৪৯৪ শক (১৫৭২ খৃঃ) হইতে ১৪৯৮ শক (১৫৭৬ খৃঃ) পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিয়াছেন। †

কৈলাসবাবুর সংগৃহীত রাজমালায় উদয়মাণিক্য প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে ;--- “গোপীপ্রসাদ নিজ নাম পরিত্যাগপূর্ব্বক উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ করিয়া ৯৯৫ ত্রিপুরাব্দে (১৫৮৫ খৃঃ) ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।” অন্যত্র লিখিত আছে, --- “উদয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জয়মাণিক্য ১০০৬ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে)

---

* “Ananta Manik succeeded to the throne by the help of his father-in-law the quondam cook, with whom Ananta always dined. After the king reigned 1½ years he was strangled at the instigation of his father-in-law.” J. A. S. B. — Vol. XIX.

† “পঞ্চ বৎসর রাজত্ব করিয়া শাসন।
এই মতে মরিল উদয়মাণিক্য রাজন।।”
রাজমালা — উদয়মাণিক্য খণ্ড।

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।" এতদ্দ্বারা উদয়মাণিক্যের রাজত্বকাল এগার বৎসর স্থিরীকৃত হইয়াছে। কমিং সাহেব এবং সেণ্ডিস্ সাহেব অবিচারিতভাবে, কৈলাসবাবুর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়াছেন। ত্রিপুর বংশাবলী মতে ইনি ৯৯৫ হইতে ১০০৪ ত্রিপুরাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাজগণের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে রাজমালা ব্যতীত নির্ভরযোগ্য অন্য প্রমাণ নাই ; সুতরাং রাজমালার মত উপেক্ষা করিয়া উপরি উক্ত ব্যক্তিগণের উক্তি সমর্থন করা যাইতে পারে না। উদয়মাণিক্যের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেও চেষ্টা করা হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

জয়মাণিক্যের শাসনকাল

উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্য রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্গত শেষ রাজা। ইনি ১৪৯৮ শকে (১৫৭৬ খৃঃ) সিংহাসনারূঢ় হইয়া, ১৪৯৯ শক (১৫৭৭ খৃঃ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার শাসনকাল দেড় বৎসর মাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। *

কৈলাসবাবুর মতে, জয়মাণিক্য ১০০৬-১০০৭ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৬ — ১৫৯৭ খৃঃ) রাজত্ব করিয়াছিলেন। কমিং সাহেব এবং সেণ্ডিস্ সাহেব এই ধারণাই পোষণ করিয়াছেন। লঙ্ সাহেব এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। ত্রিপুর বংশাবলী বলেন, জয়মাণিক্য ১০০৪ ত্রিপুরাব্দে (১৫৯৪ খৃঃ) রাজা হইয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবনা করিলে দেখা যাইবে, ইঁহাদের কোন নির্দ্ধারণই বিশুদ্ধ নহে। রাজমালা রচয়িতা উদয়মাণিক্যের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, জয়মাণিক্যের রাজ্য লাভের কাল ১৫৯৪ কিম্বা ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে না। সম্মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, জয়মাণিক্যের পরবর্ত্তী অমরমাণিক্যের শাসনকালের দুইটী রৌপ্য মুদ্রা বিশেষ লক্ষ্যস্থানীয় হইবে ; ইহার একটী ১৪৯৯ শকে — অপরটী ১৫০২ শকে উৎকীর্ণ হইয়াছে। রাজ্যলাভ করিবার পূর্ব্বে কাহারও নামের মুদ্রা প্রচলিত হইতে পারে না, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত ; সুতরাং অমরমাণিক্য ১৪৯৯ শকে (১৫৭৭ খৃঃ) রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। এরূপ স্থলে অমরমাণিক্যের ঊর্দ্ধতন ভূপতি জয়মাণিক্যের শাসনকাল ১৫৯৪ কি ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। এই সমস্ত কারণে জয়মাণিক্য ১৪৭৬-১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত এবং প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দৃষ্ট হয় না।

---

* "ক্রমান্বয়ে দেড় বৎসর রাজত্ব করিল।"
ত্রিপুর বংশাবলী।

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা দ্বিতীয় লহরের অন্তর্ভূক্ত রাজগণের (ধর্ম্মমাণিক্য হইতে জয়মাণিক্য পর্য্যন্ত) শাসনকাল যেরূপ নিরূপিত হইল তাহার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

নাম।		শক।	ত্রিপুরাব্দ।	খৃষ্টাব্দ।
ধর্ম্মমাণিক্য	....	১৩৫৩—১৩৮৪	৮৪১—৮৭২	১৪৩১—১৪৬২
প্রতাপমাণিক্য	....	১৩৮৫—১৩৮৫	৮৭৩—৮৭৩	১৪৬৩—১৪৬৩
ধন্যমাণিক্য	....	১৩৮৫—১৪৩৭	৮৭৩—৯২৫	১৪৬৩—১৫১৫
ধ্বজমাণিক্য	....	১৪৩৮—১৪৪৩	৯২৬—৯৩১	১৫১৬—১৫২১
দেবমাণিক্য	....	১৪৪৪—১৪৪৯	৯৩১—৯৩৭	১৫২২—১৫২৭
ইন্দ্রমাণিক্য	....	১৪৪৯—১৪৫০	৯৩৭—৯৩৮	১৫২৭—১৫২৮
বিজয়মাণিক্য	....	১৪৫০—১৪৯২	৯৩৮—৯৮০	১৫২৮—১৫৭০
অনন্তমাণিক্য	....	১৪৯২—১৪৯৪	৯৮০—৯৮২	১৫৭০—১৫৭২
উদয়মাণিক্য	....	১৪৯৪—১৪৯৮	৯৮২—৯৮৬	১৫৭২—১৫৭৬
জয়মাণিক্য	....	১৪৯৮—১৪৯৯	৯৮৬—৯৮৭	১৫৭৬—১৫৭৭

উদয়মাণিক্য ও জয়মাণিক্যের শাসনকাল সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। আগরতলাস্থিত উজীর বাড়ীর গ্রন্থাগারে কতিপয় রাজার রাজত্বকাল নির্দ্দেশক একখানা প্রাচীন তালিকা পাওয়া গিয়াছে। উক্ত তালিকায় উদয়মাণিক্য হইতে তৎপরবর্ত্তী রাজগণের নাম ও রাজত্বকাল লিখিত আছে ; উদয়মাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের নাম নাই। সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র কাগজে তাহাও লিখিত ছিল, কোন কারণে বিনষ্ট হইয়াছে। এই তালিকার নির্দ্দেশমতে উদয়মাণিক্য ১৪৯২ হইতে ১৪৯৭ শক পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর এবং জয়মাণিক্য ১৪৯৭ হইতে ১৪৯৮ শক পর্য্যন্ত দেড় বৎসর রাজত্ব করা প্রকাশ পাইতেছে। সময় সম্বন্ধে রাজমালার সহিত এই তালিকার কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যাইতেছে, এরূপ পার্থক্যের কারণ নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। যে কারণেই ঘটিয়া থাকুক, এবম্বিধ সামান্য বৈষম্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। উক্ত তালিকা দ্বারাও পূর্ব্বকথিত ঐতিহাসিকগণের নির্দ্ধারণ অপ্রকৃত বলিয়া জানা যাইতেছে। এ স্থলে উক্ত তালিকার প্রতিকৃতি প্রদান করা হইল।

রাজগণের সময় নির্ণয় উপলক্ষে স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে, কৈলাসবাবু তাঁহাদের শাসনকাল যেরূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী সংগ্রাহকগণ তাহাই নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা এতদ্বিষয়ে কোনরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিয়াছেন, এমন বুঝা যায় না।

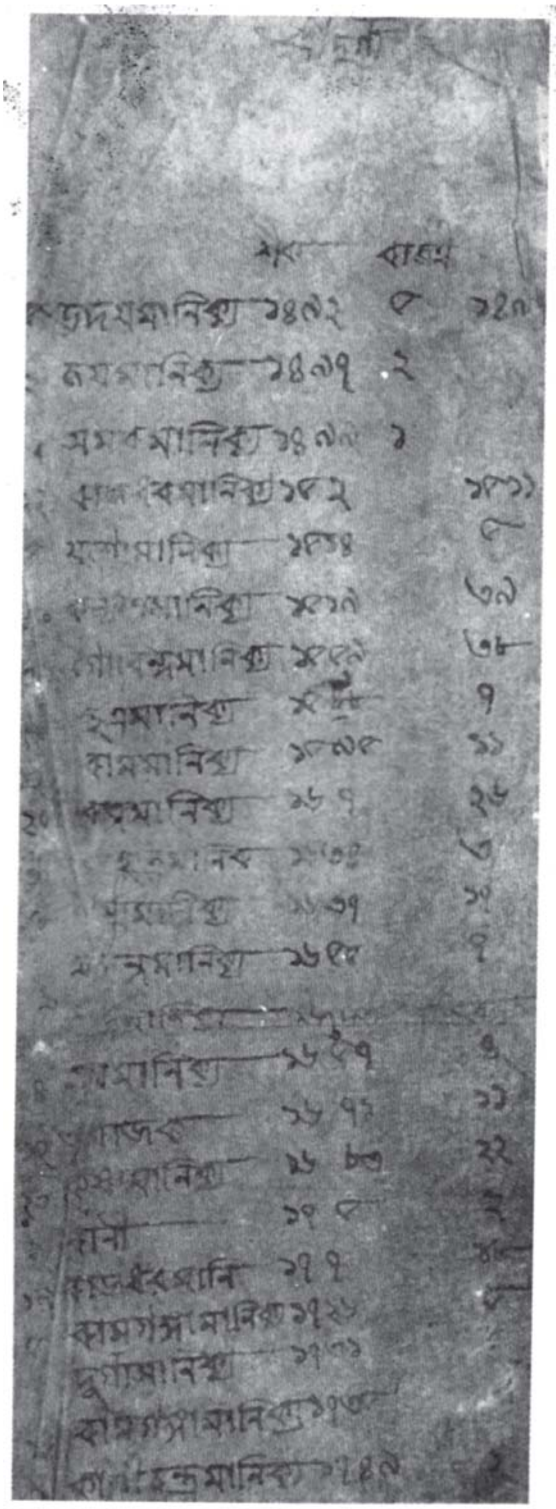

ত্রিপুরেশ্বরগণের কাল নির্ণায়ক প্রাচীন লিপি।

তাম্রশাসনের তথ্যানুসন্ধান

রাজমালার প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে, ভূমিদান সম্বন্ধীয় দানপত্র তাম্রফলকে সম্পাদনের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী লহর সমূহেও ইঁহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এই প্রণালীতে দানপত্র সম্পাদনের প্রথা কতকালের প্রাচীন এবং পরবর্ত্তী কালে তাহার অবস্থা কি রকম দাঁড়াইয়াছিল, এ স্থলে তদ্বিষয়ক আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তাম্র-শাসনের বিবরণ

পুরাকালে ধর্ম্মপ্রাণ নরপতিগণ ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রবুদ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ভূমিদান করিতেন। তাঁহাদের সম্পাদিত দানপত্র তাম্রফলকে উৎকীর্ণ হইবার প্রথা ছিল। দানকৃত ভূমির পরিমাণ ও তাহার পরিচয়সূচক বিবরণ, দাতার নাম, গোত্রাদিসহ দান-গ্রহীতার নাম ইত্যাদি লিপি করিবার পর, দাতাগণ আপন আপন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া উক্ত ফলক প্রদান করিতেন। এই প্রণালীতে সম্পাদিত দানপত্র সাধারণতঃ 'তাম্রশাসন' নামে অভিহিত হইত।

তাম্রশাসন প্রবর্ত্তনের কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য

এই প্রথা কোন্ সময়ে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। রাজচক্রবর্ত্তী সগর প্রভৃতি ধর্ম্মপরায়ণ ভারত-সম্রাটগণের শাসনকালে কি প্রণালীতে দানপত্র সম্পাদিত হইত, তাহাও বর্তমানকালের অগোচর।

শ্রী রামচন্দ্রের তাম্রশাসন

পুরাতত্ত্ব আলোচনায় এই মাত্র জানা যায় যে, ত্রেতাযুগে দাশরথি রামচন্দ্র ধর্ম্মারণ্যে জীর্ণোদ্ধার ও যজ্ঞ সম্পাদনোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রশাসনদ্বারা ভূমি দান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের শাসনের বিবরণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। উক্ত ফলকে যে-সকল বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল —

"আস্ফোটয়ন্তি পিতরঃ কথয়ন্তি পিতামহঃ।
ভূমিদোহস্মৎকুলে জাতঃ সোহস্মান্ সন্তারয়িষ্যতি।।
বহুভির্বহুধা দত্তা রাজভিঃ পৃথিবীত্বিয়ম্।
যস্য যস্য যদাভূমিস্তস্য তস্য তদাফলম্।।
যষ্টিবর্ষ সহস্রানি স্বর্গে বসতি ভূমিদঃ।
আচ্ছেত্তাচানুমন্তা চ তান্যেব নরকং ব্রজেৎ।।
সন্দং শৈস্তুদ্যমানস্ত মুদ্গরৈর্ব্বিনিহত্য চ।
পাশৈঃ সুবধ্যমানস্তু রোরবীতি মহাস্মরম্।।
তাড্যমানঃ শিরে দণ্ডৈঃ সমালিঙ্গ্য বিভাবসুম্।
ক্ষুরিকয়াচ্ছিদ্যমানো রোরবীতি মহস্বনম্।।
যমদুতৈর্ম্মহাঘোরৈর্ব্রহ্ম বৃত্তি বিলোপকঃ।
এবংবিধৈর্ম্মহা দুষ্টৈঃ পীড্যন্তে তে মহাগণৈঃ।।

ততস্তির্য্যক্ত্বমাপ্নোতি যোনিং বা রাক্ষসীং শুনীম্।
ব্যালীং শৃগালীং পৈশাচীং মহাভূত ভয়ঙ্করীম্।।
ভূমেরঙ্গুল হর্ত্তা হি স কথং পাপমাচরেৎ।
ভূমেরঙ্গুল দাতা চ স কথং পুণ্যমাচরেৎ।।
অশ্বমেধ সহস্রাণাং রাজসূয় শতস্য চ।
কন্যা শত প্রদানস্য ফলং প্রাপ্নোতি ভূমিদঃ।।
আয়ু যশঃ সুখং প্রজ্ঞা ধর্ম্মো ধান্যং ধনং জয়ঃ।
সন্তানং বর্দ্ধতে নিত্যং ভূমিদঃ সুখমশ্নুতে।।
ভূমেরঙ্গুল মেকন্তু যে হরন্তি খলা নরাঃ।
বিন্ধ্যাটবীম্বতোয়াসু শুষ্ক কোটর বাসিনঃ।
কৃষ্ণসর্পাঃ প্রজায়ন্তে দত্ত দায়াপহারকাঃ।।
তড়াগাণাং সহস্রেণ অশ্বমেধ শতেন বা।
গবাং কোটিপ্রদানেন ভূমিহর্ত্তা বিশুধ্যতি।।
যানীহ দত্তানি পুনর্ধনানি দানানি ধর্ম্মার্থ যশস্করাণি।
ঔদার্য্যতো বিপ্রানিবেদিতানি কো নাম সাধুঃ পুনরাদদীত।।
চলদলদললীলা চঞ্চলে জীবলোকে তৃণলবলঘুসারে সর্ব্ব সংসার সৌখ্যে।
অপহরতি দুরাশঃ শাসনং ব্রাহ্মণানাং নরক গহন গর্ত্তাবর্ত্ত পাতোৎসুকো যঃ।।
যে পস্যন্তি মহীভূজঃ ক্ষিতিমিমাং যাস্যন্তি ভুক্ত্বাখিলাং নো যাতা ন তু
যাতি যাস্যতি ন বা কেনাপি সার্দ্ধং ধরা।
যৎকিঞ্চিদ্ভুবি তদ্বিনাশি সকলং কীর্ত্তিঃ পরং স্থায়িনী, ত্বেবাং বৈ
বসুধাপি স্বৈরুপকৃতা লোপ্যা ন সৎকীর্ত্তয়ঃ।।
এৈকব ভগিনী লোকে সর্ব্বেযামেব ভুভুজাম্।
ন ভোজ্যা ন করগ্রাহ্যা বিপ্রদত্তা বসুন্ধরা।।
দত্ত্বা ভূমিং ভাবিনঃ পার্থিবেশান্ ভূয়োভূয়ো যাচতে রামচন্দ্রঃ।
সামান্যোহয়ং ধর্ম্ম সেতুর্নৃপাণাং স্বে স্বে কালে পালনীয়ো ভবদ্ভিঃ।।
অস্মিন্ বংশে ক্ষিতৌ কোহপি রাজা যদি ভবিষ্যতি।
তস্যাহং করলগ্নোহস্মি মদ্দত্তং যদি পাল্যতে।।"

স্কন্দপুরাণ — ব্রহ্মখণ্ড, ৩৪ অঃ, ২৪—৪১ শ্লোঃ।

মর্ম্ম ঃ— "পিতৃ পিতামহগণ সাপেক্ষে বলিয়া থাকেন, আমাদের কুলে যদি কোন ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করে, তবে সে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে। বহু রাজা বহু প্রকারে এই পৃথিবী দান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যিনি যখন ভূস্বামী হইয়াছেন, তাঁহারই তখন দানফল হইয়াছে। ভূমিদাতা যষ্টি সহস্র বর্ষ স্বর্গে বাস করেন। প্রদত্তভূমির আহর্ত্তা এবং আহরণে অনুমোদন কর্ত্তা উভয়েরই নরকে বাস হয়। সেখানে ব্রহ্মবৃত্তি লোপকারী ব্যক্তিকে যমদুতের সন্দংশদ্বারা চ্যাবিত, মুদ্গরদ্বারা নিহত এবং পাশদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে। তদবস্থায় সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। যমদুতেরা তাহাকে বহ্নি মধ্যে পাতিত করে, দণ্ডদ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করে, এবং ক্ষুরদ্বারা অঙ্গ কর্ত্তন করিতে থাকে। এই অবস্থায় পতিত হইয়া, তাহাকে কেবল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে হয়। এইরূপে

মহাদুষ্ট মহাগণ কর্ত্তৃক ভূমিহর্ত্তা পীড়িত হইয়া থাকে। পরে তির্য্যক যোনি, রাক্ষসী যোনি এবং শুনী যোনি প্রাপ্ত হয়। অপিচ ব্যালী, শৃগালী ও মহাভূত ভয়ঙ্করী পৈশাচী যোনি পর্য্যন্ত তাহার লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রদত্ত ভূমির অঙ্গুলিমাত্র স্থান হরণ করে, যে আর কিরূপে কি পাপ আচরণ করিবে? অর্থাৎ তার আর পাপ করিবার বাকী কিছুই থাকে না; আর যিনি অঙ্গুলিমাত্র ভূমিও দান করেন, তিনি আর কিরূপে পুণ্যাচরণ করিবেন? অর্থাৎ পুণ্যানুষ্ঠানের তাঁহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সহস্র অশ্বমেধ, শত বাজপেয় এবং শত কন্যা দানের ফল — ভূমিদাতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভূমিদাতার আয়ু, যশ, সুখ, প্রজ্ঞা, ধর্ম্ম, ধান্য, ধন, জয়, সন্তান সকলই বর্দ্ধিত হয়, তিনি নিত্যসুখ লাভ করিয়া থাকেন। প্রদত্ত ভূমির অঙ্গুলিমাত্রও যে-সকল খল স্বভাব নর হরণ করে, নির্জ্জন বিন্ধ্যাটবীর শুষ্ক কোটরে তাহারা কৃষ্ণসর্প হইয়া বাস করিয়া থাকে। যাহারা দান করিয়া আবার হরণ করিয়া লয়, তাহাদেরও ঐ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ভূমিহর্ত্তা লোক সহস্র তড়াগ, শত অশ্বমেধ এবং কোটি গো প্রদান করিয়া বিশুদ্ধ হয়। ধর্ম্ম, অর্থ ও যশের নিমিত্ত যে-সকল ধন ও অন্যান্য দানদ্রব্য উদারতার সহিত ব্রাহ্মণকে নিবেদন করা হয়, কোন্ সাধু ব্যক্তি তাহা পুনরায় গ্রহণ করিয়া থাকেন? এই জীবলোক চলপত্রের পত্র-লীলার ন্যায় চঞ্চল এবং এই সংসারের সর্ব্বসুখ তৃণখণ্ডের ন্যায় অসার; এ অবস্থায় নরক-গহন গর্ত্তের আবর্ত্তে পতনোৎসুক দুর্ব্বুদ্ধি লোকই ব্রাহ্মণ শাসন অপহরণ করিয়া থাকে। যে-সকল মহীপাত এই ক্ষিতি পালন করেন, তাঁহারা ইহা ভোগ করিয়াই চলিয়া যাইবেন। তাঁহাদের কাহারও সহিতই এই ধরা যায় নাই, যায় না, বা যাইবে না। এই ভূতলে যাহা কিছু আছে, সকলই যায় না বা যাইবে না। এই ভূতলে যাহা কিছু আছে, সকলই বিনশ্বর, একমাত্র কীর্ত্তিই চিরস্থায়িনী; সুতরাং বসুধাপতিগণ কদাচ সৎকীর্ত্তি লোপ করিবেন না। বিপ্রসাৎকৃত বসুন্ধরাই এ জগতে মহীপতিগণের ভগিনী ; সুতরাং তাহা কখনই তাঁহাদের ভোগযোগ্যা বা করগ্রাহ্যা নহে। আমি রামচন্দ্র ভূমিদান করিয়া ভাবী ভূপতিগণের নিকট ভুয়োভূয়ঃ প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যেন স্ব স্ব অধিকার কালে এই সাধারণ ধর্ম্ম সেতু পালন করেন। এই বংশে যদি কেহ ক্ষিতিপতি হন, আর তিনি যদি এই মৎপ্রদত্ত শাসন পালন করেন, তবে তিনি তাঁহার করতলগত হইয়া থাকিব।”

(বঙ্গবাসীর অনুবাদ।)

এই শাসন প্রদানকালে দাশরথি রামচন্দ্রের বয়ঃক্রম চতুশ্চত্বারিংশত বর্ষ ছিল।

তাম্রশাসন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত

উদ্ধৃত লিপিতে, ভূমিদানের অক্ষয় ফল লাভের কথা বর্ণিত হইয়াছে। দাতার ন্যায়, দাতার ঊর্দ্ধতন পুরুষগণও এই পুণ্যের অংশ লাভ করে থাকেন। এবং পরবর্ত্তী ভূপতিগণও সেই ফলে বঞ্চিত হন না। আবার, স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি যে ভূম্যধিকারী হরণ করেন, তাঁহার পাপের অন্ত নাই। অনেক শাস্ত্রগ্রন্থেই এতদ্বিষয়ক নানাবিধ ব্যবস্থা পাওয়া যায়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে স্বয়ং ভূমিদান করা অপেক্ষা পরদত্ত দান রক্ষা করা অধিক পুণ্যপ্রদ। তিনি বলিয়াছেন ;—

“দদ্যাড্ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ।
আগামী ভদ্র নৃপতি পরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ।।

পটে বা তাম্রপট্টে বা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নং।
অতি লেখ্যাত্মনোবংশ্যানাত্মানঞ্চ মহীপতিঃ।।
প্রতিগ্রহ পরীমাণং মানাচ্ছেদোপবর্ণং।
স্বহস্ত কালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থির।।"
(যাজ্ঞবল্ক্য)।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ উত্তর খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে ও অন্যান্য গ্রন্থে ভূমিদান এবং ব্রহ্মবৃত্তি সম্বন্ধীয় অনেক কথা পাওয়া যায়। নিজের কিম্বা অন্যের প্রদত্ত ভূমি হরণকারীর গুরুতর পাপের কথাও বিস্তর আছে ; তাহার একটীমাত্র এ স্থলে দেওয়া গেল ;—

"স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যো হরেত বসুন্ধরাম্।
ষষ্টি বর্ষ সহস্রাণি বিষ্ঠাযাং জায়তে কৃমিঃ।।
ভূমেঃ স্বপরদত্তায়া হরণান্নাধিকং ক্বচিৎ।
পাপমস্তি মহারৌদ্রং নস্বীকুর্ম্মঃ পুনান্ততাম্।।"
ব্রহ্মপুরাণ — ১৫৫ অঃ, ৬—৭ শ্লোক।

শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রতি বিশ্বাস।

এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্যে আস্থাবান ছিলেন বলিয়াই প্রাচীনকালের পুণ্যশ্লোক ভূপতিগণ অকাতরে ভূমি দান করিতেন, এবং তাঁহাদের স্থলবর্ত্তীগণও সেই দান অক্ষুণ্ণ রাখিতেন। অধিকাংশ তাম্রশাসনেই শ্রীরামচন্দ্রের সম্পাদিত শাসনের অংশবিশেষ উৎকীর্ণ হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দৃষ্টান্ত স্থলে বল্লাল সেনের, ভোজবর্ম্মা দেবের, হরিবর্ম্ম দেবের, ধর্ম্মমাণিক্যের, লক্ষ্মণ সেনের ও শ্যামল বর্ম্মের সম্পাদিত শাসন এবং অন্যান্য অনেক তাম্রশাসনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায়, রামচন্দ্রের পরবর্ত্তী ভূস্বামীগণ তাঁহারই পুণ্য আদর্শের অনুসরণ করিতেছিলেন। কোন কোন শাসনে রামচন্দ্রের অনুরোধের উল্লেখ থাকায়, এই ধারণা অধিকতর বদ্ধমূল হইতেছে। রাজা দেবখড়্গ তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কের ২৫শে পৌষ তারিখে আসরফপুরের তাম্রশাসন সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই শাসনে উৎকীর্ণ বাক্যাবলী এ স্থলে উল্লেখযোগ্য।

"ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য
জীবিতঃ চ সকলমিদমুদাহৃতং চবুধ্য নহি পুরুষৈঃ
পরকীর্ত্তয়ো বিলো — —।। এতান্যেতাং ভাবিনঃ
পার্থিবেন্দ্রাং ভূয়োভূয়ো প্রার্থয়ত্যেষ রামঃ।"

মর্ম্ম ঃ— শ্রী এবং মানব জীবন পদ্মদলস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল, ইহা মনে করিয়া এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া, কেহ অন্যের কীর্ত্তি লোপ করিবে না। ভবিষ্যৎ রাজগণের উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধ করিয়াছেন।

সে কালের ভূস্বামীগণ এত ধর্ম্মভীরু ছিলেন যে, পরদত্ত ভূমি হরণ করা শাস্ত্র বিগর্হিত হইলেও, দাতাগণ শাস্ত্রের বাক্য অধিকতর দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে ভাবী অধীশ্বরদিগকে প্রদত্ত ভূমির উপর হস্তক্ষেপ না করিবার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাইতে বিস্মৃত হইতেন না। স্বয়ং রামচন্দ্রও তাঁহার তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন ;—

ভূমিদাতাগণের ধর্ম্মভীরুতার নিদর্শন

"অস্মিন বংশে ক্ষিতৌ কোহপি রাজা যদি ভবিষ্যতি।
তস্যাহং করলগ্নোহস্মি মদ্দত্তং যদি পাল্যতে।।"

এই আদর্শও পরবর্ত্তী দাতাগণের মধ্যে অনেকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র, দানরক্ষাকারী ভবিষ্য পুরুষের করতলগত থাকিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, পরবর্ত্তীকালে এই অঙ্গীকার আরও দৃঢ় করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য কুমিল্লা নগরীর বক্ষঃস্থিত সুবিশাল ধর্ম্মসাগর প্রতিষ্ঠাকালে ব্রাহ্মণদিগকে তাম্রশাসন দ্বারা যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই দানপত্রে লিখিত আছে ;—

ধর্ম্মমাণিক্যের তাম্রশাসন

"মম বংশ পরিক্ষীণে যঃ কশ্চিদ্ভূপতি ভবেৎ।
তস্য দাসস্য দাসোহং ব্রহ্মবৃত্তিং ন লঙ্ঘয়েৎ।।"

হলায়ুধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়' নামক পুথিতে রাজা লক্ষ্মণ সেনের সম্পাদিত যে দানপত্রের লিপি সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে পাওয়া যায় ;—

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন

"ময়ি মৃতে সতি কশ্চিদ্রাজা যে ভবেৎ।
তস্য দাসস্য দাসোহং যো যে কীর্ত্তিং ন লঙ্ঘয়েৎ।।"

বিক্রমপুরের সামন্ত রাজা শ্যামল বর্ম্মা ৯৯৪ শকে সেন রাজগণের করদরূপে উক্ত প্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আদিশূরের ন্যায় পঞ্চগোত্রীয় পাঁচ জন বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া এক যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সমাগত ব্রাহ্মণপঞ্চকের মধ্যে শৌনকগোত্রীয় যশোধর শর্ম্মাকে তাম্র-শাসনদ্বারা সামন্তসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই দানপত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসন

"ময়া দত্তামিমাং ভূমিং যঃ করোতি হি পালনং।
তস্য দাসস্য দাসোহহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি।।"

এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। তাম্রশাসনদ্বারা ভূমিদানের প্রথা রামচন্দ্রের পরবর্ত্তী সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সন্ধানে ভারতের নানাস্থান হইতে প্রতিনিয়ত তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইতেছে। একমাত্র ত্রিপুর-রাজ্যে অনুসন্ধান করিলে শত শত তাম্রশাসন পাওয়া যাইবে।

তাম্রশাসন প্রদানের প্রথা আধুনিক নহে

তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ কেবল সামরিক-বীর ছিলেন না — দান-বীরও ছিলেন। রাজমালার প্রতি লহরেই তাম্রপট্টের বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। এই অবস্থা কেবল ত্রিপুরায় নহে — সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইবে। সমগ্র ভারতে এখনও বহু সংখ্যক তাম্রশাসন অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে, কত কালে তাহার সম্যক উদ্ধার হইবে, সে বিষয় মনুষ্য-ধারণার অগোচর।

ধর্ম্মের সহিত শৌর্য্যের মর্য্যাদা রক্ষা

তাম্রশাসনের ক্রমিক বিবরণ আলোচনা করিলে জানা যাইবে, সমাজে এমন একটা সময় আসিয়াছিল, যে কালে ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার সঙ্গে শৌর্য্যের গৌরবও পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত। সে কালে দাতাগণ ধর্ম্মভাব প্রণোদিত হইয়া দানপত্র সম্পাদন কালেও বীর্য্যের গরিমা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। দানপত্রে দাতার এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ ঘোষণা উপলক্ষে যে-সকল গর্ব্বিত বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা শূরত্বের পূজা ভিন্ন আর কিছু নহে। কিন্তু তাম্রশাসনের প্রথম যুগে দাতাগণের হৃদয়ে এবম্বিধ ভাব পোষণের দৃষ্টান্ত নাই ; পূর্ব্বোদ্ধৃত রামচন্দ্রের দানপত্রেও এরূপ আভাস পাওয়া যায় না। বৌদ্ধমতাবলম্বী অনেক রাজাও এরূপ গর্ব্বের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্থলে শ্রীচন্দ্র দেবের শাসনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে এই ভাবের ক্রমশঃ বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইয়াছিল। তদ্দরুণ ধর্ম্মভাব কত ম্লান হইতেছিল, দুই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে।

রাজা দেবখড়্গের তাম্রশাসন

রাজা দেবখড়্গের আসরফপুর লিপির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই শাসনে উৎকীর্ণ বাক্যাবলীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে ;—

"জয়ত্যশেষ ক্ষিতিপাল মূলিমালা মণিদ্যোতিত পাদপীঠ * * প্রণতোত্তমাগং শ্রীদেবখড়্গো নৃপতির্জ্জিতারিঃ।"

অর্থাৎ — রাজা দেবখড়্গ, যাঁহার পাদপীঠ অশেষ ক্ষিতিপালগণের মৌলিস্থিত মণিরাজিদ্বারা সমুদ্ভাসিত * * যিনি অরিকুল জয় করিয়াছেন, তাঁহার জয়।

কেশব সেনের তাম্রশাসন

কেশবসেন দেবের ইদিলপুর তাম্রশাসনের চতুর্থ শ্লোকে যে-সকল বাক্য উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত ভাবাপন্ন। শ্লোকটী এই ;—

"অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং,
সুধা কিরণ শেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদঙঘ্রিনখধোরণিস্ফুরিতমৌলয়ঃ ক্ষ্মাভুজো,
দশাস্যনতিবিভ্রমং বিদধিরে কিলৈকৈকশঃ।।"

মর্ম্ম ঃ— সুধাকিরণ শেখর স্বয়ং মহাদেবের সদৃশ বিজয়সেন নামক এক নরপতি এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজিত নৃপতিগণ যখন নত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণতঃ হইতেন, তখন সেই সকল ভূপতিবৃন্দের মুকুটমণির জ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়ায় বোধ হইত, যেন দশাস্য রাবণ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে।

১১৬৫ শকে রাজা দামোদর দেবের সম্পাদিত চট্টলের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় ;—

দামোদর দেবের তাম্রশাসন

"দেবঃ শ্রীমধুসূদনাখ্য নৃপতির্যেনাপি সেবানমৎ ভূমিপাল ললাটঘৃষ্টচরণঃ শ্রীবাসুদেবোহজনি।।" ইত্যাদি।

রাজা ঈশান দেবের প্রদত্ত ভাটেরার শাসনে উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

ঈশান দেবের তাম্রশাসন

"ক্ষ্মা পাল চূড়ামণি মণ্ডিতাঙিঘ্রঃ পুত্রোহভবৎ কেশব দেবদেবঃ।।" ইত্যাদি।

কালের এই উত্তাল তরঙ্গ ত্রিপুর সিংহাসনের পাদমূল পর্য্যন্ত চুম্বন করিয়াছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য, উদয়পুরে জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। সেই দানের তাম্রফলকে উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

বিজয়মাণিক্যের তাম্রশাসন

"রাজারাজ শিরোরত্ন নিঘৃষ্ট চরণাম্বুজঃ।
শ্রীশ্রীবিজয়মাণিক্যো রাজা রাজভি রাজতে।।"

এরূপ বহু দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতে পারে। উৎকলরাজ নরসিংহ দেবের প্রশস্তিতেও এবম্বিধ লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে। ইহা সাময়িক স্রোতের একটানা গতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বিজয়মাণিক্যের পূর্ব্ব কি পরবর্ত্তীকালে সম্পাদিত ত্রিপুরার যে-সকল তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটীতেই এবম্বিধ উক্তি নাই। বিজয়মাণিক্য কিম্বা রাষ্ট্র-বিজয়ী অন্যান্য রাজগণের এরূপ উক্তি গর্ব্ব-দৃপ্ত হইলেও নিতান্ত নিরর্থক বলা যাইতে পারে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে দেখা যাইতেছে, কাল মাহাত্ম্যের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক করদ-রাজাও আত্ম অবস্থা ভুলিয়া দানপত্র সম্পাদনকালে, রাজচক্রবর্ত্তীর ন্যায় রাজগণের শিরোরত্ন চরণে ঘর্ষণকারী বলিয়া অমূলক শ্লাঘা করিতে ছাড়েন নাই ; চাটুকার পারিষদ্বর্গও তাহা অম্লানচিত্তে রচনা ও তাম্রফলকে খোদাই করিয়া প্রভুকে কৃতার্থ করিয়াছেন! এই সকল কার্য্য আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, তৎকালে ধর্ম্মভাবকে বিদলিত করিয়া, যশোলিপ্সা সমাজে মস্তকোত্তোলন করিতেছিল।

তাম্রশাসনে অঙ্কিত শৌর্য্য ভাবের কথা

কোন কোন শাসন আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, সমাজের রুচি ক্রমশঃ নিম্নগামী হইতেছিল। বিলাসিতা এবং ব্যভিচারিতার প্রসারের যুগে এই সকল শাসন সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ কেশব সেনের তাম্রশাসনের কথা উল্লেখযোগ্য। এই প্রশস্তির ৯ম শ্লোকে দাতা স্বীয় পিতা লক্ষ্মণ সেনের কীর্ত্তি বর্ণনোপলক্ষে বলিয়াছেন ;—

তাম্রশাসনে অঙ্কিত বাক্যদ্বারা রুচির পরিচয়

"প্রত্যুষে নিগড়স্বরৈর্নিয়মিত প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজাং,
মধ্যাহ্নে জলপান মুক্ত করভ প্রোদ্গাল ঘণ্টারবৈঃ।

সায়ং বেশ বিলাসিনী জারণন্মঞ্জীর মঞ্জুস্বনৈ
র্যেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটন বন্দ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ।।

মৰ্ম্ম ঃ— (লক্ষ্মণ সেন) প্রত্যুষে নরঘাতী বন্দীবৃন্দের বন্ধন-শৃঙ্খল রবে, মধ্যাহ্নে জলপানার্থ সমাগত করভ ও উষ্ট্রযূথের গলঘণ্টা শব্দে এবং সায়ংকালে রাজপথ বাহিনী বারবিলাসিনীগণের সুমধুর নূপুর নিক্কণে আকাশপথ ধ্বনিত করিতেন।

পূর্ব্বে যে লক্ষ্মণ সেনের প্রশস্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তিনি ঠিক এই ভাষায়ই আত্মকীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছিলেন, কেশব সেন পিতার সেই অতুলকীর্ত্তি পুনর্ব্বার ঝালাইয়া দিয়াছেন মাত্র। অতঃপর পিতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, শাসনের ১৮শ শ্লোকে কেশব আত্মকীর্ত্তি বর্ণন করিয়াছেন। তাহা আরও কদর্য্য। এস্থলে সেই শ্লোক প্রদান করা যাইতেছে।

"আকর্ণাঞ্চলমেলকারবিশিখক্ষেপৈঃ সমাজেদ্বিষাং
দানান্তঃ কণগর্ভদর্ভকলনৈর্গোষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং।
নীবীবন্ধবিসরণৈঃ পরিষদিত্রস্যৎ কুরঙ্গীদৃশাং
অব্যাপারনুখোষিতং ক্ষণমপি প্রাপ্নোতিনৈতৎকরঃ।।"

মৰ্ম্ম ঃ— তাহার (কেশব সেনের) হস্তদ্বয় কখনও বিশ্রাম সুখ লাভ করিত না, আকর্ণ আকর্ষিত বাণদ্বারা বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ, ব্রাহ্মণদিগকে হিরণ্যগর্ভদান এবং লজ্জাশীলা কুরঙ্গনয়না সুন্দরীগণের কটিবন্ধন বস্ত্র শ্লথ করা প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার হস্তদ্বয় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিত।

ইহাই শেষ নহে। উক্ত শাসনের ২৩শ শ্লোকও উল্লেখযোগ্য। তাহা এই ;—

"আরূহ্যাভ্রং লিহগৃহশিখামস্য সৌন্দর্য্য লেখাং,
পশন্তীভিঃ পুরিবিহরতঃ পৌরসীমন্তিনীভিঃ।
বার্ত্তাকূতৈর্নয়নচলিতৈর্বিভ্রমং দর্শয়ন্ত্যো,
দৃষ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণাবিঘটিত প্রেমবদ্ধৈঃ কটাক্ষৈঃ।।"

মৰ্ম্ম ঃ— পুরী বিহার কালীন সুন্দরীগণ অভ্রভেদী গৃহচূড়ায় আরোহণ করিয়া তাঁহাকে (রাজাকে) দেখিতেন, তিনি এই সমস্ত চলিত নয়না কামিনীগণের প্রতি ক্ষণমাত্র প্রেম কটাক্ষ করিতেন।

ধৰ্ম্ম-প্রণোদিত চিত্তে দানপত্র সম্পাদন করিতে যাইয়া, যে কালে সায়ংকালীয় রাজপথ বাহিনী বারবিলাসিনীর নূপুরধ্বনি হৃদয়ে জাগ্রত হইত, পথে চলিবার কালে গৃহচূড়াস্থিতা সুন্দরীগণের সহিত কটাক্ষ বিনিময় মনে পড়িত, সুন্দরীগণের কটিবন্ধন বস্ত্র লইয়া টানাটানির কথা হৃদয়ে উদিত হইত, বিশেষতঃ যে কালে সেই সকল কীর্ত্তি কাহিনী দানপত্রে উৎকীর্ণ করা রাজা এবং রাজপণ্ডিতগণ গৌরবজনক মনে করিতেন, সেই কালের রুচির বিষয় — ধৰ্ম্ম

ভাবের বিষয় চিন্তনীয় নহে কি? কেবল তাম্রফলকে নহে — শিলালিপিতে এবং সাহিত্যেও সেই রুচির অল্প বিস্তর ছাপ পড়িয়াছিল। কিন্তু ত্রিপুরার কোন শাসনে এবম্বিধ কুরুচি স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই।

তাম্র-শাসনে অযথা বাক্য

এ স্থলে আর একটী কথা বলিবার আছে। ভূমিদাতাগণ তাম্র-শাসনদ্বারা আপনাদিগকে রাষ্ট্র-বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিবার একটা সহজ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে সকল রাজা এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই বিজয়-শ্রী লাভের সামর্থ্য ছিল কি না, হৃদয়ে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয়। এতদ্বিষয়ক একটী সন্দিগ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। ১১৬৫ শকে (১২৪৩ খৃঃ) সম্পাদিত রাজা দামোদর দেবের চট্টল-শাসনে তাঁহাকে 'ত্রিপুর জয়িনং' বিশেষণে ভূষিত করা হইয়াছে। * এই বাক্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কারণ দামোদরের রাজত্ব খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই শেষ হইয়াছিল। ইহা বঙ্গদেশে মুসলমান প্রভাব বিস্তারের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কথা। তৎকালে ত্রিপুরার সামরিক বল অসাধারণ ছিল। চট্টগ্রামে, মঘ ব্যতীত ত্রিপুরার প্রতিযোগী অন্য কোন প্রবল শক্তি থাকিবার প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে, দামোদর দেব নিজেকে ত্রিপুর বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকিলেও ত্রিপুরায় কিম্বা চট্টগ্রামে তাঁহার কোনরূপ প্রাধান্যের নির্দশন পাওয়া যাইতেছে না। তিনি চট্টগ্রামে খণ্ড রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ছিলেন সত্য, কিন্তু ত্রিপুর-শক্তির সম্মুখীন হইবার উপযুক্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এমনকি, তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহা নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ত্রিপুরা বিজয়ের উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন হইলে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তাঁহাকে বিস্মৃতির আঁধারে বিসর্জ্জন করিতে পারিতাম না। নিশ্চয়ই, তাঁহার পরিচয়সূচক কোন নিদর্শন বিদ্যমান থাকিত।

সমাজের অবস্থা বিপর্য্যয়ের কথা

পূর্ব্বোক্ত সমগ্র বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইবে, তাম্র-শাসনের প্রবর্ত্তনকালে সমাজের ছোট বড় সকলেই সরল, ধর্ম্মভীরু এবং সত্যনিষ্ঠ ছিল। দানপত্রের স্থায়িত্ব রক্ষার নিমিত্ত দাতা এবং গ্রহীতা উভয় পক্ষেরই সতর্ক দৃষ্টি ছিল; তদুদ্দেশ্যেই এই কার্য্যে তাম্রফলক ব্যবহৃত হইত। অধিকস্থায়ী এবং পবিত্র বলিয়াই বোধ হয় এই ধাতুর ব্যবহার চলিয়াছিল। এই পন্থা যে কৃত্রিম দানপত্র প্রস্তুত পক্ষে নিতান্ত সহজ, দাতা বা গ্রহীতা কোন পক্ষের মনেই সেই চিন্তা স্থান পাইত না। অনেক শাসন, বিশেষতঃ ত্রিপুরার তাম্র-শাসন সমূহ আলোচনায় জানা যাইতেছে, শকের যোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত দানপত্রে, প্রদত্ত ভূমির চতুঃসীমা লিপি করিবারও প্রয়োজন বোধ হয় নাই, পরিমাণ লিপি করিলেই যথেষ্ট হইত। ভূমির চতুঃসীমা দাতা এবং দান গ্রহীতার জানা থাকিত মাত্র। কিন্তু এমন প্রশস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও গ্রহীতা সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াসী হইতেন না। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে তাম্রপত্রে ভূমির চতুঃসীমা উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সমাজের রুচি

---

* "আন্ত্যাজ শ্রীমুষণ পিশুনঃ প্রেমভূঃ কৈরবাণাং চূড়ারত্নং ত্রিপুর জয়িনং কেলিকারো নিশায়াঃ।"

পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই দানগ্রহীতাগণের আচরণ সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইয়া থাকিবে। কালপ্রভাবে সর্ব্বত্রই ক্রমশঃ তাম্রশাসনের প্রচলন একবারে রহিত করিতে হইয়াছে; ইহাও সমাজের অবনতির ফল বলিয়াই মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে যে কোন নিদর্শনপত্র (দলিল) সম্পাদনকালে সাক্ষী উপস্থিত রাখিয়া এবং রেজিষ্টরী করাইয়াও অনেকস্থলে নিরাপদ হওয়া যায় না। অধিকাংশ দলিলের পেছনে বিবাদ-বিসম্বাদ, মামলা-মোকদ্দমা লাগিয়াই আছ। সুতরাং ইহা যে তাম্রশাসন প্রচলিত রাখিবার যুগ নহে, এ কথা অতি সহজবোধ্য এবং লোক-চরিত্রই সেই প্রথা রহিতের মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয়। আইনের মার-পেঁচ, আর আইন ব্যবসায়ীর কূটবুদ্ধি এবম্বিধ পরিবর্ত্তনের পথপ্রদর্শক বলিয়া বুঝা যাইতেছে।

ত্রিপুরার তাম্রশাসনই এই আলোচনার মূলীভূত বিষয়। কিন্তু বর্ত্তমানকালে অনেক শাসন দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং আবিষ্কৃত অনেক শাসনের প্রতি আস্থা স্থাপন করিতে হৃদয়ে দ্বিধাভাব উপস্থিত হওয়ায়, বিষয়টী যথাযথ আলোচনার সুবিধা ঘটিল না।

সৈন্যাধ্যক্ষের উপাধি

ত্রিপুরার সামরিক বিভাগের প্রাচীন বিবরণ আলোচনায় জানা যায়, এই রাজ্যে সৈন্যাধ্যক্ষগণের উপাধি সময় সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মহারাজ ত্রিলোচনের পূর্ব্বে ইঁহাদের কি উপাধি ছিল জানিবার সুবিধা নাই। তৎপরবর্ত্তীকালের যে বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদান করা গেল।

সেনা

সৈন্যাধ্যক্ষের 'সেনা' উপাধি

মহারাজ ত্রিলোচনের কিয়ৎকাল পূর্ব্ব হইতে সৈন্যাধ্যক্ষগণের 'সেনা' উপাধি থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিম্ন শ্রেণীর যোদ্ধৃগণ 'সৈন্য' এবং তাহাদের অধ্যক্ষগণ 'সেনা' পদবীবাচ্য ছিল। ত্রিলোচনের শাসনকালেও এই প্রথা প্রচলিত থাকা জানা যাইতেছে। ইহার দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক।

মহারাজ ত্রিলোচন ভূমিষ্ঠ হইবার সংবাদ শ্রবণে রাজ্যময় আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল। তৎকালে —

"আনন্দ হৃদয় হৈল সৈন্য সেনাগণ।।
মনুষ্য শরীরে দেখে শোভা ত্রিনয়ন।
পাত্র মন্ত্রী সৈন্য সেনা সবে তুষ্ট মন।।"

প্রথম লহর, ত্রিপুর-খণ্ড — ১৭ পৃঃ।

মহারাজ ত্রিলোচন কর্ত্তৃক চতুর্দ্দশ দেবতা প্রতিষ্ঠাকালের বিবরণ আলোচনা করিলে পাওয়া যায় ;—

"পাত্র মন্ত্রী সৈন্য সেনা লইয়া রাজায়।
নমস্কার করিলেন সর্ব্ব দেব পায়।।"

প্রথম লহর, ত্রিলোচন খণ্ড — ৩১ পৃঃ।

মহারাজ দাক্ষিণ, হেড়ম্বপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া খলংমা নামক স্থানে গমনোপলক্ষে রাজমালা বলেন ;—

"সৈন্য সেনা সনে রাজা স্থানান্তরে গেল।
বরবক্র উজানেতে খলংমা রহিল।।"

প্রথম লহর, দাক্ষিণ খণ্ড — ৩৭ পৃঃ।

মহারাজ শিক্ষরাজের বনগমনকালে 'সেনা'গণ রাজার সঙ্গে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার উল্লেখ আছে ;—

"পুত্র আদি সেনাগণ কাঁন্দিতে কাঁন্দিতে।
আগুবাড়ি দিল নিয়া কতদূর পথে।।"

প্রথম লহর, তৈদাক্ষিণ খণ্ড — ৪২ পৃঃ।

মহারাজ যুঝারু ফাএর লিকা অভিযান উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে ;—

"ত্রিপুরার চরগণ তাহাকে দেখিয়া।
যুদ্ধ হেতু সৈন্য সেনা গেলেক চলিয়া।।"

প্রথম লহর, যুঝারু ফা খণ্ড — ৫০ পৃঃ।

এই সময় পর্য্যন্ত সৈন্যাধক্ষগণের 'সেনা' উপাধি পাওয়া যায়। সম্যক বিবরণ আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ ত্রিপুর হইতে যুঝারু ফা পর্য্যন্ত ৭২ জন রাজার শাসন সময়ে সৈন্যাধ্যক্ষগণের 'সেনা' উপাধি ছিল।

পরবর্ত্তীকালে (মহারাজ প্রতীত ও মহারাজ যুঝারু ফা-এর সময়ে) 'সেনা' উপাধির সঙ্গে ক্বচিৎ 'সেনাপতি' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয়, এই সময়ই সৈন্যাধ্যক্ষগণের 'সেনাপতি' উপাধির সূত্রপাত হইয়াছিল।

জাঙ্গে ফা হইতে ছেঙ্কাছাগ পর্য্যন্ত ২১ জন রাজার নাম রাজমালায় পাওয়া যায়, তাঁহাদের শাসনকালের কোন বিবরণই উক্ত গ্রন্থে নাই। সুতরাং ইঁহাদের কালে সৈন্যাধ্যক্ষগণের কি উপাধি ছিল, জানিবার উপায় নাই।

সেনাপতি

মহারাজ ছেঙ্কাছাগ-এর পুত্র ছেংথুম ফা-এর সময়, সাধারণ সিপাহিগণের 'সৈন্য' এবং তাহাদের অধিনায়কবৃন্দের 'সেনাপতি' উপাধি ছিল। এই উপাধি সম্ভবতঃ ছেংথুম্ ফা-এর পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। গৌড়েশ্বরের সহিত

সেনাপতি উপাধি

মহারাজ ছেংথুম ফা-এর যে যুদ্ধ হয় তাহার সূচনায় পাওয়া যাইতেছে ;—

(১) "সৈন্য সেনাপতি সবে অনুমতি দিল।
নৃপতিকে মহাদেবী অনেক ভর্ৎসিল।।"

(২) "এ বলিয়া ঢোলে বাড়ি দিতে আজ্ঞা কৈল।
যত সৈন্য সেনাপতি সব সাজি আইল।।"

প্রথম লহর, ছেংথুম্ ফা খণ্ড — ৫৬ পৃঃ।

ধর্ম্মদেব সিংহাসন গ্রহণের নিমিত্ত কাশীধাম হইতে রাজ্যে প্রত্যাগমনকালে ;—

"কতদিনে আসিলেক দেশ সন্নিহিতে

সৈন্য সেনাপতি আসে আগুবাড়ি নিতে।।
পঞ্চ ভ্রাতৃ মিলিয়া করিল আলিঙ্গন।
রাজ পদধূলি লৈল সেনাপতিগণ।।"

দ্বিতীয় লহর, ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড — ৪ পৃঃ।

মহারাজ প্রতাপমাণিক্যের শাসনকালেও সেনাপতি উপাধির উল্লেখ পাওয়া যায় ;—

"প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র লোকে রাজা করে।
অধার্ম্মিক দেখি তাকে লোকে মারে পরে।।
মহা বলবন্ত দেখি দিনে না মারিছে।
সেনাপতি সবে চক্রে রাত্রিতে বধিছে।।"

দ্বিতীয় লহর, প্রতাপমাণিক্য খণ্ড — ৬ পৃঃ।

দশ জন সেনাপতি নিয়োগের প্রথা

ধর্ম্মমাণিক্যের পূর্ব্ব হইতেই দশ জন সেনাপতি নিযুক্ত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সামরিক বিভাগসহ শাসনভার ইঁহাদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজমালা প্রথম লহরে এইমাত্র বিবরণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় লহরের প্রথম রাজা ধর্ম্মমাণিক্যের সময়েও 'সেনাপতি' উপাধি প্রচলিত এবং দশ জন সেনাপতি নিযুক্ত ছিল। রাজকুমার ধর্ম্মদেব পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি বারাণসীক্ষেত্রে সন্ন্যাসীবেশে অবস্থানকালে, দেশ হইতে লোক যাইয়া তাঁহাকে জানাইল ;—

"তোমার পিতা মহামাণিক্য শীতলা হইয়া।
বৈকুণ্ঠ নিবাসী হৈল পঞ্চসুত রাখিয়া।।
তোমা চারি ভাই আছে রণের মাঝার।
সেনাপতি নাহি দিছে রাজা হইবার।।
দশ সেনাপতি মধ্যে রাজা হৈতে চায়।
না মানে কাহারে কেহ মনে ভয় পায়।।"

দ্বিতীয় লহর, ধর্ম্মমাণিক্য খণ্ড — ৪ পৃঃ।

মহারাজ প্রতাপমাণিক্যের শাসনকালে পাওয়া যায় ;—

"রত্নমাণিক্য রাজা স্বর্গে হৈল গতি।
অধার্ম্মিক প্রতাপমাণিক্য হৈল খ্যাতি।।
তাহানে মারিল রাত্রে দশ সেনাপতি।"

প্রথম লহর, রত্নমাণিক্য খণ্ড — ৭০ পৃঃ।

প্রতাপমাণিক্যের নিধন সাধনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর ধন্যমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার নিমিত্ত সেনাপতিগণ কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় কুমার ধন্য, সেনাপতিগণের ভয়ে বিশ্বস্ত পুরোহিতের গৃহে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সেনাপতিগণ তাঁহার সন্ধান পাইয়া;—

"পরে দশ সেনাপতি সৈন্য সজ্জা করি।
পুরোহিত গৃহে গেল হস্তী অশ্বে চড়ি।।"

দ্বিতীয় লহর, প্রতাপমাণিক্যখণ্ড — ৭ পৃঃ।

অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে ;—

"নৃপতি দেখিতে চলে দশ সেনাপতি।
পুরোহিত লৈয়া গেল অতি শীঘ্র গতি।।"

দ্বিতীয় লহর, ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ১২ পৃঃ।

ছেংথুম্ ফা-এর সময় হইতে ধন্যমাণিক্যের রাজত্বের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত 'সেনাপতি' উপাধির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মহারাজ ধন্য, দুর্দ্দান্ত সেনাপতিদিগকে বধ করিয়া নূতন সৈন্যদল গঠনকালে সৈন্যাধ্যক্ষগণের শ্রেণী বিভাগ করিয়া সরদার, হাজারী ও বড়ুয়া উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। * এই সময় প্রধান সেনাপতিদিগকে 'নারায়ণ' উপাধি প্রদান করা হয়। এই সকল উপাধির স্থূল বিবরণক্রমশঃ দেওয়া যাইতেছে।

সরদার

সরদার উপাধি

মহারাজইহা সৈন্যগণের অব্যবহিত উপরের পদ ছিল। সরদারগণের কি রকম ক্ষমতা ছিল এবং কত সংখ্যক সৈন্যের উপর এক এক জন সরদার থাকিবার ব্যবস্থা ছিল, জানিবার সূত্র পাওয়া যাইতেছে না। পার্ব্বত্য সৈন্যের নায়কগণের

* "সরদার করিলেক অর্দ্ধ সৈন্য দিয়া।
হাজারী করিয়াছিল কত সৈন্য লৈয়া।।
* * * *
শ্রীধন্যমাণিক্য রাজা তদবধি সেনা।
বড়ুয়া পদবী খ্যাতি করিল রচনা।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ১২ পৃঃ।

সরদার উপাধি ছিল। সম্ভবতঃ লাঠিয়াল শ্রেণীর যোদ্ধৃবৃন্দের অধিনায়ক-দিগকেও সরদার উপাধি দেওয়া হইত। সে কালে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে লাঠিয়াল সৈন্য থাকিবার প্রমাণ রাজমালায় পাওয়া যায়। প্রয়োজন হইলে ইহারা মৃত্তিকা খননের কার্য্যও করিত। ত্রিপুর রাজ্যে যে সুবৃহৎ দীর্ঘিকার প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়, তাহার অধিকাংশ সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী দ্বারা খনিত হইয়াছে। লাঠিয়াল শ্রেণীর সৈন্যগণ যুদ্ধযাত্রাকালে অন্যান্য অস্ত্রের সহিত কোদাল সঙ্গে লইত, ত্রিপুর বাহিনীর জয়ন্তিয়া অভিযান কালে দেখা গিয়াছে ;—

"দ্বাদশ হাজার হাড়ি হাতে কোদাল লৈয়া।
হাড়িয়ে ডগর বাদ্য চলে বাজাইয়া।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৪৪ পৃঃ।

হাজারী

ইহা সরদারের উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের পদবী। এক হাজার পদাতিকের অধিনায়কগণ হাজারী উপাধি লাভ করিতেন। রাজমালায় 'হাজরা' উপাধির উল্লেখও বিরল নহে। 'হাজারী' এবং 'হাজরা' অভিন্ন উপাধি বলিয়াই মনে হয়।

হাজারী উপাধি

বড়ুয়া

ইহা হাজারীর উপরিস্থ পদ। 'বড়' শব্দ হইতে বড়ুয়া পদবী সৃষ্ট হইয়াছিল। এই পদবী অদ্যাপি কোন কোন পার্ব্বত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন আর সৈনিক বিভাগের সহিত এই পদবীর কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

বড়ুয়া উপাধি

নারায়ণ

মহারাজ ধন্যমাণিক্য রণদক্ষ প্রধান সেনাপতিদিগকে 'নারায়ণ' উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, রসাঙ্গ (আরাকান) বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষ 'রসাঙ্গমর্দ্দন' ও 'নারায়ণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সেনানীর নাম জানা যাইতেছে না। ইঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন সেনাপতির 'নারায়ণ' উপাধি লাভের প্রমাণ নাই। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির 'নারায়ণ' উপাধির নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;—

নারায়ণ উপাধি

"চাটিগ্রাম হতে ভঙ্গ দিল গৌর সেনা।
রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণকে বসাইল থানা।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২৪ পৃঃ।

দেবমাণিক্যের সময় সেনাপতির কি উপাধি ছিল, রাজমালায় তদ্বিষয়ের উল্লেখ না থাকিলেও তাঁহার পরবর্ত্তী ইন্দ্রমাণিক্যের শাসনকালে 'নারায়ণ' উপাধি পাওয়া যাইতেছে। এতদ্দারা বুঝা যায়, দেবমাণিক্যের সময়েও ঐ উপাধি প্রচলিত ছিল। ইন্দ্রমাণিক্যের

প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

"দৈত্যনারায়ণ নাম প্রধান সেনাপতি।
ব্রাহ্মণ মারিতে যুক্তি করিল সঙ্গতি।।"

ইন্দ্রমাণিক্য খণ্ড — ৩৬ পৃঃ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকালেও এই দৈত্যনারায়ণ সেনাপতি ছিলেন, যথা;—

"দৈত্যনারায়ণ সেনাপতি অতি পুণ্যবান।
জগন্নাথ স্থাপে মঠ করিয়া নির্ম্মাণ।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৩৯ পৃঃ।

দৈত্যনারায়ণ ক্ষমতাগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া রাজ্যমধ্যে নানাবিধ অশান্তি উৎপাদন এবং রাজার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করায়, মহারাজ বিজয় তাঁহাকে বধ করিয়া গোপীপ্রসাদ নামক সেনাপতিকে 'নারায়ণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, যথা ;—

"রাজা বলে গোপীপ্রসাদ তোমার হৈল ভালা।
আজি হইতে তুমি আমার বেহাই হইলা।।
* * * *
* * * *
তার পরে মহলদ্বারে রাখিল সম্মুখে।
পরে গোপীপ্রসাদ নারায়ণ করিলাম তোকে।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৬২-৬৩ পৃঃ।

বিজয়মাণিক্যের পুত্র অনন্তমাণিক্যের শাসনকালেও নারায়ণ পদবী প্রচলিত ছিল। রাজমালায় উল্লেখ আছে ;—

"তাহার ভাগিনা বীরমর্দ্দন নারায়ণ।
তাহাকে শিখায়ে মন্ত্রী বধিতে রাজন।।"

অনন্তমাণিক্য খণ্ড — ৬৬ পৃঃ।

উদয়মাণিক্যের শাসনকালে অনেক সেনাপতির 'নারায়ণ' উপাধি ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে গৌড়েশ্বর ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত বিপুল বাহিনী প্রেরণ করায়, মহারাজ উদয় বিপক্ষের বিরুদ্ধে ;—

"রণাগণ নারায়ণ পাঠাইল ত্বরিতে।।
রাজার ভগিনীপতি রণাগণ নারায়ণ।
সেনাপতি করে তাকে সৈন্যের রক্ষণ।।"

উদয়মাণিক্য খণ্ড — ৬৯ পৃঃ।

এই যুদ্ধে নারায়ণ উপাধি বিশিষ্ট যে সকল সেনাপতি রণাগণের সহযাত্রী হইয়াছিলেন, রাজমালায় তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় ;—

"চন্দ্রদর্প নাম চন্দ্রসিংহ নারায়ণ।
উড়িয়া নারায়ণ ছিল অরিভীম তখন।।

আগুয়ান নারায়ণ আর গজভীম।
চলিল এসব সৈন্য পরাক্রমে সীম।।"
উদয়মাণিক্য খণ্ড — ৫৯ পৃঃ।

রাজমালার প্রথম ও দ্বিতীয় লহরে এই পর্য্যন্ত বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী লহর সমূহেও 'নারায়ণ' উপাধির বিস্তর উল্লেখ আছে, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

'নারায়ণ' উপাধিধারী সেনাপতিগণের হস্তে রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত থাকায়, তাঁহাদের প্রভাব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তদ্ধেতু ইঁহাদের সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল বলিয়াছেন ;—

"Bordering upon Bhatty is a very extensive country subject to the King of Tipperah. * * * him they style Yeyah Manik (Bijoy Manikya) and whoever are possessed of Rajship bear the title of Manik at the end of their names and all the nobility are called Narayan. Their Military force consists of a thousand elephants, two hundred thousands, infantry, but they have few or on cavalry." — Translation of Ayin-i-Akbori by Francis Gladwin P. 298.

মর্ম্ম ঃ— ভাটী অঞ্চলে ত্রিপুরা রাজার অধীনে এক বিস্তৃত রাজ্য আছে। বিজয়মাণিক্য ইহার রাজা। যে কেহ রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেই তাঁহাদের নামের সঙ্গে 'মাণিক' উপাধি সংযুক্ত হয় এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ 'নারায়ণ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। একসহস্র হস্তী ও দুই লক্ষ পদাতিক তাঁহাদের সামরিকবল, কিন্তু অশ্বারোহী সৈন্য বিরল।

'রিয়াজ-উস্-সলাতিন' গ্রন্থেও নারায়ণের বিবরণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, তাহা রাজমালার পরবর্ত্তী লহরে আলোচিত হইবে।

চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক নারায়ণ

চতুর্দ্দশ দেবতার পূজক শ্রেণীর মধ্যে প্রধান পূজকের (চন্তাইর) নিম্নবর্ত্তী ব্যক্তি 'নারায়ণ' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। এই উপাধি কি কারণে এবং কোন্ সময় পূজকের প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা বর্ত্তমানকালে অসাধ্য হইয়াছে।

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে সৈনিক বিভাগের পুনর্ব্বার সংস্কার হয়। এই সময়ও প্রধান সেনাপতিগণের 'নারায়ণ' উপাধি স্থিরতর থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পাঠান সৈন্য দ্বারা অশ্বারোহী দল গঠন এবং 'খাড়াইত' উপাধিধারী নূতন সৈনিক-বল গ্রহণ দ্বারা মহারাজ বিজয় সৈনিক বিভাগকে সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। খাড়াইত সম্বন্ধীয় বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল।

খাড়াইত বা খাড়াতিয়া

খাড়াইত উপাধি

মহারাজ বিজয়মাণিক্য খাড়াইত সম্প্রদায় নিযুক্ত দ্বারা ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগ বিশিষ্টরূপে পুষ্ট করিয়াছিলেন। রাজপুরী রক্ষা করা ইহাদের প্রধান কার্য্য হইলেও, প্রয়োজন মতে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াও কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল।

বিজয়মাণিক্যের বঙ্গাভিযানকালে তাঁহার সঙ্গে দুই সহস্র খাড়াইত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজমালায় খাড়াইতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই ;—

"খড্গ চর্ম্ম জাঠি হাতে দেখি ভয়ানক।।
সাতবার ধন্যসাগর ফিরিতে যে পারে।
সেই জনা তার নাম খাড়াতাইয়া ধরে।।
দিবা রাত্র থাকে রাজদ্বারেতে প্রহরী।
বড় বড় অঙ্গ তারার বিক্রমে কেশরী।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৫৮ পৃঃ।

ধন্যসাগর দৈর্ঘ্যে ১০০০ গজ ও প্রস্থে ২৭০ গজ। এই সাগর সাত বার প্রদক্ষিণ করা যে বলশালী ব্যক্তির কার্য্য, তাহা সহজবোধ্য। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ খাড়াইত পদলাভের অধিকারী হইত না। বিশাল বপু এবং বিক্রমশালী ব্যক্তিগণ খাড়াইত বিভাগে স্থান পাইত, রাজমালার বর্ণনা দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে।

খাড়াইত উপাধির প্রাচীনত্ব

খড্গ চর্ম্মধারী যোদ্ধৃদল প্রাচীনকাল হইতেই খড্গাধারী বা খাড়াইত নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছিল। ইহা মহারাজ বিজয়মাণিক্যের নব উদ্ভাবিত নহে। পুরাণ গ্রন্থেও এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা ;—

"সুরূপস্তরুণঃ প্রাংশুর্দৃঢ় ভক্তিঃ কুলোচিতঃ।
শূরঃ ক্লেশসহশ্চৈব খড়্গধারী প্রকীর্ত্তিতঃ।।"

মৎস্যপুরাণ — ২১৫ অঃ, ১৮ শ্লোক।

মর্ম্ম ঃ— সুন্দর দর্শন, তরুণ বয়স্ক, দীর্ঘকায়, রাজার প্রতি দৃঢ় অনুরক্ত, সৎকুল সম্ভূত, শূর এবং কষ্টসহিষ্ণু ব্যক্তিকে খড্গাধারী পদে নিযুক্ত করিতে হয়।

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, খড্গাধারী বা খাড়াইত পৌরাণিক যুগের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়। পরবর্ত্তীকালে অনেক স্থানেই সৈনিক বিভাগে এই শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। বেহারের ইতিবৃত্ত 'রাজাবলী' পুথিতে পাওয়া যায়, তথাকার সৈনিকগণের মধ্যে 'খাড়াধরা' নামক এক শ্রেণীর যোদ্ধা ছিল; ইহা খড্গাধারীর নামান্তর মাত্র। ময়নামতির গানে পাওয়া যায়, গোপীচাঁদ মায়ের নিকট বলিতেছেন ;—

"আর বিভা করাইলা খাণ্ডাএ জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরুয়া রাজার মাইয়া।।"

ভবানীদাসের ময়নামতীর গান।

'খাণ্ডা' শব্দের অর্থ 'খাড়া'। উড়িষ্যা প্রদেশে এক শ্রেণীর যোদ্ধৃবর্গের 'খণ্ডাইত' উপাধি ছিল। 'খাণ্ডাএ জিনিয়া' বাক্যদ্বারা বুঝা যায়, রাজা মাণিকচন্দ্রের 'খণ্ডাইত' সৈন্য ছিল। খণ্ডাইত ও খাড়াইত অভিন্ন বাক্য। উড়িষ্যাবাসী কোন রাজাকে লক্ষ্য করিয়া উদ্ধৃত কবিতায় 'উরুয়া রাজা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী

মহাশয় মনে করেন 'উরুয়া রাজা' শব্দ রাজেন্দ্র চোলের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বাক্যের প্রতি দৃঢ় নির্ভর করিবার উপায় নাই, অথচ উপেক্ষা করিবার যোগ্য প্রমাণও দেখা যায় না।

উড়িষ্যা প্রদেশে এক সময় খণ্ডাইত সম্প্রদায়ের সংখ্যা এবং প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সম্প্রদায় নানাজাতীয় লোকের সমবায়ে গঠিত হইয়া থাকিলেও প্রাধান্যহেতু ইহারা ত্রিপুরার 'কাঠিছোঁয়া' সম্প্রদায়ের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে। উক্ত প্রদেশে খড়্গধারী সৈন্যদল খণ্ডাইত নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ছোটনাগপুরেও এই জাতির অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহারা বলিয়া থাকে, ইঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছিল।

খণ্ডাইতগণের উপাধি দ্বারা তাহাদিগকে যোদ্ধৃপুরুষ বলিয়াই বুঝা যায়। উড়িষ্যার খণ্ডাইতগণের মধ্যে উত্তর কবাট্, দক্ষিণ কবাট্, গড় নায়েক, সিংহ, দৌবারিক, নায়েক, বাঘা, বাহুবলেন্দ্র, মহারথী, মল্ল, রণসিংহ, সামন্ত, সেনাপতি প্রভৃতি উপাধি পাওয়া যায়। ইহারা প্রধানতঃ বড় ঘরি ও ছোট ঘরি, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগের আবার অনেকগুলি উপবিভাগ আছে, এস্থলে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উচ্চ-নীচতা আছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের অন্ন অন্য সম্প্রদায় গ্রহণ করে না। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সকল সম্প্রদায়েরই জল গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জাতির অধিকাংশ লোক বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা বর্ত্তমানকালে যুদ্ধ ব্যবসায়ী না হইলেও তরবারির প্রতি উপাস্য দেবতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে, ইহা অতীত শৌর্য্যের লুপ্তপ্রায় চিহ্ন বলিয়াই মনে হয়।

নাজির

এই উপাধি মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এবং এই উপাধিধারী কালা নাজিরের নাম সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যায় ;—

নাজির উপাধি

"ত্রিপুর রাজার থানা শ্রীহট্টে বৈসাইল।
কালা নাজির ত্রিপুর থানাতে রহিল।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৪৫ পৃঃ।

পার্ব্বত্য সিপাহীদ্বারা সংস্থাপিত গারদ এবং পর্ব্বত-বাসী সৈনিকবৃন্দের পরিচালন ভার যাঁহারা হস্তে অর্পিত হইত তিনি নাজির উপাধি লাভ করিতেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিগণ এই পদের অধিকারী ছিলেন।

সতীদাহ

ত্রিপুর রাজ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে সতীদাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়া সুদীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। রাজমালার দ্বিতীয় লহরে পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের পট্টমহিষী মহারাণী কমলা দেবী পতির চিতারোহণ করিয়াছিলেন। * দেবমাণিক্যের মহিষী এবং বিজয়মাণিক্যের মহিষীবৃন্দ পতির সহগামিনী হইয়াছেন। † অনন্তমাণিক্যের সহধর্ম্মিণী মহারাণী জয়াবতী সহমরণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন; তাঁহার পিতা, সেনাপতি গোপীপ্রসাদ (পরে উদয়মাণিক্য) বাধা প্রদান করায় তাহার সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই। ‡ রাজমালার পরবর্ত্তী লহরসমূহেও এই প্রথার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

ত্রিপুরায় সতীদাহের প্রচলন

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যাইবে, বৈদিককাল হইতেই ভারতে সতী দাহ প্রথা চলিয়া আসিতেছিল। § কেহ কেহ আবার সায়ণ ভাষ্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া বৈদিক বাক্যের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এ স্থলে তাহার আলোচনা করা সম্ভবপর নহে।

সতীদাহ প্রথার প্রাচীনত্ব

বৈদিককালের পরে বৃহস্পতি, অঙ্গিরা, বিষ্ণু, ব্যাস ও হারীত প্রভৃতি পুরাণ এবং সংহিতাকার মহর্ষিগণ সতীদাহের সমর্থন করিয়াছেন। মহাভারতেও এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়, যথা ;—

"ভর্ত্রানুমরণং কালে যাঃ কুর্ব্বন্তি তথাবিধাঃ।
কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়ান্মোহাৎ সর্ব্বাঃ পূতা ভবন্তি তাঃ।।"

মর্ম্ম ঃ— কামনা, ক্রোধ, ভয় কিম্বা মোহ, যে কারণেই হউক, যে সকল রমণী মৃত পতির সহগামিনী হইবে, তাঁহারা সকলেই পবিত্র হইবে।

শাস্ত্রসমূহের বাক্য পথ-প্রদর্শক মাত্র। ভারতের সাধ্বী রমণীসমাজ পতিপ্রাণা — পতি ব্যতীত তাঁহাদের জীবনে অন্য লক্ষ্য নাই। সুতরাং জ্বলন্ত চিতায় পতি পার্শ্বে শয়ন করিয়া আত্মাহুতি দান করা তাঁহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। বরং পতির সহগামিনী হওয়া ধর্ম্মপত্নীর অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই রমণীগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মহাভারতে পাওয়া যায়, পাণ্ডুরাজার সহধর্ম্মিণী কুন্তি, পতির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় সপত্নী মাদ্রিকে বলিয়াছেন ;—

"অহং জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী জ্যেষ্ঠং ধর্ম্মফলং মম।
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবান্মা মাং মাদ্রি নির্বর্ত্তয়।।

---

* ধন্যমাণিক্য খণ্ড, — ৩৩ পৃঃ।

† দেবমাণিক্য খণ্ড, — ৩৮ পৃঃ।

‡ বিজয়মাণিক্য খণ্ড, — ৬৪ পৃঃ ও অনন্তমাণিক্য খণ্ড, — ৬৭ পৃঃ।

§ "ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানং নিপদ্যত উপত্বা মর্ত্ত্যপ্রেতং।
বিশ্বং পুরাণমনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণঞ্চেহ ধেহি।।" ১৩
তৈত্তিরীয় আরণ্যক — ৬।১।১৩।

অন্বায্যামীহ ভর্ত্তারমহং প্রেতবশং গতম্।
উত্তিষ্ঠ ত্বং বিসৃজ্যৈনমিমান্ পালয় দারকাম্।।"

মৰ্ম্ম ঃ— মাদ্রি, আমি পতির জ্যেষ্ঠা ধৰ্ম্মপত্নী। ধৰ্ম্মফল লাভের আমিই প্রধান অধিকারিণী। তুমি আমাকে অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত করিও না। আমিই মৃত পতির অনুগমন করিব, তুমি পতির মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া উত্থিতা হও এবং সন্তানদিগকে রক্ষা কর।

কিন্তু মাদ্রির আগ্রহাতিশয্য বশতঃ, কুন্তী আপন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মাদ্রিই পতির মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করিলেন। মহাভারতে সহমরণের নিদর্শন আরও অনেক আছে।

সতীদাহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত

সতীর লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সতীদাহের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার একটী বাক্য এই ;—

"আৰ্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সাধ্বীজ্ঞেয়া পতিব্রতা।।"
— কল্পতরু।

মৰ্ম্ম ঃ— যে স্ত্রী পতির ব্যথায় ব্যথিতা, পতির হর্ষে হৃষ্টা, পতি বিদেশে গমন করিলে মলিনা ও কৃশা এবং পতি বিয়োগে মৃতা হন, তিনিই সতী।

অবস্থাভেদে আবার সহমরণ নিষিদ্ধ বলিয়াও শাস্ত্রে ঘোষিত হইয়াছে। তাহার একটী বচন নিম্নে দেওয়া গেল ;—

"বালাপত্যান্ধগৰ্ব্বিণ্যো হ্যদৃষ্ট ঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে।।"

মৰ্ম্ম ঃ— গর্ভবতী, শিশুসন্তানের জননী ও রজস্বলা রমণী চিতারোহণ করিবে না। শুদ্ধিতত্ত্ব এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণেও এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা এই ;—

"বালাপত্যাশ্চ গৰ্ব্বিণ্যো হ্যদৃষ্ট ঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজাসুতে নারো হন্তি চিতাং শুভে।।"
— বৃহন্নারদীয়পুরাণ।

মৰ্ম্ম ঃ— বালাপত্যা, গর্ভিণী, রজস্বলা, অদৃষ্ট ঋতু (যাহার রজস্বলা হয় নাই) রমণীর পক্ষে সহমরণ নিষিদ্ধ।

মৃতদেহ বাসি করিয়া রাখা শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাৰ্য্য, কিন্তু অবস্থা বিশেষে এক রাত্রি রাখিবার ব্যবস্থা আছে, যথা ;—

"তৃতীয়েহহ্নি উদক্যায়া মৃতে ভৰ্ত্তরি বৈ দ্বিজাঃ।
তস্যানুমরণার্থায় স্থাপয়েদেকরাত্রকম্।।"
— ভবিষ্যপুরাণ।

মৰ্ম্ম ঃ— স্ত্রী ঋতুমতী হইবার তৃতীয় দিবসে স্বামীর মৃত্যু হইলে, সেই নারী পতির অনুগমন

করিবার নিমিত্ত এক রাত্র মৃতদেহ রক্ষা করিতে পারিবে।

সহমরণে অসমর্থা রমণীয় পক্ষে অনুমৃতা হইবার ব্যবস্থা আছে। কোন কোন শাস্ত্রগ্রন্থে সহমরণ ও অনুমরণ একার্থ জ্ঞাপক হইলেও এতদুভয়ের প্রভেদও শাস্ত্র-বাক্য দ্বারাই জানা যায়। ব্রহ্মপুরাণের মতে ;—

"দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্।।"

মর্ম্ম ঃ— দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাধ্বী স্ত্রী তাঁহার পাদুকা বক্ষে ধারণ করিয়া, শুদ্ধা হইয়া অনলে প্রবেশ করিবে।

সহমরণের সমর্থক এতদধিক শাস্ত্রীয় বচন সংগ্রহ করা নিষ্প্রয়োজন। এবার সহমরণের পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা হইবে।

সহমরণ বিধি

মৃত পতির সৎকারার্থ চিতা প্রস্তুত হইবার পর, সহমরণে সঙ্কল্পিতা স্ত্রী স্নানান্তে বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিবে। এবং কুশ লইয়া পূর্ব্বমুখে উপবিষ্টা হইয়া মাস, পক্ষ, তিথি, স্বীয় গোত্র ও নাম উচ্চারণপূর্ব্বক সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিবে। ইহার পর লোকপালগণ, আদিত্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, অন্তর্য্যামী পুরুষ, যম, দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা ও ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া তিন বার কিম্বা সাত বার চিতা প্রদক্ষিণান্তে তদুপরি আরোহণ করিবে। তৎকালে ব্রাহ্মণগণ নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবেন ;—

"ওঁ ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্নে।।"
"ওঁ ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো যাঃ সুশোভনাঃ।
সহ ভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুম্।।"
— ব্রহ্ম পুরাণ।

শুদ্ধিতত্ত্বাদি শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহে সহমরণ সংসৃষ্ট অনেক বিষয় পাওয়া যাইবে। এস্থলে সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব।

মৃত পতির সহগামিনী হওয়াই স্ত্রীর পক্ষে প্রশস্ত কর্ত্তব্য বলিয়া সংহিতা ও পুরাণসমূহ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন। যে স্ত্রী পতির সহগামিনী না হইবে, তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্যাবলম্বন বিধেয়। ব্রহ্মচারিণী স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ-মৈথুন ও তাম্বুল বর্জ্জন করিবেন এবং দিনে একবার মাত্র আহার ও মৃত্তিকায় শয়ন করিবেন। পুত্র বা পৌত্র বিদ্যমান না থাকিলে, প্রতিদিন তিল কুশোদক দ্বারা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তর্পণ করিবেন।

ইহা গেল সহমরণের অনুকূল মত। এই প্রথার বিরুদ্ধ মতও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। উভয় মতের বিচার করিতে গেলে অনুকূল মতেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আমাদের সমাজ সেই শ্রেষ্ঠ ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

সতীর আন্তরিক দৃঢ়তা

সতীগণ কেমন কায়মনোবাক্যে পতিপরায়ণা ছিলেন এবং পতির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জীবন কত ব্যর্থ মনে করিতেন, এ স্থলে তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করা যাইতেছে। ইহা ইংরেজ রাজপুরুষ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর স্যার হ্যালিডে হুগলী জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত থাকা কালে একটী সতীদাহ নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, — তাঁর বাসার কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে সতীদাহের আয়োজন হইতেছে শুনিয়া, ডাক্তার ওয়াইজ্ ও চাপলেন্‌কে সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সহমরণ-সঙ্কল্পা সতীর নিকট যাইয়া আত্মহত্যায় বিরত করিবার নিমিত্ত অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, সতী বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা শুনিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। কিছুকাল পরে সতী চিতারোহণের নিমিত্ত ব্যাকুলা হইয়া সকলের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ অনুমতি প্রদান করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মযাজক পাদরী সাহেব তাহাতেও নিবৃত্ত হইলেন না। শ্মশান-শয্যায় যে কত যাতনা হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন। সতী তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া একটী প্রদীপ আনিতে বলিলেন এবং তাহা স্বহস্তে জ্বালিয়া তদুপরি একটী অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। তিনি তীব্র দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে চাহিয়া যেন নীরব ভাষায় জানাইতেছিলেন, — "তোমরা যে যাতনার কথা বলিতেছ, তাহা কিছুই নহে।" তাঁহার প্রদীপে বিন্যস্ত অঙ্গুলী ক্রমশঃ ফোস্কা পড়িয়া, দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। পরিশেষে অঙ্গুলীটী পুড়িতে সরু ও বক্র হইয়া গেল। এই সময়ের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের তরেও রমণী হস্ত সঞ্চালন করিলেন না ; এবং তাহার বাক্যে বা অবয়বে কোন প্রকার যাতনা কিম্বা অনুভূতির লক্ষণ দেখা গেল না। তখন সতী জিজ্ঞাসা করিলেন — "আপনারা প্রবোধ পাইলেন কি?" ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন — "যথেষ্ট প্রবোধ পাইয়াছি।" তখন সতী বলিলেন, — "আমি তবে চিতায় প্রবেশ করিতে পারি।" ম্যাজিষ্ট্রেট্ মাথা নাড়িয়া সম্মতি দিলেন। তখন সতী আগ্রহের সহিত শ্মশান-শয্যায় পতির পাশে শয়ন করিলেন। উপস্থিত ইংরেজগণ সতীর আগ্রহাতিশয্যা এবং নীরব নিস্পন্দভাবে আত্মাহুতিদান দর্শন করিয়া বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

এই বিবরণ বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের লিখিত 'Bengal under Lieutenant Governors' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট ও বিশ্বকোষ সম্পাদক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ত্রিপুর রাজ্যেও ইহার উদাহরণ অনেক পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্তের বাড়াবাড়ি করা নিষ্প্রয়োজন বিধায় সে বিষয়ে নিরস্ত থাকা গেল।

ভারতবর্ষে সহমরণ প্রথার বিস্তৃতি

সহমরণ-প্রথা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল। সেকালে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরে দেখা যাইত। মুসলমান প্রভাবের কালে, যুদ্ধে নিহত বীর পুরুষগণের মহিলাবৃন্দ বিপক্ষ হস্তে লাঞ্ছিতা হইবার আশঙ্কায় জহর-ব্রত অবলম্বন

করিতেন। তাঁহারা পতির জ্বলন্ত চিতায় কিম্বা অগ্নিকুণ্ডে অম্লানচিত্তে দলে দলে আত্মদান করিয়াছেন। অনেকস্থলে সতীর শ্মশানক্ষেত্রে কীর্ত্তিস্তম্ভ দণ্ডায়মান থাকিয়া, অতীতের সতীত্ব গৌরব ঘোষণা করিতেছে।

ভারতের বাহিরে সহমরণ-প্রথা

সহমরণ-প্রথা কেবল ভারতেই ছিল এমন নহে। শাকদ্বীপ, জবদ্বীপ, লম্বকদ্বীপ, চীন, থ্রেশ্, গ্রীশ্, রোম ও উত্তর ইউরোপ প্রভৃতি অনেক দেশেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং কোন কোন দেশে এখনও বিদ্যমান আছে। তবে, সেই সকল দেশের প্রথা অন্যরূপ। অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীকে কোন না কোন প্রকারে বধ করিয়া পতির সহিত একসঙ্গে সমাহিত করা হয়। কোন কোন দেশে রাজার মৃতদেহের সঙ্গে বহুসংখ্যক দাসদাসী ও রাজার প্রিয় ব্যক্তিগণ সহগামী হইয়া থাকে। কুকিদের মৃত রাজার সঙ্গে যত অধিক সংখ্যক মস্তক প্রদান করা যাইতে পারিত, ততই গৌরব বৃদ্ধি হইত। এইসূত্রে তাহাদের সান্নিধ্যবাসী শত শত আসামী ও বাঙ্গালীর মুণ্ডপাত হইবার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু ভারতীয় হিন্দুর ন্যায় জীবন্ত দেহ দগ্ধ করিবার প্রথা অন্য দেশে বা জাতিতে নাই। এই প্রথার অনুকূলে ও প্রতিকূলে বিদেশীয় অনেক ভ্রমণকারী ও পণ্ডিত সমাজ অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রফেসর এইচ. এইচ. উইলসন, গ্রীক পণ্ডিত প্রপারটীয়স, সিসিরো, ইউরোপীয় পণ্ডিত বয়শেশ্, ঐতিহাসিক হেরোদোডস্, স্যর হ্যালিডে, বক্‌লাণ্ড্, ভ্রমণকারী এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্, আবিদুবই, মার্কোপলো, ওডরিক, গ্যাসপারো, জে. পি. ভিন্‌সেজো প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত

পতির সহিত সহমৃতা হওয়া পত্নীর অবশ্য কর্ত্তব্য, সকল শাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয় না ; যদি তাহাই হইবে, তবে প্রতিকূল মত শাস্ত্রগ্রন্থে সন্নিবেশিত হইত না। যে স্ত্রী স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করিবেন তাঁহার পক্ষেই সহমরণ ব্যবস্থেয়। যে রমণী সহমৃতা হইতে অনিচ্ছুক, তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন-যাপন করিবেন। প্রাচীনকালে পতিপ্রাণা মহিলাগণের মধ্যে পতির সহগমনে পরাঙ্মুখ স্ত্রীর সংখ্যা বেশি ছিল বলিয়া মনে হয় না।

সহমরণ-প্রথায় ব্যভিচার

সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ক্রমশঃ মানুষের মানসিক ভাব এবং বিশ্বাস অন্য প্রকার হইয়াছিল। সেই সঙ্গে সহমরণেরও ভাবান্তর দেখা গেল। অনেক স্থলে লোকগঞ্জনার ভয়ে, কিম্বা সমাজে গৌরহ লাভের আকাঙ্ক্ষায়, অনেক স্ত্রীলোকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদিগকে জোর-জবরদস্তি করিয়া পতির শবের সঙ্গে দগ্ধ করা হইত। অনেক স্থলে আবার স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গ সম্পত্তির অংশ গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে, সদ্য বিধবাকে পতির শবের সঙ্গে বাঁধিয়া, শ্মশানে কাষ্ঠচাপা দিয়া দগ্ধ করিয়া মারিত। এই সময় বিধবাগণের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা মুসলমান রাজত্বকালের কথা।

ভারত সম্রাট মহামতি আকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। যোধপুর রাজ-পরিবারে একটী সহমরণের সংবাদ পাইয়া তিনি তাহা নিবারণের নিমিত্ত অশ্বারোহণে এক শত মাইল দূরবর্ত্তী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, যে সকল সতী স্বেচ্ছায় পতির সহগামিনী হইবেন, তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়া সঙ্গত নহে, কিন্তু এ বিষয়ে কাহারও উপর জোর-জবরদস্তী করা অন্যায়। সম্রাটের এবম্বিধ অভিমত সত্ত্বেও মুসলমান শাসনকালে সতীদাহ প্রথা অবাধে চলিয়াছিল ; তৎকালে বলপ্রয়োগও যে না হইত এমন নহে।

ইংরেজ শাসনকালে সহমরণ-প্রথা

ইংরেজ শাসনকালেও সতীদাহ দীর্ঘকাল চলিয়াছে, প্রথমতঃ জোন্স্ সাহেব এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই অপরাধে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৮০৫ খৃঃ-অব্দে সতীদাহ বন্ধ করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার চেষ্টা করা হয়, হিন্দুগণের তুমুল আন্দোলনের ফলে সেইবারও গবর্ণমেণ্টকে নিরস্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

সহমরণ-প্রথা ও লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক

ইহার পর রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি ১৮১৭ ও ১৮১৯ খৃঃ-অব্দে সহমরণের বিরুদ্ধে দুইখানা পুস্তক প্রচার করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায় ১৮২৭ খৃঃ-অব্দে আর একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সময় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। তিনি রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে পৃষ্ঠপোষক পাইয়া, এই প্রথা নিবারণের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এবং ১৮২৯ খৃঃ-অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের প্রচারিত আইন (Regulation — XVII of 1829) দ্বারা সতীদাহ বন্ধ করিয়াছিলেন।

ইহার পরেও সহমরণ-প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। অনেক স্থানেই গবর্ণমেণ্টের আইন অমান্য করিয়া সতীদাহ চলিতেছিল, তজ্জন্য অনেকে অভিযুক্ত এবং দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে। সাধ্বী স্ত্রী, লোকের বাধা না মানিয়া অথবা তাহাদের অলক্ষিতভাবে অকস্মাৎ পতির জ্বলন্ত চিতায় ঝম্প প্রদান করিবার দৃষ্টান্তও অনেক আছে। পতিপ্রাণার হৃদয় আইনের অধীন নহে এবং তাঁহাদের সঙ্কল্পে বাধা প্রদান করা রাজবিধির সাধ্যায়ত্তও নহে। বর্ত্তমানকালে প্রজ্বলিত শ্মশানে আত্মদান করিবার উপায় না থাকিলেও অনেক সাধ্বী নানা উপায়ে পতির অনুগামিনী হইতেছেন। তবে, পূর্ব্বকালের তুলনায় এই উপায়ে মৃতার সংখ্যা ধর্ত্তব্য নহে।

সহমরণ-প্রথা ও ত্রিপুর রাজ্য

বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যসমূহেও উক্ত আইন কার্য্যকরী হইয়াছিল। কিন্তু এই আইন প্রচারের পরেও ক্রমান্বয়ে ৬০ বৎসর কাল ত্রিপুর রাজ্যে সতীদাহ প্রথা নির্ব্বিবাদে চলিয়াছে। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে এ বিষয়ে

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পতিত হয়। এই সময় চট্টগ্রামের কমিশনার লায়েল সাহেব (Mr. D. R. Lyall) বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ত্রিপুরার পলিটিক্যাল এজেন্টকে এতদ্বিষয়ে যে পত্র লেখেন, তদুপলক্ষে তদানীন্তন এসিষ্ট্যাণ্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট স্বর্গীয় রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ১৮৮৮ সনের ১১ই জুন তারিখে ত্রিপুর রাজ্যের পররাষ্ট্র বিভাগে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহাই সতীদাহ নিবারণকল্পে গবর্ণমেণ্ট পক্ষের প্রথম পত্র। * সেই পত্রে দ্বিতীয় দফায় লিখিত ছিল ;—

"2. During my recent movements in the Sonamura Division in March last, I heard of three cases of the kind having occurred amongst Jamatyas in the course of the last two or three years. These cases are noted in the margin **. If any more have taken place within the last 4 or 5 years anywhere in the State, this office may be supplied with a list of them."

মর্ম্ম ঃ— গত মার্চ্চ মাসে আমি যখন সোণামুড়া অঞ্চলে গিয়েছিলাম, তখন শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ২/৩ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ তিনটী (সতীদাহ) ঘটনা ঘটিয়াছিল। পার্শ্বে তাহা উল্লেখ করা হইল। যদি ৪/৫ বৎসরের মধ্যে এই রাজ্যে আরও এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার এক তালিকা এ আফিসে প্রেরিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে সতীদাহ নিবারণ জন্য বারম্বার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও ত্রিপুর দরবার এ বিষয়ের শেষ উত্তর প্রদান না করায়, কমিশনার সাহেব পুনর্ব্বার পলিটিক্যাল এজেণ্টকে আর একখানা পত্র লেখেন। ১৮৮৮ খৃঃ ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের দরবার হইতে এতদ্বিষয়ে যে উত্তর প্রদান করা হইয়াছিল, তাহার স্থূল মর্ম্ম এ স্থলে দেওয়া যাইতেছে ;—

"সতীদাহ এ রাজ্যের বহু প্রাচীন কালের প্রচলিত প্রথা এবং প্রজাসাধারণ এই প্রথাকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে। যে সকল পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত, তাহারা এখনও অশিক্ষিত, সুতরাং রাজদরবার হইতে এই প্রথার প্রতিকূলে হস্তক্ষেপ হইলে রাজ্যে অসন্তোষভাবে এবং তজ্জনিত অশান্তি উপস্থিত হইতে পারে। বিশেষতঃ বিগত দশ বৎসর হইতে এই প্রথা স্বতঃই উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বৃটিশ রাজ্যে যেরূপ উৎপীড়ন বা প্ররোচনা প্রভৃতি দ্বারা

---

* Letter No. 276. From Babu Umakanta Das, Assistant Political Agent of Hill Tippera, To Babu Banga Charan Bhattacherjee, B. A., Officer-in-charge of His Highness the Maharaja's English Office, Dated Agartala the 11th June, 1888.

** 1. Wife of Charan Senapati of Burma Cherra about three years ago.
2. Wife of Ganga Mohan Senapati, named Beni Lakshmi of Falilong Cherra in about Baisak before last.
3. Wife of Milaram Burma of Hantarai Choudhury's para on Tuiruppa Cherra, in about Magh last.

সতীকে দগ্ধ করা হইত, এ রাজ্যে তাহা হয় না। সতী স্বেচ্ছায় স্বামীর অনুগমন করিয়া থাকে।

"এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দরবার এতদ্বিষয়ে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করেন না। কিন্তু যাহাতে কেহ উৎপীড়ন বা প্ররোচনা দ্বারা সতীদাহ না করে এবং ক্রমশঃ আপনা হইতে যাহাতে এই প্রথা উঠিয়া যায়, দরবার সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।"

ইহার উত্তরে পলিটিক্যাল এজেন্ট রবাবরে চট্টগ্রামের কমিশনার যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

From

D. R. Lyall Esquire.

Commissioner of the Chittagong.

To

The Political Agent.

Hill Tippera.

No. $\frac{687}{\text{IX - 21}}$ H.T

Dated, Cittagong, the 2nd Oct., 1888.

Sir,

I have the honour to acknowledge the receipt of your No. $\frac{1993}{\text{XVI - 27}}$ dated 3rd September forwarding reply of the Hill Tipperah Durbar on the subject of Sati.

2. The reply is excessively unsatisfactory and not what I should have expected from a ruler so enlightened as the Maharaja, nor can I admit that the facts are correctly stated.

The custom of Sati is certainly not indegenous, and is, to the best of my belief, practised by none of the Hill Tribes except as an innovation. It is only the Hindooized portion of the Hill men who practise the custom, and they are not a class likely to become disaffected nor would their disaffection be of the faintest consequence.

3. The practice has clearly declined because it was believed to be forbidden, the Koylasher case which took place in February last proves this—and if it is now publicly admitted by the Maharaja that it is forbidden, the custom will very soon revive as it is quite clear that what is not forbidden is allowed, or in other words, tacitly encouraged,

4. I request that you will place the matter again before the Maharaja strongly advising him to pass a law to the same effect as Regulation XVII of 1829 and to see that it is enforced.

5. I cannot too strongly impress on the Maharaja the fact that his present action amounts to a direct encouragement of an act which has for nearly 60 years been declared illegal in India and which the whole civilized world unites in holding to be absolute barbarism.

I should be very unwilling to have to lay this question at length before the Government and trust that the Maharaja will take such action as will not necessitate my pushing the matter further.

I have etc.
(Sd.) D. R. Lyall,
Commissioner.

Memo No. $\frac{2289}{XVI-27}$ Dated Comillah, the 22nd Oct. 1888.
Copy forwarded to the Political Agent.

Agent of Hill Tipperah with reference to his No. 3/c dated 28th August/88. He is requested to place the matter again before the Maharaja and report after 3 months that a law for suppressing the custom of Sati has been passed and is enforced in Hill Tipperah.

(Sd.) Gouri Sankar Biswas,
For Pl. Agent.

অনুবাদ

নং $\frac{৬৮৭}{IX - ২১}$ চট্টগ্রাম ২রা অক্টোবর ১৮৮৮

"মহাশয়,

সতীদাহ সম্বন্ধে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার রাজ-দরবারের প্রত্যুত্তর সম্বলিত আপনার ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের $\frac{১৯৯৩}{XVI - ২৭}$ নং পত্র পাইয়াছি।

রাজ-দরবারের লিখিত উত্তর সন্তোষজনক নহে। মহারাজের ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হইতে আমি এইরূপ উত্তর পাইব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। ঐ পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না।

সতীদাহ পার্ব্বত্য ত্রিপুরার আদিম প্রথা নহে, আমার বিশ্বাস পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে এই প্রথা নূতন প্রবর্ত্তিত। যে-সকল পার্ব্বত্য লোক হিন্দু ধর্ম্মোচিত আচার অবলম্বন করে তাহারা সতীদাহ প্রথার অনুসরণ করে। এই সমস্ত ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করিবার লোক নহে এবং ইহাদের অসন্তুষ্টি আশঙ্কাজনকও নহে।

এই প্রথা নিষিদ্ধ বলিয়াই সম্প্রতি হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। কৈলাসহরের গত ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনাই তৎপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদি মহারাজের এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে, এ বিষয়ে কোনরূপ রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা নাই, তবে এই প্রথা পুনর্ব্বার প্রবল হইবে। কারণ, ইহা সহজেই উপলব্ধ হয় যে, যাহা নিষিদ্ধ নহে তাহাই অনুমোদিত। সুতরাং ইহাতে এই প্রথায় উৎসাহ প্রদান করা হইবে।

আমি অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি এই বিষয় পুনর্ব্বার মহারাজ সমীপে উপস্থিত করিবেন; এবং যাহাতে ১৮২৯ সনের ১৭ নং রেগুলেসনের ন্যায় একটী আইন জারী হয় ও তদনুসারে কার্য্য হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দিবেন। আমি বিশেষরূপে মহারাজের গোচর করিতে চাই যে, যে প্রথা ৬০ বৎসর হইল আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ভারতবর্ষে প্রচার করা হইয়াছে এবং যাহা সমস্ত সুসভ্য জাতি অসভ্য ব্যবহার বলিয়া মনে করেন, মহারাজের বর্ত্তমান কার্য্য দ্বারা সেই প্রথায় উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইতেছে।

বিষয়টী বিস্তৃতরূপে গবর্ণমেণ্টে উপস্থিত করা আমার অভিপ্রেত নহে। ভরসা করি, মহারাজ এরূপ বন্দোবস্ত করিবেন, যাহাতে আমাকে এ বিষয়ে আর অধিক কিছু করিতে না হয়।"

(স্বাঃ) **ডি. আর. লায়েল**
কমিশনার।

নং ২২৮৯ / XVI - ২৭ কুমিল্লা — ২২, অক্টোবর

পলিটিক্যাল এজেণ্টের ২৮ আগস্ট তারিখের ৩/c নং পত্রের প্রত্যুত্তরের প্রতিলিপি তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল। তাঁহাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তিনি এই বিষয় পুনরায় মহারাজের নিকট উপস্থাপিত করেন এবং তিন মাস পরে রিপোর্ট করেন যে, সতীদাহ প্রথা নিবারণ সম্বন্ধীয় আইন প্রচারিত হইয়াছে। এবং ত্রিপুর রাজ্যে এই আইন অনুসারে কার্য্য হইবে।

(স্বাঃ) **গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস**
for PI. Agent.

অতঃপর স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরের আদেশমূলে সতীদাহ প্রথা ত্রিপুর রাজ্যে চিরকালের তরে বন্ধ হইয়াছে।

সহমরণ-প্রথা সম্বন্ধে মন্তব্য

সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিবরণ নিতান্ত সংক্ষেপে শেষ করিতে হইল। এ বিষয়ে জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে, এবং ইহার অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। এস্থলে তাহার সম্যক আলোচনা করা অসম্ভব। বৃহস্পতি, অঙ্গিরা, ব্যাস, হারীত ও বিষ্ণু সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে এতদ্বিষয়ক মোটামুটি বিবরণ পাওয়া যাইবে। এই প্রথা ভালই হউক, বা মন্দই হউক, ইহা পবিত্র এবং পুণ্যজনক বলিয়া হিন্দুসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ত্রিপুরা হিন্দুরাজ্য, ত্রিপুরেশ্বরগণ স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক এবং সংরক্ষক। এই কারণেই বৃটিশ ভারতে সতীদাহ বন্ধ হইবার পরেও ষাট বৎসর কাল ত্রিপুরায় তাহা অবাধে চলিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ রাজ্যের ন্যায় এই রাজ্যে বলপ্রয়োগ দ্বারা, প্ররোচনায় বাধ্য করিয়া, কিম্বা স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে কোন সতীকে পতির সহগামিনী করিবার কথা কখনও শুনা যায় নাই। সতীগণ স্বেচ্ছায় এবং বিশেষ আগ্রহের সহিত চিতারোহণ করিতেন।

সহমরণ-প্রথা নিবারক আইন

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে আইন দ্বারা সতীদাহ নিবারণ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রদান করিয়া এতদ্বিষয়ক পরিসমাপ্তি করা যাইতেছে।

REGULATION—XVII OF 1829

I. The Practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is revolting to the feelings of human nature, it is nowhere enjoined by the religion of the Hindus as an imperative duty, on the contrary a life of purity and retirement on the part of the widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practice is not kept up nor observed. In some extensive districts it does not exist. In those in which has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been shocking to the Hindus themselves and in their eyes unlawful and wicked. The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success and the Governor-General in Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether. Actuated by these considerations the Governor-General in Council—without intending to depart from one of the first and most important principles of the system of British Government in India, that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages so long as that system can be adhered to without violation of the paramount dictates of Justice and humanity—has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation throughout the territories immediately subject to the Presidency of Fort William.

II. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindus is hereby declared illegal and punishable by the Criminal Courts.

First. All zemindars, talukdars and other proprietors of land, whether malguzari or lakhiraj all sardar farmers and under-renters of land of every description, all dependent talukdars, all naibs and. other local agents, all native officers employed in the collection of the revenue and rents of lands n the part of Government or the Court of Wards, and all mandals or other headmen of villages are hereby declared especially accountable for the immediate communication to the officers of the nearest Police station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section, and any zemindar or other description of persons above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnish the information above required, shall be liable to be fined by the Magistrate or Joint Magistrate in any sum not exceeding two hundred rupees, and in default of payment to be confined for any period of imprisonment not exceeding six months.

Second. Immediately on receiving intelligence that the sacrifice declared illegal by this Regulation is likely to occur, the Police darogha shall either repair in person to the spot or depute his muharrir or jamader accompanied by one or more barkandazes of the Hindu religion, and it shall be the duty of the Police officers to announce to the persons assembled for the performance of the ceremony that it is illegal, and to endeavour to prevail on them to disperse, explaining to them that in the event of their persisting in it they will involve themselves in a crime and become subject to punishment by the Criminal Courts. Should the parties assembled proceed in defiance of these remonstrances to carry the ceremony into effect, it shall be the duty of the Police officers to use all lawful means in their power to prevent the sacrifice from taking place and to apprehend the principal persons aiding and abetting the performance of it, and in the event of the Police officers being unable to apprehend them they shall endeavour to ascertain their names and places of abode and shall immediately communicate the whole of the particulars to the Magistrate or Joint Magistrate for his orders.

Third. Should intelligence of sacrifice declared illegal by this Regulation not to reach the Police officers until after it shall have actually taken place, or should the sacrifice have been carried into effect before their arrival at the spot, they will nevertheless institute a full enquiry into the circumstances of the case in like manner as on all other occasion of unnatural death, and report them for the information and order of the Magistrate or Joint Magistrate to whom they may be subordinate.

অন্যান্য রাজ্যে যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আইন বা রেগুলেশনের প্রয়োজন হয়, ত্রিপুরায় একমাত্র রাজার বাক্যেই তাহা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এ রাজ্যে সতীদাহ নিবারণের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান কিম্বা আইন প্রণয়ন করিতে হয় নাই। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের এক ক্ষুদ্র রোবকারী মূলেই সেই প্রথা তিরোহিত হইয়াছে। উক্ত রোবকারী নিম্নে প্রদান করা হইল।

(Sd.) B. C. Deb.

রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর। সন ১২৯৯ ত্রিং, তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্ব্বতীয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে সতীদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক। সেমতে —

হুকুম হইল যে, —

এতদ্দ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্য্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়।

(স্বাক্ষর) **শ্রীপ্যারীমোহন রায়,**
মুন্সী।

হস্তী-বিজ্ঞান

রাজমালা দ্বিতীয় লহরের অনেক স্থলেই হস্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শ্বেতহস্তীর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। বন্য হস্তী ত্রিপুরার বিপুল সম্পদ। একমাত্র হস্তীর নিমিত্তই এই রাজ্যের উপর মুসলমানগণের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই তাঁহারা বারম্বার রাজ্য আক্রমণ ও নানাবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন।

হস্তী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। প্রাচীন ঋষিগণ এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এতদ্বিষয়ক অনেক তথ্য অবগত আছেন। তৎসমুদয় অবলম্বনে এস্থলে স্থূল বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরার জঙ্গলে হস্তীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী ছিল। বর্ত্তমানকালেও রাজ্যের প্রায় সকল অঞ্চলেই হস্তী পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বের তুলনায় সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে লোকালয় বৃদ্ধি পাওয়ায়, অনেক স্থলে হস্তীর গমনাগমনের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। হস্তীযূথ জনতার সন্নিকটে বিচরণ করিতে চাহে না। এই কারণে অনেক হস্তী দূরবর্ত্তী গভীর অরণ্যে, কিম্বা রাজ্যের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। হস্তী সংখ্যা হ্রস্ব হইবার ইহা একটী প্রধান কারণ। এতদ্ব্যতীত কুকি, চাখ্মা ও মঘ প্রভৃতি অনেক পার্ব্বত্য জাতি গজদন্ত চুরি করিবার উদ্দেশ্যে এবং মাংস সংগ্রহের নিমিত্ত সুযোগ পাইলেই বড় বড় গুণ্ডা (পুং-হস্তী) বধ করিয়া থাকে। পুং-হস্তীর সংখ্যা সাধারণতঃই কম, তাহা আবার মনুষ্য কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায়, দিন দিনই সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইহা হস্তীবংশ বৃদ্ধির আর এক অন্তরায়।

ভারতের অনেক প্রদেশেই বন্য হস্তী পাওয়া যায়, কিন্তু ত্রিপুরা পর্ব্বতের ন্যায় সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান হস্তী অন্যত্র দুর্ল্লভ। রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলের হস্তী অপেক্ষা উত্তরভাগের হস্তী দীর্ঘজীবী এবং অধিক বলশালী।

হস্তীর স্বভাব অনেক পরিমাণে মানুষের স্বভাবের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই কারণেই প্রাচীন ঋষিগণ মনুষ্য সমাজের ন্যায় হস্তীদিগকেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণাদি দ্বারা তাহা বাছিয়া লইতে হয়। এই চারি জাতীয় হস্তীকে আবার প্রধানতঃ আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তদ্বিবরণ পরে দেওয়া হইবে।

হস্তীসমূহ যূথবদ্ধ হইয়া অবস্থান ও বিচরণ করে। একটী বয়ঃজ্যেষ্ঠা কুনকী (হস্তিনী) দলের নেত্রী হয়, তাহার ইঙ্গিত মতে সমগ্র দল পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থানীয় ভাষায় এই কুনকীকে 'পালমাই' বা 'চরাল কুনকী' বলা হয়। গুণ্ডাগুলি অধিক বলশালী এবং সাহসী হইলেও অসতর্ক এবং অধিকাংশ সময় মদমত্ত অবস্থায় থাকে। বিশেষতঃ দলমধ্যে নূতন বাচ্চা জন্মিলে তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকাই ইহাদের স্বভাব। এই সকল কারণে

প্রায়ই গুণ্ডাকে দলপতি করা হয় না। একদল হইতে অপসারিত হস্তী অন্য দলে সহজে মিলিতে পারে না। সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়।

হস্তীযূথ সর্ব্বদা একস্থানে থাকে না। যে স্থানে প্রচুর পরিমাণে তৃণ পল্লবাদি পাওয়া যায়, অথচ নিকটে জল আছে, সেইস্থানে কিয়ৎকাল বিচরণ করে। সমস্ত দিন আপন আপন ইচ্ছানুরূপ বেড়াইয়া আহার করে, তখন প্রায়ই দল ছাড়িয়া দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়ে। রাত্রিতে কোনও শৃঙ্গদেশে একত্রিত হইয়া, ছোট ছোট বাচ্চাগুলিকে মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে বড় হস্তীগুলি শয়ন করে। ইহারা এত সতর্ক যে, নিদ্রিতাবস্থায় সামান্য শব্দ পাইলেই হঠাৎ জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

অনেক সময় ইহারা পার্ব্বত্য নদী, ছড়া বা হ্রদে দলবদ্ধভাবে নামিয়া স্নান ও জলক্রীড়া করে। তাহাদের বিশাল বপুর অবরোধে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া অনেক সময় নদীর বেগ মৃদু হয়, তখন উপরিভাগের (উজানের) জল স্ফীত হইয়া উঠে এবং উহাদের আলোড়নে নিম্নভাগের (ভাঁটির) জল কর্দ্দমময় হইয়া যায়। অধিক উত্তাপের সময় ইহারা প্রায়ই জলমগ্নাবস্থায় কিম্বা শীতল গুহাস্থিত নীড়িব অরণ্য-ছায়ায় অবস্থান করে। গ্রীষ্মকালে ইহারা দূরবর্ত্তী গভীর পর্ব্বতে চলিয়া যায় এবং শীতের সমাগমে পুনর্ব্বার নামিয়া আইসে।

হস্তীযূথ যে স্থানে আট দশ দিবস অবস্থান করে, সেই স্থান বনজঙ্গল শূন্য হইয়া পড়ে। এক স্থানের আহার্য্য ফুরাইয়া গেলে, তাহারা অন্য স্থানে চলিয়া যায়। স্থান পরিত্যাগের সময় উপস্থিত হইলে 'পালমাই'-এর ইঙ্গিত মতে সকলে একস্থানে মিলিত হয় এবং পর পর ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পালমাই-এর পশ্চাদনুসরণ করে। দলের প্রধান গুণ্ডাটী প্রায়ই সকলের পেছনে থাকে। স্থানত্যাগের কালে, সদ্য-প্রসূত বাচ্চা লইয়া কোন হস্তিনী দলের অনুসরণে অসমর্থা হইলে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রহরীরূপে তিন চারিটী হস্তিনী পেছনে রাখিয়া অবশিষ্ট দল সুবিধাজনক স্থানে চলিয়া যায়। পেছনের দল, বাচ্চা সহ ধীরে ধীরে চলিয়া দুই তিন দিন পরে যাইয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয়।

রামকলা, তারা, ডুমুরগাছ এবং মুলিবাঁশের করুল (কচিবাঁশ) হস্তীর প্রিয় খাদ্য। এতদ্ব্যতীত প্রায় সকল জাতীয় তৃণ পল্লবই ইহারা আহার করে। পদ্মের মৃণাল এবং কৎবেল ইহাদের উপাদেয় খাদ্য।

হস্তীযূথ সাধারণতঃ এক পথেই সর্ব্বদা যাতায়াত করে। তাহাদের গমনাগমনের পথ পঁচিশ ত্রিশ হস্ত পরিসর বিশিষ্ট এবং রেলপথের ন্যায় সোজা হয়। স্থানীয় ভাষায় এই রাস্তাকে 'দোয়াল' বলে। জন-মানব শূন্য নীবিড় অরণ্যে হস্তীর দোয়াল ব্যতীত অন্য পথ নাই। সেখানে মনুষ্য গমন করিলে এই পথ অবলম্বনেই চলাফিরা করিতে হয়। ইহাতে প্রতি পাদক্ষেপে হস্তীযূথের সম্মুখে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে।

হস্তীর আসক্তিও কিয়ৎপরিমাণে মনুষ্যেরই অনুরূপ। দলস্থ কতিপয় নির্দ্দিষ্ট কুনকীর প্রতি কে একটী গুণ্ডা আসক্ত থাকে। এবং তাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা বিচরণ করিতে ভালবাসে। অন্য কুনকীকে বড় পছন্দ করে না। হস্তিনী ঋতুমতী না হইলে কখনও গুণ্ডার সহিত সঙ্গতা হয় না।

হস্তিনী প্রতিবারে এক একটী বাচ্চা প্রসব করে, কদাচিৎ যমজ সন্তান প্রসব করিতে দেখা যায়। ইহারা সাধারণতঃ ২৪ মাস গর্ব্ভধারণের পর পুং-বাচ্চা এবং ১৮ মাসের পর স্ত্রী-বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে এই নিয়মের সামান্য ব্যত্যয় ঘটিতেও দেখা যায়। হস্তিনী একবার প্রসব করিবার পর একবৎসর মধ্যেই পুনর্ব্বার গর্ব্ভধারণ করে। হস্তিনীগণ সাধারণতঃ ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রথম গর্ব্ভধারণের যোগ্যা হয়। হস্তিনীর গর্ব্ভ ও স্তন ঠিক মানুষের মত। পশুমধ্যে হস্তীর সন্তান বাৎসল্য অতুলনীয়। কোন দলে এক বা একাধিক নূতন বাচ্চা প্রসূত হইলে, তাহারা গুণ্ডা কর্ত্তৃক বিনষ্ট না হয়, দলস্থ সমস্ত হস্তিনীর সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকে। শাবকের আশঙ্কাজনক সময় অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির গুণ্ডাগুলিকে দলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। প্রবেশ করিতে চাহিলেই সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দেয়। এতদবস্থাপন্ন গুণ্ডাগুলি কিছু দূরে দূরে থাকিয়া দলের অনুসরণ করে।

সন্তান মরিলে কিম্বা কোন কারণে যূথভ্রষ্ট হইলে মাতা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় চীৎকার করে এবং অরণ্যময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। সন্তানদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইহারা ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করে। এরূপ সংগ্রামকালে বাচ্চাটীকে বুকের নীচে রাখে এবং হিংস্র জন্তুটী ঘুরিয়া ফিরিয়া যে দিক হইতে আক্রমণ করে, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া শুণ্ড, দন্ত এবং পদ সাহায্যে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করে, এই সময় হস্তিনী মুহুর্ম্মুহুঃ চীৎকার করিতে থাকে। প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সুযোগ পাইলে তাহাতেও ত্রুটী করে না। এই সময় হস্তীশিশু জননীর বক্ষতল ত্যাগ করিয়া কিছুতেই বাহির হয় না। দলের অন্যান্য হস্তী নিকটে থাকিলে তাহারাও আসিয়া সাহায্য করে। একাধিক হস্তী দেখিলে ব্যাঘ্র আপনা হইতেই পলায়ন করে। অনেক সময় বাচ্চার লোভ ব্যতীতও ব্যাঘ্রগণ হস্তীকে আক্রমণ করে এবং কোন কোন অবস্থায় হস্তী কর্ত্তৃক নিহতও হয়।

দৈবাৎ কোন শাবক দলছাড়া হইলে তাহা ধরিয়া খাইবার আশায় বৃহদাকারের দুই একটী ব্যাঘ্র প্রায়ই হস্তীযূথের পশ্চাদনুসরণ করে। গণ্ডারেরা হস্তীর মল ভক্ষণ করিতে ভালবাসে, এজন্য কোন কোন সময় হস্তীদলের সঙ্গে দুই একটী গণ্ডার থাকিতেও দেখা যায়।

এক কুনকীর বাচ্চা অন্য কুনকী কর্ত্তৃক পালিত হইতে সচরাচরই দেখা যায়। উহারা পালিত বাচ্চাকে আপন সন্তানের ন্যায় ভালবাসে এবং সর্ব্বদা সযত্নে রক্ষা করে। বাচ্চাও মায়ের সঙ্গ ছাড়িয়া সর্ব্বদা পালনকর্ত্রীর সঙ্গেই থাকে, দুগ্ধপানের

সময় ব্যতীত মায়ের কাছে যায় না। বাচ্চাটী পালয়ত্রীর দৃষ্টির অন্তরালে গেলে, সে মায়ের মত ব্যস্তভাবে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহা ঠিক মানব সমাজের ধাত্রীর অনুরূপ কার্য্য বলা যাইতে পারে।

প্রত্যেক কুনকী আপন আপন বংশবল্লী লইয়া একত্রে থাকে। মানব সমাজ যেমন এক বাড়ীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহে পরিবারস্থ পুত্র কন্যাদি লইয়া পৃথক পৃথক ভাবে বাস করে, ইহারাও তদ্রূপ এক দলের মধ্যেই আপন আপন সন্তান-সন্ততি লইয়া একটু স্বতন্ত্রভাবে থাকে। এই অবস্থায় অতি সহজ দৃষ্টিতেই বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

হস্তীর প্রত্যেক দলে বিশ পঁচিশটী হইতে, শতাধিক পর্য্যন্ত সংখ্যা দৃষ্ট হয়। দলের মধ্যে একাধিক দুষ্ট প্রকৃতির গুণ্ডা থাকিলে সর্ব্বদাই তাহাদের পরস্পরে কলহ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয়ের মধ্যে যে হস্তীটী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, সে অনবরত মাইর খাইয়া দল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই শ্রেণীর বিতাড়িত কতিপয় গুণ্ডা একত্রিত হইয়া এক একটী ক্ষুদ্র দল গঠন করে। স্থানীয় ভাষায় এই দলকে 'ফাটুয়া দল' বলে।

হস্তীসমূহের উচ্চতানুসারে দেশভেদে নানাবিধ আখ্যা প্রদান করা হয়। ত্রিপুর রাজ্যে ইহার যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুংহস্তী সম্বন্ধে ঃ— দুগ্ধ পানের অবস্থা পর্য্যন্ত 'বাচ্চা' বলা হয়। দুগ্ধ ছাড়িবার পর, ৭ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হস্তী 'মিয়ানা' এবং তদূর্দ্ধ উচ্চতা বিশিষ্ট হস্তী 'গুণ্ডা' বা 'দাঁতাল' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পুংহস্তীর মধ্যে যে হস্তীর দন্তদ্বয় বাহির হয় না, তাহাকে 'মক্না' বলে।

হস্তিনী সম্বন্ধে ঃ— বাচ্চা অবস্থা উত্তীর্ণের পর ৭ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হস্তিনী 'মিয়ানী' এবং তদূর্দ্ধ উচ্চ হস্তিনীকে 'কুন্‌কী' বলে। সাধারণতঃ হস্তিনীগণ প্রথম গর্ব্ভধারণ না করা পর্য্যন্ত মিয়ানী শ্রেণীভুক্ত।

প্রাদেশিক প্রথানুসারে হস্তীর মস্তক, কর্ণ, চক্ষু, শুণ্ড, দন্ত, নখ ও পুচ্ছ ইত্যাদির লক্ষণানুসারে হস্তী শুভ কি অশুভ লক্ষণাক্রান্ত তাহা নির্ণয় করা হয়। প্রাচীন ঋষিগণও হস্তীর লক্ষণাদি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, অতঃপর তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইবে।

হস্তীর দন্ত বিশেষ মূল্যবান এবং তদ্দ্বারা নানাবিধ বিলাস দ্রব্য, খেলনা, উপবেশনের আসন এবং পাটী নির্ম্মিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে গজদন্তদ্বারা অনেক বস্তু নির্ম্মিত হইয়া থাকে। হস্তীর অস্থিও কাজে লাগে, কিন্তু তাহা দন্তের ন্যায় মূল্যবান বা দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে।

ত্রিপুরার গজদন্তে একমাত্র রাজার অধিকার, তাহা অন্যে গ্রহণ করিলে আইন অনুসারে দণ্ডার্হ হয়। এরূপ আইন প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও অনেকে নীবিড় অরণ্য মধ্যে গোপনে হস্তী বধ করিয়া দন্ত চুরি করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

গজমুক্তা নিতান্ত দুর্ল্লভ এবং মূল্যবান বস্তু। পুংহস্তীর শুণ্ডের দুই পার্শ্ব দিয়া যে দুইটী বৃহৎ দন্ত নির্গত হয়, তাহার কোন কোন দন্তের অভ্যন্তরে মুক্তা জন্মিয়া থাকে। দন্ত চিড়িলে তাহা পাওয়া যায়। হস্তিনীর দন্তে মুক্ত জন্মে না।

হস্তী সম্বন্ধীয় প্রাদেশিক বিবরণ মোটামুটিভাবে প্রদান করা গেল। এতদ্বিষয়ে বলিবার আরও অনেক কথা থাকিলেও বাহুল্য ভয়ে তাহা বর্জ্জন করিতে হইল।

প্রাচীন ঋষিগণ হস্তী সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার স্থূল বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে। সাধারণতঃ অগ্নি পুরাণ, গরুড় পুরাণ, নন্দি পুরাণ, কালিকা পুরাণ, ব্রহ্ম পুরাণ, হরিবংশ, পরাশর সংহিতা, বৃহস্পতি সংহিতা, গার্গ্য সংহিতা, বৃহৎ সংহিতা, বসন্তরাজ শাকুন, যুক্তিকল্পতরু, কবিকল্পলতা, বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর, শুদ্ধিতত্ত্বম্, রাজ নির্ঘণ্ট প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থেই অল্পাধিক পরিমাণে হস্তী সম্বন্ধীয় নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিবরণ পাওয়া যায়। তাহার সম্যক আলোচনা করা সম্ভবপর নহে ; মোটামুটি বিবরণ প্রদান করা হইবে মাত্র।

ঋষিগণ হস্তীদিগকে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিতে বিভক্ত করিবার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন, —

"ব্রহ্মাদি জাতিভেদেন তেষাং ভেদ চতুর্ব্বিধঃ।
বিশালাঙ্গাঃ পবিত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ স্বল্প ভোজিনঃ।
শূরা বিশালা বহ্বাশাঃ ক্রুদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।।"

পরাশর।

যে হস্তী বিশাল নহে, পবিত্র এবং অল্পভোজী, সে ব্রাহ্মণ জাতীয়। ক্ষত্রিয় জাতীয় হস্তী বলিষ্ঠ, বিশালকায় এবং ক্রুদ্ধ স্বভাবাপন্ন হইয়া থাকে। বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় হস্তী মিশ্রলক্ষণাক্রান্ত হয়। এই সকল জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হস্তী স্বতন্ত্র আখ্যা লাভ করিয়া থাকে ; যথা, —

"এক জাতি সমুৎপন্নো গজঃ শুদ্ধ ইতিস্মৃতঃ।
লক্ষণঞ্চ যথা প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চতত্র দৃশ্যতে।।
শুদ্ধ দ্বিজাতি সম্ভূতস্তল্লক্ষণ সমন্বিতঃ।
জারজো নাম বিখ্যাতো যথাস্বং বলবীর্য্যবান্।।
দ্বিজাতিদ্বয় জাতো যঃ স শূর ইতি কথ্যতে।
দ্বিজাতি জারজোৎপন্ন উদ্দান্ত ইতি কথ্যতে।।
এবং সংযোগ ভেদেন গজ জাতিরনেকধা।
তাং যো জানাতি তত্ত্বেন স রাজ্ঞঃ পাত্রমর্হতি।।"

পরাশর।

এক জাতীয় পিতা ও মাতা হইতে উৎপন্ন হস্তীকে শুদ্ধ বলে। শাস্ত্রোক্ত উৎকৃষ্ট লক্ষণসমূহ শুদ্ধ হস্তীতে বিদ্যমান থাকিবে। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ জাতীয় হস্তী হইতে উৎপন্ন, অথচ ব্রাহ্মণ জাতীয় হস্তীর লক্ষণযুক্ত ও বীর্য্যবান্ হস্তীকে জারজ বলে। দুইটী দ্বিজাতীয় হস্তী হইতে উৎপন্ন হস্তী শূর

বলিয়া কথিত হয়। ব্রাহ্মণ জাতীয় ও জারজ হইতে সমুদ্ভূত হস্তীকে উদ্দান্ত বলে। এইরূপ পরস্পরের সংমিশ্রণে অনেক জাতীয় হস্তীর উৎপত্তি হয়। যিনি হস্তী জাতির এই সকল ভেদ সম্যকভাবে অবগত আছেন, তিনি রাজার অমাত্য পদ লাভের যোগ্য।

গজসমূহ অষ্টদিগ্‌গজের বংশধর বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক ঘোষিত এবং তদ্ধেতু ইহাদিগকে আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা, —

"গজানামষ্টধাভেদাঃ সংক্ষেপেন প্রকাশ্যতে।
ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুদোহঞ্জনঃ।।
পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ।
এষাং বংশ প্রসূতত্বাৎ গজানামষ্টজাতয়ঃ।।"

ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক, ইহারা দিগ্‌গজ নামে বিখ্যাত। ইহাদের বংশপ্রসূত গজসমূহ আট জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। শাস্ত্র গ্রন্থসমূহে পূর্ব্বোক্ত অষ্টদিগ্‌গজের লক্ষণ নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"যে কুঞ্জরাঃ পাণ্ডর সর্ব্বদেহাঃ সুদীর্ঘ দন্তাঃ সিতপুষ্পদন্তা।
অলোমশা অল্পভুজো বলাঢ্যা মহাপ্রমাণা লঘুপুষ্ট লিঙ্গাঃ।।
ক্রুদ্ধাঃ সমীকে মৃদবোহন্যকালে লঘবম্বুপানা বহুলো প্রদানাঃ।
বিস্তীর্ণ দানাস্তনুলোমপুচ্ছা ঐরাবতস্যাভিজন প্রসূতাঃ।।
তেষেব সর্ব্বেষু বিশুদ্ধবর্ণা অতীব বৃত্তাঃ প্রভবন্তি মুক্তাঃ।
নাল্পেন পুণ্যেন মহীপতিনাং স্পৃশন্তি ভূমণ্ডল-মধ্যমেতে।
দন্তা বিভগ্না অপিযুদ্ধরঙ্গে পুনঃ প্ররোহন্তি পুরৈব তেষাম্‌।।"

যে হস্তী শুভ্রবর্ণ, সুদীর্ঘ ও পুষ্পদন্তা, লোমশূন্য, অল্পভোজী, বলবান্‌, বৃহৎ অবয়ব, ক্ষুদ্র অথচ পুষ্ট লিঙ্গবিশিষ্ট, যুদ্ধকালে কোপনস্বভাব এবং অন্য সময়ে নম্র, অল্প জলপায়ী, শরীর ও পুচ্ছ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, যাহার শরীর হইতে প্রভূত মদস্রাব হয়, সেই হস্তীই ঐরাবত বংশীয়। এতজ্জাতীয় হস্তীতে বিশুদ্ধ বর্ণযুক্ত এবং সুগোল মুক্তা উৎপন্ন হয়। ইহারা রাজগণের অল্পপুণ্যে ভূমণ্ডল স্পর্শ করে না। যুদ্ধহেতু ইহাদের দন্ত ভগ্ন হইলেও পুনর্ব্বার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতজ্জাতীয় হস্তীকেই সাধারণতঃ শ্বেতহস্তী বলা হয়।

"যে কুঞ্জরা কোমল সর্ব্বদেহাঃ পুচ্ছা ন দণ্ডাঃ খর গণ্ডদেশাঃ।
স্রবন্মদাঃ সন্ততরোষ ভাজোহমর প্রিয়াঃ সর্ব্বভুজো বলাঢ্যাঃ।।
সুতীক্ষ্ণদন্তা রসনা গজানাং তে পুণ্ডরীকঃ প্রবর প্রসূতাঃ।
তে পদ্মগন্ধং বিসৃজন্তি রেতো দানঞ্চ নৈষাং বমথুঃং প্রভৃতা।।
ন তোয় পানেহভ্যধিকা স্পৃহা চ শ্রমেহপি নৈতে বল মুৎসৃজন্তি।
অমীতু যেষাং নিবসন্তি রাজ্ঞাং তে বৈ সমস্ত ক্ষিতি শাসনার্হাঃ।।"

যে হস্তীর সর্ব্বাঙ্গ কোমল, পুচ্ছ দণ্ডাকৃতি নহে, গণ্ডদেশ খর, সতত মদস্রাবী ও ক্রুদ্ধ, দেবপ্রিয়, সর্ব্বভুক, বলবান এবং যাহার দন্ত ও জিহ্বা অতিশয় তীক্ষ্ণ, সেই হস্তী পুণ্ডরীকের

বংশোদ্ভব। ইহাদের রেত পদ্মগন্ধ বিশিষ্ট এবং মদস্রাব ও বমন অধিক হয় না। ইহাদের জলপানের স্পৃহা অধিক নহে, এবং ইহারা শ্রমে ক্লান্ত হয় না। এই হস্তী যে রাজার গৃহে থাকে, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসনের যোগ্য হন।

"যে কুঞ্জরাঃ কর্কশ খর্ব্বদেহাঃ কদাপি মাদ্যন্তি গলন্মদাশ্চ।
আহার যোগাদ্বলবীর্য্য ভাজোনাত্যম্বুকামা বহু লোম গণ্ডাঃ।
বিরূপদন্তাস্তনু পুচ্ছ কর্ণা জ্ঞেয়া বুধৈর্ব্বামন বংশ জাতাঃ।।"

যে হস্তীর দেহ কর্কশ ও খর্ব্ব, যাহারা কখন কখন উন্মত্ত হয়, সর্ব্বদা মদস্রাব করে, আহারের দ্বারা বল ও বীর্য্যবান হয়, যাহারা অধিক জলপানে ইচ্ছুক নহে, যাহার গণ্ডস্থল অধিক লোমযুক্ত, দন্তদ্বয় কুৎসিত, দেহ, পুচ্ছ এবং কর্ণ বিরূপ, পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে বামন বংশজাত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

"যে দীর্ঘ দেহাস্তনু দীর্ঘ শুণ্ডাঃ কুদন্ত ভাজো মলপূর্ণ দেহাঃ।
স্থবিষ্ঠ গণ্ডাঃ কলহপ্রিয়াশ্চ তে কুঞ্জরা স্যুঃ কুমুদস্য বংশাঃ।
অন্যদ্বিপান দর্শনমাত্র তন্ত নিঘ্নন্তিতে দুর্গমনাশ্চ পুং সাম্।।"

যাহার দেহ ও শুণ্ড দীর্ঘ, দন্তদ্বয় কুৎসিত, শরীর সতত মলযুক্ত, গণ্ডদ্বয় স্থূল, যাহারা কলহ প্রিয়, তাহারা কুমুদবংশজাত। ইহারা অন্য হস্তী দেখিলেই বধ করে। ইহাদের নিকট মনুষ্য সহজে অগ্রসর হইতে পারে না।

"যে স্নিগ্ধ দেহাঃ সলিলাভিলাষা মহা প্রমাণাস্তনু শুণ্ড দন্তাঃ।
স্থবিষ্ঠ দন্তাঃ শ্রমদুঃসহাশ্চ তে কুঞ্জরাশ্চাঞ্জন বংশ জাতাঃ।।"

যে হস্তীর স্নিগ্ধ দেহ, জলপানে অত্যন্ত অভিলাষী, যাহার দেহ সুবৃহৎ, যাহার দন্ত ও শুণ্ড ছোট, দন্তদ্বয় স্থূল এবং শ্রমকষ্ট সহ্য করিতে পটু, তাহারা অঞ্জন বংশসম্ভূত।

"রেতশ্চ দানঞ্চ সৃজন্তি শশ্বদানূপদেশে প্রভবন্তি যে তু।
তে পুষ্পদন্তাভিজন প্রসূতা মহা জবাস্তে তনু পুচ্ছ ভাগাঃ।।"

যে হস্তী সর্ব্বদা মদজল ও রেতঃ পরিত্যাগ করে, যাহারা অনূপদেশে উৎপন্ন, যাহাদের পুচ্ছ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বেগ অতি তীব্র, সেই হস্তী পুষ্পদন্ত বংশজাত।

"সুদীর্ঘ দন্তা বহু লোমভাজো মহাপ্রমাণাশ্চ সুকর্ক্কশাঙ্গাঃ।
ভ্রাম্যন্তি নাধ্ব ভ্রমণাভিযোগান্নাহার পানাদিষু চাতি শক্তিঃ।।
মরু প্রদেশে বিচরন্তি তে বৈ মুক্তা ফলানামিহ জন্ম মধ্যে।
মহাশরীরাতিসুকর্ক্কশাঙ্গা নারিষ্ট দন্তা মৃদু শুক্ল দন্তাঃ।।
মহাশনাঃ ক্ষীণ পুরীষমূত্র বিস্তীর্ণ কর্ণাস্তনু রোমগণ্ডা।
তে সার্ব্বভৌমাভিজন প্রসূতা বিশুদ্ধ মুক্তাঃ প্রভবন্তি চৈষু।।"

যাহারা দন্ত সুদীর্ঘ, যে হস্তী বহু লোমযুক্ত, বৃহদাকার, কর্কশ অঙ্গবিশিষ্ট, ভ্রমণে অক্লান্ত, আহার ও পানে অতিশয় পটু, মরুভূমিতে বিচরণ করিতে ইচ্ছুক, যাহার দেহ কর্কশ ও সুবৃহৎ, দন্তদ্বয় দীর্ঘ, কোমল ও শুক্লবর্ণ, অধিক ভোজী, কিন্তু মল ও মূত্র অল্প ত্যাগ করে, কর্ণ বিস্তীর্ণ,

গণ্ডদেশ ও রোমাবলী ক্ষীণ, তাহারাই সার্ব্বভৌম দিগ্‌গজের বংশ। এতজ্জাতীয় হস্তীতে বিশুদ্ধ মুক্তা উৎপন্ন হয়।

"যে দীর্ঘশুণ্ডাঃ সুবিভক্ত দেহাঃ মহাজবাঃ ক্রোধ পরীতকাশ্চ।
বিস্তব্ধকর্ণাস্তনুপুচ্ছদন্তাঃ সদাশনাশ্চৈব বশাপ্রিয়াশ্চ।।
প্রবৃদ্ধ গণ্ডাস্তনু লোমযুক্তাঃ স্তে সুপ্রতীক প্রবর প্রসূতাঃ।
মহাপ্রমাণামিতমৌক্তিকানি ভবন্তি চৈতন্নিজগাদ কাপ্যঃ।।"

যাহাদের শুণ্ড দীর্ঘ, দেহ সুবিভক্ত, বেগ প্রচণ্ড, যাহারা ক্রোধী, যে হস্তীর কর্ণদ্বয় সর্ব্বদা স্তব্ধ থাকে, পুচ্ছ ও দন্ত ক্ষীণ, সর্ব্বদা ভক্ষণাভিলাষী, হস্তিনীপ্রিয়, গণ্ডদেশ বৃহৎ, গাত্র অধিক লোমযুক্ত, তাহারা সুপ্রতীক বংশসম্ভূত। এই সকল হস্তীতে বৃহদাকারের মুক্তা পাওয়া যায়।

এই গেল অষ্টদিগ্‌গজের বংশ বিবরণ। বৃহৎ সংহিতা প্রণেতা বরাহমিহির আবার হস্তীদিগকে মোটামুটীভাবে চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়াছেন, — ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও মিশ্র। হেমচন্দ্রও তাহাই বলিয়াছেন,—

"ভদ্রোমন্দ্রোমৃগোমিশ্রশ্চতস্রোগজ জায়তঃ।"

যে হস্তীর হস্ত মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুবিভক্ত, দেহ নাতিস্থূল ও নাতিকৃশ, অথচ অতিশয় বলশালী, মেরুদণ্ড ধনুকের ন্যায় বাঁকা, জঘনভাগ শূকর সদৃশ, তাহাই ভদ্র জাতীয় হস্তী।

যাহারা বক্ষঃস্থল ও কক্ষদেশ শিথিল, উদর দীর্ঘ, গলদেশ বৃহৎ, চর্ম্ম পুরু, পেট ও পুচ্ছমূল স্থূল, চক্ষুদ্বয় সিংহের অনুরূপ, তাহাকে মন্দ্র হস্তী বলে।

যাহার অধর, লাঙ্গুল ও লিঙ্গ খর্ব্বাকৃতি, গলদেশ, দন্ত, শুণ্ড, কর্ম্ম ও পদচতুষ্টয় অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং চক্ষুদ্বয় স্থূল, তাহা মৃগ জাতীয় হস্তী।

যে সকল হস্তী মিশ্রলক্ষণ বিশিষ্ট, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুই জাতীয় হস্তীর লক্ষণ যাহাতে পরিলক্ষিত হয়, তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণ বা সঞ্চয় জাতীয় হস্তী বলা হয়।

ইহার প্রত্যেক জাতীয় হস্তীর উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, শরীরের পরিধি এবং মদ-জলের বর্ণ ইত্যাদি নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করা হইল।

বরাহমিহির, পরাশর, গার্গ্য এবং ভোজরাজ প্রভৃতির গ্রন্থে হস্তীর লক্ষণাদি পরীক্ষা সম্বন্ধীয় নানাবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরুর মতই অধিকতর প্রশস্ত। প্রয়োজন বোধে তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

উত্তম হস্তী

"রম্যো ভীমো ধ্বজোহধীরো বীরঃ শূরোহষ্টমঙ্গলঃ।
সুন্দরঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ স্থিরো গম্ভীর বেদ্যপিয
বরারোহ ইতিপ্রোক্তা গজা দ্বাদশ সপ্তমাঃ।।"

রম্য, ভীম, ধ্বজ, অধীর, বীর, শূর, অষ্টমঙ্গল, সুন্দর, সর্ব্বতোভদ্র, স্থির, গম্ভীরবেদী ও

বরারোহ, এই দ্বাদশবিধ হস্তীকে আর্য্য ঋষিগণ উৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

"বিভক্তাবয়বঃ পুষ্টঃ সুদন্তঃ সুমহানপি।
তেজস্বী রম্য ইত্যুক্তো গজঃ সম্পত্তিবর্দ্ধক।।"

যে হস্তীর অঙ্গ সুবিভক্ত এবং পুষ্ট, দন্ত সুন্দর, দেহ বৃহৎ এবং তেজস্বিতাপূর্ণ তাহা রম্য হস্তী। এই সকল হস্তী প্রভুর সম্পত্তি বর্দ্ধক।

"অঙ্কুশাদি প্রহারেণ যস্য ভীতির্নজায়তে।
স ভীমোহয়ং গজঃ শুদ্ধো রাজ্ঞঃ সর্ব্বার্থসাধনঃ।।"

যে হস্তী অঙ্কুশাদির প্রহারে ভীত হয় না এবং শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত তাহাকে ভীম বলে। ইহারা রাজার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি করে।

"শুণ্ডাগ্রাৎ পুচ্ছপর্য্যন্তং রেখা যস্যৈব দৃশ্যতে।
ধ্বজঃ শুদ্ধো গজো নাম সাম্রাজ্য প্রাণদায়কঃ।।"

যে হস্তীর শুঁড় হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত একটী রেখা লক্ষিত হয়, সেই শুদ্ধ-লক্ষণাক্রান্ত হস্তীকে ধ্বজ বলে। ইহারা সাম্রাজ্য ও দীর্ঘায়ুদায়ক।

"সমৌ কুম্ভৌ খরাকারৌ আবর্ত্তৌ তত্র চোচ্ছ্রয়ৌ।
অধীরোহয়ং গজো নাম্না রাজ্ঞাং বিপ্র বিনাশনঃ।।"

যাহার কুম্ভদ্বয় পরস্পর সমান, দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, দেহ আবর্ত্তবিশিষ্ট এবং আবর্ত্ত স্থান উন্নত, তাহাকে অধীর বলে। এই হস্তী রাজগণের অমঙ্গলকারী।

"আবর্ত্তঃ প্রষ্ঠতো যস্য স্বনাভিমভিবিন্দতি।
পুষ্টাঙ্গো বলবান্ বীরো রাজ্ঞামভিমত প্রদঃ।।"

যে হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত আবর্ত্ত থাকে, দেহ পুষ্ট এবং বলশালী তাহাকে বীর বলে। এই হস্তী রাজগণের অভিলষিত বিষয়ে সিদ্ধি প্রদান করে।

"মহাপ্রমাণঃ পুষ্টাঙ্গঃ সুদন্তশ্চারুগণ্ডকঃ।
ভক্ষণে ভক্ষণে শ্রান্তঃ শূরো লক্ষ্মীবিবর্দ্ধণঃ।।"

যে হস্তী বৃহদাকার বিশিষ্ট, দেহ পুষ্ট, দন্ত ও গণ্ডস্থল সুন্দর, আহার করিলে পরিশ্রান্ত হয়, সেই হস্তীকে শূর বলে। এই হস্তীর দ্বারা রাজলক্ষ্মীর বৃদ্ধি হয়।

"সিতৌ দন্তৌ সিতঃ পুচ্ছঃ সিতারেখা সিতানখাঃ।
রক্ত কুম্ভাক্ষিবীর্য্যাঙ্গৈ বিজ্ঞেয়ঃ সোহষ্টমঙ্গলঃ।।
অয়ং গজেন্দ্রো যস্যাস্তে তস্য স্যাৎ সকলা মহী।
নারিষ্টানীতয়স্তত্র যত্রাস্তেহয়ং গজেশ্বরঃ।।
আয়োজনশতং যাবদনর্থং কুরুতে ক্ষয়ম্।
নাল্প পুণ্যৈরয়ং প্রাপ্যো মনুজেন্দ্রৈঃ কলৌযুগে।।"

যাহার দন্তদ্বয়, পুচ্ছ এবং নখ শুভ্রবর্ণ এবং শরীর শ্বেতবর্ণ রেখাবিশিষ্ট, যাহার কুম্ভ, চক্ষু ও পুংচিহ্ন রক্তবর্ণ, সেই হস্তী অষ্টমল। এই হস্তী যাঁহার গৃহে থাকে। তিনি সমগ্র পৃথিবীর

অধীশ্বর হইতে পারেন। এই হস্তীর বাসস্থানে অরিষ্ট বা অনীতি থাকে না এবং সেই স্থান হইতে শত যোজন পর্য্যন্ত অমঙ্গল নষ্ট করে। কলিযুগে রাজগণের পুণ্যের অল্পতাহেতু অষ্টমঙ্গল হস্তী দেখা যায় না।

অন্য পাঁচ জাতীয় উৎকৃষ্ট হস্তীর লক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। রাজন্যবর্গের সুখকর হস্তীর লক্ষণ এই, —

"শুভৌ দন্তৌ শুভঃ শুণ্ডঃ শুভৌ কুম্ভৌ শুভস্তনুঃ।
গণ্ডয়োর্গণ্ডয়োর্মধ্যে আবর্ত্তঃ শুভলক্ষণঃ।।
শশ্বন্মদস্রুতি পরিপ্লুত গণ্ডদেশাস্তীক্ষ্ণাঙ্কুশেন বিনিবারয়িতুং ন শক্যাঃ।
জ্ঞাতিদ্বিষো নবপয়োদরবা গভীরাঃ পৃথ্বীভুজাঃ সকলসৌখ্যকরা ভবন্তি।।"

যে হস্তীর দন্তদ্বয়, শুণ্ড, কুম্ভদ্বয়, দেহ ও গণ্ডমধ্যে বা গণ্ডদ্বয়ে আবর্ত্ত থাকে, সেই হস্তী শুভলক্ষণাক্রান্ত। যে হস্তীর গণ্ডদেশ সর্ব্বদা মদস্রাবে আপ্লুত থাকে, তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ প্রহারেও যাহাকে নিবারণ করা কষ্টসাধ্য, যাহারা অপর হস্তী দেখিলে ক্রুদ্ধ হয়, যাহাদের রব জলদগম্ভীর, সেই সকল হস্তী রাজাদিগের সুখকর হইয়া থাকে।

।। দুষ্ট হস্তী ।।

দোষযুক্ত হস্তীদিগকে শাস্ত্রকারগণ বিংশতিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা ;—

"দীনঃক্ষীণোহথ বিষমো বিরূপো বিকলঃ খরঃ।
বিমদো ধ্যাপকঃ কাকো ধূম্রো জটিল ইত্যপি।।
অজিনী মণ্ডলী শ্বিত্রী হতাবর্ত্তো মহাভয়ঃ।
রাষ্ট্রহা মূষলীভালী নিঃসত্ত্ব ইতিবিংশতি।।
মহাদোষাঃ সমাখ্যাতা গজানাং ভোজভূভুজা।।"

(১) দীন, (২) ক্ষীণ, (৩) বিষম, (৪) বিরূপ, (৫) বিকল, (৬) খর, (৭) বিমদ, (৮) ধ্যাপক, (৯) কাক, (১০) ধূম্র, (১১) জটিল, (১২) অজিনী, (১৩) মণ্ডলী, (১৪) শ্বিত্রী, (১৫) হতাবর্ত্ত, (১৬) মহাভয়, (১৭) রাষ্ট্রহা, (১৮) মূষলী, (১৯) ভালী, (২০) নিঃসত্ত্ব এই বিংশতি প্রকারের হস্তী মহা দোষযুক্ত।

ইহার প্রত্যেক প্রকারের লক্ষণ ও দোষ নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

"অতিক্ষীণতরঃ ক্ষীণতনু দন্তোহতি নিষ্প্রভঃ।
দীনাখ্যঃ কুরুতে দীনং ভূভুজং নাত্র সংশয়ঃ।। ১"

যাহার দেহ অতিশয় ক্ষীণ, দন্তদ্বয় ক্ষীণ এবং নিষ্প্রভ, সেই হস্তীকে দীন বলে। এই হস্তী গৃহে রাখিলে রাজাকে দরিদ্র হইতে হয়।

"খর্ব্বশুণ্ডো মহাপুচ্ছো নিশ্বাসো বেগবর্জ্জিতঃ।
ক্ষীণোহয়ং কুরুতে ক্ষীণং স্বামিনং সম্পদা।। ২"

যাহার শুণ্ড খর্ব্ব, পুচ্ছ বৃহৎ, নিশ্বাসের বেগ মৃদু, তাহাকে ক্ষীণ বলে। এই হস্তী স্বামীর ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করে।

"কুম্ভে দন্তেহক্ষিকর্ণে চ বৈষম্যং পার্শ্বয়োস্তথা।
যস্যায়ং বিষমো নাগো নাগবৎ কুরুতে ক্ষয়ম্।। ৩"

যাহার কুম্ভ, দন্ত, চক্ষু, কর্ণ কিম্বা পার্শ্বদ্বয় পরস্পর অসমান, তাহাকে বিষমহস্তী বলে। ইহা সর্পবৎ ক্ষয়কারী।

"আস্কন্ধাত্তু শিরঃ ক্ষীণং পশ্চাদ্ভাগস্য পুষ্টতা।
বিরূপ ইতি নাগোহয়ং কুরুতে ভূধনক্ষয়ম্।। ৪"

যাহার স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ক্ষীণ এবং পশ্চাৎভাগ স্থূল, তাহাকে বিরূপ হস্তী বলে। এই হস্তী দ্বারা রাজার রাজ্য ও ধনক্ষয় হয়।

"নানাভোগৈরপি কৃতৈর্যস্য নো জায়তে মদঃ।
যুদ্ধায় নোপক্রমতে বিকলং তং বিবর্জ্জয়েৎ।। ৫।।"

বহুবিধ ভোগেও যাহার মদক্ষরণ হয় না, যে হস্তী যুদ্ধকালে বল প্রকাশ করে না, সেই হস্তীকে বিকল বলে। এবম্বিধ হস্তীকে বর্জ্জন করা উচিত।

"খরতা সহজা যস্য শরীরেহস্তীতি লক্ষ্যতে।
তনু দন্ত করো হস্তী খরঃ কুলবিনাশনঃ।। ৬।।"

যে হস্তীর শরীর স্বভাবতঃ খরতা বলিয়া বোধ হয়, যাহার দন্তদ্বয় ও শুণ্ড অপেক্ষাকৃত ছোট, তাহাকে খর হস্তী বলে। এই হস্তী দ্বারা পালকের কুলক্ষয় হয়।

"ন জায়তে মদো যস্য স্বকালে জায়তেহথবা।
বিরূপো বিবশো বাপি বিমদং দূরতস্ত্যজেৎ।। ৭।।"

যে হস্তীর মদস্রাব হয় না, হইলেও অকালে হয়, যে হস্তী নিতান্ত কুৎসিত ও অবশ, তাহাকে বিমদ বলে। এই জাতীয় হস্তীকে ত্যাগ করা বিধেয়।

"লঘু প্রমাণঃ ক্ষীণাঙ্গস্তনুশুণ্ড শিরোদরঃ।
অশ্রান্তং শ্বসিতি ব্যগ্রঃ পতেদ্বৈ নেত্রয়োর্ম্মলম্।।
ত্রিকে পুচ্ছাগ্রতো বাপি আবর্ত্তো মণ্ডলোহথবা।
বহিঃ প্রকুরুতে লিঙ্গং সর্ব্বথা গতচেষ্টবৎ।।
ভূভুজা নহিবীক্ষোহয়ং ধ্মাপকাখ্যো গজাধমঃ।
যদীচ্ছেচ্ছাশ্বতীং ভূতিং শরীরারোগ্যমেব বা।। ৮।।"

যে হস্তীর প্রমাণ লঘু, অঙ্গ ক্ষীণ, শুণ্ড, শির ও উদর অপেক্ষাকৃত ছোট, যে হস্তী ব্যগ্রভাবে অবিশ্রান্ত শ্বাস ত্যাগ করে, চক্ষুদ্বয় হইতে অবিরত মল নির্গত হয়, যাহার কটিদেশে ও পুচ্ছাগ্রে আবর্ত্ত কিম্বা মণ্ডল চিহ্ন থাকে, যাহার লিঙ্গ সর্ব্বদা বাহির ইয়া থাকে অথচ নিশ্চেষ্ট ভাবাপন্ন, সেই অধম হস্তীকে ধ্মাপক বলে। যিনি শ্রীবৃদ্ধি এবং আরোগ্যে অভিলাষী, সেই নরপতি এতজ্জাতীয় হস্তীকে দর্শনও করিবেন না।

"শঙ্খ দেশৌ ভগ্নৌ স্কন্ধ দেশোহতি গুচ্ছকঃ।
কাকোহয়ং কুরুতে মৃত্যুং স্বামিনো নাত্র সংশয়ঃ।। ৯।।"

যে হস্তীর শঙ্খদেশ অর্থাৎ ললাটস্থ অস্থিফলক ভগ্ন এবং স্কন্ধ অতিশয় উচ্চ, তাহাকে কাক বলে। এই জাতীয় হস্তী প্রভুর মৃত্যুকারক।

"বিষমৌ শঙ্খগৌ দন্তৌ যস্য শুণ্ড বিরোধিনৌ।
ভিদ্যেতে বা বিদীর্য্যেতাং স্বয়ং শূন্যান্তরাবুভৌ।
কুরুতে ব্যাধিতং নাথং ধূম্র নামা গজাধমঃ।। ১০।।"

যে হস্তীর ললাটস্থ অস্থিফলকদ্বয় এবং দন্তদ্বয় বিষম, যাহার শুণ্ড শরীরের বিরোধী, স্বয়ং ভিন্ন বা বিদীর্ণ এবং শূন্যান্তর, সেই অধম গজকে ধূম্র বলে। ইহারা প্রভুকে ব্যাধিযুক্ত করিয়া থাকে।

"মূৰ্দ্ধজাঃ কৰ্কশা রূক্ষা জটারূপানুবন্ধিনঃ।
যস্যায়ং জটিলো নাগঃ কুরুতে ধনসংক্ষয়ম্।। ১১।।"

যে হস্তীর মস্তকের কেশ কর্কশ, রূক্ষ এবং জটার অনুরূপ, তাহাকে জটিল হস্তী বলে। ইহার দ্বারা স্বামীর ধনক্ষয় হয়।

"স্কন্ধে বা গাত্রদেশে বা লগ্নং চর্ম্মেহবলক্ষ্যতে।
অজিনী নাম নগোহয়ং কুরুতে ভূধনক্ষয়ম্।
নৈনং স্পৃশেন্নবীক্ষেত যদিচ্ছেদাত্মনঃ শ্রিয়ম্।। ১২।।"

যাহার স্কন্ধ বা গাত্রচর্ম্ম লগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে অজিনী বলে। ইহার দ্বারা স্বামীর ভূমি ও ধনক্ষয় হয়। যিনি শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী, তিনি এই হস্তীকে স্পর্শ বা দর্শন করিবেন না।

"মণ্ডলানি প্রদৃশ্যন্তে একং দ্বে বা বহূনি বা।
বিরূপান্যুদ্গতানীব মণ্ডলী কুল নাশনঃ।। ১৩।।"

যে হস্তীর অঙ্গে এক, দুই বা বহুসংখ্যক মণ্ডল থাকে এবং সেই মণ্ডলগুলি যদি বিরূপ বা উন্নত হয়, তবে সেই হস্তীকে মণ্ডলী বলে। ইহা প্রভুর কুলবিনাশকারী।

"তানি শ্বেতানি যস্য স্যুঃ শ্বিত্রী স ধন নাশনঃ।। ১৪।।"

যে হস্তীর পূর্ব্বোক্ত মণ্ডলগুলি শ্বেতবর্ণ, তাহাকে শ্বিত্রী বলে। এই জাতীয় হস্তী স্বামীর ধন বিনাশকারী।

"হৃদয়ে উদরে চৈব ত্রিকে পুচ্ছস্য মূলতঃ।
গুদে মেঢ্রে পদে চৈব আবর্ত্তৈন হতশ্রিয়ম্।
যোগিনং কুরুতে ভূপং প্রবাসিনমুপদ্রুতম্।। ১৫।।"

যে হস্তীর হৃদয়ে, উদরে, ত্রিকদেশে (মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে), পুচ্ছমূলে, গুহ্যদেশে, লিঙ্গে বা পাদদেশের আবর্ত্তগুলি শ্রীহীন হয়, তাহাকে হতাবর্ত্ত কহে। ইহারা রাজাদিগকে যোগী, প্রবাসী বা উপদ্রুত করিয়া থাকে।

"গচ্ছতো যস্য গুল্‌ফাভ্যাং ভবেৎ সংঘর্ষণং মুহুঃ।
অপি সর্ব্বগুণৈর্যুক্তস্ত্যাজ্যশ্চ স মহাভয়ঃ।।
রাষ্ট্রং ধনং কুলং সৈন্যং মৈত্রং দারান্ তথা প্রজাঃ।
ক্ষপয়ত্য শুভো নাগো দৃষ্ট মাত্রো ন সংশয়ঃ।।
তত্রাপম্রিয়তে লোকস্তত্র বজ্র ভয়ং ভবেৎ।
ব্যাধি বহ্নি ভয়ং বাত্র যত্রাস্তে স মহাভয়ঃ।। ১৬।।"

যে হস্তীর গমনকালে গুল্‌ফদ্বয়ের (পায়ের গোড়ালী) মুহুর্মুহুঃ পরস্পর সংঘর্ষণ হয়, তাহাকে মহাভয় বলে। এই হস্তী সর্ব্বগুণান্বিত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়ঃ। রাজ্য, ধন, কুল, সৈন্য, মিত্র, পত্নী এবং প্রজা ইহার দৃষ্টিমাত্রেই বিনষ্ট হয়, এই হস্তী যে দেশে থাকে, সেই দেশের লোকও ক্রমশঃ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, এবং তদ্দেশে বজ্রভয়, ব্যাধিভয় এবং অগ্নিভয় জন্মিয়া থাকে।

"ভৃশং সন্তাড্যমানস্তু পাদৈকং যো ন গচ্ছতি।
পৃষ্ঠোদরং সমাবৃত্ত্য রেখা রক্তসমা যদি।।
ন্যস্তাগ্রিম পদস্থানে পশ্চাৎপাতঃ পদে যদি।
অপি সর্ব্বগুণৈর্যুক্তো রাষ্ট্রহায়ং গজাধমঃ।।
রাষ্ট্রদপা ক্রিয়তেহয়ং ভূভুজা শ্রিয়মিচ্ছতা।
রাষ্ট্রান্তে রক্ষিতো মোহাৎ কুরুতে রাষ্ট্র সংক্ষয়ম্।। ১৭।।"

যে হস্তী বিশেষভাবে তাড়িত হইয়াও এক পা চলিতে চাহে না, যাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে উদর পর্য্যন্ত গোলাকার রেখা পরিদৃষ্ট হয়, চলিবার কালে অগ্রপদের স্থানে পশ্চাতের পদ পতিত হয়, তাহাকে রাষ্ট্রহা বলে। এই হস্তী সর্ব্বগুণযুক্ত হইলেও হস্তীর মধ্যে অধম। যে রাজা নিজ শ্রীবৃদ্ধির অভিলাষী, তিনি এতজ্জাতীয় হস্তীকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। এই হস্তী যে রাজ্যে বা প্রদেশে থাকে, অল্পকালের মধ্যেই তাহা বিনষ্ট হয়।

"পাদাশ্চাত্যন্ত বিষমা দন্তৌ চান্যোন্য বৈষমৌ।
পঞ্জরো দৃশ্যতে ভগ্ন একোবাষ্টৌ দ্বয়োহথবা।
দন্তৌ বা চলতো যস্য কিমু বা ন প্ররোহতঃ।
কুম্ভৌ বা বিষদৌ যস্য মূষলী স গজাধমঃ।
রাষ্ট্র দুর্গ বলামাত্যক্ষয়কৃত্তং পরিত্যজেৎ।। ১৮।।"

যে হস্তীর পদ পরস্পর অসমান, দন্তময় বিষম, পঞ্জর সমূহের মধ্যে একটী, দুইটী কিম্বা সমস্তগুলিই ভগ্ন, যাহার দন্তদ্বয় নড়ে, বা রহে না, যাহার কুম্ভ দুইটী শ্বেতবর্ণ, সেই অধম হস্তীকে মূষলী বলে। ইহার দ্বারা রাজ্য, দুর্গ, সৈন্য ও অমাত্যগণ বিনষ্ট হয়। এবম্বিধ দুষ্ট হস্তীকে পরিত্যাগ করা একান্ত উচিত।

"চর্ম্ম খণ্ড ইবাভাতি ভালে যস্যাতি কর্ক্কশঃ।
ভালী স কুরুতে নাগো ভর্ত্তুঃ কুলধনক্ষয়ম্।। ১৯।।"

যে হস্তীর ললাটের চর্ম্ম অত্যন্ত কর্কশ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে ভালী বলে। ইহা স্বামীর কুল ও ধনক্ষয়কারী।

"পুষ্টো বিশালঃ সদ্দন্তঃ সৎকারোহপি শুভোহপি সন্।
ন রণে সাহসো যস্য স নিঃ সত্ত্বো গজাধমঃ।।
সর্ব্বেষাং গজ দোষণামুক্ত এব মহানয়ম্।
যেনৈকেন গুণাঃ সর্ব্বে তৃণায়ন্তে সুনিশ্চিতম্।। ২০।।"

যে হস্তীর দেহ পুষ্ট এবং বিশাল, দন্তদ্বয় সুন্দর, যে হস্তী রণে সাহসহীন, সেই অধম হস্তীকে নিঃসত্ত্ব বলে। হস্তীর যত প্রকারের দোষ উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহার দোষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

বিংশতি প্রকার দুষ্ট হস্তীর লক্ষণ ও দোষ মোটামুটী ভাবে বর্ণিত হইল। গার্গ্য প্রভৃতি ঋষিগণের মতে আরও নানাবিধ লক্ষণযুক্ত দুষ্ট হস্তী আছে, এ স্থলে তাহার সম্যক উল্লেখ করা অসম্ভব। রাজগণের পক্ষে দুষ্ট হস্তী দর্শন করাও নিষিদ্ধ। দৈবাৎ দর্শন করিলে, সেই দোষ প্রশমনের নিমিত্ত হোম ও দানাদি কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এতদ্বিষয়ক শাস্ত্রীয় মত নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে।

"দোষৈর্দুষ্টান্ গজান্নাজান বীক্ষেত কদাচন।
ন্যসেদ্বা পররাষ্ট্রেষু নগরাৎ ক্রিয়তে বহিঃ।।
দস্যাৎ দ্বিজেভ্যঃ শুদ্ধেভ্যো গণাকায়াথবা নৃপঃ।
দৃষ্ট্বা যদি গজান্ দুষ্টান্ দদ্যাচ্ছৃঙ্গি শতং দ্বিজে।।
পুরং নিরাজয়েদ্বাপি আত্মানম্বাথবা সুতম্।
দেব সূক্তেন জুহুয়াদযুতন্বাতি তৎপরঃ।।
তিলান্ বা জুহুয়াদগ্নৌ তৎপ্রতীকার হেতবে।"

রাজগণ দুষ্ট হস্তী কদাচ দর্শন করিবেন না। এই প্রকারের হস্তীকে পররাজ্যে গচ্ছিত রাখিবেন, অথবা নগর হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। অথবা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কিম্বা গণককে দান করিবেন। যদি কোন কারণে দুষ্ট হস্তী রাজার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবে ব্রাহ্মণকে শত গো দান এবং নগরীকে, নিজকে কিম্বা পুত্রকে নীরাজিত * করিবেন। দেবসূক্ত মন্ত্র দ্বারা হোম কিম্বা তাহার প্রতিকারার্থ অগ্নিতে তিল হোম করিবেন।

হস্তীর যে-সকল লক্ষণ বলা হইল, হস্তিনীর প্রতিও তাহা প্রযোজ্য। পরাশর সংহিতায় হস্তীর যে-সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রায় ভোজরাজের বর্ণনারই অনুরূপ। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই আখ্যায়িকায় সন্নিবেশ করা হইল না।

দেশ ও অরণ্য ভেদে হস্তীর আকার ও বর্ণগত পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। সেই বিস্তৃত বিবরণ অল্প কথায় বলিবার উপায় নাই।

হস্তীর পরমায়ু মনুষ্যের সমান, অর্থাৎ ১২০ বৎসর। পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট হস্তীর যে-সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার এক একটী লক্ষণের অভাবে হস্তীর ১০ বৎসর হিসাবে আয়ুক্ষয় হইয়া

---

* নীরাজন — ইহা হোম বিশেষ। এই হোমের বিধি, সম্পাদন প্রণালী এবং তজ্জাত ফল ইত্যাদি বিষয় কালিকাপুরাণ — ৮৬ অধ্যায়, পদ্মপুরাণ — ১০৭ অধ্যায়, স্কন্দপুরাণ, কালোত্তরতন্ত্র এবং হরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। দেবতার আরত্রি কার্য্যকেও নীরাজন বলা হয়।

থাকে। সাধারণতঃ ৬০ বৎসর বয়সে হস্তীর এবং ৩০ বৎসর বয়সে হস্তিনীর সমস্ত অবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

হস্তী, মনুষ্য সমাজের বিশেষ উপকারী। এই বৃহৎ জন্তুকে ধৃত করিবার প্রণালী, পোষ মানাইবার উপায়, পালন ও ব্যবহারের নিয়ম, ব্যাধি এবং চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ক অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা রাজমালার তৃতীয় লহরে বর্ণিত হইবে।

প্রচলিত কিম্বদন্তী

।। দোয়াপাথর ও শ্বেতহস্তী।।

দৌচাপাথর বা দোয়াপাথর

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে 'দৌচাপাথর' নাম পাওয়া যায়। মহারাজ ধন্যমাণিক্য কর্ত্তৃক নরবলির সংখ্যা সঙ্কোচনের বিবরণ উপলক্ষে বর্ণিত হইয়াছে ;—

"পূর্ব্বেতে ত্রিপুর রাজা নরবলি দিত।
সহস্রে সহস্রে বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত।।
শ্রীধন্যমাণিক্য মানা তাহাকে করিল।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল।।
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দ্দশ দেবে।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে।।
দৌচাপাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয়।
গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময়।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২৯ পৃঃ।

'দৌচাপাথর' একটী স্থানের নাম ; সাধারণতঃ এই স্থান 'দোয়াপাথর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ত্রিপুরগণ ইহাকে "নানাগোমতী দোয়াপাথর" বলে। ইহা একটী দেবস্থান, ত্রিপুরেশ্বরগণ এই স্থানে সময় সময় বাস্তব্য করিতেন। এই স্থানে দেবার্চ্চনোপলক্ষে প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক নরবলি হইত। মহারাজ ধন্যমাণিক্য সেই নিয়ম রহিত করিয়া, সমরক্ষেত্রে ধৃত শত্রুগণের মধ্যে দুইটী মাত্র বলি প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

শ্বেতহস্তীর কথা

'দোয়াপাথর' সম্বন্ধীয় একটী প্রাচীন আখ্যান ত্রিপুরা জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। তৎসঙ্গে শ্বেতহস্তীর জন্মবৃত্তান্তও সংযোজিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ শ্বেতহস্তীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ ছিল, ত্রিপুরায়ও এই জাতীয় হস্তী ক্বচিৎ দেখা যাইত। * যে বস্তু বা প্রাণী দুষ্প্রাপ্য, প্রাচীন সমাজে তৎসম্বন্ধে নানাবিধ সংস্কারমূলক উপাখ্যান রচিত

---

* "থানাংচিতে একহস্তী ধবল আছিল।
হেরম্ব রাজায়ে তাকে চাহিয়া পাঠাইল।।" ইত্যাদি

ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ১৭ পৃঃ।

হইত, অসভ্য সমাজে তাহার বাড়াবাড়ি খুব বেশী ছিল। পার্ব্বত্য সমাজে প্রচলিত দোয়াপাথর এবং শ্বেতহস্তী সম্বন্ধীয় আখ্যানও সংস্কারমূলক। এই আখ্যান ত্রিপুরাগণ তাহাদের নিজ ভাষায় বলিয়া থাকে। ত্রিপুর ভাষায় ইহার নাম 'কেরাং কথমা'। আখ্যানটী ভাষান্তরিত করিয়া নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

দোয়াপাথরের বিবরণ ও শ্বেতহস্তীর জন্মকথা

যে স্থান হইতে গোমতী ও খোয়াই নদী উদ্ভূত হইয়াছে, সাধারণে তাহাকে রঘুনন্দন পর্ব্বত বলে। গোমতীর উৎপত্তি স্থানের পূর্ব্বদিকের অনতিদূরবর্ত্তী স্থান "নানাগোমতী দোয়াপাথর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে এই স্থান ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের বিহারভূমি ছিল।

এই স্থানের অনতিদূরবর্ত্তী পার্ব্বত্য পল্লীর এক গৃহস্থের টংগৃহে একজন পূর্ণ গর্ভবতী যুবতী বসিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার বংশমঞ্চের নিম্নদেশে একটী পূর্ণ গর্ব্ভবতী গাভী শায়িতাবস্থায় অলসভাবে রোমন্থন করিতেছিল। অসতর্কতাবশতঃ যুবতীর চালিত থুরি (মাকু) হস্তচ্যুত হইয়া সেই মঞ্চের নীচে পতিত হইল। গর্ব্ভভার পীড়িতা যুবতী টং হইতে নামিয়া মাকুটী তুলিয়া লইতে বড়ই আলস্য বোধ করিলেন; এবং মাচার নিচে শায়িতা গাভীটিকে বলিলেন, — "তুমি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার মাকুটি তুলিয়া দাও।" উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সে কালে মনুষ্য ও পশু-পক্ষীর মধ্যেও পরস্পর বাক্যালাপ চলিত। যুবতী দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া গাভী বলিল, — "যদি তুমি একটী বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, তবে তোমার মাকুটি তুলিয়া দিতে পারি।" — "কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে?" যুবতী-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া গাভী বলিল, — "আমরা উভয়েই গর্ব্ভবতী। আমাদের মধ্যে যদি একের পুত্র ও অন্যের কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহাদিগকে পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে হইবে। এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমি মাকুটী উঠাইয়া দিতে পারি।"

যুবতী ভাবিলেন, পশুর সহিত মনুষ্যের বিবাহ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ইহাতে সম্মতি দান করা না করা একই কথা। বিশেষতঃ তিনি আলস্যবশতঃ গাভীদ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে আগ্রহান্বিতা ছিলেন। তাই বলিলেন — "আমি নিতান্ত আলস্য বোধ করিতেছি, তুমি মাকুটী তুলিয়া দাও। আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত আছি এবং সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রহিলাম।" এই প্রতিজ্ঞা নিতান্তই অযথা মনে করিয়া রমণী ঈষদ্ হাসিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে ঠিক একই সময়ে গর্ব্ভবতী রমণীর একটী কন্যা এবং গাভীর একটী বৃষ বৎস ভূমিষ্ঠ হইল। নবপ্রসূতা কন্যা এবং বৎস উভয়েই মাতৃস্নেহে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত

ও পরিপুষ্ট হইতেছিল। মেয়েটী যখন সমবয়স্কা বালিকাগণের সঙ্গে খেলায় ব্যাপৃতা থাকিত, তখন বৎসটী মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিয়া বালিকার অনুসরণ করিত এবং তাহার দিকে অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। সে মুহূর্ত্তের জন্যও বালিকার কাছছাড়া হইতে চাহিত না। প্রতিবেশিনীগণের মধ্যে অনেকেই গাভী এবং যুবতীর প্রতিজ্ঞার কথা অবগত ছিল। তাহারা স্মিতমুখে বালিকা ও বৎসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, সেই প্রতিজ্ঞার বিষয় আলোচনা করিত এবং বৎসটীর ব্যবহার দর্শনে বিস্মিতা হইত।

বালিকা ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ করিল। সে মাতার প্রতিজ্ঞার কথা অনেকদিন হইতেই শুনিয়া অসিতেছিল এবং গো-বৎসের কার্য্যও লক্ষ্য করিতেছিল। জননীর সেই প্রতিজ্ঞার কথা ক্রমশঃ বৃদ্ধদলের আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল, যুবক-বৃন্দ সেই কথা লইয়া হাসি-ঠাট্টা আরম্ভ করিল। বালিকা এখন সমস্তই বুঝিতেছিল, সে এই ব্যাপারে লজ্জিতা ও মর্ম্মপীড়িতাবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিল। একদিকে লোকগঞ্জনা, অন্যদিকে গো-বৎসের ঐকান্তিক ভালবাসা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বালিকা একদিন ব্যথিতচিত্তে মায়ের নিকট অবস্থা জানিতে চাহিলে মা সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন, — "লোকের কথা তুমি কখনও কাণে তুলিও না, ইহা অসম্ভব কথা, মানুষের সহিত কি পশুর বিবাহ হইতে পারে?"

কালক্রমে বালিকা যৌবন-সীমায় উপনীতা হইল ; গো-বৎসও পূর্ণাবয়ব বৃষে পরিণত হইল। এখন বৃষটী মুহূর্তের জন্যও তাহার সঙ্গছাড়া হইতে চাহে না, এবং এক দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। আর যুবতী মায়ের প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়। ইহার উপর আবার লোকের পরিহাস তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল।

যুবতী বুঝিল আত্মহত্যা ব্যতীত এই দুর্ব্বিষহ যাতনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের অন্য উপায় নাই। একদিন সে গোপনে কোন নির্জ্জন স্থানে যাইয়া একটী আমলকি বৃক্ষে ঝুলিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল। এই ঘটনায় বৃষটী উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া, সেই আমলকী বৃক্ষে বারম্বার শিরাঘাত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

ইহার কিয়ৎকাল পরে তদ্দেশীয় রাজা মৃগয়া উপলক্ষে হস্তীপৃষ্ঠারূঢ় হইয়া বন গমন করিলেন। তিনি পর্ব্বতাভ্যন্তরে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলেন, পথপার্শ্বে একটী পত্রবিহীন আমলকী বৃক্ষে একবৃন্তে দুইটী মাত্র আমলকী ঝুলিতেছে। এমন বৃহৎ এবং সুন্দর আমলকী, রাজা আর কখনও দেখেন নাই ; দুইটী একবৃন্তাবলম্বী হওয়ায় উহার সৌন্দর্য্য যেন আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রাজা আগ্রহের সহিত সহচরবর্গকে বলিলেন, "এমন আমলকী কখনও দেখি নাই, ফল দুইটী আমায় পাড়িয়া দাও।" এক ব্যক্তি ব্যস্তভাবে ফল পাড়িতে গেল, দৈবাৎ একটী ফল তাহার হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়ায়, রাজার বাহন হস্তিনী তৎক্ষণাৎ তাহা শুণ্ডদ্বারা তুলিয়া মুখে দিল। অপরটী রাজার হস্তে প্রদান করা হইল।

রাজা মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংগৃহীত আমলকীটী রাণীর হস্তে দিয়া বলিলেন, — "এমন বৃহৎ এবং সুন্দর আমলকী আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। একটী বৃক্ষে একবৃন্তে দুইটী মাত্র ফল ছিল, তাহা পাড়িবার কালে একটী ভূপতিত হওয়ায় আমার হস্তিনী ভক্ষণ করিয়াছে, অপরটি তোমার জন্য আনিয়াছি।" রাণী অতিশয় আহ্লাদের সহিত রাজদত্ত সেই ফলটী ভক্ষণ করিলেন।

রাণী নিঃসন্তান ছিলেন। আমলকী ভক্ষণের অল্পকাল পরে তাঁহার গর্ব্ভসঞ্চার হইল। এই ঘটনায় রাজা এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের আনন্দের সীমা রহিল না। কাল পূর্ণ হইলে, রাণী অপূর্ব্ব সুন্দরী এক কন্যা প্রসব করিলেন। রাজ্যময় আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল।

রাজার হস্তিনীটিও রাণীর সমসাময়িক কালে গর্ব্ভবতী হইয়াছিল। তাহার গর্ব্ভকাল পূর্ণ হইবার পর, সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত একটী শ্বেত করভ ভূমিষ্ঠ হইল। সুদুর্ল্লভ শ্বেতহস্তী রাজ্য মধ্যে জন্মগ্রহণ করায়, সকলেই ইহা শুভ লক্ষণ এবং সৌভাগ্যের চিহ্ন বলিয়া মনে করিতেছিল।

রাজনন্দিনী এবং হস্তীশাবক উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হস্তীশাবকটী সর্ব্বদা রাজকুমারীর কাছে কাছে থাকিত। সঙ্গছাড়া হইতে বড়ই অনিচ্ছুক ছিল। করভের এবম্বিধ অনুরক্তি দর্শনে সকলেই বিস্মিত এবং আনন্দিত হইত।

এখন রাজকুমারী কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি সহচরীবর্গের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকের নিমিত্ত সময় সময় অন্তঃপুরের বাহিরে বিচরণ করিতেন। সেই সময় শ্বেতহস্তীটিও তাঁহার সঙ্গে ছুটাছুটি করিত। একদিন রাজকুমারী একাকিনী বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সুযোগে হস্তীটি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে শুণ্ডদ্বারা পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করিল এবং নানাগোমতী দোয়াপাথরে যাইয়া উপনীত হইল। বন্য লতাপত্রের সাহায্যে এক কুটির নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে রাজকুমারীকে রাখিল। প্রতিদিন সযত্নে ফলমূলাদি আহরণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিত ; রাজকুমারী তদ্বারাই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজকুমারীর নিরুদ্দেশ হেতু রাজ্যময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল, চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধানের নিমিত্ত লোক ছুটিল, কিন্তু কোথাও কুমারীর সন্ধান পাওয়া গেল না। জনৈক প্রধান ব্যক্তির উপদেশমতে খুঁজিয়া দেখা গেল, শ্বেত হস্তীটী হস্তীশালায় নাই। বহু অনুসন্ধানেও তাহাকে পাওয়া গেল না। রাজকুমারীর প্রতি এই হস্তীর প্রবল অনুরাগের কথা কাহারও অবিদিত ছিল না, সকলেই বুঝিল, ইহা হস্তীরই কার্য্য ; সে রাজকুমারীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

তখন পুনর্ব্বার অনুসন্ধানের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরিত হইল। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রেরিত লোকগণ বহু চেষ্টা করিয়াও রাজকুমারী কিম্বা শ্বেতহস্তীর সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল। পূর্ব্বদিকে প্রেরিত লোকগণ আসিয়া জানাইল, তাহারা হস্তীর পদচিহ্ন পাইয়াছে এবং সেই চিহ্ন ধরিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু হস্তী কিম্বা রাজকুমারীকে

পায় নাই। তাহারা অনুমান করে, রাজকুমারী সহ হস্তী নানাগোমতী দোয়াপাথরে গিয়াছে ; কিন্তু সেই স্থান নিতান্ত দুর্গম বলিয়া অগ্রসরে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

অতঃপর রাজা ঘোষণা করিলেন যে, যে ব্যক্তি শ্বেতহস্তী বধ করিয়া রাজকুমারীর উদ্ধারসাধন করিতে পারিবে, রাজার বাণপ্রস্থ অবলম্বনের পূর্ব্ব কালের নিমিত্ত অর্দ্ধ রাজ্য ও রাজকুমারীকে তাহার হস্তে অর্পণ করা হইবে। আর রাজার বাণপ্রস্থাশ্রম অবলম্বনের পর সেই ব্যক্তি সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। এই ঘোষণার পর অনেক দিন চলিয়া গেল ; কিন্তু রাজ্য বা রাজকুমারী লাভের লালসায় কেহই এহেন দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইল না। তখন রাজা এবং রাণী কন্যাকে পুনঃপ্রাপ্তির উপায় না দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে ভগবানের নিকট মৃত্যুকামনা করিতে লাগিলেন।

রাজার উদ্বিগ্নচিত্ত কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছে না। দিন আসে — দিন যায়, দুঃখময়ী শর্ব্বরী সমগ্র জগৎ তমসাবৃত করিয়া কতবার আসিল কতবার গেল ; কিন্তু রাজকুমারীর সন্ধান মিলিল না। রাণীর অশ্রুধারার বিরাম নাই, রাজপুরীর সকলেই শোকবিহ্বল, গভীর শোক-ছায়া রাজ্যময় ছাইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র রাজকুমারীর অভাবে সমগ্র রাজ্য যেন নির্জীব হইয়া পড়িল।

এহেন দুঃসময়ে একদা ভূতুয়া ও রাঙ্গিয়া নামক দুই ব্যক্তি রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া জানাইল, — "আমরা শ্বেতহস্তী বধ করিয়া রাজকুমারীর উদ্ধারসাধন করিব ; কিন্তু আমাদের নিমিত্ত ছয় মাসের রসদ রাজ সরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।" রাজা হৃষ্টচিত্তে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, রসদ সংগ্রহ করিয়া দিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর প্রতি আদেশ দেওয়া হইল। তখন ভূতুয়া ও রাঙ্গিয়া পাঁচ হাতিয়ার বাঁধিয়া বহু লোকজনসহ দোয়াপাথর অভিমুখে যাত্রা করিল।

তাহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর ক্ষুদ্র আকারের হস্তীর পদচিহ্ন দেখিতে পাইল। যতই চিহ্ন ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই পদচিহ্নের আকার ক্রমশঃ বৃহৎ দেখা যাইতেছিল। তদ্দর্শনে তাহারা বুঝিল, হস্তী কুমারীকে লইয়া যাইবার কালে পূর্ণবয়স্ক হয় নাই। নানাগোমতী দোয়াপাথরের পথেই তাহার বয়স পূর্ণ হইয়াছিল এবং এই কারণে পদচিহ্ন ক্রমশঃ বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝা গেল, দোয়াপাথরে পৌঁছিতে হস্তীর দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। তাহারা বহু কষ্ট ভোগ করিয়া, অনেককালের পর দোয়াপাথরে উপস্থিত হইল। সেখানে যাইয়া সঙ্গীয় সমস্ত লোকজন ফিরাইয়া দিল। কেবল ভূতুয়া ও রাঙ্গিয়া একটি টং প্রস্তুত করিয়া সেখানে রহিল।

ইহাদের মধ্যে রাঙ্গিয়াই বুদ্ধিমান এবং কার্য্যক্ষম। ভূতুয়া তাহার নির্জ্জন প্রবাসের সঙ্গীমাত্র। রাঙ্গিয়া প্রতিদিন শ্বেতহস্তী ও কুমারীর সন্ধানে বাহির হইত, ভূতুয়া প্রহরী ভাবে বাসায় থাকিত।

রাঙ্গিয়া বাহির হইবার সময় ভূতুয়াকে বিশেষ সতর্ক করিয়া বলিয়া যাইত, — "যদি কেহ আসিয়া জিজ্ঞাসা করে 'ক্বট ক্বট জাঙ্গে' তবে তুমি বলিও — রাঙ্গিয়া ভূতুয়া জাঙ্গে।" রাঙ্গিয়া প্রত্যহ বাহির হইবার সময় ভূতুয়াকে এরূপ বলিয়া যাইত। এক দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় রাঙ্গিয়ার অনুপস্থিতিকালে অকস্মাৎ এক ভীষণ দর্শন রাক্ষসী ভূতুয়ার টং গৃহের সম্মুখে আসিয়া বিকটস্বরে জিজ্ঞাসা করিল — "ক্বট ক্বট জাঙ্গে?" ভূতুয়া পূর্ব্ব উপদেশ মতো উত্তর করিল — "রাঙ্গিয়া ভূতুয়া জাঙ্গে।" ইহা শুনামাত্রই রাক্ষসী ভয়ে পলায়ন করিল। কিয়ৎকাল পরে আবার সে চুপি চুপি আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল — "ক্বট ক্বট জাঙ্গে?" এবারও উত্তর হইল — "রাঙ্গিয়া ভূতুয়া জাঙ্গে।" রাক্ষসী ভয়বিহ্বল চিত্তে বিকট চীৎকার করিয়া অরণ্যমধ্যে অদৃশ্য হইল।

এবার ভূতুয়া মনে ভাবিল, রাঙ্গিয়া আমার ছোট ভাই। তাহার নাম অগ্রে বলায় রাক্ষসী ভয়ে পলায়ন করিতেছে, আমার নাম আগে বলিলে আরও ভয় পাইবে। যদি রাক্ষসী পুনর্ব্বার আসে, তবে আমার নামই অগ্রে বলিব। রাক্ষসীর চরিত্র সম্বন্ধে ভূতুয়ার কিছুই জানা ছিল না ; এবং রাঙ্গিয়া যে দেবতার ঔরসজাত, সে কথাও তাহার অজ্ঞাত ছিল। এই কারণেই সে নিজের নাম অগ্রে বলিবার কল্পনা করিতেছিল। সে এই সকল কথা ভাবিতেছে, এমন সময় আবার রাক্ষসী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল — 'ক্বট ক্বট জাঙ্গে?" অমনি ভূতুয়া উত্তর করিল — "ভূতুয়া রাঙ্গিয়া জাঙ্গে।" ইহা শুনামাত্র রাক্ষসী গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং ক্রোধভরে ভূতুয়াকে টংঘর হইতে বাহির করিয়া তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিল। ভূতুয়া ভয়ে সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিল, তাহাকে একটা ঝোপের মধ্যে উড়াইয়া ফেলিয়া রাক্ষসী পাতাল পুরীতে চলিয়া গেল।

এদিকে রাঙ্গিয়া বহু অনুসন্ধানের পর একটা হ্রদের মধ্যে শ্বেতহস্তীর দেখা পাইল। হস্তীটা হ্রদের স্নিগ্ধবারি শুণ্ডদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন এবং কোমল মৃণাল তুলিয়া হৃষ্টচিত্তে ক্ষণ করিতেছিল। সে রাঙ্গিয়াকে দেখামাত্রই বুঝিল, তাহার প্রবলরিপু উপস্থিত। তখন হস্তী শুঁড় গুটাইয়া, পুচ্ছ উন্নত করিয়া এবং দাঁত পাতিয়া চীৎকার সহকারে রাঙ্গিয়াকে আক্রমণ করিল। রাঙ্গিয়া পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল, সে হস্তীর সম্মুখীন হইয়া অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল। অবিশ্রান্তভাবে সাত দিবস ঘোরতর যুদ্ধের পর শ্বেতহস্তী নিহত হইল। রাঙ্গিয়া তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটন করিয়া তৎসহ টংগৃহে ফিরিয়া আসিল।

রাঙ্গিয়া কিয়দ্দূর হইতে টংগৃহের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া বুঝিল, নিশ্চয়ই কোনরূপ অনর্থ ঘটিয়াছে। সে টংগৃহের নিকট আসিয়া দেখিল ভূতুয়া নাই। সেই বনে রাক্ষসীর গতিবিধির কথা তাহার পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। ভূতুয়া রাক্ষসীর হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে কিম্বা রাক্ষসী তাহাকে ধরিয়া নিয়াছে, ইহা বুঝিতে রাঙ্গিয়ার বিলম্ব ঘটিল না। সে অনেক চিন্তার পর এক স্থানে একটা গর্ত্ত খনন করিয়া গজদন্তদ্বয় প্রোথিত করিল।

অতঃপর রাঙ্গিয়া ভূতুয়ার সন্ধানে বহির্গত হইয়া বহু অনুসন্ধানের পর একস্থানে দেখিতে পাইল একটী গর্ত্ত হইতে পিপীলিকা প্রবাহ উত্থিত হইতেছে এবং গর্ত্তের পার্শ্ববর্ত্তী শুষ্ক পত্রের উপর কয়েক ফোঁটা রক্ত রহিয়াছে। তর্দ্দশনে তাহার সন্দেহ হওয়ায় সেই স্থান খনন করিতে প্রবৃত্ত হইল। দুই হস্ত পরিমিত গভীর গর্ত্ত খননের পর তন্মধ্যে এক খণ্ড জিহ্বা পাওয়া গেল। রাঙ্গিয়া বুঝিল, ইহা ভূতুয়ার জিহ্বা, রাক্ষসী কর্ত্তন করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়াছে। অনেক অনুসন্ধানের পর ঝোপের ভিতর ভূতুয়াকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পাওয়া গেল। এবং সযত্ন শুশ্রূষায় ভূতুয়া সচেতন হইল। কিন্তু তাহার বাক্য উচ্চারণের শক্তি নাই। তখন রাঙ্গিয়া কর্ত্তিত জিহ্বাখণ্ড হস্তে লইয়া বলিল, — "যদি সত্য সত্যই আমি দেব ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তবে কখনও আমার বাক্য ব্যর্থ হইবে না। ভূতুয়ার কর্ত্তিত জিহ্বা নিশ্চয়ই পূর্ব্ববৎ জোড়া লাগিবে। আর এই উপাখ্যান চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে। রগ্ন, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি যে কোন ব্যক্তি এই উপাখ্যান বলিয়া দেবতার পূজা করিলে, সে নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে।" এই বলিয়া সে চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী করিয়া ভূতুয়ার জিহ্বা তাহার মুখস্থিত অংশের সহিত সংযোগ করিল, অমনি সেই খণ্ডিত জিহ্বা জোড়া লাগিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ভূতুয়া তাহার দুর্গতির সমগ্র বিবরণ রাঙ্গিয়ার নিকট ব্যক্ত করিল এবং একটী খাগড়া ঝোপের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল — "এই ঝোপের ভিতর একটী সুরঙ্গ আছে, রাক্ষসীকে সেই সুরঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিতে আমি দেখিয়াছি।" তখন রাঙ্গিয়া ভূতুয়াকে বলিল — "আমাকে রাজকুমারীর সন্ধানে যাইতে হইবে। তুমি এইস্থানে আমার প্রতীক্ষায় থাক, আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কোথাও যাইও না। এখন আর তোমার কোনরূপ আশঙ্কার কারণ নাই।"

অতঃপর রাঙ্গিয়া খাগড়া ঝোপ উৎপাটন করিয়া দেখিল একটা বৃহৎ সুরঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। এবং পাতাল হইতে একটা ঘিলালতা উঠিয়া সুরঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী একটী বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। ঐ লতা অবলম্বন করিয়াই রাক্ষসী সুরঙ্গ পথে যাতায়াত করিত। রাঙ্গিয়া সেই লতা ধরিয়া সুরঙ্গে প্রবেশ করিল। কিয়দ্দূর নিম্ন গমনের পর সে দেখিতে পাইল, অট্টালিকাময় এক সমৃদ্ধ পুরী বিদ্যমান রহিয়াছে। সুসজ্জিত উদ্যান, স্বচ্ছসলিলা সরোবর, গগনস্পর্শী অট্টালিকা দর্শনে সে বুঝিল ইহা একটী সুবৃহৎ রাজপুরী। রাঙ্গিয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বেড়াইল, কোথাও মনুষ্যের দর্শন পাইল না। পরিশেষে একটী প্রকোষ্ঠে যাইয়া দেখিল এক পরমাসুন্দরী যুবতী একাকিনী পালঙ্কে বসিয়া ব্যাকুলভাবে রোদন করিতেছে। তখন রাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে যুবতীর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "সরলে, তুমি কে? এবং কেনই বা এই জনমানবহীন পাতাল পুরীতে একাকিনী বসিয়া রোদন করিতেছ?" অকস্মাৎ মনুষ্যের আগমন দর্শনে যুবতী চমকিতা ও আশ্বস্তা হইল। সে দুইহাতে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া বীণা-মধুর স্বরে উত্তর করিল — "আমি

অতিশয় দুর্ভাগিনী, রাজকন্যা হইয়াও মনুষ্যের অসহনীয় দারুণ দুঃখ ভোগ করিতেছি।" যুবতীর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া রাঙ্গিয়া বুঝিল, ইনিই তাহার অনুসন্ধেয় রাজকুমারী। তখন সে আশ্বাসবাক্যে বলিল, "তোমার ভয় নাই, আমি রাক্ষসীকে বধ করিয়া তোমার উদ্ধার সাধন করিব। রাক্ষসী কোন্ সময় আসিবে আমায় বল।" কুমারী বলিল, "রাক্ষসী আসিবার আর বেশি বিলম্ব নাই। কিন্তু সেই ভীষণ মূর্ত্তি রাক্ষসীকে কি তুমি বধ করিতে পারিবে?" ইহা বলিয়া রাজকুমারী রাঙ্গিয়ার চক্ষুর উপর স্বীয় কাতর দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক ব্যথিত প্রাণে পলকবিহীন নয়নে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই নৈরাশ্য দৃষ্টি রাঙ্গিয়ার হৃদয়কে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে প্রবোধ বাক্যে কুমারীর ভয় ভাবনা নিরশন জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল।

ঠিক সন্ধ্যার সময় রাক্ষসী গভীর গর্জ্জন করিয়া আসিতে লাগিল। তাহার অঙ্গের বাতাসে প্রবল ঝড় উত্থিত হইল। রাঙ্গিয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রস্তুত ছিল, রাক্ষসী পুরীতে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে ভীষণবেগে আক্রমণ করিল। উভয়ের অনেকক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধের পর রাক্ষসীর পরাজয় ঘটিল, রাঙ্গিয়া সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিল।

অতঃপর রাঙ্গিয়া রাজকুমারী-সহ আসিয়া ভূতুয়ার সহিত মিলিত হইল। এবং অবিলম্বে দোয়াপাথর পরিত্যাগ করিয়া, রাজকুমারী ও ভূতুয়া-সহ রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল। শ্বেতহস্তীর দন্তময় মৃত্তিকা গর্ত্ত হইতে উঠাইয়া সঙ্গে লইল।

অনেক গিরিকন্দর, হ্রদ, উপত্যকা অতিক্রম করিয়া দীর্ঘকালের পর তাহারা রাজধানীতে পৌঁছিল। রাজা ও রাণী, হারানিধি রাজকুমারীকে পাইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। রাণী কন্যাকে কোলে বসাইয়া বারম্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। রাজ্যময় আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল, ঘরে ঘরে মাঙ্গলিক কার্য্য এবং আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান চলিল।

রাঙ্গিয়া, রাজাকে বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া শ্বেতহস্তীর দন্তদ্বয় উপঢৌকন প্রদান করিল। রাজা হৃষ্টচিত্তে রাঙ্গিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছ। তাহার পুরস্কার স্বরূপ আমার প্রাণতুল্যা দুহিতাসহ অর্দ্ধ রাজ্য তোমার হস্তে অর্পণ করিতেছি।" ইহার পর বিপুল সমারোহে রাঙ্গিয়ার সহিত রাজকুমারীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল। ভূতুয়া রাজার পারিষদ শ্রেণীতে স্থান পাইল। রাজারাণী, কন্যা এবং জামাতাকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় কিয়ৎকাল অতীত হইবার পর, রাজা ভোগবাসনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি জামাতার হস্তে সমগ্র রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ভগবদারাধনার নিমিত্ত সস্ত্রীক বনগমন করিলেন। রাঙ্গিয়া, রাজকুমারী-সহ সুখে রাজত্ব করিতে থাকিল।

ইহাই উপাখ্যানের স্থূল মৰ্ম্ম। পাৰ্ব্বত্য ত্রিপুরাগণের মধ্যে কেহ রুগ্ন, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ বা চলচ্ছক্তিবিহীন হইলে, তাহার কল্যাণ কামনায় এই আখ্যান বলিয়া পূজা দেওয়া হয়। পাৰ্ব্বত্য অরণ্যস্থিত ঘিলালতা বিজড়িত যে কোন বৃক্ষমূলে পূজা হইয়া থাকে। পূজার স্থানে দুইজনের অধিক লোক যাওয়া নিষিদ্ধ। পূজা সমাপনান্তে ফিরিবার সময় বৃক্ষে জড়িত ঘিলালতাটি সাত টুকড়া করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। সরলবিশ্বাসী রোগীগণকে এই পূজা দ্বারা অনেক সময় উৎকট ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে দেখা যায়। অদ্যাপি ত্রিপুর জাতির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় এই পূজার প্রচলন আছে।

প্রাচীন আখ্যানসমূহ পল্লবিত হইলেও, চিন্তা করিয়া দেখিলে তন্মধ্যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। এই আখ্যায়িকায় জানা যাইতেছে, ত্রিপুর রাজ্যে একসময় শ্বেতহস্তীর অস্তিত্ব ছিল। এই রাজ্য ব্রহ্মদেশের সীমান্তবর্তী। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ শ্বেতহস্তীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, এরূপ স্থলে ত্রিপুরায় তাহার অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য নহে। বিশেষতঃ রাজমালার উক্তিদ্বারাও এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

শ্বেতহস্তী সম্বন্ধে পৌরাণিক মত

পৌরাণিক অনেক গ্রন্থে হস্তী সম্বন্ধীয় অল্পাধিক বিবরণ পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে হস্তীবিজ্ঞান বিস্তৃতভাবে প্রদান করা হইয়াছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ হস্তীকে আট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্বেতহস্তীকে 'ঐরাবত' আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত ধবলবর্ণ ছিল, সম্ভবতঃ এই কারণেই শ্বেতহস্তী উক্তরূপ আখ্যা লাভ করিয়াছে। এতদ্বিষয়ক প্রাচীন মত নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

"গজনামষ্টধ্যভেদঃ সংক্ষেপণ প্রকাশ্যতে।
ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোহঞ্জনঃ।।
পুষ্পদন্তঃ সাৰ্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগগজাঃ।
এযাংবংশ প্রসূতত্বাৎ গজানামষ্টজায়তঃ।।"

পরাশর সংহিতা।

ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম ও সুপ্রতীক এই অষ্টবিধ হস্তী দিগ্‌গজ নামে বিখ্যাত।

ইহা গেল হস্তীর শ্রেণী বা জাতি বিভাগ ; অতঃপর প্রত্যেক শ্রেণীর লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঐরাবতই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐরাবতের লক্ষণ সম্বন্ধে পাওয়া যায় ;—

"যেকুঞ্জরাঃ পাণ্ডর সৰ্ব্বদেহাঃ সুদীর্ঘদন্তাঃ সিতপুষ্পদন্তাঃ।
অলোমশা অল্পভুজো বলাঢ্যা মহাপ্রমাণা লঘু পুষ্ট লিঙ্গাঃ।।
ক্রুদ্ধাং সমীকে মৃতবোহন্যকালে লঘবম্বু পানা বহুলো প্রদানাঃ।
বিস্তীর্ণ দানাস্তনু লোমপুচ্ছা ঐরাবতস্যাভিজন প্রসূতাঃ।।" ইত্যাদি।

যে হস্তী ধবলবর্ণ, লোমশূন্য, অল্পভোজী অথচ বলশালী, সুবৃহৎ, ক্ষুদ্র অথচ স্থূললিঙ্গ বিশিষ্ট, যুদ্ধকালে কোপন স্বভাব এবং অন্য সময়ে নম্র, অল্প জলপায়ী অথচ অধিক মদশ্রাবী, পুচ্ছের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম লোমযুক্ত, তাহাই ঐরাবত জাতীয় হস্তী।

এতদ্দ্বারা জানা যাইবে, ধবল হস্তীকেই ঐরাবত শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। শ্বেতহস্তী সুদুর্ল্লভ। ইহা দেবতার ন্যায় পূজার্হ এবং সৌভাগ্যের চিহ্নস্বরূপ। রাজগণও ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন না। শ্বেতহস্তী সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, এস্থলে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

রাজা রামগতির আখ্যান *

ইতিপূর্ব্বে ১৫ পৃষ্ঠার পাদটীকায় রাজা রামগতির আখ্যান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। রাজা রামগতির লীলাক্ষেত্র খণ্ডল পরগণা। এই পরগণা পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, কাল প্রভাবে তাহা মোগল সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত এবং পরে বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এই লহরের ধন্যমাণিক্য খণ্ডে খণ্ডলবাসিগণের যে-সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে কুচক্রী এবং কুটবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়াই জানা যায়। পক্ষান্তরে, ইহারা যে নিতান্ত সরল এবং অন্ধবিশ্বাসী, তা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রামগতির আখ্যান প্রদান করিতে হইল।

খণ্ডল, দক্ষিণশিক ও চৌদ্দগ্রাম প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলের অনেক স্থানে অদ্যাপি একটী সুদীর্ঘ গ্রাম্য ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা রাজা রামগতির কথা লইয়া রচিত। কবিতাটী নিম্নে প্রদান করা হইল।

"রামগতি রায় সিদ্ধাবালা,
গৌরা কামার তার চেলা,
তারা করে ওনা পেনা,
প্রভু আনি বাড়ী।।
যখন প্রভু আনিয়া ছিল,
রাধাকান্ত ঠাকুর ছিল,
তান বাড়ী প্রভুরে নিল,
বস্‌তে দিল গো-শালা ঘরে।।

---

* এই আখ্যান, বিলনীয়া বিভাগের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সিংহ মহাশয়, খণ্ডল পরগণাস্থ কালীনগর নিবাসী, ৭৪ বৎসর বয়স্ক পূর্ণচন্দ্র বৈদ্যের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত বৈদ্য বলে, তাহার পাঁচ কি ছয় বৎসর বয়সের কালে রাজা রামগতির ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল।

বিল্বপত্র নাহি ছিল,
যজ্ঞ-কাষ্ঠ আনি দিল,
তারা সবে করে যজ্ঞ-ধূনী।।
প্রভু বলে সতী আনি দেও মোরে,
সতী আনি নাহি দিলে প্রভু যাবে পাতালে,
ভক্ত সবে করে হায় রে হায়!
ধনীরাম পাটারী (১) ছিল,
সতী আন্‌তে লড় দিল,
সতীর পায়ে ধরি
ভক্ত সবে করে গড়াগড়ী।।
'আয়নী' রে পাইল ভূতে,
গাঙ্গ্ ফিরার (২) উত্তর পাড়ে,
তিনশত মানুষের
জাত মার্‌ল সুরা কাণার পুতে।।
এক পাতিল সিন্নি রান্ধে,
রাঁড়ি বুড়ি বসি কান্দে,
প্রভু মোরে সিন্নি না দেখাইল।
খোয়াজের পুত যায়,
হিলাল গাজি নাম তায়,
খেজুড়িয়া গ্রাম শালার বাড়ী।।"

এই কবিতা হইতে এবং স্থানীয় অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ন্যূনাধিক সত্তর বৎসর পূর্ব্বে খণ্ডল পরগণার অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে রামগতির এবং করলীয়া টিলায় তাহার পুরোহিত রাধাকান্ত ঠাকুরের বাড়ী ছিল। এই সকল স্থান পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলায় ছিল, এখন নোয়াখালী জেলাস্থিত ফেণী মহকুমার অন্তর্গত হইয়াছে। স্থানটী ত্রিপুরা রাজ্যের বিলনীয়া বিভাগীয় আফিসের পশ্চিমোত্তর কোণে এক মাইলের মধ্যে অবস্থিত। রামগতি জাতিতে কায়স্থ ছিল। তাহার পিতার নাম সুরা কাণা। সম্ভবতঃ এক চক্ষু হীন ছিল বলিয়া সে 'কাণা' উপাধি লাভ করিয়াছে, তাহার নাম ছিল সুরমণি কিম্বা সুরচন্দ্র।

কতকগুলি সাধারণ শ্রেণীর লোকের উপর রামগতির বিশেষ প্রভাব ছিল। 'গৌরা কামার' নামক এক ব্যক্তি তাহার প্রধান চেলা ছিল, উদ্ধৃত কবিতা, আলোচনায় ইহা জানা যাইতেছে। 'সিদ্ধাবালা' এবং 'চেলা' শব্দদ্বারা মনে হয়, রামগতি কোন প্রকারের ধর্ম্মভাবের দরুণ এই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান কালেও কোন কোন গ্রামে,

---

(১)　পাটারী — গ্রাম্য তহশীল গোমস্তা।

(২)　গাঙ্গ্ ফিরা — নদী একপথ ছাড়িয়া অন্য পথে প্রবাহিতা হইলে, পূর্ব্বের যে শুষ্কপ্রায় খাত থাকে, তাহাকে গাঙ্গ্ ফিরা বলে।

যেমন — ত্রিনাথের মেলা, কিশোরী ভজন প্রভৃতি উপলক্ষে সমপ্রদায় গঠিত হইয়া থাকে, রামগতিও তদ্রূপ একটা দল গঠন করিয়াছিল, অবস্থা আলোচনায় ইহাই বুঝা যায়।

রামগতির গুরুর নাম এবং ভজন-প্রণালীর বিষয় বর্ত্তমান কালের অগোচর। গুরুর আগমনোপলক্ষে রামগতির বাড়ীতে সমারোহ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। তাহার পুরোহিত রাধাকান্ত ঠাকুরও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি প্রভুকে নিজের বাড়ীতে নেওয়ার কথাও কবিতায় পাওয়া যাইতেছে ; কিন্তু সে বাড়ীতে যাইয়া গুরু ঠাকুরের বসিবাস স্থান হইল গো-শালায়! এই উক্তি দ্বারা প্রভুর জাতি ও মর্য্যাদার প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। যাই হউক, রামগতির ভক্তবৃন্দ প্রভুকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার পুজোপচার সংগ্রহ, যজ্ঞধুনী প্রজ্বালন, সমস্তই হইল, তখন প্রভু বলিলেন — "আমাকে সতী আনিয়া দাও, নতুবা আমি পাতালে প্রবেশ করিব।"

প্রভুর আজ্ঞা পালনের উপায় না দেখিয়া তাঁহার পাতাল প্রবেশের ভয়ে ভক্তবৃন্দের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন ধনীরাম পাটারী, সতী আনয়নের নিমিত্ত দৌড়িয়া ছুটিল। পাটারীগণ যে কোন্ শ্রেণীর জীব এবং নিম্ন সমাজে তাহাদের আধিপত্য কত বেশী ছিল, তাহার বিস্তর নিদর্শন বর্ত্তমান কালেও পাওয়া যায় ; তাহাদের অসাধ্য কার্য্য ছিল না। এজন্যই ধনীরাম, সতী সংগ্রহ কার্য্যে সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়া থাকিবে। 'আয়নীরে পাইল ভূতে' এই উক্তি দ্বারা এবং পরবর্ত্তী বিবরণ দ্বারা বুঝা যায়, ধনীরাম এই আয়নীকেই 'সতী'র সুদুর্ল্লভ আসন প্রদান দ্বারা ধন্যা করিয়াছিল।

গুরুজী ভক্তগমের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া যাত্রাকালে বলিয়া গেলেন, — "আমি আবার আসিব ; কিন্তু তখন অন্যরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইব। অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ আমাকে চিনিতে পারিবে না।"

রামগতি কাঠুরিয়া ছিল। পার্ব্বত্য অরণ্য হইতে প্রতিদিন কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লোকালয়ে বিক্রয় করিত। সে একদিন কাষ্ঠভার বহন করিয়া ক্লান্ত হওয়ায় বনের মধ্যে বিশ্রাম করিবার সময় উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতেছিল। তৎকালে কোনও দুষ্ট লোক জঙ্গলের অন্তরাল হইতে ডাকিয়া বলিল, — "রামগতি, তোর দুঃখের অবসান হইয়াছে, তুই শীঘ্রই রাজা হইবি।" এই বাক্যকে রামগতি ভগবানের প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করিল এবং তাহার অন্তরঙ্গ ভক্ত গৌরা কামারের নিকট সমস্ত কথা বলিল। এই কর্ম্মকারের দ্বারা কথাটী সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল।

এদিকে রামগতির দল ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রভাবও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেবতার প্রত্যাদেশমূলে অবস্থা এতদূর গড়াইল যে, রামগতির ভক্তেরা তাহাকে 'রাজা রামগতি' আখ্যা প্রদান করিল এবং বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত সিংহাসনে সস্ত্রীক

বসাইয়া, তাহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করাইল। শ্রেষ্ঠ চেলা, গৌরা কামার প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিল, ধনীরাম রাজস্ব সচিব হইল। কালিকাপুরে তাহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ধনীরাম গ্রাম্য পাটারী ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গৌরা কামারের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। পূর্ব্বে যে আয়নীর কথা বলা হইয়াছে, ইতিমধ্যে সেই যুবতী ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সে অবিবাহিতা থাকিবে; গুরুজী (রামগতির গুরু) আবির্ভূত হইলে তাহাকে সে পতিত্বে বরণ করিবে।

এরূপভাবে ভক্তবৃন্দের মধ্যে কিছুকাল রাজা রামগতির রাজত্ব চলিবার পর, জনৈক ভিক্ষাজীবী ফকির ভিক্ষায় বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে রাজা রামগতির বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। এই ফকিরের নাম ছিল হিলাল গাজি। সে ছাগলনাইয়া থানার অন্তর্গত খাজুড়িয়া গ্রাম নিবাসী খোয়াজ মোল্লার পুত্র। হিলাল গাজি পঙ্গু ছিল এবং অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় ভিক্ষাবৃত্তিই তাহার একমাত্র উপজীবিকা হইয়াছিল। ইহাকে দেখিয়া, কেহ কেহ মনে করিল, গুরুজী (রামগতির গুরু) চাতুরী করিবার অভিপ্রায়ে এই মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই সংবাদ ক্রমশঃ গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ফকির বেচারা আর যায় কোথায়! রাজা রামগতি ও তাহার ভক্তবৃন্দ দল বাঁধিয়া যাইয়া ফকিরকে ধরিল এবং যত্ন সহকারে তাহাকে বাড়ীতে আনিল। কেহ তাহার পায়ে লুটাইয়া প্রণাম করিতেছে, কেহ বাতাস করিতেছে, কেহ পদসেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছে, তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইল। বিপন্ন হিলাল গাজি ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করিয়া বারম্বার আত্মপরিচয় প্রদান করিল। তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার নিমিত্ত কত সাধ্য-সাধনা করিল ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সে যতই প্রকৃত পরিচয় বলিয়া অব্যাহতি পাইতে চায়, ভক্ত-সমাজ ততই আঁকড়াইয়া ধরিতেছিল। তাহারা মনে করিল, গুরুদেব ছলনা করিয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে প্রয়াসী। হিলাল গাজী অনেক চেষ্টা করিয়াও মুক্তি না পাওয়ায় মনে করিল, ইহা নিয়তির নির্ব্বন্ধ, খোদাতাল্লার ইচ্ছায় এরূপ ঘটিতেছে। সুতরাং নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ।

তখন সকলে মিলিয়া প্রভুকে স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করাইল। এবং আসনে বসাইয়া অর্চ্চনা করিতে লাগিল। গুরুপদে উৎসর্গীকৃতপ্রাণা আয়নীকে আনিয়া তাহার বামপার্শ্বে বসান হইল। এক হাঁড়ি সিন্নি রাঁধিয়া গুরুর ভোগ হইল, ভক্তবৃন্দ ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া জীবন সার্থক করিল।

রাজত্বের সীমা ভক্ত সমাজে নিবদ্ধ রাখিয়া রামগতির তৃপ্তি হইতেছিল না, ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ হইল। অল্পকালের মধ্যেই রামগতির রাজত্ব কাহিনী রাজপুরুষগণের কর্ণগোচর হইল।

গুরু হিলাল গাজি রামগতির বাড়ীতে অবস্থানকালে, অকস্মাৎ একদল পুলিশ আসিয়া গুরুজীসহ রাজা, রাণী, পাত্র, মিত্র সকলকেই গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। রামগতির সাধের রাজত্বের এইখানেই অবসান হইল। পুলিশ, ধর্ম্মধ্বজী রামগতিকে সপারিষদ ধর্ম্মাধিকরণে প্রেরণ করিল।

এই সংবাদ পাইয়া হিলাল গাজির ভ্রাতা, তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আসিল এবং বহু চেষ্টার ফলে প্রকৃত তথ্য উদঘাটিত হওয়ায় হিলাল গাজি মুক্তিলাভ করিল। রামগতি ও তাহার প্রধান চেলাগণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। ইহাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ স্থাপিত হইয়াছিল, জানা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করে, ইহারা রাজদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল।

রামগতি এবং তাহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ হিলাল গাজির প্রসাদী সিন্নি ভক্ষণ করিবার দরুণ সমাজচ্যুত হইয়াছিল। ভক্ত সমাজ ব্যতীত আরও ন্যূনাধিক তিন শত লোক এই কারণে সমাজবর্জ্জিত হয়। এই সুযোগে কুমিল্লা হইতে জনৈকি পাদ্রি আসিয়া তাহাদের মধ্যে অনেককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরগণ এখনও কুমিল্লানগরীতে বাস করিতেছে। যাহারা হুজুগে পড়িয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সমাজভুক্ত হইল, কেহ বা সমাজচ্যুত অবস্থায়ই রহিল।

রাজা রামগতির শেষ পরিণতির কথা কেহই বলিতে পারে না ; সুতরাং সেই বিবরণ প্রদান করিবার উপায় নাই।

বিষলতার উৎপত্তি

রাজমালায় ধন্যমাণিক্য খণ্ডে লিখিত আছে ;—

"দুই প্রহরে খনিলেক তাতে এক দীঘী।
না খায় গোমতী জল বিষ দিছে লাগি।।"

(২য় লহর — ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণোপলক্ষে গোমতী নদীর তীরে ছাউনী করায় তাঁহার সৈন্যবল ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে ত্রিপুর সেনানী, নদীর জলে বিষলতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিষলতা ত্রিপুর পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়। পার্ব্বত্য জাতিসমূহ, এই লতা থেঁতলাইয়া নদীতে কিম্বা পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ ঢেপায় (হ্রদ বা বিলে) নিক্ষেপ করে। কিয়ৎকাল পরে, ছোট-বড় সর্ব্ববিধ মৎস্য বিষাক্রান্ত হইয়া ভাসিয়া উঠে, এবং এই সুযোগে বিষদাতাগণ

তাহা ধরিয়া লয়। এই লতা এত বিষাক্ত যে, ইহার রস উদরস্থ অথবা অন্য প্রকারে শরীরে প্রবিষ্ট হইলে প্রাণনাশের আশঙ্কা বটে। যে কালে সমরক্ষেত্রে ধনুর্ব্বাণের ব্যবহার ছিল, তৎসময় কুকি প্রভৃতি পার্ব্বত্য যোদ্ধাগণ এই লতার রস তীরের ফলকে মাখাইয়া শত্রুপক্ষের উপর প্রয়োগ করিত। বর্ত্তমান কালেও মৎস্য মারিবার নিমিত্ত এই লতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যুবরাজ কৃষ্ণমণি খুচুং কুকিগণের সহিত সমরকালে এই বিষভরা তীরের আঘাতে মৃতকল্প হইয়াছিলেন। তৎকালে জয়ন্ত চন্তাই বিষলতার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় যে কিম্বদন্তী বর্ণন করিয়াছেন, "কৃষ্ণমালা" গ্রন্থ হইতে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এস্থলে অন্য কথা না বলিয়া কৃষ্ণমালার ভাষা অবিকল প্রদান করাই সর্বতোভাবে সঙ্গত মনে করিতেছি, তাহা এই ;—

"শুনিয়া বিস্ময় মনে হইল রাজার।
জয়ন্ত চন্তাই পাশে (১) পুছে (২) আরবার।।
কিঞ্চিৎ হইয়া ঘাও যুবরাজ পায়।
মূর্চ্ছিত হইল কেনে বিষের জ্বালায়।।
বল এই হলাহল জন্মে কোন খানে।
খুচুং কুকিয়ে তাহা পাইল কেমনে।।
শুনিয়া চন্তাই বলে শুন নরপতি।
ইতিহাসরূপে কহি বিষের উৎপত্তি।।
খুচুঙ্গের রাজা ছিল নামে শুভরায়।
'মলাল' রাজাকে কহে কুকির ভাষায়।।
তাঁহার তনয়া এক রূপবতী হৈল।
শ্রেষ্ঠ এক কুকি তাকে বিবাহ করিল।।
বিবাহ রাত্রিতে হৈল জামাতা নিধন।
তাহার কনিষ্ঠ ভাই ছিল ছয় জন।।
ম্লেচ্ছ জাতি ধর্ম্মাধর্ম্ম কভু জানে নাই।
সে কন্যাকে সংগ্রহ করিল তার ভাই।।
সেও সেই রাত্রিতে গেলেন যম ঘর।
আর ভাই সংগ্রহ করিল তার পর।।
এইরূপে ছয় ভাই সকল মরিল।
সর্ব্বের কনিষ্ঠ অবশিষ্ট এক রৈল।।
ভাই সব মৈল দেখি ভাবে মনে মন।
বুঝিতে না পারে কিছু মরণ কারণ।।
সে বলে একক আমি বাঁচি কার্য্য নাই।
আমি যাব যেই পথে গেল ছয় ভাই।।

---

(১) পাশে — নিকটে। (২) পুছে — জিজ্ঞাসা করে।

ই বলিয়া সেহ তারে সংগ্রহ করিয়া।
সে নারীর সঙ্গে এক ঘরে রহে গিয়া।।
শয্যা হ'তে অন্তর হৈয়া ভিন্ন স্থানে।
অগ্নি জ্বালি জাগিয়া রহিল সাবধানে।।
নিদ্রায় সে নারী যদি অচেতন হৈল।
দেখে নাক হ'তে এক সর্প নিকলিল (১)।।
সর্প নিকালিয়া শয্যা বিচারিয়া চায়।
মনুষ্য না পাইয়া পুনি (২) নাকেতে সামায় (৩)।।
তা দেখিয়া সেই কুকি ভাবে মনে মনে।
বুঝি এই সর্পে মারিয়াছে ভাইগণে।।
এই নারী মারিয়াছে মোর ছয় ভাই।
ইহাকে মারিব আমি যে করে গোসাই।।
এখানে থাকিলে সাপে খাইব আসিয়া।
ইহা ভাবি ঘর হনে (৪) গেল নিকলিয়া।।
রজনী প্রভাতে সেই ভাবে মনে মনে।
এই ত নাগিনী কন্যা মারিব কেমনে।।
তবে বিহারের ছলে বনিতা লইয়া।
নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে প্রবেশিল গিয়া।।
বনে গিয়া লগুড় প্রহার দিয়া মারি।
থুইল (৫) খাদাই (৬) তথা গর্ত্ত এক করি।।
ঘরে আসি কাঁন্দিয়া কহিল লোক ঠাঁই।
পত্নী মোর কোথা গেল উদ্দেশ না পাই।।
শুনিয়া কন্যার পিতা খুচুঙ্গের রাজা।
কন্যাকে বিচারি চাহে সঙ্গে লৈয়া প্রজা।।
কন্যা না পাইয়া সদা করয়ে ক্রন্দন।
একদিনে রজনীতে দেখিল স্বপন।।
কন্যা আসি কহে পিতার শিয়রে বসিয়া।
না কান্দ না কান্দ বাপু আমার লাগিয়া।।
সর্প আমি কন্যারূপে হৈয়া অবতার।
আসিছিলাম ছয় জন কুকি বধিবার।।
তা সবার ছোট ভাই আমাকে মারিয়া।
নদীকূলে বটমূলে রাখিছে গাড়িয়া (৭)।।

---

(১) নিকলিল — বাহির হইল। (২) পুনি — পুনর্ব্বার।
(৩) সামায় — প্রবেশ করে। (৪) ঘর হনে — গৃহ হইতে।
(৫) থুইল — রাখিল। (৬) খাদাই — প্রোথিত করিয়া।
(৭) গাড়িয়া — প্রোথিত করিয়া।

নাভি ভেদি এক লতা উঠিছে আমার।
ইহা হ'তে হবে তোমার সব উপকার।।
সর্পের গরল আছে ই লতার কসে (১)।
তাতে মাখা তীর যায় শরীরে প্রবেশে।।
বিষ জালে বিকল হইবে সেইজন।
অল্প ঘাও হইলেও ত্যজিবে জীবন।।
কিন্তু এক কথা মাত্র আছয়ে বিশেষ।
চাপেঙ্গ নদী (২) দক্ষিণেতে যত সব দেশ।।
সে সকল দেশে এই বিষ না লাগিব।
এই বন ভরি এই বিষতলা হইব (৩)।।
স্বপ্ন দেখি খুচুঙ্গের নৃপতি জাগিয়া।
প্রভাতে পর্ব্বতে গেল কুকিগণ লইয়া।।
মাটি খনি সেই কন্যার পাইল উদ্দেশ।
দেখে লতা হইছে ভেদিয়া নাভি-দেশ।।

---

(১) কসে — রসে, লতা ছিন্ন করিলে যে তরল পদার্থ নির্গত হয়।

(২) চাথেঙ্গ নদী — এই নদী বরবক্র নদীর দক্ষিণে অবস্থিত, বর্ত্তমান কালে এই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন্ নদীকে চাথেঙ্গ বলা হইত, তাহাও জানিবার উপায় নাই। কৃষ্ণমালায় এই নদীর সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

"হিড়িম্ব দেশের দক্ষিণেতে এক নদী।
বরবক্র নাম তার ঘোষে অদ্যাবধি।।
খলংমা বলয়ে ত্রিপুর সকলে।
কুকি সবে বসতি করয়ে তার কুলে।।
রুকনী নামেতে নদী তাহার দক্ষিণ।
তথাতে বসতি করয়ে কুকিগণ।।
* * * *
মনোগত কার্য্য সিদ্ধি সে নদী করয়ে।
তাহার দক্ষিণ স্থল সুন্দর আছয়ে।।
কাঙ্গংলাই নামে এক পর্ব্বতের শৃঙ্গ।
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ।।"

কৃষ্ণমালা — ২য় সর্গ।

উদ্ধৃত অংশে যে-সকল নদী ও পর্ব্বতের নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে বরবক্র (বরাক) নদীর নাম অদ্যাপি অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে ; অন্য কোন নাম বর্ত্তমানকালে প্রচলিত নাই।

(৩) সেকালে সম্ভবতঃ চাথেঙ্গ নদীর দক্ষিণ ভাগে বিষলতা ছিল না, অথবা উক্ত নদীর দক্ষিণদিকস্থ স্থানসমূহে উক্ত লতার বিষ-ক্রিয়া থাকিবে না, প্রাচীনকালে সাধারণের এরূপ বিশ্বাস ছিল।

তার পরে স্বপ্ন কুকি সব কাছে কয়।
দেখিয়া শুনিয়া সবে পাইল প্রত্যয়।।
বিষলতা সেই বনে প্রচুর হইল।
খুচুঙ্গ কুকিয়ে বিষ ই কারণে পাইল।।" ইত্যাদি
কৃষ্ণমালা — ৪র্থ সর্গ।

বিষলতার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় এই প্রবাদ বাক্য কাল্পনিক হইলেও বিষলতা কিন্তু কাল্পনিক পদার্থ নহে। ত্রিপুর পর্ব্বতের এই লতা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা এই লতা দেখিয়াছি এবং ইহার গুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

প্রাচীন সংস্কার

।। ডাইনের কথা ।।

ত্রিপুর রাজ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে সাধারমের মধ্যে, ডাইন বা ডাইনী সম্বন্ধে একটী সংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে। এই শব্দটী "ডাকিনী" শব্দের অপভ্রংশ। প্রাচীন কালে রাজা, প্রজা সকলেই ডাইনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিতেন। মুসলমান সেনানায়ক হৈতন খাঁকে বধ করিবার নিমিত্ত ধন্যমাণিক্য 'বলাগমা' নাম্নী ডাকিনীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"আমার প্রজা খাও তোরা ডাইন সব লোক।
এখন না খাও কেন হৈতন খাঁ সম্মুখ।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২৬ পৃঃ।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয় শ্রেণীর প্রতিই 'ডাইন' শব্দের আরোপ হইয়া থাকে। ত্রিপুর ভাষায় ডাইনকে 'ছেকাল্' বলে। লোকে মনে করে, ইহারা মনুষ্যের অসাধ্য সকল কার্য্যই করিতে পারে। নদীর স্রোত স্তম্ভন, শূন্যপথে গমনাগমন, মন্ত্রবলে মনুষ্যের জীবন সংহার করা ইত্যাদি ইহাদের পক্ষে অতি সহজ কার্য্য। ইহারা ইচ্ছা করিলে যে-কোন ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করাইতে পারে এবং দৃষ্টি-মাত্রেও বধ করিতে পারে। ভোজন-কালে ইহাদের দৃষ্টিপাত হইলে, ভোক্তার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হওয়া অনিবার্য্য। ডাইনের প্রতি লোকের এই সকল বিশ্বাস ত আছেই, তদ্ভিন্ন আরও অনেক অদ্ভুত ধারণা দ্বারা এদের অধিকতর ভয়াবহ করা হইয়াছে। তদ্রূপ দুই একটী বদ্ধমূল সংস্কারের কথা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

(১) রজনীযোগে ডাইনের মাড়ির দন্ত মুখ হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে। সেই দন্ত হইতে নীলাভ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। যদি কোন সুযোগে এই দন্ত কাহারও

গৃহে প্রবেশ করিতে পারে, তবে সেই গৃহস্থের নানাবিধ বিপদ সঙ্ঘটন অনিবার্য্য। *

(২) ইহারা নরখাদক। মন্ত্রবলে মনুষ্যকে বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে।

(৩) ইহাদের দৃষ্টি এ সাঙ্ঘাতিক যে মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক দৃষ্টি নিক্ষেপ করামাত্র মনুষ্যের সদ্য মৃত্যু ঘটে, বৃক্ষের পত্র ঝরিয়া যায়, ইত্যাদি।

কোন ব্যক্তি প্রকৃত ডাইন কি না তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত নানাবিধ প্রক্রিয়ার কতাও প্রচলিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইল।

এই দৃঢ় বিশ্বাস, অনেক স্থলে গুরুতর অনিষ্টপাতের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ১২৯১ ত্রিপুরাব্দে (১৮৮১ খৃঃ) এইরূপ ধারণামূলে সোণামুড়া বিভাগে এক লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। উক্ত বিভাগের অন্তর্বর্ত্তী পাঞ্জিহাম রায় নামক রিয়াং সরদারের পল্লীস্থ কপি রায় নামক এক ব্যক্তি তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা ব্যবসা করিত। চিরপোষিত বিশ্বাসমূলে কালাহা রিয়াং প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি কপি রায়কে ডাইন বলিয়া স্থির করিল। কবি রায়ের স্ত্রী খিচিমাকে ইহারা সমস্ত অবস্থা জানাইয়া তাহার স্বামীকে বধ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করায়, খিছিমা বলিল — “যদি সে ডাইন হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বধ করিতে পার।” অতঃপর দিবা দুই প্রহরে, পর্ব্বতাভ্যন্তরস্থ নিবিড় অরণ্যে, দুর্ভাগা কপি রায়কে বলি প্রদান দ্বারা মহা সমারোহে কালিকা দেবীর অর্চ্চনা করা হয়।

এই সময় স্বনামধন্য স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর সোণামুড়া বিভাগের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার প্রযত্নে অপরাধিগণ ধৃত ও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল ; কিন্তু তদ্দ্বারা লোকের অন্ধ বিশ্বাসের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটে নাই। ইহার পরেও উক্তরূপ হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত সমাজ হইতে ডাইনের আতঙ্ক বিদূরিত হইয়া থাকিলেও রমণী সমাজে এবং অশিক্ষিতদিগের হৃদয়ে প্রাচীন বিশ্বাস অদ্যাপি অটুট রহিয়াছে। ডাইনের নাম শুনিলে এখনও তাহাদের মুখমণ্ডলে মুহূর্ত্ত মধ্যে দারুণ ভীতির ছায়াপাত হইতে দেখা যায়।

ডাইন বা ডাকিনীর অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বাস কেবল ত্রিপুরায়ই পোষিত হইতেছে এমন নহে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কি সভ্য কি অসভ্য, সকল সমাজেই ডাকিনী বিষয়ক বিশ্বাস বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, পুরাণ এবং তন্ত্রাদি গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ এবং অর্চ্চনার বিধি সংযোজিত আছে। ব্রহ্মপুরাণের মতে —

“সার্দ্ধঞ্চ ডাকিনীনাঞ্চ বিকটানাং ত্রিকোটিভিঃ।।”

---

* আলেয়ার আলোর সহিত এই দন্ত সমস্যার সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে।

কাশীখণ্ডের ৩০শ অধ্যায়ে পাওয়া যাইতেছে ;—

"ডাকিনী শাকিনী ভূত প্রেত বেতাল রাক্ষসঃ।।"

ইহারা শিব ও শক্তির অনুচর। ইহাদিগকে সংহারক শক্তির অংশিবিশেষ বলা হইয়াছে। ইহারা সর্ব্বদাই মানবের অমঙ্গলদায়ক।

কোন কোন মানব বা মানবীর প্রতি উপরিউক্তরূপ দোষারোপ অল্পাধিক পরিমাণে সকল দেশেই হইয়া থাকে। শিশুগণের পীড়া হইলে 'ডাকিনী খাইয়াছে' বলিয়া অনেক স্থলে মনে করা হয়। অনেকে বলে — ইহারা মারণ ও বশীকরণ ইত্যাদি মন্ত্রের সাধক-সাধিকা। বর্ত্তমান কালে সাধারণতঃ এই বিশ্বাস অনেক পরিমাণে অন্তর্হিত হইয়া থাকিলেও কুকি, ত্রিপুরা, মঘ, কোল, ভিল প্রভৃতি পার্ব্বত্য সমাজে এখনও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিশ্বাসের দ্বারা নানাবিধ অনিষ্টপাতের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

খোজার বিবরণ

রাজমালায় দ্বিতীয় লহরে পাওয়া যায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে খোজাদিগকে গ্রহণ করা হইত। গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের সেনাপতি গৌড়মল্লিক ত্রিপুরা আক্রমণ করিলে, জনৈক খোজা যে কৃতীত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই বিস্ময়কর। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"খোজাছিল একজন মন্ত্রণা পরিপাটী।
গোমতী বান্ধিল সেই সোণামুড়ার ভাটী।।
নদীকূলে বৈসে ত্রিপুর রাঙ্গামাটী রাজ।
নদী বান্ধি ডুবাইয়া মারিব সমাজ।।
এই যুক্তি করিয়া সেনাকে আজ্ঞা দিল।
সোণামুড়ার ভাটি দিয়া গোমতী বান্ধিল।।
তিন দিন রাখিলেক বান্ধিয়া গোমতী।
পরদিন ভাঙ্গি নদী হৈয়া বেগবতী।।"

ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২৩ পৃঃ।

পাঠান বাহিনীর সহিত উপর্য্যুপরি যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর ত্রিপুর সৈন্যদল খোজার পরামর্শানুসারে এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। ইহার ফলে, নদীর বাঁধের উপরে (উজানে) বিস্তর জল জমা হইয়া, নিম্নদেশের (ভাটির) জল শুকাইয়া গেল। মুসলমানগণ শুষ্ক নদীপথে

আরামের সহিত পার হইবার কালে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তিন দিবসের অবরুদ্ধ জলরাশি হঠাৎ আসিয়া তাহাদের উপরে পতিত হইল। সেই প্রবলবেগে অনেকে ডুবিয়া মরিল, অনেকে আশ্রয়বিহীন অবস্থায় ভাসিয়া গেল। সেনাপতি গৌড়মল্লিক সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া হতাবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পূর্ব্বোক্ত খোজার বুদ্ধি-প্রাখর্য্যের কথা এবং তাঁহার আদেশে সৈনিক বিভাগ পরিচালিত হইবার বিষয় আলোচনা করিলে বুঝা যায়, তিনি এই বিভাগের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহার নাম বা পদবী রাজমালায় লিখিত হয় নাই।

মুসলমান শাসনেও অনেক খোজার বিশেষ প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি লাভের কথা শুনা যায়। খোজা মুসলমান রাজত্ব কালেরই আমদানী। তৎকালে বাদশাহ ও নবাবগণের সৈনিক বিভাগে খোজা সৈন্য নিযুক্ত থাকিত। অন্দরখণ্ডের প্রহরীর কার্য্য নির্ব্বাহ এবং বেগম মহলে যাতায়াত করা ইহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

স্বাভাবিক নপুংসকগণ খোজা নামে অভিহিত ছিল। এতদ্ব্যতীত সে কালে নিষ্ঠুর আচরণ দ্বারা অনেকের পুরুষত্ব বিলোপ করা হইত। ছান্দলী বা আতল্‌ছি, বাদামী ও কাফুরী এই তিন শ্রেণীর খোজার বিবরণ পাওয়া যায়। শিশুকালে যাহাদের উপস্থ ও মুষ্ক ছেদন করা হইত তাহারা আতল্‌ছি বা ছান্দলী, যাহাদের কেবলমাত্র মুষ্ক কর্ত্তন করা হইত, তাহারা বাদামী এবং যাহাদের কেবল উপস্থ ছেদিত হইত, তাহারা কাফুরী আখ্যা লাভ করিত। *

অতিরিক্ত অর্থ লালসায় অনেকে আপন সন্তানদিগকে শৈশবকালেই খোজা করিত। ইহাদিগকে যথেষ্ট মূল্য দিয়া বাদশাহ ও নবাবগণ ক্রয় করিতেন। বালক কিম্বা যুবকদিগকে ক্রয় করিয়া বলপূর্ব্বক খোজা করিবার নৃশংস প্রথা সচরাচরই চলিতেছিল। অনেক স্থলে ইহারা ক্রীতদাস রূপে ব্যবহৃত ও লাঞ্ছিত হইত। † ভারত-সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনকালে এই অমানুষিক নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত সুদৃঢ় রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল ; কিন্তু দাসত্ব প্রথা সম্বন্ধে তৎকালে কোনরূপ প্রতিকার হয় নাই।

শ্রীহট্টে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক খোজা পাওয়া যাইত। সম্রাট আকবরের খ্যাতনামা মন্ত্রী আবুলফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন — "শ্রীহট্টে অনেক খোজা ও ক্রীতদাস-দাসী পাওয়া যায়।" প্রকৃতপক্ষে তৎকালে বালক-বালিকাদিগকে পণ্যদ্রব্যের ন্যায় উচ্চদরে বিক্রয় করা হইত। গেইট সাহেব তদীয় 'History of Assam' গ্রন্থেও এ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহার উত্তর প্রদান করিতে যাইয়া অনেক কথা লিখিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট হইতে ত্রিপুরায় খোজা সংগ্রহ করা অতি সহজ ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই ত্রিপুরার সৈনিক বিভাগে খোজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

---

* আইন-ই-আকবরী — ব্লকমান, ৩৮৯ পৃঃ।

† Yule's Marco Polo, — Vol. II, P. 79.
Wright's Marco Polo, — P. 280.

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(বর্ণমালানুক্রমিক)

অনন্তমাণিক্য ঃ--- (৬১ পৃঃ --- ১৪ পংক্তি)। ইনি মহারাজ বিজয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র। চন্দ্র হইতে গণনায় ১৫৫ এবং ত্রিপুরের অধস্তন ১১০ স্থানীয়। মহারাজ বিজয় জ্যেষ্ঠ পুত্র ডুঙ্গুরকে পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ অনন্তকে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইনিই ত্রিপুর সিংহাসন লাভ করেন। ইনি বাল্যকালে নিতান্ত কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন। রাজা বুঝিলেন, সেনাপতির অনুকূলতা ভিন্ন অনাবিষ্ট পুত্রের সিংহাসন লাভের পথ নিষ্কণ্টক হইবে না। এজন্য তিনি প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যার সহিত পুত্রের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করাইলেন, এবং প্রতিনিয়ত ভাবী রাজার কল্যাণ সাধন করিবার নিমিত্ত গোপীপ্রসাদকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিলেন। কিন্তু অনন্তমাণিক্য রাজ্যলাভ করিবার অল্পকাল পরেই সেনাপতি রাজ্যভোগের লালসায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া, জামাতাকে বধ করতঃ স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেড় বৎসরকাল মহারাজ অনন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছেন।

অমরমাণিক্য ঃ--- (১ পৃঃ --- ৮ পংক্তি)। ইনি মহারাজ দেবমাণিক্যের পুত্র এবং বিজয়মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। চন্দ্রের অধস্তন ১৫৮ ও ত্রিপুরের নিম্নবর্ত্তী ১১৩ স্থানীয়। ইনি উদয়মাণিক্যের পুত্র জয়মাণিক্যকে নিহত করিয়া পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করেন। রাজমালা তৃতীয় লহরে ইঁহার বিশদ বিবরণ বিবৃত হইবে। ইনি ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে এবং ইঁহারই আদেশে রাজমালার দ্বিতীয় লহর রচিত হইয়াছে। এজন্য মহারাজ অমর, ধর্ম্মমাণিক্যের ন্যায় অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

অরিভীম ঃ--- (৬৮ পৃঃ --- ২০ পংক্তি)। ইনি মহারাজ উদয়মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। অরিভীম প্রকৃত নাম নহে, অরাতি মর্দ্দন জনিত উপাধি। তাঁহার নাম ছিল রামদাস। * সেকালে সেনাপতিগণের সাধারণ উপাধি 'নারায়ণ' ছিল, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইনি চট্টগ্রামের পাঠান সমরে লিপ্ত ছিলেন, রাজমালায় এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। ইঁহার "উড়িয়া নারায়ণ" অন্য উপাধি ছিল। অতঃপর বর্ণিত ভাঙ্গিল ফাও এই উপাধি পাইবার কথা জানা যায়। এরূপ উপাধি লাভের কারণ 'ভাঙ্গিল ফা' এর বিবরণে পাওয়া যাইবে।

---

* রামদাসের নাম অরিভীম নারায়ণ।
রাজমালা।

আওয়ান নারায়ণ ঃ— (৬৯ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিক্যের সেনাপতিগণের মধ্যে একজন। চট্টগ্রামের সংগ্রামে প্রধান সেনাপতি রণাগণের সহকারীরূপে ইনি পাঠান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রণাগণের অনবধানতা প্রযুক্ত এই যুদ্ধে ত্রিপুরার পরাজয় ঘটে।

ইন্দ্রমাণিক্য ঃ— (৩৭ পৃঃ — ২ পংক্তি)। ইনি দেবমাণিক্যের পুত্র এবং বিজয়মাণিক্যের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। চন্দ্র হইতে ১৫৩ ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ১০৮ স্থানীয়। দেবমাণিক্যের পরলোকগমনের পর, লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মিথিলাবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ বিজয়মাণিক্যকে কারাগারে নিক্ষেপ, এবং শিশু ইন্দ্রকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্ব এক বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণের অত্যাচারে সেনাপতিগণ উত্ত্যক্ত হইয়া, ইন্দ্রমাণিক্যসহ তাঁহাকে হত্যা এবং মহারাজ বিজয়কে রাজা করিয়াছিলেন। ইঁহার শাসনকাল ১৫২৭ হইতে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক বৎসর।

উদয়মাণিক্য ঃ— (৬৭ পৃঃ — ৩ পংক্তি)। ইতিপূর্ব্বে অনন্তমাণিক্যের বিবরণে বলা হইয়াছে, তিনি স্বীয় শ্বশুর ও সেনাপতি গোপীপ্রসাদ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সেই জামাতাঘাতী সেনাপতিই, উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনরূঢ় হন। ইনি রাজধানী রাঙ্গামাটীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে "উদয়পুর" নামকরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মবিগর্হিত উপায় দ্বারা অভাবনীয় রাজপদ লাভ করিয়া, ইনি নিতান্ত বিলাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছলেন ; দুই শত চল্লিশটী বিবাহ করাই ইহার জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় ভোগের লালসায় পারদঘটিত বটিকা সেবন হেতু ইঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইঁহার শাসনকালে চট্টগ্রামে মুসলমানগণের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হওয়ায়, সেই সমরে প্রধান সেনাপতি রণাগণের তত্ত্বাবধানে তিন হাজার সেনাপতিসহ বায়ান্ন হাজার সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু রণাগণের ঔদ্ধত্য ও অপরিণামদর্শিতার ফলে চট্টগ্রামের পথেই পাঠানগণ কর্ত্তৃক ত্রিপুরার বিপুল বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। এই যুদ্ধে ত্রিপুরার চল্লিশ হাজার এবং পাঠানের পাঁচ হাজার সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল। এবার চট্টগ্রাম মুসলমানগণের কুক্ষিগত হওয়ায় রাজ্যের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, উদয়মাণিক্য সেই ক্ষতি উদ্ধার করিয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। ইঁহার শাসন ১৫৭২ হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল।

একাব্বর ঃ— (৫৩ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। হুমায়ুনের পুত্র, ভারত-সম্রাট মহামতি আকবর সাধারণতঃ একাব্বর বা আকাব্বর নামে পরিচিত ছিলেন। শেরসাহ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হুমায়ুন, বেগমসহ রাজধানী হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন ; এই বিপদের সময় অমরকোটে আকবরের জন্ম হইয়াছিল। ইঁহার রাজত্বকাল ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছে। ইনি সদাচারী, প্রজারঞ্জক দয়ালু এবং পক্ষপাতশূন্য ছিলেন। হিন্দু ও

মুসলমানদিগকে সমান চক্ষে দেখিতেন, এজন্যই তাঁহার সুখ্যাতি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

কমলা ঃ— (৮ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। মহারাণী কমলা মহাদেবী। ইনি মহারাজ ধন্যমাণিক্যের পট্টমহিষী। দান ধর্ম্ম ইঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল ; ইনি ব্রাহ্মণদিগকে অনেক ভূমি দান করিয়াছেন। কসবা নগরের সন্নিহিত কমলাসাগর ইঁহার সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। উদয়পুরেও এই নামে সরোবর খনন করাইয়াছিলেন।

করা খাঁ ঃ— (২৪ পৃঃ — ২৭ পংক্তি)। ইনি পাঠান সেনাপতি ছিলেন। হোসেনশাহ ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্যের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, দ্বিতীয় বারে হৈতন খাঁ-এর সঙ্গে ইঁহাকে ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ যাত্রায়ও ইঁহারা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

কালা খাঁ ঃ— (৪ পৃঃ — ২১ পংক্তি)। ইনি ধর্ম্মমাণিক্যের অমাত্য এবং সেনাপতি ছিলেন। সে কালে সেনাপতিগণের হস্তে শাসনভার ছিল, এ কথা অনেকবার বলা হইয়াছে। ইনি রিয়াং জাতীয়। এই জাতির ভাবী রায় (রাজা) 'চাপিয়া খাঁ' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। এই কারণেই ইঁহার 'খাঁ' উপাধি হইয়াছে।

কালা নাজির ঃ— (৪৩ পৃঃ — ২২ পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি এবং বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইঁহার অসাধারণ শৌর্য্য ও প্রতিভাবলে উত্তরদিকে রাজ্যের সীমা বহু বিস্তৃতি লাভ করে। ইনি চট্টগ্রামে পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁয়ের সহিত সংগ্রামে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া, সমরশায়ী হইয়াছিলেন।

কৌতুক ঃ— (৩ পৃঃ — ২২ পংক্তি)। ইনি কান্যকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণ। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য বারাণসীধাম হইতে ইঁহাকে আনিয়া স্বীয় পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কুমিল্লার ধর্ম্মসাগর উৎসর্গোপলক্ষে মহারাজ ধর্ম্ম, আট জন ব্রাহ্মণকে কালিয়াজুড়ি প্রভৃতি গ্রামের ভূমিদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কৌতুকের নামও পাওয়া যায়। ইঁহার বংশ অনেক কাল পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

খড়্গা রায় ঃ— (২৫ পৃঃ — ১২ পংক্তি)। ইনি ধন্যমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। হৈতন খাঁ প্রমুখ প্রবল পাঠান বাহিনী ত্রিপুরা বিজয়ের নিমিত্ত আসিয়া জামির খাঁ গড় আক্রমণ করিবার কালে খড়্গা রায় সেই গড়ের সেনানায়ক ছিলেন। ইনি বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও গড় রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে হৈতেন খাঁ-এর হস্তে পরাজিত হইয়া ছয়ঘরিয়া গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

গগন খাঁ ঃ— (৪ পৃঃ — ২১ পংক্তি)। ইনি ধর্ম্মমাণিক্যের অমাত্য ও সেনানায়ক। ধন্যমাণিক্যের সময়েও ইনি সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ-এর

ত্রিপুরা আক্রমণ কালে ছয়ঘরিয়া গড় গগন খাঁ-এর তত্ত্বাবধানে ছিল। জামির খাঁ গড় জয় করিয়া হৈতন খাঁ ছয়ঘরিয়া গড় আক্রমণ করিলেন। এই সময় গগন খাঁ তিন প্রহর কাল প্রবল বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে পরাজিত ও পলায়নপর হইয়াছিলেন। এই সেনানিবাস হৈতন খাঁ অধিকার করেন।

গজভীম ঃ— (৪৮ পৃঃ — ১৯ পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি। পাঠান সৈন্যাধ্যক্ষ মমারক খাঁ-এর সহিত চট্টগ্রামের যুদ্ধে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুর সেনাপতি কালা নাজির হত হইবার পর রাত্রিকালে পাঠানগণ নিশ্চিন্ত মনে গড়ের ভিতর রন্ধনাদি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাকালে, সেনানায়ক গগন খাঁ-এর পরামর্শানুসারে ত্রিপুর সৈন্যগণ এক সুড়ঙ্গ খনন করিয়া সেই পথে গড়ে প্রবিষ্ট হইয়া অকস্মাৎ পাঠানদিগকে আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিয়াছিল। সেনাপতি মমারক খাঁকে ধৃত ও লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধাবস্থায় দরবারে উপস্থিত করিবার পর, তাঁহাকে চতুর্দ্দশ দেবতার নিকট বলি দেওয়া হয়। 'গজভীম' ইঁহার নাম নহে — উপাধি। বিশেষ পারদর্শিতার সহিত হস্তী খেদায় বহুসংখ্যক হস্তী ধৃত করিয়া এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

গদাভীম ঃ— (৬৫ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। ইঁহার নাম ছিল ময়ূরধ্বজ। * ইনি অনন্তমাণিক্যের মল্লগুরু ছিলেন। অনন্তের শ্বশুর ও সেনাপতি গোপীপ্রসাদ (পরে উদয়মাণিক্য) রাজ্যলোভে জামাতাকে (রাজাকে) বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি গদাভীমকে নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া, রাজাকে মল্লবিদ্যা শিক্ষা প্রদান কালে গলা টিপিয়া মারিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মভীরু গদাভীম এই প্রস্তাবে অসম্মত হওয়ায়, গোপীপ্রসাদ স্বীয় ভাগিনেয় বীরমর্দ্দন নারায়ণের দ্বারা সেই কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন।

গরুড়ধ্বজ ঃ— (৬৮ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিক্যের সেনাপতি অরিভীমের পুত্র, † নিজেও সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। 'গরুড়ধ্বজ' নাম নহে — উপাধি। গৌড়ের সহিত বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া এই উপাধি পাইয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"গৌড় সৈন্য সঙ্গে তার বহু ছিল রণ।
গরুড়ধ্বজ খ্যাতি তার হইল তখন।।"

এই সেনাপতির নাম কি ছিল, জানা যাইতেছে না, রাজমালায় কেবল উপাধিরই উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে।

---

* "গদাভীম নারায়ণ ময়ূরধ্বজ নাম।"
রাজমালা — ৩য় লহর, রত্নমাণিক্য খণ্ড।

† গরুড়ধ্বজ নাম অরিভীমের নন্দন।
রাজমালা।

গোপীপ্রসাদ নারায়ণ ঃ— (৬২ পৃঃ — ২৩ পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিক্যের ও তৎপর অনন্তমাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার কন্যাকে অনন্তমাণিক্য বিবাহ করেন। রাজা অল্পবয়স্ক ছিলেন, শ্বশুর গোপীপ্রসাদই জামাতার পক্ষে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। কিয়ৎকাল পরে ইনি রাজ্যলাভের লালসায় জামাতাকে গোপনে হত্যা করিয়া উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার সময়ে রাজধানী রাঙ্গামাটীর 'উদয়পুর' নামকরণ হইয়াছে।

গৌড়মল্লিক ঃ— (২২ পৃঃ — ২১ পংক্তি)। ইনি গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের সেনাপতি ছিলেন। ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে চট্টগ্রামের অধিকার মুসলমানগণের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়ায়, হোসেনশাহ হৃতপ্রদেশ পুনরুদ্ধার ও ত্রিপুর রাজ্য হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে এই সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুর বাহিনী কৌশলক্রমে ইঁহার অধিকাংশ সৈন্য গোমতীর জলে ডুবাইয়া বধ করায়, ইনি বিশেষ বিপন্নাবস্থায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

চন্দ্রসিংহ নারায়ণ ঃ— (৬৯ পৃঃ — ২২ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিক্যের সেনাপতি। পাঠান বাহিনীর সহিত চট্টগ্রামের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি রণাগণের সঙ্গে ইনিও ছিলেন। ইঁহার উপাধি ছিল 'চন্দ্রদর্প'। কি উপলক্ষে এই উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, জানিবার উপায় নাই।

ছামথম্ খাঁ ঃ— (৪ পৃঃ — ২১ পংক্তি)। রাজমালায় ইঁহার নাম 'খাঁ ছামথুম্' লিখিত হইয়াছে। ইনি রিয়াং জাতীয়। ধর্ম্মমাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি ও অমাত্য ছিলেন।

জয়মাণিক্য ঃ— (৭২ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিক্যের পুত্র ; পিতার অভাবে ত্রিপুর সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। ইঁহার শাসনকালে, সেনাপতি রণাগণ (রঙ্গ নারায়ণ) শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। জয়মাণিক্য রাজবংশীয় নহেন। ইঁহার পিতা সেনাপতি ছিলেন, পরে অনন্তমাণিক্যকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। জয়মাণিক্য পিতার পরিত্যক্ত সিংহাসন অধিককাল ভোগ করিতে পারেন নাই। সেনাপতি অমরদেব (ইনি দেবমাণিক্যের পুত্র) ইঁহাকে বধ করিয়া পৈতৃক সিংহাসন ভিন্নবংশীয় রাজার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইনি ১৫৭৬ — ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দেড় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জয়া মহাদেবী ঃ— (৬৭ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। অনন্তমাণিক্যের মহিষী — নাম জয়াবতী। ইনি উদয়মাণিক্যের (সেনাপতি গোপীপ্রসাদের) দুহিতা ছিলেন। পিতা কর্ত্তৃক পতি নিহত হইবার পর, ইনি সহমরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, পিতার বাধা অতিক্রম করিয়া সেই সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এই তেজস্বিনী রমণী পিতার প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহাকে অপদস্থ করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিলেন, "তুমি রাজাকে বধ করিয়া রাজ্য অধিকার করিয়াছ, রাণীকে গ্রহণ করা বাকী থাকিবে কেন?" ইহা বলিয়া তিনি পিতার বামপার্শ্বে সিংহাসনে

বসিতে উদ্যতা হইয়াছিলেন। পিতা গোপীপ্রসাদ উপায়ান্তর না দেখিয়া সিংহাসন হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক অবতরণ করিলেন। তিনি দুহিতার হাত এড়াইবার নিমিত্ত চন্দ্রপুর নামক স্থানে রাজপাট উঠাইয়া নিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

জামাল খাঁ পন্নি ঃ— (৭১ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। পাদশাহনামার মতে ইঁহার নাম জামাল খাঁ পোমারী। ইনি পাঠান সেনাপতি। উদয়মাণিক্যের শাসনকালে চট্টগ্রামের অধিকার পাঠানের হস্তগত হইবার পরে সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ইঁহাকে চট্টগ্রামে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ইনি রাজা বলদেবের সহিত কামরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ডাঙ্গর ফা ঃ— (১৭ পৃঃ — ৮ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুর সিংহাসনের ১৪৩ সংখ্যক ভূপতি ; নামান্তর হরিরায়। রাজমালা প্রথম লহরের টীকায় ইঁহার বিবরণ লিখিত হওয়ায়, এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

ডুঙ্গুর ঃ— (৬১ পৃঃ — ১৩ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দৈবজ্ঞের গণনায় স্থির হয়, ইঁহার ছেদ যোগে জন্ম হইয়াছে ; সুতরাং অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু ঘটিবে। ইঁহার চরিত্রও অতিশয় মন্দ ছিল। এই সকল কারণে মহারাজ বিজয় ইঁহাকে তীর্থবাসের উদ্দেশ্যে উড়িষ্যায় পাঠাইয়া দ্বিতীয় পুত্র অনন্তকে রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

ত্রিলোচন ঃ— (১০ পৃঃ — ২ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুরার ৪৭ সংখ্যক ভূপতি, ভারত-সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার বিবরণ প্রথম লহরে লিখিত হওয়ায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

দায়ুদ বাদশা ঃ— (৫৩ পৃঃ — ৭ পংক্তি)। ইনি সুলেমান কররাণির পুত্র, পিতার পরলোকগমনের পরে, বঙ্গের তক্ত লাভ করেন। ইনি সম্রাট আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। বঙ্গের অধিকার প্রাপ্তির কিয়ৎকাল পরে দায়ুদ, আকবরের প্রভুত্ব উপেক্ষা করিয়া বিহার আক্রমণ করেন। কিন্তু সম্রাটের সেনাপতি মুনায়েম খাঁ ও রাজা তোডরমল্ল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। এই সন্ধিদ্বারা দায়ুদের একমাত্র উড়িষ্যার অধিকার স্থিরতর রহিয়াছিল। সৈন্যাধ্যক্ষ মুনায়েম খাঁ পরলোকগত হইবার পর, দায়ুদ সন্ধিসূত্র ছিন্ন করিয়া পুনর্ব্বার বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও নিহত হন। এই ঘটনা হইতেই বঙ্গে পাঠান শাসন চিরকালের তরে বিলুপ্ত ও মোগল অধিকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। দায়ুদ, ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার সহিত চট্টগ্রামের অধিকারঘটিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছিলেন।

দুর্ল্লভ চন্তাই ঃ— (৫০ পৃঃ — ১৮ পংক্তি)। ইঁহার পূর্ণ নাম দুর্ল্লভেন্দ্র চন্তাই। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের সময় হইতে ইনি চতুর্দ্দশ দেবতার প্রধান পূজক ছিলেন এবং ইঁহার বর্ণিত

বিবরণ অবলম্বনে রাজমালা প্রথম লহর রচিত হইয়াছে। ইঁহারই প্ররোচনায়, সমরক্ষেত্রে ধৃত গৌড়েশ্বর দায়ুদ শাহের শ্যালক ও সেনাপতি মমারক খাঁকে চতুর্দ্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল ; ইহা বিজয়মাণিক্যের শাসনকালের কথা। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই প্রাচীন চন্তাই পরলোকপ্রাপ্ত হওয়ায় মহারাজ বিজয় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বিজয়দুর্ল্লভ নারায়ণকে চন্তাই পদে বরণ করিয়াছিলেন।

দুর্ল্লভনারায়ণ ঃ— (৪০ পৃঃ — ১২ পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিক্যের শ্বশুর ও সেনাপতি দৈত্য নারায়ণের কনিষ্ঠ সহোদর। বিজয়মাণিক্য অল্পবয়স্ক থাকায়, দৈত্যনারায়ণ রাজকার্য্য করিতেছিলেন। তিনি ক্ষমতাগর্ব্বে উন্মত্ত হইয়া পদে পদে রাজাকে উপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার প্রাধান্যের সুযোগ অবলম্বনে দুর্ল্লভনারায়ণ নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রজাবর্গের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার, পরস্ত্রীহরণ তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিল। অতঃপর বিজয়মাণিক্য উপায়ান্তর না দেখিয়া, দৈত্যনারায়ণের জ্যেষ্ঠ কন্যার জামাতা মাধবের দ্বারা তাঁহাকে বধ করাইয়া, এই সকল উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন।

দেবমাণিক্য ঃ— (২৫ পৃঃ — ২৯ পংক্তি)। ইনি ধন্যমাণিক্যের পুত্র। চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৫২ ও ত্রিপুর হইতে ১০৭ স্থানীয় রাজা। মিথিলা-নিবাসী লক্ষ্মীনারায়ণ নামক এক তান্ত্রিক সাধক দেবমাণিক্যকে শিষ্য করিয়া তাঁহার উপর অমিত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় দেবমাণিক্য দেবীর দর্শনলাভের নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে আট জন সেনাপতিকে শ্মশানক্ষেত্রে বলি প্রদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে শ্মশান-সাধনকালে দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ রাজাকে বধ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইঁহাকেও কিয়ৎকাল পরে সেনাপতিগণের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল। দেবমাণিক্যের শাসনকাল ১৫২২ হইতে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল।

দৈত্যনারায়ণ ঃ— (৩৭ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিক্যের শ্বশুর ও সেনাপতি ছিলেন। দৈত্যনারায়ণ প্রমুখ সেনাপতিগণ সমবেতভাবে ইন্দ্রমাণিক্যকে বধ করিয়া বিজয়মাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করেন। এবং দৈত্যনারায়ণ স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিয়া, পদে পদে রাজার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ আরম্ভ করেন। এই সময় দৈত্যনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা দুর্ল্লভনারায়ণ কর্ত্তৃক রাজ্য মধ্যে নানাবিধ অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হইয়াছিল। মহারাজ বিজয় অনন্যোপায় হইয়া দৈত্যনারায়ণকে বধ করিয়া সুশাসনের পথ উন্মুক্ত করিতে বাধ্য হন। দৈত্যনারায়ণ উড়িষ্যা হইতে জগন্নাথ বিগ্রহ আনয়ন ও উদয়পুরে স্থাপন করিয়াছিলেন।

ধন্বন্তরীনারায়ণ ঃ— (৬৩ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। ইনি চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন। ইঁহার পুত্র যাদুরায় বা যাদুবৈদ্য, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের অন্তিমকালের চিকিৎসক। ইনি ত্রিপুরা জাতীয় এবং "নারায়ণ" উপাধিধারী থাকা জানা যাইতেছে।

ধন্যমাণিক্য ঃ— (৬ পৃঃ — ১৫ পংক্তি)। ইনি মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র। চন্দ্র হইতে অধস্তন ১৫১ ও ত্রিপুর হইতে ১০৬ স্থানীয়। পিতার পরলোকগমনের পর সেনাপতিগণ ইঁহাকে বঞ্চিত করিয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপকে রাজা করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে সেই সেনাপতিগণই প্রতাপমাণিক্যকে নিহত করিয়া, ধন্যমাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করেন। ইনি রাজা হইয়া দেখিলেন, রাজার অদৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে সেনাপতিগণের কৃপার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি কৌশলক্রমে তাঁহাদিগকে বধ করিয়া ভবিষ্যৎ আশঙ্কা নিবারণ করিলেন। অতঃপর বিশ্বস্ত নূতন সেনাপতি নিযুক্ত ও সৈনিক বিভাগ সংগঠন করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। ইঁহার শাসনকালে রাজ্যের সীমা বিস্তর প্রসারিত হইয়াছিল। ইনি চট্টগ্রামের অধিকার লইয়া পাঠানগণের সহিত বারম্বার আহবে লিপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গেশ্বর হোসেনশাহ ইঁহার হস্তে পুনঃ পুনঃ পরাভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে দেবার্চ্চনায় নরবলির সংখ্যা অনেক হ্রাস করা হয়। মহারাজ ধন্য বঙ্গভাষার পোষক ছিলেন ; তাঁহার প্রযত্নে উৎকলখণ্ড এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। সেই সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান কালে পাওয়া যাইতেছে না। ইনি ত্রিহুত হইতে সঙ্গীতজ্ঞ লোক আনাইয়া, স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্যে ও প্রজা সমাজে নৃত্যগীতের প্রচলন করিয়াছিলেন। দেবালয় গঠন ও দেবতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি মহারাজ ধন্যের অম্লান কীর্ত্তি। তন্মধ্যে উদয়পুর পীঠস্থানে মন্দির নির্ম্মাণ ও ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তি স্থাপনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; ইতিপূর্ব্বে তদ্বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইনি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া, বসন্ত রোগে মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৪৬৩ হইতে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার রাজত্বকাল।

ধর্ম্মমাণিক্য ঃ— (২ পৃঃ — ২ পংক্তি)। ইনি মহামাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। চন্দ্রের অধস্তন ১৪৯ ও ত্রিপুরের পরবর্ত্তী ১০৪ স্থানীয়। মহারাজ ধর্ম্ম পিতা বিদ্যমানে সন্ন্যাসীবেশে তীর্থভ্রমণে রত ছিলেন। পিতৃ বিয়োগের পর রাজ্যে আগমনপূর্ব্বক সিংহাসনারোহণ করেন। কুমিল্লানগরীস্থিত ধর্ম্মসাগর ইঁহার সমুজ্জ্বল কীর্ত্তি। ইঁহার শাসনকালের বিশেষত্ব এই যে, সেই সময়ের মধ্যে যুদ্ধাদি অশান্তিদায়ক কোন ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই এবং প্রকৃতিপুঞ্জ সুখশান্তিতে কালাতিপাত করিয়াছে। মহারাজ ধর্ম্ম ১৪৩১ হইতে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারাই রাজমালা রচনার সূত্রপাত হইয়াছে।

নির্ভয়নারায়ণ ঃ— (৪৫ পৃঃ — ১০ পংক্তি)। ইনি হেড়ম্ব রাজ্যের অধীশ্বর এবং ত্রিপুরাধিপতি বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। বিজয়মাণিক্য জয়ন্তিয়ার বিরুদ্ধে হাড়ি সৈন্য প্রেরণ করিবার পর, জয়ন্তিয়ারাজ হেড়ম্বের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হেড়ম্বপতি নির্ভয়নারায়ণের মধ্যবর্ত্তীতায় সেই বিবাদের মীমাংসা হইয়াছিল। নির্ভয়নারায়ণ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ১৬০—১৬১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিরোজ খাঁ আন্নি ঃ— (৭১ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। ইনি গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর উদয়মাণিক্যের শাসনকালে পাঠান-বাহিনী চট্টগ্রামের অধিকার ত্রিপুরার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়ায়, সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত বঙ্গেশ্বর, জামাল খাঁ পন্নির সহযোগে ইঁহাকে চট্টলে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পুণ্যবতী ঃ— (৩৯ পৃঃ — ৭ পংক্তি)। ইনি ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের মহিষী। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"বিজয়মাণিক্য নাম হইল নরপতি।
তাহান মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

শ্রেণীমালা আলোচনায় জানা যায়, ইঁহার অপর নাম ছিল — লক্ষ্মীবালা। ইনি প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যা ছিলেন। মহারাজ বিজয়, রাজক্ষমতাগ্রাসী দৈত্যনারায়ণের নিধন দ্বারা শাসনের পথ নিষ্কণ্টক করেন। এতদুপলক্ষে মহারাণী পতিকে তীব্র ভর্ৎসনা দ্বারা ব্যথিত এবং দৈত্যনারায়ণের হত্যাকারী মাধবকে রাজার অগোচরে নিহত করায়, মহারাজ ক্ষুব্ধ হইয়া ইঁহাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহারাণী পুণ্যবতী, হোমনাবাদ ও তিষ্ণা প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে বিস্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন।

প্রচণ্ড উজীর ঃ— (৪৫ পৃঃ — ২৩ পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিক্যের উজীর (মন্ত্রী) ছিলেন।* পাঠান সৈন্যগণের দুই মাসের বেতন প্রদান করিতে বিলম্ব হওয়ায়, তাহারা

---

* উজীর পদ এবং আরও কতিপয় পদ মুসলমান শাসনের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালেই এই সকল উপাধি প্রচলিত হয়। ত্রিপুর বংশাবলী পুস্তিকায় বিজয়মাণিক্যের প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

"বিজয়মাণিক্য রাজা বুদ্ধিমন্ত ছিল।
কৌশল করিয়া রাজ্য শাসিতে লাগিল।।
উজীর সুবা নাজির কবরা আর যে দেওয়ান।
বরুয়া হাজারী মুন্সী ঠাকুর হুদ্দাবান।।
এ সমস্ত আমলাসহ পরামর্শ করি।
শাসিতে লাগিল রাজ্য করি বাহাদুরী।।" ইত্যাদি।

ত্রিপুর রাজ্যে কিরূপ যোগ্যতর ব্যক্তিকে উজীর নিযুক্ত করা হইত, কৃষ্ণমালা গ্রন্থে তাহার আভাস পাওয়া যায় ; যথা —

"বিমল কুলেতে জন্ম যে জনার হয়।
দেবেতে দ্বিজেতে ভক্তি যাহার থাকয়।।
শাস্ত্রেতে পণ্ডিত হয়, হয়ে ধর্ম্মে মতি।
প্রজার পালন জানে, জানে রাজনীতি।।

বিদ্রোহী হইয়া ইঁহাকে মেহেরকুলে (কুমিল্লানগরীতে) বধ করিয়াছিল। বিদ্রোহী সৈন্যদল রাজাকে বধ করিয়া রাজধানী আক্রমণের নিমিত্তও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, মহারাজ বিজয় স্বয়ং সমরক্ষেত্রে ইহাদিগকে বিনাশ করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন।

প্রতাপ ঃ— (৬ পৃঃ — ১৫ পংক্তি)। (প্রতাপমাণিক্য)। ইনি ধর্ম্মমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র ; পিতার পরলোকগমনের পর, সেনাপতিগণের সাহায্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যকে অন্তরিত করিয়া, পৈতৃক সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার রাজত্ব এক বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অধার্ম্মিক ছিলেন বলিয়া সেনাপতিগণ রাত্রিকালে ইঁহাকে গোপনে হত্যা করিয়া জ্যেষ্ঠ ধন্যমাণিক্যকে সিংহাসন প্রদান করেন। ইনি ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন এবং সেই সালেই নিহত হন। মহারাজ প্রতাপ, চন্দ্র হইতে ১৫০ ও ত্রিপুর হইতে গণনায় ১০৫ স্থানীয় ছিলেন।

প্রতাপ ঃ— (১৩ পৃঃ — ৮ পংক্তি)। ইনি গৌড় রাজ্যের অধীনস্থ, ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বরদাখাত পরগণার জমীদার ছিলেন। ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্য বঙ্গরাজ্যের পূর্বাঞ্চল হস্তগত করিবার কালে, জমীদার প্রতাপ গৌড়েশ্বরের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া ত্রিপুরেশ্বরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

প্রতাপনারায়ণ ঃ--- (৪৫ পৃঃ --- ২৯ পংক্তি)। ইনি প্রচণ্ড উজীরের পুত্র এবং ত্রিপুরাধিপতি বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। প্রতাপ পিতার সঙ্গে মেহেরকুলে (কুমিল্লায়) অবস্থানকালে, ত্রিপুরেশ্বরের বিদ্রোহী পাঠান সৈন্যগণ উজীরকে বধ করায়, প্রতাপ নারায়ণ নিরুপায় হইয়া, অরণ্যে প্রবেশপূর্বক স্বীয় জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

বলাগমা ঃ— (২৬ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। বলাগমা একজন পার্বত্য রমণী। প্রাচীন রাজমালায় ইহার নাম বলাংমা লিখিত হইয়াছে। এই রমণী ‘ডাইন’ (ডাকিনী) বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ ত্রিপুর আক্রমণের নিমিত্ত আগমন করায়, তাঁহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত মহারাজ ধন্যমাণিক্য বলাগমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। [‘ডাইন’ সম্বন্ধীয় বিবরণ পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।]

শিষ্টের রক্ষণ জানে দুষ্টের দমন।
ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে সুজন দুর্জ্জন।।
সভা উপযুক্ত কথা কহিবারে জানে।
কাব্যেতে রসিক হয়, পরাক্রমী রণে।।
প্রিয় বাণী কহে, হয় প্রিয় দরশন।
সাধয়ে প্রভুর কার্য্য করি প্রাণপণ।।
বিপদে চঞ্চল নহে থাকয়ে সুস্থির।
হেন জন হইবারে উচিত উজীর।।”
কৃষ্ণমালা।

বাণেশ্বর ঃ— (৫ পৃঃ — ৭ পংক্তি)। ইনি রাজপুরোহিত এবং সভাপণ্ডিত ছিলেন। স্বীয় সহোদর শুক্রেশ্বরের সহযোগে ইনি রাজমালার প্রথম লহর রচনা করিয়াছেন। উক্ত লহরে বাণেশ্বরের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য, ধর্ম্মসাগর প্রতিষ্ঠা কালে অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত ইঁহাকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।

বিজয়মাণিক্য ঃ— (৩৭ পৃঃ — ৬ পংক্তি)। ইনি মহারাজ দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। চন্দ্রের অধস্তন ১৫৪ ও ত্রিপুর হইতে ১০৯ স্থানীয়। পিতৃবিয়োগের পর লক্ষ্মীনারায়ণ নামক মৈথিল ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় বিজয়কে অবরুদ্ধ করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইন্দ্রমাণিক্য সিংহাসন অধিকার করেন। অল্পকাল পরে সেনাপতিগণ লক্ষ্মীনারায়ণ ও জামাতৃ ইন্দ্রমাণিক্যকে নিহত করিয়া বিজয়কে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। বিজয়মাণিক্য রাজা হইলেন সত্য, তাঁহার শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ রাজাকে সাক্ষীগোপাল স্বরূপ রাখিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন। এই সময় অবিচার অত্যাচারে প্রকৃতিপুঞ্জ উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ বিজয় উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্বশুরকে বধ করিতে বাধ্য হইলেন। ইঁহার শাসনকালে রাজ্যের সীমা অসাধারণ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। গৌড়ের সহিত ইঁহার বারম্বার যুদ্ধ হইয়াছে। ইনি বঙ্গ বিজয়ার্থ নির্গত হইয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। কেবল শূরত্বে নহে, ধর্ম্মানুষ্ঠানেও ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের মধ্যে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মহারাজ বিজয় দিল্লীর সম্রাট মহামতি আকবরের সমসাময়িক রাজা। ইনি ১৫২৮ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজ্যশাসন করিয়া বসন্ত রোগে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

বিজয়দুর্ল্লভ নারায়ণ ঃ— (৬১ পৃঃ — ৬ পংক্তি)। দুর্ল্লভেন্দ্র চন্তাই-এর মৃত্যুর পর বিজয়মাণিক্য কর্ত্তৃক ইনি চন্তাই পদে (চতুর্দ্দশদেবতার প্রধান পূজক) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রাজমালায় উল্লেখ আছে, মহারাজ চতুর্দ্দশদেবতা কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ইঁহাকে উক্ত পদ প্রদান করেন।

বীরমর্দ্দননারায়ণ ঃ— (৬৬ পৃঃ — ১৪ পংক্তি)। ইনি অনন্তমাণিক্যের সেনাপতি এবং রাজার শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি গোপীপ্রসাদের ভাগিনেয়। গোপীপ্রসাদ, রাজাকে বধ করিয়া রাজ্যলাভের প্রয়াসী হন ; এবং এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদনার্থ প্রথমতঃ রাজার মল্ল-গুরু গদাভীমকে অনুরোধ করেন। গদাভীম এই ঘৃণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, বীরমর্দ্দনের দ্বারা তাহা সাধিত হইয়াছিল। এই কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক, আশ্রয়দাতা রাজাকে গুপ্তহত্যা করিয়া বীরমর্দ্দন নাম কলঙ্কিত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নাই। ইহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা।

ভাঙ্গিল ফা ঃ— (৭১ পৃঃ — ২৮ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিক্যের অন্যতম সেনাপতি। ইঁহার উপাধি ছিল উড়িয়ানারায়ণ। কেহ কেহ মনে করেন, উড়িষ্যা বিজয় হেতু ইঁহার এই উপাধি লাভ হইয়াছিল ; এই অনুমান প্রকৃত নহে। রাজালা তৃতীয় লহরে, অমরমাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যায় ;—

> "রাম্বু আদি করি রাজ্য ছয় থানা লয়।
> দেয়াঙ্গ উড়িয়া রাজ্য লইতে আশয়।।"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, মঘগণের অধিকৃত রাম্বু ও দেয়াঙ্গ প্রভৃতি স্থানের সন্নিকটে উড়িয়া রাজ্য ছিল। এই স্থান জয় করিয়াই "উড়িয়া নারায়ণ" উপাধি লাভ করিয়াছেন। * অধ্যাপক শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন, উড়িষ্যা দেশীয় কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভাঙ্গিল ফা গৌড়েশ্বরের সহিত চট্টগ্রামের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের তোপের মুখে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ভানুনারায়ণ ঃ— (৫৭ পৃঃ — ১১ পংক্তি)। মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে ইনি শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত ইটা পরগণার জনৈক তালুকদার ছিলেন, — জাতিতে ব্রাহ্মণ। মহারাজ বিজয় দিগ্বিজয় উপলক্ষে ইটায় গমনকালে ইঁহাকে বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিষ্কর প্রদান করেন। অতঃপর গ্রহীতার প্রার্থনানুসারে উক্ত ভূমির এক চতুর্থাংশ রাজকর ধার্য্য হইয়াছিল।

ভৃগুরাম ঃ— (৫৪ পৃঃ — ২২ পংক্তি)। ইঁহার নামান্তর পরশুরাম ও ভার্গব। জমদগ্নির পুত্র বলিয়া ইঁহার অন্য নাম জামদগ্ন্য। ইনি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের নিধন সাধন ও পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যা করিয়াছিলেন। এই বীরপুরুষকর্ত্তৃক পৃথিবী একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া হইয়াছিল। ইনি দশ অবতারের মধ্যে ৬ষ্ঠ অবতার বলিয়া পরিগণিত। মাতৃহত্যার পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত ইনি ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে যাইয়া পরশুর সাহায্যে উক্ত কুণ্ডের তীর খননদ্বারা ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

মমারক খাঁ ঃ— (৪৬ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। কেহ কেহ ইঁহাকে মহম্মদ খাঁ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু পাদশাহনামার মতে মমারক খাঁ নামই বিশুদ্ধ। ইনি গৌড়েশ্বর দায়ুদ শাহের শ্যালক ও সেনাপতি ছিলেন। চট্টগ্রামের যুদ্ধে ত্রিপুর বাহিনী কর্ত্তৃক ধৃত ও পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রাজদরবারে নীত হওয়ার পর, ইঁহাকে চতুর্দ্দশ দেবতার সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল।

---

* কবি ভবানী দাসের ময়নামতীর গানে উরুয়া (উড়িয়া) রাজার নাম পাওয়া যায়। মেহেরকুল ও পাটিকারার রাজা গোবিন্দচন্দ্র (নামান্তর গোপীচাঁদ) উড়িয়া রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামে গোবিন্দের আধিপত্য থাকিবার প্রমাণ ময়নামতীর গানে পাওয়া যায়। সুতরাং এই উড়িয়া রাজা রাজমালায় লিখিত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, ইহাই বুঝা যাইতেছে।

পাদশাহ নামায় পাওয়া যায়, ইনি কামরূপের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত হইয়া রাঙ্গামাটীতে অবস্থানপূর্ব্বক কিয়ৎকাল উক্ত প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

মহামাণিক্য ঃ— (১ পৃঃ — ১৩ পংক্তি)। ইনি রাজমালা প্রথম লহরের অন্তর্গত শেষ রাজা। প্রথম লহরে ইঁহার বিবরণ প্রদান করায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

মাধব ঃ— (৪০ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। ইনি বিজয়মাণিক্যের শ্বশুর ও প্রধান সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের জ্যেষ্ঠা কন্যার-জামাতা। দৈত্যনারায়ণ ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার ধনসম্পত্তি সমস্তই জামাতার হস্তে ছিল ; এমনকি, মাধব আহার্য্য প্রদান না করিলে দৈত্যনারায়ণ আহার করিতেন না।

বিশ্বাসঘাতক মাধব, বিজয়মাণিক্যের প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া শ্বশুরকে স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন। দৈত্যনারায়ণের কন্যা (বিজয়মাণিক্যের মহিষী) পিতৃহন্তা মাধবকে গুপ্তচরদ্বারা নিহত করিয়া তাঁহার পাপের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায়।

মুকুন্দ ঃ— (৬১ পৃঃ — ২২ পংক্তি)। ইনি উড়িষ্যার ভূপতি এবং বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক ছিলেন। মহারাজ বিজয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডুঙ্গুর ফা-এর কোষ্ঠীতে ছেদযোগ আছে, দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া এরূপ বলায়, মহারাজ সেই পুত্রকে পুরুষোত্তমধামে অবস্থান করিবার জন্য প্রেরণ করিয়া, তাঁহাকে সযত্নে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উড়িষ্যাপতি মুকুন্দদেবকে পত্রদ্বারা অনুরোধ করিয়াছিলেন।

বিশ্বকোষে (মাদলপঞ্জী নামক পুথি অনুসারে) উড়িষ্যার ভূপতিবৃন্দের যে বংশতালিকা প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে তিন জন মুকুন্দদেবের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম মুদুন্দদেব, প্রখ্যাতনামা মহারাজ চোরগঙ্গার অধস্তন ২৮শ স্থানীয়। ইনি রাজা রঘুনাথ ছোটরার পুত্র, ১৪৭৩ শক হইতে ১৪৮১ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৫০ — ১৪৯২ শক। সুতরাং এই মুকুন্দদেবই মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সমসাময়িক সাব্যস্ত হইতেছেন।

যাদুবৈদ্য ঃ— (৬৩ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। ইনি জাতিতে ত্রিপুরা এবং ধন্বন্তরীনারায়ণের পুত্র। চিকিৎসা ব্যবসায়ী বলিয়া 'বৈদ্য' উপাধি লাভ করেন। মহারাজ বিজয়মাণিক্য বসন্তরোগে আক্রান্ত হওয়ায় এই ব্যক্তি তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু রোগের প্রবল আক্রমণ হইতে তিনি রাজাকে রক্ষা করতে সমর্থ হন নাই, এই রোগেই মহারাজ বিজয় পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

রণচতুরনারাণ ঃ— (১ পৃঃ — ১১ পংক্তি)। ইনি মহারাজ অমরমাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন। মহারাজের আদেশানুসারে রাজমালা দ্বিতীয় লহর এই সেনাপতি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। এই লহরের লেখক কে ছিলেন, রাজমালায় উল্লেখ নাই, এবং বর্ত্তমান কালে তাহা জানিবারও উপায় নাই।

রণাগণনারায়ণ ঃ— (৬৯ পৃঃ — ১৭ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিক্যের ভগিনীপতি ও সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম রঙ্গনারায়ণ। চট্টগ্রামের পথে ইনি পাঠান কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া পলায়নপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করেন। এই যুদ্ধে ত্রিপুরেশ্বরের চল্লিশ সহস্র সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল, বিনষ্ট পাঠান সৈন্যের সংখ্যা মাত্র পঞ্চ সহস্র। ইনি প্রাচীন বয়স্ক ছিলেন বলিয়া সকলে ইঁহাকে “বুড়া” বা “বুড়িয়া” বলিত। উদয়পুরস্থ ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরের উত্তর দিকস্থ বুড়িয়ার দীঘি এই বুড়ার কীর্ত্তি।

উদয়মাণিক্যের পরলোকগমনের পর তৎপুত্র জয়মাণিক্যের সময়েও রণাগণ সেনাপতি ছিলেন। ইনি স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়া বিশেষ প্রভাবশালী হইয়া উঠেন। পরিশেষে জয়মাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হইবার নিমিত্ত বৃদ্ধের দুরাশা জন্মিল। কিন্তু অন্যতর সেনাপতি (দেবমাণিক্যের পুত্র) অমরদেব দিন দিন পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া রণাগণ বুঝিলেন, এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমানে তাঁহা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার নহে। এজন্য তিনি অমরদেবকে নিহত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রাজকুমার অমর অন্য ব্যক্তির ইঙ্গিতে ইহা জানিতে পাইয়া আত্মরক্ষা করেন। অতঃপর তিনি বৃদ্ধ রণাগণকে বধ করতঃ তাঁহার রাজ্যলাভের পিপাসা মিটাইয়াছিলেন।

রসাঙ্গমর্দ্দননারায়ণ ঃ— (২৪ পৃঃ — ১৫ পংক্তি)। ইনি ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি। ইঁহার নাম কি ছিল জানিবার উপায় নাই। রসাঙ্গের (আরাকান) কিয়দংশ জয় করিবার দরুন ইঁহার “রসাঙ্গমর্দ্দন” উপাধি হইয়াছিল। জয়মাণিক্যের সময় পর্য্যন্ত ইনি সেনাপতি পদে নিযুক্ত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, কোন স্থলেই ইঁহার নামোল্লেখ নাই, উপাধির উল্লেখ মাত্র আছে।

রাজবল্লভনারায়ণ ঃ— (৭৬ পৃঃ — ৩০ পংক্তি)। ইনি অমরদেবের (পরে অমরমাণিক্য) জ্যেষ্ঠ পুত্র। জয়মাণিক্যের মল্লবিদ্যার গুরু এবং সেনাপতি ছিলেন। অমরদেবের সহিত বিবাদ উপলক্ষে জয়মাণিক্য বিপদাপন্ন হইয়া পলায়ন করেন, তদবস্থায় রাজবল্লভ পথিমধ্যে তাঁহাকে ধৃত ও নিহত করিয়াছিলেন।

রাম কবি ঃ— (৯ পৃঃ — ২ পংক্তি)। ইহা নাম বলিয়া মনে হয় না, সম্ভবতঃ ইনি রামায়ণ গান করিয়া “রাম কবি” হইয়াছিলেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য রাজা হইবার অল্পকাল পরে ;—

> “প্রেত চতুর্দ্দশী গান বর্ণিয়া শুনিল।।
> রাম কবি সৃজিলেক সেই ত নৃপতি।
> শ্রীধন্য মাণিক্য রাজার তাতে হৈল প্রীতি।।”
>
> রাজমালা — ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, মহারাজ ধন্য রামায়ণের একটী দল সৃজন করিয়াছিলেন, এবং রাম কবি সেই দলের অধিকারী ছিলেন। এতদুপলক্ষে রাজদরবার হইতে এই উপাধি লাভ

করাও বিচিত্র নহে। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে ইঁহার নাম কি ছিল, জানিবার উপায় নাই।

রামদাস ঃ— (৭৮ পৃঃ — ৭ পংক্তি)। ইহা মহারাজ অমরমাণিক্যের বাল্যকালের নাম। রণচতুরনারায়ণ, অমরমাণিক্যের বাল্যকালের অবস্থা বর্ণন উপলক্ষে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ;—

"রামদাস নাম তোমার আছিল তখন।" *

রায় কছম ঃ— (২৪ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। ইনি ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি ছিলেন; জাতিতে রিয়াং। সৈন্যাধ্যক্ষ রায় কাচাগের সহযোগে ইনি থানাংছি প্রভৃতি কুকি-প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। ইঁহাদের শক্তি-সমবায়ে মহারাজ ধন্য অনেকবার পাঠান বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে রায় কাচাগ, রায় কছমের সহোদর ভ্রাতা ছিলেন।

রায় কাচাগ ঃ— (১৪ পৃঃ — ১১ পংক্তি)। ইঁহাকে রায় চয়চাগও বলা হইত। ইনি রিয়াং জাতীয় ধন্যমাণিক্যের সেনাপতি এবং প্রবলপরাক্রমশালী ছিলেন। এককালে ইঁহার প্রাধান্য তে বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, মেকেঞ্জি সাহেব ইঁহাকে ত্রিপুরেশ্বর জ্ঞানে "চয়চাগ মাণিক্য" লিখিয়াছে।† ইঁহার বাহুবলে এবং রণকৌশলে ত্রিপুর রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত এবং প্রতিপক্ষগণ সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। পাঠান শক্তি বারম্বার ইঁহার হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছে। একমাত্র এই বীর্য্যশালী ও কৌশলী সেনানায়কের প্রভাবে মহারাজ ধন্য সম্রাট পদবাচ্য হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ ঃ— (৩৪ পৃঃ — ২ পংক্তি)। ইনি মিথিলাবাসী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। এই তান্ত্রিক সাধক সন্ন্যাসীবেশে ত্রিপুরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ দেবমাণিক্য ইঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ইঁহার উপদেশানুসারে তান্ত্রিকমতে শ্মশান সাধনাদি যোগ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। দ্বিজ লক্ষ্মীনারায়ণ, রাজাকে দুর্ব্বল করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব বদ্ধমূল করিবার দূরাকাঙ্ক্ষায়, তাঁহাকে দেবীর দর্শন লাভের প্রলোভনে ভুলাইয়া, ক্রমান্বয়ে আটজন সেনাপতি শ্মশানে নিয়া বধ করাইলেন ; পরিশেষে রাজাকেও শ্মশান সাধনকালে বধ করিয়াছিলেন। দেবমাণিক্যের পরলোকগমনের পর, তাঁহার শিশুপুত্র ইন্দ্রমাণিক্যকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ এক বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। সেনাপতিগণ নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হইয়া লক্ষ্মীনারায়ণসহ ইন্দ্রমাণিক্যের হত্যা সাধন দ্বারা উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মী মহাদেবী ঃ— (৪২ পৃঃ — ২২ পংক্তি)। ইনি সেনাপতি দৈত্যনারায়ণের কন্যা এবং বিজয়মাণিক্যের প্রধানা মহিষী ছিলেন। বিজয়মাণিক্য মাধব নামক ব্যক্তি দ্বারা দৈত্যনারায়ণকে বধ করায়, মহারাণী রাজার অগোচরে পিতৃহন্তা মাধবকে নিহত

---

* রাজমালা — জয়মাণিক্য খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা।

† North East Frontier of Bengal, — P. 270.

করিয়াছিলেন। এই কার্য্য মহারাজের বিরক্তিকর হওয়ায় কিয়ৎকালের নিমিত্ত মহারাণী নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করেন। অমাত্যগণের অনুরোধে আবার তাঁহাকে বনবাস হইতে ফিরাইয়া আনা হইয়াছিল।

লোকতর ফা ঃ— (৭২ পৃঃ — ১৯ পংক্তি)। ইনি উদয়মাণিক্যের পুত্র, পিতার পরলোকগমনের পর, জয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিপুর সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াছিলেন। ইহার অল্পকাল পরে সেনাপতি অমর, জয়মাণিক্যের পিসা ও প্রধান সেনাপতি রণাগণকে হত্যা করেন ; এই সূত্রে রাজা ও সেনাপতির মধ্যে মনোমালিন্য সঙ্ঘটিত হওয়ায়, অমরের পুত্র রাজবল্লভ জয়মাণিক্যের নিধন সাধন দ্বারা সেই মনোমালিন্যের অবসান করিয়াছিলেন।

সমরজিতনারায়ণ ঃ— (৭৫ পৃঃ — ৬ পংক্তি)। ইনি রণাগণের ভ্রাতা এবং জয়মাণিক্যের সেনাপতি। অমরদেবের সহিত রণাগণের সংগ্রামকালে অমর কৌশলক্রমে ইঁহার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক ছিন্নমস্তক রণাগণের গড়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। রণাগণ ভ্রাতার মস্তক দর্শনে ভীত হইয়া গড় পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করেন এবং কিয়দ্দিবস লুক্কায়িত অবস্থায় থাকিবার পর, অমরদেব কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন।

সাহসনারায়ণ ঃ— (৭৬ পৃঃ — ১৭ পংক্তি)। এই ব্যক্তি সৈনিক বিভাগের সাধারণ কর্ম্মচারী ছিলেন। জয়মাণিক্যের সেনাপতি অমরদেবের আদেশে প্রধান সেনাপতি রণাগণের মস্তক ছেদন করিয়া "সাহসনারায়ণ" উপাধি ও সেনাপতি পদ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার নাম জানা যাইতে পারে নাই।

সূর্য্য খাড়াইত ঃ— (৫৮ পৃঃ — ২১ পংক্তি)। বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে 'খাড়াইত' বা 'খাড়াতিয়া' উপাধিধারী এক শ্রেণীর সৈন্য রাজার শরীর রক্ষক ছিল। সাতবার ধন্যসাগর প্রদক্ষিণ করিতে সমর্থবান ব্যক্তি 'খাড়াইত' উপাধির অধিকারী হইত। খড়গ, চর্ম্ম ও শূল ইহাদের ব্যবহার্য্য অস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। খড়্গ (তরবারি) ব্যবহারের দরুনই 'খাড়াইত' উপাধি হইয়াছে।

বিজয়মাণিক্যের দিগ্বিজয় গমনকালে সূর্য্য খাড়াইত তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্বর্ত্তী চৌয়াল্লিশ নামক স্থানে মহারাজের অবস্থানকালে সূর্য্য খাড়াইত প্রমুখ সৈন্যগণ রাজার অগোচরে নগর লুণ্ঠনে বহির্গত হয়, তৎকালে জনৈক নগরবাসী কর্ত্তৃক সূর্য্য খাড়াইত হত হইয়াছিলেন।

হাজরা ঃ— (৭৭ পৃঃ — ২৩ পংক্তি)। 'হাজরা' নাম নহে — উপাধি। দেবমাণিক্যের শাসনকালে এই ব্যক্তি সৈনিক বিভাগে হাজারী ছিলেন। পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে, যে সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে এক হাজার সৈন্য থাকিত, তিনি "হাজারী" পদবাচ্য হইতেন। এই হাজরা মহারাজ অমরমাণিক্যের মাতামহ এবং বাছাল জাতীয় ছিলেন। বাছালগণ জাতিগত হিসাবে কথঞ্চিৎ হীন হইলেও এই সম্বন্ধ স্থাপনাবধি পার্ব্বত্য সমাজে বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিল

এবং সেই সম্মান অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই হাজরা রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণের সহকারীরূপে চট্টগ্রামের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিবার প্রমাণ আছে।

হৈতন খাঁ ঃ— (২৪ পৃঃ — ২৭ পংক্তি)। ইনি গৌড়েশ্বর হোসেনশাহের সেনাপতি। হোসেন, ধন্যমাণিক্যের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে পরাস্ত হইবার পর, দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত হৈতন খাঁ ও করা খাঁকে এক শত হস্তী, পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ পদাতিক সৈন্যসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এবারও ত্রিপুর সেনাপতির কৌশলে, হৈতনের প্রবল বাহিনীর অধিকাংশ গোমতী স্রোতে ডুবিয়া জীবন বিসর্জ্জন করে এবং হতাবশিষ্ট অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

হোপকলাউ ঃ— (৩১ পৃঃ — ২২ পংক্তি)। ইনি ধন্যমাণিক্যের জামাতা। রাজ আজ্ঞায় কুকি-প্রদেশে স্বর্ণখনির অনুসন্ধানে গিয়াছিলেন। কুকিগণ মনে করিল, সুবর্ণের সন্ধান পাইলে, নিশ্চয়ই ত্রিপুরেশ্বর এখানে একটী থানা বসাইবেন এবং তদ্দরুণ তাহাদিগকে নানাবিধ অসুবিধা ভোগ ও স্বর্ণের খনিতে কার্য্য করিতে হইবে। অজন্য তাহারা হোপকলাউকে সাদরে গ্রহণ করতঃ অতিরিক্ত মদ্যদ্বারা বিহ্বল করিয়া, তদবস্থায় নিহত করিয়াছিল।

হোসেন শাহ ঃ— (২২ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। বঙ্গেশ্বর মজঃফর শাহ অত্যাচারী বলিয়া অমাত্যবর্গ কর্ত্তৃক নিহত হইবার পর, হোসেন শাহ্ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইনি মজঃফরের মন্ত্রী ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। তিনি নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়া এ দেশে আগমন করেন, এবং রাজ সরকারে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমোন্নতি লাভ করতঃ বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি কামতাপুর রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্যের সহিত ক্রমান্বয়ে দুইবার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, তৃতীয় বারের যুদ্ধে ত্রিপুর রাজ্যের সামান্য অংশ হস্তগত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অধিককাল স্বীয় বশে রাখিতে সমর্থ হন নাই। হোসেন সদাশয় এবং বঙ্গসাহিত্যের পোষক ছিলেন। ইঁহার শাসন ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২৭ বৎসরকাল স্থায়ী ছিল।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে উল্লিখিত স্থান ইত্যাদির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(বর্ণমালানুক্রমিক)

আত্মারাম ঃ— (৪৩ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। এই স্থান খাসিয়া পর্ব্বতের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে এখানে খাসিয়া রাজের সেনানিবাস (থানা) ছিল। ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয় কালে সেই স্থান অধিকার এবং স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"আত্মারাম আদি যত খাসিয়া নৃপ থানা।
ত্রিপুরে জিনিয়া করে আপন সীমানা।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৪৩ পৃষ্ঠা।

আসাম ঃ— (২৪ পৃঃ ২৪ পংক্তি)। ইহা বাঙ্গালা দেশের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত, এই স্থান অহম্ জাতির নামানুসারে আসাম নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ। পুরাকালে এই রাজ্যের বিস্তৃতি অনেক দূর পর্য্যন্ত ছিল। শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায় ;—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্কর বাসিনী।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াত্তু পশ্চিমে।।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বাস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।।
কামরূপ ইতিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ।"

যোদিনী তন্ত্র।

মর্ম্ম ঃ— করতোয়া অবধি দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত কামরূপ। ইহার উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিম সীমায় করতোয়া নদী, পূর্ব্ব সীমায় তীর্থশ্রেষ্ঠ দিক্ষু নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যার সঙ্গমস্থান। এই সীমা সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত এবং ইহার অন্তর্গত স্থান কামরূপ নামে বিখ্যাত।

এতদ্দ্বারা সে কালে, বর্ত্তমান আসাম, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর এবং কোচবিহার প্রভৃতি প্রদেশ আসাম বা কামরূপের অন্তর্ভুক্ত থাকা সূচিত হইতেছে।

শাস্ত্রানুসারে আসাম (কামরূপ) প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানে পীঠদেবী কামাখ্যা ব্যতীত আরও কতিপয় পীঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। কালিকাপুরাণ এবং যোগিনী তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে তীর্থক্ষেত্রের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

আসাম বুরুঞ্জির মতে, মহীরঙ্গ নামক জনৈক দানব পুরাকালে আসামের অধিপতি ছিলেন। তদ্বংশীয় আরও চারি জন রাজা ক্রমান্বয়ে এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপর নরকাসুর এই প্রদেশের আধিপত্য লাভ করেন। ইনি বিষ্ণু কর্ত্তৃক আসামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।* শ্রীশ্রীকামাখ্যা দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ উপলক্ষে নরকাসুর ঘটিত একটী আখ্যান প্রচলিত আছে। মহারাজ নরক রামায়ণের ঘটনার সমসাময়িক ব্যক্তি। † বর্ত্তমান গৌহাটী নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। নরকাসুরের পর তৎপুত্র ভগদত্ত আসামের অধিপতি হন ; ইনি কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভগদত্তের পর তদ্বংশীয় আরও পাঁচ জন রাজার নাম কামরূপ বুরুঞ্জিতে পাওয়া যায়।

অতঃপর এখানে দেবেশ্বর নামক এক রাজা কিয়ৎকাল রাজত্ব করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়, ইনি ধীবর জাতীয় ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহার কিয়ৎকাল পরে ব্রহ্মপুত্র বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজবংশ কর্ত্তৃক এই প্রদেশ শাসিত হয়। চীন পরিব্রাজক হিউ এন সিয়াং-এর আসাম ভ্রমণকালে (৫৬০-৬১ শক) তিনি নারায়ণদেব বংশীয় বর্ম্ম উপাধিবিশিষ্ট ভাস্কর বর্ম্মাকে এখানে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছেন। উক্ত পরিব্রাজক এই রাজাকে ব্রাহ্মণ জাতীয় বলিয়াছেন, কিন্তু উপাধিদ্বারা ইঁহার ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ‡ অতঃপর কলিন্দ বর্ম্মা নাম পাওয়া যায়। § অনেকে অনুমান করেন, ইনি ভাস্কর বর্ম্মার বংশীয় ছিলেন। অতঃপর নাগাঙ্ক নামক জনৈক রাজা এই প্রদেশ অধিকার করেন। প্রবাদানুসারে ইনি করতোয়া নদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশ ক্রমান্বয়ে ৪০০ বৎসর এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপর ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকুলের আড়িমাও নামক রাজা এবং উত্তরকুলে ছুটিয়া জাতি আধিপত্য বিস্তার করে। আড়িমাও-এর পুত্র জোঙ্গলবলহু রাজ্যলাভ করিলে পর, কাছাড় রাজের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহাদি হওয়ায়, নিজেকে নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। নওগাঁয়ের শহরী পরগণায় বর্ত্তমান কালেও সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। কপিলি নদীর তীরবর্ত্তী শেষ যুদ্ধে জোঙ্গলবলহু পরাজিত হইয়াছিলেন।

---

* কালিকাপুরাণ — ৩৬শ — ৪০ শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত আসাম অঞ্চলে প্রেরিত বানরকে সুগ্রীব বলিয়াছিলেন ;—

“যোজনানি চতুঃষষ্টি বরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহান গাবে বরুণালয়ে।।
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিতষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ।।”

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড — ৪২ সর্গ, ৩০-৩১ শ্লোক।

‡ Beal’s Budhist Record — Vol. II, P. 96.

§ দশকুমার চরিত।

আরও কোন কোন বংশ আসামে কিয়ৎকাল রাজত্ব করিবার পর আধিপত্য স্থাপিত হয়। ধর্ম্মপাল বঙ্গের পালবংশীয় রাজা বলিয়াই অনেকেই বিশ্বাস, কিন্তু এতদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। ইহা ১০৯৭ শকের কথা। এতদ্বংশীয় পরবর্ত্তী রাজগণের নাম আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইঁহারা পালবংশীয় রাজাই ছিলেন।

পালবংশের পতনের পর, কামতাপুরের রাজবংশ এ স্থানে কিছুকাল রাজত্ব করেন। ইঁহার পর পর্য্যায়ক্রমে কোচ ও অহোম জাতির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা জয়ধ্বজ সিংহের সময় হইতে এই প্রদেশের প্রতি মুসলমানদের হস্ত প্রসারিত হইয়াছিল।

সম্রাট-ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুমলা আসাম জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু আধিপত্য বিস্তার করিতে অসমর্থ হইয়া ১৬৬৩ খৃঃ-অব্দে তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

কিয়ৎকাল পরে আসামে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয়। এই সময় ইংরেজগণ বণিকভাবে এই রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ; দেশের সমৃদ্ধি ও শস্য-সম্পদ দর্শনে ইঁহারা বিমুগ্ধ হইলেন এবং এই সময় হইতেই উক্ত প্রদেশ হস্তগত করিবার সঙ্কল্প তাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল। এই সময় আসামের রাজা গৌরীনাথ সিংহ দরঙ্গের কোচরাজ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়ায় ইংরেজেরা তাঁহার সাহার্য্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন (১৭৯২ খৃঃ)। অতঃপর অন্তর্বিপ্লব, শাসন বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি কারণে ক্রমশঃ আসামের অবস্থা হীন হইতে চলিল। ব্রহ্মরাজ সুযোগ পাইয়া আসামের প্রতি নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে (১৮২৪ খৃঃ-অব্দে) ব্রহ্ম ও ইংরেজের মধ্যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়। এই যুদ্ধ উপলক্ষে ১৮২৬ খৃঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারি তারিখে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে আসামের সমগ্র নিম্ন প্রদেশ বৃটিশ রাজ্যের কুক্ষিগত হইল। তৎকালে রাজ্যের উত্তরাংশ পুরন্দর সিংহ নামক জনৈক সেনাপতির হস্তে ছিল। ১৮৩৪ খৃঃ-অব্দে ইংরেজগণ তাহা আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। তদবধি আসাম রাজ্যের অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে।

ইছামতী ঃ— (৫৫ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। ইহা একটি নদী ; ঢাকা জেলার বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। এই নদী সাহেবগঞ্জের সন্নিহিত স্থানে ধলেশ্বরী হইতে নির্গতা হইয়া, মদনগঞ্জের নিকটে পুনর্ব্বার ধলেশ্বরীতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে। নদীটী অতি প্রাচীন, ইহার পৌরাণিক নাম ইক্ষুনদী। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পাওয়া যায় ;—

"ইক্ষু লোহিত ইত্যেতা হিমবৎ পাদনিসৃতাঃ।"

কথিত আছে, ইহার তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হইত, এজন্য 'ইক্ষুনদী' নাম হইয়াছে। এই নদী যে যে স্থান দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছে, রেনেল্ কৃত মানচিত্রের

১৬শ খণ্ডে তাহা পাওয়া যাইবে। এই নদীর তীরে বহু সমৃদ্ধ জনপদ ও বাণিজ্যস্থান আছে। ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য বঙ্গাভিযান কালে, এই নদীপথে গমন করিবার কথা রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"ইছামতী পথে পদ্মাবতী গেল পরে।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ১৬ পৃঃ।

বর্ত্তমান কালে এই নদী পূর্ব্বের ন্যায় খরস্রোতা নহে। এখন পথভ্রষ্টা এবং ক্ষীণতোয়া হইয়াছে।

ইটা ঃ— (৫৭ পৃঃ — ১০ পংক্তি)। ইহা একটী খণ্ডরাজ্যে গণ্য হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে এই ভূ-ভাগ শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত একটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ স্বধর্ম্ম পা (রাজমালার মতে সধর্ম্মা বা সুধর্ম্ম) কৈলাসহরের রাজপাটে রাজত্ব করিবার কালে, বাৎস্যগোত্রীয় নিধিপতি নামক জনৈক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ তাঁহার সভায় উপনীত হন। রাজা এই প্রভাবান্বিত বিপ্রের গুণে মুগ্ধ হইয়া তদ্দ্বারা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। * এই যজ্ঞান্তে নিধিপতি এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ ব্রহ্মত্র স্বরূপ লাভ করেন। এই স্থান পূর্ব্বে 'মনুকুল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সে কালে, আধুনিক চৌয়াল্লিশ, বালিশিরা, সাতগাঁও, ছয়চিরি, ইন্দানগর, ভানুগাছ, ইন্দেশ্বর ও বরমচাল এই আটটী পরগণা লইয়া মনুকুল প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। নিধিপতি এই দানলব্ধ ভূমিতে নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, এবং তাঁহার অনুরোধে আরও কতিপয় ব্রাহ্মণ তথায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। কথিত আছে, উক্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় ছিল, ব্রাহ্মণবর্গ বাসভবন নির্ম্মাণের নিমিত্ত দূরবর্ত্তী উচ্চস্থঅন হইতে ইটা (ডেলা), ছুড়িয়া স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, এই ঘটনা হইতে স্থানের নাম 'ইটা' হইয়াছে। উত্তরোত্তর এই স্থানের সৌষ্ঠব ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হওয়ায় ইহা এক ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। নিধিপতির অধস্তন অষ্টম স্থানীয় ভানুনারায়ণ ত্রিপুরেশ্বর হইতে রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার স্থাপিত রাজধানীর 'রাজনগর' নামকরণ হইয়াছিল। অদ্যাপি তথায় প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। এওলাতলি নামক নিধিপতির স্থাপিত বাসস্থানে অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। ভানুনারায়ণের পুত্র সুবিদনারায়ণ ইটার পরবর্ত্তী অধিকারী।

ইহা মুসলমান প্রভাবের কাল। সুবে বাঙ্গালার নিয়োজিত দেওয়ান, রায় উপাধিধারী বৈদ্যবংশীয় আনন্দনারায়ণ রায়ের সহিত রাজস্ববিষয়ক প্রশ্ন লইয়া সময় সময় ভানুনারায়ণের কলহ উপস্থিত হইত ; তিনি ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত রাজা বলিয়া বঙ্গের দেওয়ানকে অগ্রাহ্য করিতেছিলেন। বড়ুয়া পাহাড়স্থিত পাগড়ীয়াটিলায় এবং পর্ব্বতপুরে সুবিদনারায়ণ নির্ম্মিত সেনানিবাসের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দেওয়ানের সহিত সামাজিক

* এই যজ্ঞ বিবরণ এবং নিধিপতির পরিচয়, রাজমালা প্রথম লহরের ১০৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইহা ৬০৪ ত্রিপুরাব্দের (১১৯৪ খ্রিঃ) ঘটনা।

ঘটনা লইয়া রাজার আর এক নূতন কলহ উপস্থিত হওয়ায়, এই দেওয়ানের প্ররোচনায় পাঠান সৈন্যকর্ত্তৃক ইটা রাজ্য আক্রান্ত ও পাঁচ দিবস অবিশ্রান্ত সংগ্রামের পর তাহাদের হস্তগত হইল। রাজা যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, রাজমহিষী ও রাজকুমারী আত্মজীবন আহুতিদ্বারা কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। রাজভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ পলায়নপর হইলেন। রাজপুত্র চতুষ্টয় বন্দীভাবে দিল্লীতে নীত ও তথায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, জ্যেষ্ঠানুক্রমে জামাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজি খাঁ ও ঈশা খাঁ নাম গ্রহণপূর্ব্বক পৈতৃত রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদবধি হিন্দু শাসিত ইটা রাজ্য মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত হইল। ইহা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা।

ইংরেজ শাসনকালে এই প্রদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রীহট্ট জেলার একটি পরগণারূপে পরিগণিত হইয়াছে।

উৎকল ঃ— (৩৯ পৃঃ — ১৯ পংক্তি)। প্রথম লহরের টীকায় (২৪১ পৃঃ) এই স্থানের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

উদয়পুর ঃ— (৬৮ পৃঃ — ৯ পংক্তি)। এই স্থান কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্বদিকে নয়ক্রোশ দূরবর্ত্তী, গোমতী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে 'ত্রিপুরাসুন্দরী' পীঠদেবী, এবং ত্রিপুরেশ বা নল নামক ভৈরব অবস্থিত। পীঠস্থান বলিয়া স্থানটী ভারতবিখ্যাত হইয়াছে। এখানে সর্ব্বদাই নানা দেশীয় তীর্থযাত্রী এবং সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। প্রথম লহরের ১২২ পৃষ্ঠায় এই পীঠস্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

এই স্থানের প্রাচীন নাম রাঙ্গামাটী ; উদয়মাণিক্যের শাসনকালে উদয়পুর নাম হইয়াছিল।* লিকা সম্প্রদায়ের মঘ রাজাদ্বারা এতদঞ্চল শাসিত হইতেছিল ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ যুঝারু ফা (নামান্তর হিমতি) মঘ রাজাকে জয় করিয়া এই স্থানে স্বীয় রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎকালে ইনি বঙ্গদেশের কিয়দংশ জয় করিয়া সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে একটী অব্দের প্রচলন করেন, তাহা ত্রিপুরাব্দ নামে অভিহিত হইয়াছে। প্রথম লহরের ১৯৭ পৃষ্ঠায় এই অব্দ প্রচলনের বিবরণ প্রদান করা গিয়াছে। এখন ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ চলিতেছে, এই হিসাবে কিঞ্চিন্ন্যূন সাড়ে তের শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে ত্রিপুরার রাজপাট স্থাপিত হইয়াছিল।

মহারাজ যুঝারু ফা হইতে কল্যাণমাণিক্য (২য়) পর্য্যন্ত ৫৫ জন নরপতি কিঞ্চিন্ন্যূন বার শত বৎসর কাল এই স্থানে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ১১৭০ ত্রিপুরাব্দে তথাকার রাজপাট উঠাইয়া আগরতলায় নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। নানাবিধ রাষ্ট্রবিপ্লব এড়াইবার অভিপ্রায়ে এই পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল। তদবধি দেড় শত

---

* রাঙ্গামাটীর স্থূল বিবরণ প্রথম লহরের ২৬৭ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবৎ এই স্থানের রাজপাটজনিত গৌরব বিনষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এই স্থান সর্ব্বতোভাবে রাজধানীর উপযুক্ত ছিল ; বর্ত্তমান রাজধানীকে তাহার তুলনায় অনেক বিষয়েই অপকৃষ্ট বলিতে হইবে। স্থানটী সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত যে সকল চেষ্টা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা সে কালের সামরিক জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সমুন্নত পর্ব্বতমালার সুদৃঢ় বেষ্টনে এই স্থান বহিঃশত্রুর দুরতিক্রমণীয় হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিপ্লব অন্তর্বিপ্লব আত্মবিরোধ প্রভৃতি নানাবি উপদ্রবে এখানে কত যে হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছে, তাহার সম্যক বিবরণ প্রদান করা অসম্ভব। হিন্দু, মুসলমান এবং বৌদ্ধগণের উত্তপ্ত শোণিতে এই স্থান বহুবার প্লাবিত হইয়াছে। কোন কোন পাষণ্ড ষড়যন্ত্রকারীর প্ররোচনায় এই সুপবিত্র পীঠস্থান রাজরক্ত-কলুষিত হইবারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

এখানে বহুসংখ্যক সাগর, দীঘি প্রভৃতি জলাশয়, রাজপ্রাসাদ, দেবালয়, সেনানিবাস প্রভৃতি মঠ ও মন্দির বর্ত্তমান থাকিয়া ত্রিপুরার প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখন এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের একটী উপবিভাগ এবং উদয়পুরেই তাহার প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর, স্বীয় পিতার নাম স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে সহরটীর 'রাধাকিশোরপুর' নাম দিয়াছেন। *

ঊনকোটী ঃ— (৫৯ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। ইহা বর্ত্তমান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত একটী তীর্থস্থান। এই লহরের ১০৭ পৃষ্ঠায় উক্ত তীর্থের বিবরণ পাওয়া যাইবে। প্রথম লহরের ৯৭ পৃষ্ঠায় যে ছাম্বুলনগরের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত এই তীর্থক্ষেত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

কচুয়াছড়া ঃ— (৭৫ পৃঃ — ৩ পংক্তি)। ইহার অপর নাম কলুয়াছড়া বা কালুয়াছড়া। এই স্থান উদয়পুরের পূর্ব্বদিকে কলুয়াছড়ার তীরে অবস্থিত। কলুয়াছড়া গোমতী নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই ছড়ার তীরবর্ত্তী পার্ব্বত্য পল্লীতে অমরমাণিক্যের জন্ম হইয়াছিল।

কনোজ ঃ— (৩ পৃঃ — ২ পংক্তি)। ইহার প্রাচীন নাম কান্যকুব্জ, কন্যকুব্জ, মহোদয়, কন্যাকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ, কুশস্থল ;—

"কন্যকুব্জং মহোদয়ং কন্যাকুব্জং গাধিপুরং।
কৌশং কুশস্থলঞ্চ তৎ।।" (হেম — ৪।৩৯)।

এই স্থান ফরুখাবাদা জেলায় কালীনদীর পশ্চিম তীরে, গঙ্গা ও কালীর সঙ্গম স্থানে অবস্থিত। রামায়ণে পাওয়া যায় ;—

"কুশ নাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্।।"

(বাল্মীকি রামায়ণ — আদিকাঃ, ৩২।৬)।

---

* ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট — ১১শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১২ পৃঃ।

কুশের পুত্র কুশনাভ কর্ত্তৃক এই নগরী স্থাপিত হইয়াছে। তৎপুত্র গাধি এই স্থানে রাজত্ব করিবার সময় হইতে স্থানের অপর নাম 'গাধিপুর' হইয়াছে। কন্যাকুব্জ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে রামায়ণের আদিকাণ্ড — ৩২ ও ৩৩ সর্গে যে উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই ;—

ঘৃতাচি অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের শত কন্যা উৎপন্ন হয়। পূর্ণ যৌবনা সেই সকল আলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী কন্যা একদা উদ্যান ভ্রমণকালে, বায়ুর দৃষ্টিগোচর হওয়ায়, তিনি বিমুগ্ধ চিত্তে সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। কন্যাগণ বলিলেন — "আমরা স্বাধীন নহি, আমাদের পিতা আছেন, তিনি যাঁহার হস্তে অর্পণ করিবেন, তাঁহাকেই আমরা ভর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিব। আপনার প্রস্তাবে সম্মতিদানের অধিকার আমাদের নাই।" বায়ু, কন্যাগণের কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাদের শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক সমস্ত অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। কন্যাগণ এই ঘটনায় কুব্জা হওয়ায়, স্থানের নাম 'কন্যাকুব্জ' হইয়াছে। পরে তাহাদের কুব্জতা বিদূরিত হইয়াছিল।

খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন্-সিয়াং এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত বিবরণের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তাঁহার মতে বায়ুর পরিবর্ত্তে, মহাবৃক্ষ ঋষি কন্যাদিগকে লাভের প্রার্থী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার অভিসম্পাতে উহাদের কুব্জতা ঘটে।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি এই স্থানকে কনোগিজ (Kanogiza) ও প্লিনি, কলিনিপক্ষ (Calinipaka) নামে অভিহিত করিয়াছেন। কুশবংশের রাজত্বের পরে এই প্রদেশে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের পর, প্রভাকরবর্দ্ধন হইতে হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) পর্য্যন্ত তিন জন রাজার নাম চীন পরিব্রাজকগণের ভ্রমণবৃত্তান্তে পাওয়া যায়। ইহার পর কুলচুরি ও পালবংশীয় রাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করেন। ইঁহারা দেবশক্তি বংশীয় নৃপতিগণ হইতে এই প্রদেশ হস্তগত করিয়াছিলেন। তৎপর চন্দ্র রাজগণের প্রাধান্য হয়। এই বংশীয় জয়চন্দ্র বা জয়চাঁদই কনোজের শেষ হিন্দুরাজা। আদিশূর যজ্ঞ সম্পাদনার্থ এই স্থান হইতে পঞ্চ গোত্রীয় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।

কলমিগড় ঃ— (৭৩ পৃঃ — ৭ পংক্তি)। এই স্থানে ত্রিপুরার সেনানিবাস ছিল। উদয়পুর হইতে খণ্ডল অভিমুখীন রাস্তার উপর এই দুর্গ থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সোণামুড়া শহরের দক্ষিণদিকে এক ক্রোশ অন্তরে 'দুধ পুষ্করিণী' নামক একটী বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। এই দীঘির পশ্চিম পার্শ্বে বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া ইষ্টক প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে মৃণ্ময় প্রাচীর ও পরিখা ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এই স্থানে সেনানিবাস থাকিবার প্রবাদ সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু এই গড়ের নাম কি ছিল,

তাহা কেহ বলিতে পারে না। রাজমালার বর্ণনার সহিত মিলাইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, ইহাই কলমিগড়ের ভগ্নাবশেষ।

কৈলা ঃ— (১৩ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। কৈলাসহর। এই স্থান শ্রীহট্ট জেলার সীমান্ত প্রদেশে মনুনদীর তীরে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম ছাম্বুলনগর। কৈলাসহর নাম কত কালের, এবং কি উপলক্ষে এই নামকরণ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান কৈলাসহরের অনতিদূরে ঊনকোটী তীর্থ এবং মহাদেব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ত্রিপুরার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী স্বর্গীয় ধনঞ্জয় ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন — ইহা শিবাধিষ্ঠিত স্থান বলিয়াই 'কৈলাস + হর = কৈলাসহর' নাম হইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদানুসারে ইহার প্রাচীন নাম 'কলা-হাওর'। শ্রীহট্ট অঞ্চলে জলাভূমি (বিল)-কে হাওর বলে। এই জলময় স্থানে বিস্তর রামকলার বন ছিল, এই জন্য 'কলা-হাওর' নাম হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে, এখানে কয়লার খনি ছিল বলিয়া স্থানের নাম 'কয়লা-হাওর' হইয়াছে। তাহাদের মতে কলা-হাওর বা কয়লা-হাওর নাম ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া, 'কৈলাসহর' হইয়াছে। ইহার কোনটী গ্রহণীয়, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। প্রচলিত একটী গ্রাম্য ছড়াদ্বারা জানা যাইতেছে রাজধানী স্থাপনের পূর্ব্বে কিম্বা রাজধানী উঠাইয়া লইবার পরে কোন এক সময়ে এই স্থানের রাস্তাঘাট নিতান্তই দুর্গম হইয়াছিল। ছড়াটী এই ;—

"হাতে লাঠি, বনে ধর।
তবে যাবি কলাহর।।"

এই স্থানে যাইতে এক হাতে লাঠি এবং অন্য হাতে বন জঙ্গলের উপর ভর করিতে হইত। এখানে রাজধানী স্থাপনের পর হইতে বোধ হয় সাধারণের এই কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহা কুকি জাতির বসতিস্থান ছিল, এখনও দূরে দূরে কুকিপল্লী আছে। এতদঞ্চলে বর্ত্তমান কালে ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ চারি জন দারহুলা ও তিন জন লুসাই রাজা বাস করিতেছেন। এখানকার প্রচলিত 'কাতাল ও কাঁকচাঁদ' ঘটিত আখ্যায়িকা পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে। ত্রিপুর রাজ্যের সদর ব্যতীত অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কৈলাসহর বিভাগে হিন্দু ও মুসলমান সম্ভ্রান্ত বংশীয় অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, এখানে অর্থশালী লোকও অনেক আছে। বহুসংখ্যক কুকিরাজা, সম্ভ্রান্ত বংশীয় তালুকদার, ধনশালী ব্যবসায়ী প্রভৃতি দ্বারা এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের একটী গণনীয় বিভাগে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে ত্রিপুরার রাজধানী ছিল, ত্রিপুরেশ্বরগণ বৈদিক যজ্ঞাদি সম্পাদনদ্বারা ইহাকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, ঊনকোটি মাহাত্ম্য অনুসারে এই স্থান সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত। এখানে প্রতি বৎসর অশোকাষ্টমীতে বিস্তর যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে।

কৈলাসহর প্রধান বাণিজ্য স্থান। পর্ব্বতজাত কার্পাস ও নানা জাতীয় কাষ্ঠ এখানকার প্রধান পণ্যদ্রব্য। ইহার ব্যবসায় দ্বারা অনেকে ধনশালী হইয়াছে। প্রতি বৎসর হস্তীখেদাদ্বারাও বিস্তর অর্থাগম হইয়া থাকে।

কৈলাগড় ঃ— (২৫ পৃঃ — ৯ পংক্তি)। ইহা কসবার নামান্তর। কসবা পারসী শব্দ, ইহার অর্থ সমৃদ্ধ শহর বা জনপদ। মুসলমান শাসনকালে এই নাম হইয়াছে।

এই স্থানে কিয়ৎকালের নিমিত্ত ত্রিপুরার রাজধানী ছিল। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের মহিষী মহারাণী কমলাদেবী কর্ত্তৃক খনিত কমলাসাগর এই স্থানে অবস্থিত। এই সাগরের পূর্ব্বপাড়ে অল্পোন্নত টীলার উপর মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে শ্রীশ্রী-কালিকাদেবী ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিকে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ এবং পরিখা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই স্থানে একাধিকবার মুসলমানের সহিত ত্রিপুরার যুদ্ধ হইয়াছে। ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে হোসেন শাহের সেনাপতি হৈতন খাঁ কর্ত্তৃক এই দুর্গ আক্রান্ত হইয়াছিল, ইহা ১৪৩৭ শকের ঘটনা।

কোচ ঃ— (২৪ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। কোচ জাতির অধিকৃত প্রদেশ। এই প্রদেশের বিস্তৃত বিবরণ রাজমালার প্রথম লহরে (২৪৯ পৃষ্ঠায়) বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

খছুং ঃ— (২০ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। এই স্থান খুচুং নামেও অভিহিত হইত। ইহা লুসাই পর্ব্বতের সন্নিহিত উত্তরদিকে অবস্থিত। * এখানে খুচুং সম্প্রদায়ের কুকিগণ বাস করিত বলিয়া স্থানের নাম উক্তরূপ হইয়াছে। মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের শাসন সময়ে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক রাষ্ট্রবিপ্লব সঙ্ঘটিত হইবার ফলে ত্রিপুরায় বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময় লুসাই ও খুচুং সম্প্রদায়ের কুকিগণ রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করে। এই বিদ্রোহ দমন জন্য যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে (পরে কৃষ্ণমাণিক্য) বিস্তর আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

এতৎসম্বন্ধে কৃষ্ণমালায় লিখিত আছে ;—

"হেন কালে উপদ্রব পূর্ব্ব কুলে † হৈল।
বঙ্গপাড়া থাকি সবে সমাচার পাইল।।

---

* "খুচুঙ্গ কিরাত বাস করয়ে যেখানে।
লুচি-দফা কুকি থাকে তাহার দক্ষিণে।।"
কৃষ্ণমালা।

† বরবক্র নদী ও তাহার দক্ষিণ দিকস্থ চাথেঙ্গ নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানকে প্রাচীনকালে 'পূর্ব্বকুল' বলা হইত। কৃষ্ণমালায় পাওয়া যায় ;—

"কঙ্গলাই নামে এক পর্ব্বতের শৃঙ্গ।
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাতেঙ্গ।।
ই সব স্থানেতে বৈসে যত কুকিচয়।
পূর্ব্বকলিয়া বলি তা সবায় কয়।।"
কৃষ্ণমালা।

খুচু দফা এক কুকি লুচি দফা * আর।
সে সব না থাকে অধিকারে ত্রিপুরার।।
তারা আসি পূর্ব্বকুলে দস্যুবৃত্তি করি।
মনুষ্য মারিয়া ধন লেয়া যায় হরি।।”

রাজমালায় এতৎসম্বন্ধীয় যে-সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

“হেড়ম্ব ছাড়ি যুবরাজ গেল পূর্ব্বকুল।
খুছঙ্গ কুকির সঙ্গে যুদ্ধ যে বহুল।।
* * * *
চাথেঙ্গ নদী পূর্ব্বকুল আসিল যখন।
হেড়ম্ব খুছঙ্গ যুদ্ধে উদ্যোগ করেন।।
খুছঙ্গ মারিতে গেল কবরা গোবর্দ্ধন।
খুছঙ্গ জিনিয়া জয় পাইল তখন।।”

রাজমালা — কৃষ্ণমাণিক্য খণ্ড।

এই যুদ্ধে খুচুংদিগকে জয় করিয়া জনার্দ্দন সেনাপতি “খুচুং দর্পনারায়ণ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। †

খুচুং সম্প্রদায়ের কোন কুকি রাজার কন্যা হইতে বিষলতার উৎপত্তি হইবার একটী প্রাচীন প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

খণ্ডল ঃ— (১৩ পৃঃ — ১১ পংক্তি)। পূর্ব্বে মণ্ডল শব্দের বিবৃতি প্রদান করা হইয়াছে। (প্রথম লহর — ২৩২ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন মতে মণ্ডল শব্দের অর্থ — “দ্বাদশরাজকম্” — (মেদিনী)। “স চ দেশঃ সমন্তাদ্বিংশতিযোজনং চত্বারিংশদ্ যোজনং বা।” (কেচিৎ)। মণ্ডল, দ্বাদশ রাজক নামে অভিহিত ছিল ; অর্থাৎ বার জন রাজার অধিকৃত স্থানকে মণ্ডল এবং তাহার অধিপতিকে মণ্ডলেশ্বর বলা হইত। মণ্ডল অপেক্ষা ক্ষুদ্র ভূভাগ ‘খণ্ডল’ নামে অভিহিত ছিল।

রাজমালায় বর্ণিত খণ্ডল, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান বিলনীয়া বিভাগের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। ইহা কালপ্রভাবে ত্রিপুর রাজ্যের কুক্ষিচ্যুত এবং ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে ‘বসিক’ উপাধিধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী দ্বারা এতদঞ্চল শাসিত হইত। ইহা একটী বিস্তীর্ণ পরগণা, পূর্ব্বে ত্রিপুরা জেলায় ছিল, এখন নোয়াখালী জেলার অধীনে আছে।

---

* লুসাইদিগকে লুচি দফা বলা হইয়াছে।

† জনার্দ্দন নামে এক ছিল সেনাপতি।
খুচুং দর্পনারায়ণ হৈল তার খ্যাতি।
কৃষ্ণমালা।

খামাচেব ঃ— (২০ পৃঃ — ১৪ পংক্তি)। বড়বক্র নদীর দক্ষিণ ও চাথেং নদীর উত্তরস্থিত ভূভাগ প্রাচীনকালে 'পূর্ব্বকুল' নামে অভিহিত হইত। লঙ্গাই উপত্যকাও এই প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী ছিল। ইহা কুকি প্রদেশ। খামাচেব সম্প্রদায়ের কুকিগণ এই প্রদেশের যে স্থানে বাস করিত, সেই স্থান 'খামাচেব' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই স্থান বর্ত্তমান সময়ে বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

খামারাঙ্খল ঃ— (২০ পৃঃ — ১৫ পংক্তি)। এই স্থান পূর্ব্বকুলের অন্তর্নির্বিষ্ট, ছাতাচূড়া পর্ব্বতের পূর্ব্বদিকে হিঙ্গলাছড়ার পূর্ব্বপাড়ে অবস্থিত। বর্ত্তমান কালেও এখানে রাঙ্খল সম্প্রদায়ের কুকি জাতি বাস করিতেছে।

খাসিয়া ঃ— (৪৩ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। ইহা একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। এই প্রদেশ ব্রহ্মপুত্র ও সুর্ম্মা নদীর মধ্যভাগে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয়পাদে এই প্রদেশের রাজা বিজয়মাণিক্যের অবিমৃষ্যকারিতার দরুণ ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য এই রাজ্য আক্রমণ করেন। হেড়ম্বেশ্বর নির্ভয়নারায়ণের মধ্যবর্ত্তিতায় এই বিবাদের শান্তি হইয়াছিল।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশের দেওয়ানী পাইবার সময় হইতেই ইংরেজ কোম্পানির শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয়। ইঁহারা প্রথমতঃ চুণ ও কমলালেবুর ব্যবসা আরম্ভ করেন এবং উত্তরোত্তর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করায় ১৮২৯ খৃঃ -অব্দের এপ্রিল মাসে খাসিয়াগণ ইঁহাদিগকে আক্রমণ করে এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর খাসিয়া প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে ইংরেজের হস্তগত হয়। বর্ত্তমান সময়ে পার্ব্বত্য প্রদেশের কিয়দংশ খাসিয়া সরদারগণ কর্ত্তৃক এবং অবশিষ্টাংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে।

গঙ্গানগর ঃ— (২৫ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুর ও অমরপুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত।

গঙ্গামণ্ডল ঃ— (১৩ পৃঃ — ২ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরা জেলার একটী সুবৃহৎ পরগণা। এই ভূ-ভাগ মুসলমান সাম্রাজ্য কালে ত্রিপুর রাজ্যের কুক্ষিচ্যুত হইয়া, স্বতন্ত্র জমিদারী স্বত্বে পরিণত হইয়াছে। প্রথমতঃ বরদাখাতের জমিদার আকাসাদেক ১৬,৩৮৯ টাকা রাজস্ব অবধারণে এই স্থানের বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। তৎপর শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর খরিদসূত্রে ইহার অধিকারী হইয়াছেন।

গোমতী ঃ— (২২ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। ইহা একটী নদী। এই নদী, আঠারমুড়া পর্ব্বতজাত ছাইমা নদী এবং লংতরাই পর্ব্বতোৎপন্ন রাইমা নদীর সহযোগে উৎপন্ন হইয়া, ডুম্বুর নামক জলপ্রপাত হইতে নির্গত হইয়াছে। ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী অমরপুর ও উদয়পুর এবং সোণামুড়া ও কুমিল্লানগরী এই নদীর তীরে অবস্থিত।

গৌড় ঃ— (১৩ পৃঃ — ৯ পংক্তি)। এই স্থানে দীর্ঘকাল বঙ্গদেশের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজমালা প্রথম লহরের ২৫২ পৃষ্ঠায় এই স্থানের স্থূল বিবরণ প্রদত্ত হওয়ায় এ স্থলে পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

ঘাটলা ঃ— (৭০ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। এই স্থান খণ্ডল ও দাঁড়রার সন্নিহিত। এই স্থানের উপর দিয়া চট্টগ্রামে যাইবার রাস্তা ছিল।

চণ্ডিগড় ঃ— (২০ পৃঃ — ২ পংক্তি)। সোণামুড়া শহরের পূর্ব্বদিকস্থ তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী অল্পোন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গে এই গড় বা সেনানিবাস সংস্থাপিত ছিল। এই স্থান মেলাগড় বাজারের সন্নিহিত। শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের বর্ত্তমান চিফ্ সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিজয়কুমার সেন, এম্. এ. বি-এল মহোদয় সোণামুড়া বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পদে নিযুক্ত থাকাকালে, উক্ত পর্ব্বতশৃঙ্গস্থ মৃত্তিকা গর্ত্তে একটী প্রাচীন তোপ পাইয়াছিলেন, এই স্থানে সেনানিবাস থাকিবার ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই স্থানের ইষ্টক রাশি দেখিলে বুঝা যায় গড়টী প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। মহারাজ অনন্তমাণিক্যকে বধ করিয়া তাঁহার শ্বশুর ও সেনাপতি গোপীপ্রসাদ উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় কন্যাকে (অনন্তমাণিক্যের বিধবা মহিষীকে) এই স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। *

চন্দ্রপুর ঃ— (৬৮ পৃঃ — ৩ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুর শহর হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। মহারাজ উদয়মাণিক্যের রাজপাট এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে মহারাজ উদয় 'চন্দ্রসাগর' নামে এক দীর্ঘিকা খনন ও 'চন্দ্র গোপীনাথ' নামকরণে জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"সিংহাসন তুলি নিল চন্দ্রপুর গ্রামে।।
রাজা বলে তোমা স্বামী পাটে তুমি থাক।
চন্দ্রপুর গ্রামে আমি পাট করিবেক।।
* * * *
বহুল করিয়া যত্ন এক মঠ দিল।
চন্দ্র গোপীনাথ নাম শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিল।।
উদয়মাণিক্য পুরী চন্দ্রপুর গ্রাম।
তাতে দীঘি দিল রাজা চন্দ্রসাগর নাম।।"

উদয়মাণিক্য খণ্ড, — ৬৮ পৃঃ।

---

* "গোপীপ্রসাদ এই কথায় অস্বীকার হইয়া।
নিজেই হইল রাজা অভিষিক্ত হৈয়া।।
কন্যা প্রতি গোপীপ্রসাদ আদেশ করিল।
চণ্ডিগড় ভূমি কন্যায় জায়গীর দিল।।"

ত্রিপুর বংশাবলী।

এই চন্দ্রসাগরের বিস্তৃতি দীর্ঘে ৫০৫ গজ, প্রস্থে ২৬১ গজ। ৪।০ চারি দ্রোণ চারিকাণি ভূমি জুড়িয়া এই সাগর খনিত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণ তীরে রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

চাটিগ্রাম ঃ— (২২ পৃঃ — ১৫ পংক্তি)। ইহার চট্টল, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অনেক নাম আছে। এই সকল নামোৎপত্তি সম্বন্ধে নানাব্যক্তি নানা কথা বলিয়াছেন; তাহার সম্যক উল্লেখ করিতে গেলে বাক্যবাহুল্য ঘটিবে। ব্রহ্মবাসিগণ হইতে এই স্থান 'চিতাগাঁও' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। চিতা শব্দের অর্থ যুদ্ধ, গাঁও শব্দের অর্থ স্থান। চট্টগ্রাম দীর্ঘকাল যুদ্ধক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মঘ, ত্রিপুরা, মুসলমান ও পর্ত্তুগীজ জাতির উত্তপ্ত শোণিতে এই স্থান বারম্বার প্লাবিত হইয়াছে, ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সুতরাং এই স্থানের চিতাগাঁও নাম সুসঙ্গত হইয়াছে। অনেকে বলে, সমুদ্রযাত্রী পোতসমূহের দিক্ নির্ণয়ের সুবিধার নিমিত্ত এই স্থানে 'চাটি' (আলো) জ্বালানো হইত, সেই সূত্রে স্থানের নাম 'চাটিগ্রাম' হইয়াছে। ইহার কোনটী সত্য, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইয়ুরোপীয় ভ্রমণকারিগণ "পোর্ট গ্রেণ্ডো" নাম দিয়েছেন।

এই প্রদেশ মঘ জাতির শাসনাধীন ছিল, পরে হিন্দুদের হস্তগত হয়। তৎকালে ত্রিপুরেশ্বরগণের শাসন দীর্ঘ সময় চলিয়াছিল। ইহার পর ত্রিপুর, মঘ, মুসলমান ও ওলন্দাজগণের মধ্যে চট্টগ্রাম লইয়া বারম্বার শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে চট্টগ্রাম কখনও ত্রিপুরার, কখনও মঘের, কখনও বা মুসলমানের হস্তগত হইতেছিল। এই বিপ্লবের দরুণ চট্টলবাসীদিগকে সুদীর্ঘ-কাল যে অশান্তি ও উপদ্রব ভোগ করিতে হইয়াছে, অন্য কোন দেশের পক্ষে তদ্রূপ ঘটিয়াছে কি না, জানা নাই। ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের শাসনকালের পর হইতে বিজয়লক্ষ্মী স্থায়ীভাবে মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইয়াছিলেন।

চৌয়াল্লিশ ঃ— (৫৮ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। ইহা বর্ত্তমানকালে দক্ষিণ শ্রীহট্টের অন্তর্গত একটি পরগণা। বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহারাজ বিজয় বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই স্থানে শিকার ব্যপদেশে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

চৌহাটিয়া ঃ— (৭৪ পৃঃ — ২৮ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুর ও অমরপুরের মধ্যবর্ত্তী, গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানকালে এই নাম বিলুপ্ত হইয়াছে।

ছকড়িয়া ঘাট ঃ— (২৮ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। ইহার অন্য নাম ছঘরিয়া গড়। এই স্থান সদর (আগরতলা) বিভাগের অন্তঃপাতী চড়িলাম মৌজার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে মুরছুম জাতীয় পার্ব্বত্য প্রজার বাস ছিল। এবং প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান "ছয়ঘরিয়া বাড়ী" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ইহার সন্নিহিত একটী উচ্চ টীলার উপর, চতুষ্কোণ

বিশিষ্ট এবং দীর্ঘাকারের তিনটী গৃহ ভিত্তির চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। এই স্থানে সেনানিবাস থাকিবার কথা বর্ত্তমানকালেও লোকে বলিয়া থাকে।

ছনগাঙ্গ ঃ— (২৬ পৃঃ — ২ পংক্তি)। ইহা একটী নদীর নাম। ইহা গোমতী নদীর পূর্ব্বোত্তর দিক হইতে আসিয়া সেই নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

ছত্রসিক ঃ— (২৪ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। এই স্থান আরাকানের অন্তর্গত এবং রামু বা রাম্বুনগরের সন্নিহিত। মহারাজ ধন্যমাণিক্য এই স্থান পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন।

ছাইমার ঃ— (২০ পৃঃ — ১৩ পংক্তি)। ইহা কুকি প্রদেশ এবং লুসাই পর্ব্বতের অন্তর্নিবিষ্ট স্থান। এই স্থানের কুকিগণ ত্রিপুরার বশ্যতা অস্বীকার করায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে সেনাপতি রায়কাচাগ কর্ত্তৃক ইহারা পরাজিত হইয়া ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

ছাইবেম ঃ— (২০ পৃঃ — ১৩ পংক্তি)। ইহাও লুসাই পর্ব্বতের অন্তর্গত কুকি প্রদেশ। ছাইমার প্রদেশের কুকিগণের ন্যায় এই স্থানের কুকি সম্প্রদায়ও ত্রিপুরার শাসন অমান্য করিতেছিল। মহারাজ ধন্যমাণিক্যে ইহাদিগকে পুনর্ব্বার বসে আনয়ন করেন।

ছাকাচেব ঃ— (২০ পৃঃ — ১৪ পংক্তি)। ইহা হালামগণের আভাসভূমি। ছাকাচেব সম্প্রদায়ের হালামগণের আবাসস্থল বলিয়া স্থানের উক্তরূপ নাম হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে ছাকাচেব সম্প্রদায়ের হালামগণ কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত কমলপুরের পাহাড়ে বাস করিতেছে।

ছাকারাঙ্খল ঃ— (২০ পৃঃ — ১৫ পংক্তি)। ছত্রচূড়ার (ছাতাচূড়া) পূর্ব্ব দিকস্থ হিঙ্গলা ছড়ার পূর্ব্ব পাড়ে প্রাচীনকাল হইতে রাঙ্খল সম্প্রদায় বাস করিয়া আসিতেছে। এই কারণে উক্ত প্রদেশের এক অংশের নাম ছাকারাঙ্খল ও অপর অংশের নাম খামারাঙ্খল হইয়াছে। এই স্থানে বর্ত্তমানকালেও রাঙ্খলগণ বাস করিতেছে।

ছাম্বুল ঃ— ছাম্বুলনগরের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে, এ স্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

জয়ন্ত্যা ঃ— (৪৪ পৃঃ — ১১ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

জামিরখাঁ গড় ঃ— (২৫ পৃঃ — ১০ পংক্তি)। এই স্থান ছঘরিয়া গড় হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। বর্ত্তমানকালে এই স্থান 'বাংমা' নামে পরিচিত। এখানে প্রাচীন দুর্গের প্রাচীর ও পরিখা চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই ইষ্টক গ্রথিত প্রাচীর ৭ সাত হস্ত বেধবিশিষ্ট। প্রাচীরের ইষ্টকে ১৪৪১ অঙ্কিত আছে, ইহা শকাঙ্ক। এই অঙ্কদ্বারা জানা যাইতেছে, উক্ত দুর্গ ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধ্বজমাণিক্যের শাসনকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রাচীরের বাহিরে

সুপ্রশস্ত পরিখা বিদ্যমান, তাহার গভীরতা এখনও স্থানে স্থানে ২ ½ হাত, ৩ হাত পাওয়া যায়। এই পরিখা হইতে উত্থিত মৃত্তিকাদ্বারা প্রাচীর আবৃত করিয়া তাহা অধিকতর দৃঢ় করা হইয়াছিল। বিশালগড় হইতে উদয়পুর পর্য্যন্ত নবনির্ম্মিত রাজবর্ত্ম এই গড় ভেদ করিয়া নেওয়া হইয়াছে।

জাহ্নবী ঃ— (৫৫ পৃঃ — ১০ পংক্তি)। গঙ্গা নদীর নামান্তর। 'জাহ্নবী' নামোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত আছে ;—

"জানুদ্বারা পুরা দত্তা জহ্নুঃ সংপীয় কোপতঃ।
তস্যকন্যাস্বরূপা চ জাহ্নবী তেন কীর্ত্তিতা।।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ — শ্রীকৃষ্ণের জন্ম খণ্ড।

এই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনীতে তিথি বিশেষে স্নানের ফল নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে ;—

"সামান্যদিবস স্নান সঙ্কল্পং শৃণ সুন্দরি।
পুণ্যং দশগুণঞ্চৈব মৌষলস্নানতঃ পরম্।।
ততস্ত্রিংশদ্গুণং পুণ্যং রবি সংক্রমণে দিনে।
অমরাঞ্চাপি তত্তুল্যং দ্বিগুণং দক্ষিণায়নে।।
ততো দশগুণং পুণ্যং নরানাঞ্চোত্তরায়ণে।
চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যাং অনন্তং পুণ্যমেব চ।।
অক্ষয়ায়াঞ্চ তত্তুল্যং নৈতদ্বেদনিরূপিতম্।
অসংখ্যপুণ্যফলদমেতেষু স্নানদানকম্।।
সামান্যদিবসস্নানাৎ দানাৎ শতগুণং ভবেৎ।
মন্বন্তরায়াং দেবেশি যুগাদ্যায়াং তথৈব চ।।
মাঘস্য সিতসপ্তম্যাং ভীষ্মাষ্টম্যাং তথৈব চ।
ততোহপি দ্বিগুণং পুণ্যং নন্দায়াং ভবদুর্ল্লভে।।
দশহরাদশম্যাঞ্চ যুগাদ্যাদিসমং ফলম্।
নন্দাসমঞ্চ বারুণ্যাং মহৎপূর্ব্বে চতুর্গুণম্।।
ততচতুর্গুণং পুণ্যং দ্বিমহৎ পূর্ব্বকে সতি।
পুণ্যং কোটিগুণঞ্চৈব সামান্যস্নানতোহিষৎ।।
চন্দ্রোপরাগ সময়ে সূর্য্যে দশগুণং ততঃ।
পুণ্যোহপ্যৰ্দ্ধোদয়ে কালে ততঃ শতগুণং ফলম্।।
সর্ব্বেষামেব সঙ্কল্পং বৈষ্ণবানাং বিপর্য্যয়ঃ।।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ — প্রকৃতি খণ্ড।

জিনারপুর ঃ— (৫৭ পৃঃ — ৮ পংক্তি)। এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল, বর্ত্তমানকালে শ্রীহট্ট জেলার মৌলবী বাজার উপবিভাগের অন্তর্গত একটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই স্থানে গমন করিয়া

তথায় এক খাল খনন করাইয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"জিনারপুরেতে রাজা খাল কাটি দিল।
ত্রিপুরার খাল বলি নাম তার হৈল।।"
বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৫৭ পৃঃ।

ডরানাম ঃ— (৬৯ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। এই নাম বিশুদ্ধ নহে। রাজমালায় লিখিত আছে — "ডরানাম পথ হৈয়া গৌড় সৈন্য যাইতে।" কিন্তু প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায় — "দাঁড়রার পথ দিয়া গৌড় সৈন্য যাইতে।" এই 'দাঁড়রা' শব্দই লিপিকার প্রমাদে 'ডরানাম' হইয়াছে ; এরূপ ভুলের দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যায়। দাঁড়রা বর্ত্তমান নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত ফেণী উপবিভাগের একটী ক্ষুদ্র পরগণা। এই স্থান ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্ভূত।

ডুম্বুতীর্থ ঃ— (৬১ পৃঃ — ১৩ পংক্তি)। ইহার অপর নাম ডম্বুর। ইহা একটি মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাত। প্রাচীনকালে এই স্থান তীর্থমধ্যে পরিগণিত ছিল। এই লহরের ১১৫ পৃষ্ঠায় ডম্বুরের বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

ডোমঘাটি ঃ— (২৫ পৃঃ — ২৪ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুরের সন্নিহিত দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম তাপর ধুম বা তারপা ধুম। এই স্থানে প্রাচীন জলাশয় ইত্যাদি লোকালয়ের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এবং এখান হইতে খণ্ডল যাইবার একটী পুরাতন বাঁধানো রাস্তা আছে। এই রাস্তা সমসের গাজির নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

তমকান ঃ— (৫৯ পৃঃ — ১০ পংক্তি)। ইহা খোয়াই নামক স্থানের প্রাচীন নাম। এই স্থানে মহারাজ ডাঙ্গর ফা-এর এক বাড়ী ছিল। ইহার অন্য নাম 'বাল্লাঘাট'। শ্রীহট্ট অঞ্চলে 'বাধা' শব্দকে 'বাল্লা' বলে। শত্রুপক্ষের আগমনে বাধা প্রদান জন্য এখানে একটী সৈন্যাবাস ছিল, এই কারণে 'বাল্লাঘাট' নাম হইয়াছে। এই স্থান ত্রিপুর রাজ্যের একটী বিভাগে পরিণত, এবং বাল্লাঘাটে এই বিভাগের সদর কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

তরপ ঃ— (৫৭ পৃঃ — ৬ পংক্তি)। এই শব্দ লিপিকার প্রমাদে বিকৃত হইয়াছে। রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"শ্রীহট্টে চলিল রাজা বিজয় মহাবীর।।
তার পরে জাঙ্গাল রাজা বান্ধয়ে আজ্ঞাতে।
ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি খ্যাতি হয় তাতে।।"

অন্য গ্রন্থের পাঠ এইরূপ ;—

"শ্রীহট্টে ত গেলেন বিজয় মহাবীর।।
তরপে জাঙ্গাল বান্ধে রাজার আজ্ঞায়ে।
ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি অদ্যাপি কহয়ে।।"

এই স্থলে ‘তরপে’ স্থলে ‘তার পরে’ লিখিত হইয়াছে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

তরপ বর্ত্তমানকালে শ্রীহট্ট জেলার একটী পরগণায় পরিণত হইয়া থাকিলেও প্রাচীন কালে ইহা একটী সামন্ত রাজ্য ছিল। তারপর শেষ হিন্দু রাজার নাম আচকনারায়ণ। ইনি ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রিত রাজা হইলেও অন্যান্য স্বাধীন ভূপতি অপেক্ষা তাঁহার প্রভাব কম ছিল না। আচকনারায়ণ সম্বন্ধে তরপের ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় ;—

“আচকনারায়ণ যে ত্রিপুরাধিপতির করদ কিম্বা সংসৃষ্ট ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ; তৎকালে যিনি যে দেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইতেন, তিনি সেই দেশের রাজা বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত এবং খ্যাত হইতেন।”

তরপের ইতিহাস — ৩২ পৃঃ।

তরপ রাজ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। সরাইল, সতর খণ্ডল, জোয়ানশাহী প্রভৃতি পরগণা এই রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। তথাকার রাজা আচকনারায়ণ ধর্ম্মনিষ্ঠ, দয়ালু এবং প্রজাবৎসল ছিলেন। ইনি শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দের সমসাময়িক (খৃঃ ১৪শ শতাব্দী) ব্যক্তি। সম্ভবতঃ মহারাজ রত্নমাণিক্য এই সময় ত্রিপুর সিংহাসনে সমারূঢ় ছিলেন।

আচকনারায়ণের শাসনকালে পাঠানগণ শ্রীহট্টের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার এলাকা মধেও কাজি নুরউদ্দীন নামক ব্যক্তি আপন পুত্রের বিবাহোপলক্ষে গো-হত্যা করায় রাজ আজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড হয়। নুরউদ্দীনের ভ্রাতা হেলিমউদ্দীন ইহার প্রতিকার প্রার্থী হইয়া দিল্লীর সম্রাট সদনে অভিযোগ উপস্থিত করায়, শ্রীহট্টে মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে দিল্লী হইতে সৈয়দ নাসিরউদ্দীনকে সসৈন্যে প্রেরণ করা হয়। তিনি প্রথমতঃ শ্রীহট্টের রাজা গৌরগোবিন্দের ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল অকৃতকার্য্য হওয়ায় ব্রহ্মপুত্র তীরে শিবির স্থাপন করিয়া সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিয়ৎকাল পরে শাহ জালাল নামক জনৈক সাধক ব্যক্তির সাহায্যে গৌরগোবিন্দকে পরাস্ত করিয়া, তরপ আক্রমণের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। রাজা আচকনারায়ণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হৃদয়ে সপরিবারে ত্রিপুরেশ্বরের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ত্রিপুরাধিপতি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা করিলেন না। আচকনারায়ণ হতাশ হৃদয়ে মথুরা যাত্রা করিলেন, সেখানেই তাঁহার মানবলীলা শেষ হইয়াছিল। তদবধি তরপ দেশ মুসলমানের কুক্ষিগত হইয়াছে।

তিষ্ণা ঃ— (৩৯ পৃঃ — ১১ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারী চাকলে রোশনাবাদের একটী সুবৃহৎ পরগণা ; চৌদ্দগ্রাম পরগণার সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। কুমিল্লা হইতে যে সুদীর্ঘ রাজবর্ত্ম চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা এই পরগণার পূর্ব্বাংশে পতিত হইয়াছে।

বিখ্যাত জগন্নাথ দীঘি তিষ্ণা পরগণার বক্ষঃস্থিত কৌস্তুভমণি স্বরূপ। যে সময় চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ত্রিপুরার অধিকারভুক্ত ছিল, তৎকালে এই পরগণার নানাস্থানে রাজন্যবর্গের বিশ্রামাগার নির্ম্মিত ও সুবৃহৎ জলাশয় খনিত হইয়াছিল।

ত্রিপুরার খাল ঃ— (৫৭ পৃঃ — ৯ পংক্তি)। এই খাল শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত জিনারপুর নামক স্থানে মহারাজ বিজয়মাণিক্য কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"জিনারপুরেতে রাজা খাল কাটি দিল।
ত্রিপুরার খাল বলি নাম তার হইল।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৫৭ পৃঃ।

ত্রিপুরার জাঙ্গাল ঃ— (৫৭ পৃঃ — ৭ পংক্তি)। শ্রীহট্ট জেলাস্থিত তরপ পরগণায় মহারাজ বিজয়মাণিক্যের নির্ম্মিত এক রাস্তা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার নাম ত্রিপুরার জাঙ্গাল। এই রাস্তা বা জাঙ্গাল সম্বন্ধে শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতা মহাশয় বলিয়াছেন ;—

"রাজা আচকনারায়ণ (তরপের রাজা) সম্বন্ধে তরফ অঞ্চলে এখনও অনেক গল্প শ্রুত হওয়া যায়। কথিত আছে যে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পুণ্যপ্রদ বরবক্র (বরাক) নদ তাঁহার রাজধানী হইতে অনেক দূরে থাকিলেও তিনি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সেই নদে স্নান করিতে যাইতেন। যে স্থানে তিনি স্থান করিতেন, তাহা অদ্যাপি স্নানঘাট নামে কথিত হয়। যে পথ দিয়া স্নানে যাইতেন, তাহা 'ত্রিপুরার জাঙ্গাল' নামে অভিহিত হয়।"

ইহার পরেই বলিয়াছেন ;—

"রাজা আচকনারায়ণের বংশ পরিচয়াদি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না ; তিনি ত্রৈপুর বংশীয় নৃপতি হইলেও হইতে পারেন। তন্নির্ম্মিত পথ "ত্রিপুরার জাঙ্গাল" নামে অভিহিত হওয়ার ইহাই কারণ বলিয়া বোধ হয়।"

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — ২য় ভাঃ, ২য় খঃ, ৫ম অধ্যায়।

কথিত ত্রিপুরার জাঙ্গাল রাজা আচকনারায়ণের নির্ম্মিত নহে, এবং তদ্ধেতু রাস্তার পূর্ব্বোক্ত নামকরণ হয় নাই। এই পথ ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের নির্ম্মিত। রাজমালায় পাওয়া যাইতেছে ;—

"শ্রীহট্টে চলিল রাজা বিজয় মহাবীর।।
তরপে জাঙ্গাল রাজা বান্ধয়ে আজ্ঞাতে।
ত্রিপুরার জাঙ্গাল বলি খ্যাতি হয় তাতে।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ৫৭ পৃঃ।

রাজা আচকনারায়ণ কোন্ বংশীয় ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। ত্রিপুর রাজবংশীয় অনেক ব্যক্তি নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইনিও সেই বংশীয় কি না, জানিবার উপায় নাই। ত্রিপুরার সামন্ত রাজা ছিলেন, এই মাত্র

অনুসন্ধানে পাওয়া যায়।

ত্রিহুত ঃ— (২৯ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। ইহা সংস্কৃত তীরভুক্তি শব্দের অপভ্রংশ। ত্রিহুতের অংশবিশেষ লইয়া মহারাজ নিমির পুত্র মিথি, মিথিলা রাজ্য স্থাপন করেন। ভবিষ্যপুরাণে পাওয়া যায় ;—

"নিমেঃ পুত্রস্তু তত্রৈব মিথির্নাম মহান স্মৃতঃ।
প্রথমং ভুজবলৈর্যেন তৈরহূতস্য পার্শ্বতঃ।।
নির্ম্মিতং স্বীয় নাম্না চ মিথিলাপুরমুত্তমম্।
পুরীজনন সামর্থ্যাজ্জনকঃ স চ কীর্ত্তিতঃ।।"

মর্ম্ম ঃ— নিমির পুত্র মিথি, তীরহুতের এক দেশে স্বনামে মিথিলাপুর নগরী নির্ম্মাণ করেন। পুরীজননের সামর্থ্য হেতু তিনি জনক নামে কথিত হন।

তদবধি মিথিলার নৃপতিগণ সকলেই 'জনক' উপাধি গ্রহণ করিতেন। *

শাস্ত্রগ্রন্থদ্বারা তীরভুক্তি বা ত্রিহুতের সীমা নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে ;—

"গণ্ডকী তীরমারভ্য চম্পারণ্যান্তগং শিবে।
বিদেহভূঃ সমাখ্যা-তা তৈরভুক্তার্ভিধঃ স তু।।"

অর্থাৎ — বিদেহ বা তীরভুক্তি দেশ গণ্ডকী নদীর তীর হইতে আরম্ভ করিয়া চম্পারণ্যের (চম্পারণ) শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই ত্রিহুত বা মিছিলা রাজ্যে, নিমি হইতে অধস্তন ৫৬ পুরুষ মহারাজ কৃতি পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। জনক বংশের অবসানের পর নান্য দেব নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা তীরহুতের আধিপত্য লাভ করেন। নেপাল রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী শিমরাওন্ গড় তাঁহার কীর্ত্তি। অদ্যাপি এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। দুর্গগাত্রে সংযোজিত শিলালিপির পাঠ এইরূপ ;—

"নন্দেন্দু বিন্দু বিধুসম্মিত শাক বর্ষে ১০১৯
তৎ শ্রাবণে সিতদলে মুনি সিদ্ধিতিথ্যাম্।
স্বাতি শনৈশ্চর দিনে করিবৈরি লগ্নে
শ্রীনান্যদেব নৃপতি বিদধীতবাস্তম্।।"

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, নান্যদেব ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খৃঃ) শ্রাবণের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে স্বাতি নক্ষত্রাশ্রিত শনিবারে সিংহ লগ্নে এই দুর্গের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১০১১ শক হইতে ১২৪৫ শক পর্য্যন্ত এই বংশের ছয় জন রাজা ক্রমান্বয়ে ত্রিহুতে রাজত্ব করিয়াছেন। তৎপর রাজা ভবসিংহের বংশ এই প্রদেশের অধিনায়ক হন। ভবসিংহ

---

* 'আইন-ই-তীরহুত' গ্রন্থের মতে 'জনক' শব্দের অপভ্রংশে জঙ্গ্ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

কামেশ্বর ঝাঁ-এর পুত্র। ইঁহার অধস্তন তৃতীয় পুরুষ রাজা শিবসিংহের আশ্রয় লাভ করিয়া বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর স্বীয় প্রতিভা বিস্তার করিয়াছিলেন, শিবসিংহের ছয় পত্নীর মধ্যে পঞ্চম মহিষীর নাম ছিল লখিমা বা লছিমা দেবী। বিদ্যাপতির পদে পাওয়া যায় ;—

"রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ —
লছিমা দেবী পরমাণ।।" ইত্যাদি।

শিবসিংহের খুল্লতাত ভ্রাতা নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে, তিনি বঙ্গের সুবাদার সুলতান গিয়াস্‌উদ্দীনের হস্তে পরাজিত ও মুসলমানগণের করপ্রদ হইয়াছিলেন। ইহার পরেও এই বংশের কতিপয় ব্যক্তি ত্রিহুতে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পাঠান-শাসনের অনুবর্ত্তী ছিলেন। অতঃপর নানা হাত ঘুরিয়া এই প্রদেশ দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান রাজবংশের হস্তে পতিত হইয়াছে। সম্রাট আকবরের সময় হইতেই তদঞ্চলে মুসলমান-শাসন সুদৃঢ় হইয়াছিল।

ত্রিহুত বা মিথিলা প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যাচর্চ্চার নিমিত্ত ভারত বিখ্যাতি ছিল। বর্ত্তমান কালেও মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলী আদর্শ স্থানীয়। সঙ্গীত-কলার চর্চ্চাও এ দেশে যথেষ্ট ছিল। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধন্যমাণিক্য ত্রিহুত হইতে নৃত্য-গীত নিপুণ ব্যক্তিদিগকে আনিয়া স্বরাজ্যে এই বিদ্যার প্রচলন করিয়াছিলেন। রাজমালায় লিখিত আছে ;—

"ত্রিহুত দেশ হইতে নৃত্য-গীত আনি।
রাজ্যেতে শিখায় গীত-নৃত্য নৃপমণি।।"
ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২৯ পৃঃ।

মহারাজের এই সদনুষ্ঠানজনিত ফল আজ পর্য্যন্তও ত্রিপুরাবাসিগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। রাজ্যের ঘরে ঘরে সঙ্গীতরসজ্ঞ লোক পাওয়া যাইবে। দুঃখের কথা, সাধারণের অভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গুণটী ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।

তৈকতান ঃ— (২৬ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। এই স্থান গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী ; দেবদ্বারের অল্প উজানে এবং ছনগাঙ্গের দুই বাঁক ভাটীতে অবস্থিত। পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ ত্রিপুরা আক্রমণ কালে, এই স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

থানাংচি ঃ— (১৭ পৃঃ — ১০ পংক্তি)। ইহা কুকি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৬ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

থুণাইলামপাড়া ঃ— (৭৫ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। তৈকতানের অল্প উত্তরদিকে ছাইমা জাতীয় পার্ব্বত্য প্রজাগণ বাস করিত। জনবসতির চিহ্নস্বরূপ একটি পুরাতন পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পার্ব্বত্য পল্লীকে 'থুণাইলামপাড়া' নামে অভিহিত করা হইত বলিয়া জানা যায়।

দক্ষিণ বাজু ঃ— (৪৩ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। রাজধানী রাঙ্গামাটির উত্তর-দিকস্থ প্রদেশসমূহ (আসাম প্রভৃতি) দক্ষিণ বাজু এবং দক্ষিণদিকস্থ চট্টগ্রাম প্রভৃতি দেশ বাম বাজু নামে অভিহিত হইত।

দেবদ্বার ঃ— (২৬ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। যে স্থানে ছনগাঙ্গ গোমতী নদীতে পতিত হইয়াছে, তাহার ভাটিতে এই স্থান অবস্থিত। এখানে পর্ব্বতের প্রস্তরময় গাত্রে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। মাছিছা বা মারছা (দেবতামুড়া) নামক স্থানের অনুকরণে এই সকল মূর্ত্তি খোদিত হইয়া থাকিবে। ইহার অনেক মূর্ত্তি পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ-এর সঙ্গীয় শিল্পীগণের খোদিত বলিয়া রাজমালা আলোচনায় জানা যায়, যথা ;—

“গঙ্গানগর হৈতে রাজা ডোমঘাটি পথে।
রহিল হৈতন খাঁ গড় করি তাথে।।
* * * *
ছনগাঙ্গ তৈকতাল দেবদ্বার নাম।
তার কত বাক উজান মাছিছড়া ধাম।।
হৈতন খাঁ সঙ্গে ছিল যত শিল্পকর।
নির্ম্মাইছে গড় পরে দেব বহুতর।।”

ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২৫-২৬ পৃঃ।

দৌচাপাথর ঃ— (২৯ পৃঃ — ৮ পংক্তি)। সাধারণতঃ এই স্থানকে দোয়াপাথর বলে। এই স্থান বর্তমান কালে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের (Chittagong Hill tract) দীঘি নালা থানার এলাকায় অবস্থিত। এই স্থানে অনেক প্রাচীন দীঘি পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে। সেকালে এখানে ত্রিপুরেশ্বরগণের বিরাম ভবন ছিল। দেবস্থান বলিয়া সকলেই এই স্থানকে পবিত্র মনে করিত, এবং প্রতি বৎসর অসংখ্য বলিদ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করা হইত। এখানে নরবলিও অনেক হইয়াছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্য সমস্ত দেবালয়েই নরবলির সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন। তখন নিয়ম করা হয়, শত্রু পাইলে তাহাদের দুইজনকে এই স্থানে বলি দেওয়া হইবে। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“পূর্ব্বেতে ত্রিপুরা রাজা নরবলি দিত।
সহস্র সহস্র বঙ্গ বর্ষে কাটা যাইত।।
শ্রীধন্যমাণিক্য মানা তাহাকে করিল।
তদবধি নরবলি নিষেধ হইল।।
তিন বৎসরে এক নর চতুর্দ্দশদেবে।
কালিকাতে এক নর পাইবেক যবে।।
দৌচাপাথরে দুই নর শত্রু পাইলে হয়।
গোমতীতে দুই বলি ঘটে যে সময়।।
ইহাতে অধিক বলি মানা করে রাজা।
তদবধি নিশ্চিন্তে রহিল রাজ্য প্রজা।।”

ধন্যমাণিক্য খণ্ড — ২৯ পৃষ্ঠা।

ত্রিপুরা ভাষায় দোয়াপাথর ও শ্বেত হস্তী সম্বন্ধীয় একটী আখ্যান প্রচলিত আছে। এই লহরের ২২৯ পৃষ্ঠায় তাহা পাওয়া যাইবে।

ধ্বজঘাট ঃ— (৫৫ পৃঃ — ৮ পংক্তি)। ইহা ঢাকা জেলাস্থিত সুবর্ণগ্রামের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের একটী তীর্থঘাট। পরশুরাম এই ঘাটে স্নান করিয়া ধ্বজ রোপণ ও তাহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তদবধি স্থানের নাম ধ্বজঘাট হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য সুবর্ণগ্রাম জয় করিয়া এই স্থানে সহস্র সুবর্ণধ্বজা স্থাপন ও তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দান করায় বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি “ধ্বজঘাট বিজয়ী” বলিয়া স্বীয় নামে সুবর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করেন।

ধ্বজনগরঃ— (৬০ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। মহারাজ বিজয়মাণিক্য ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী ধ্বজঘাট হইতে বণিক্য ও কাঁসারি প্রভৃতি নানাজাতীয় শিল্পী ও পণ্য ব্যবসায়ী লোক স্বীয় রাজ্যে আনিয়া বিশালগড়ের সন্নিকটে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ধ্বজঘাট হইতে আনীত ব্যক্তিগণের বসতিস্থান বলিয়া সেই গ্রামের নাম ধ্বজনগর রাখা হইয়াছিল।

ধর্ম্মনগর ঃ— (৫৯ পৃঃ — ৬ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৭ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

ধর্ম্মপুর ঃ— (৬২ পৃঃ — ২৭ পংক্তি)। এই স্থান কোথায় ছিল, বর্ত্তমান সময়ে নির্ণয় করিবার সুবিধা নাই ; সম্ভবতঃ স্থানের নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহা যে উদয়পুর রাজধানীর সন্নিহিত ছিল, তাহা বুঝা যায়।

পঞ্চখণ্ড ঃ— (৫৭ পৃঃ — ১০ পংক্তি)। শ্রীহট্ট জেলার একটি পরগণা। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ আদি ধর্ম্মপা-এর যজ্ঞোপলক্ষে মিথিলা হইতে পাঁচ জন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহারা যজ্ঞ সমাপনের পর, রাজার অনুরোধে তদ্দেশে বাস করিতে সম্মত হইলেন। ত্রিপুরেশ্বর এই পঞ্চ তপস্বীকে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যে ভূ-ভাগ প্রদান করেন, তাহাই পঞ্চখণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে। তৎকালে এই প্রদেশ ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, কালপ্রভাবে মুসলমানগণের হাত ঘুরিয়া পরে বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। পঞ্চখণ্ড সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রথম ভাগ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ এবং রাজমালা প্রথম লহর আলোচনা করিলে জানা যাইবে।

পঞ্চদ্রোণা ঃ— (৫৫ পৃঃ — ৭ পংক্তি)। সাধারণতঃ এই স্থান ‘পাঁচদোণা’ নামে অভিহিত। ইহা ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগণাস্থিত একটী প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ জনপদ। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ বিজয়মাণিক্যে সুবর্ণগ্রাম জয়ের পর ব্রহ্মপুত্র স্নানান্তে কোনও ব্রাহ্মণকে পাঁচদ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, সেই সূত্রে স্থানের নাম পঞ্চদ্রোণা বা পাঁচদোণা হইয়াছে। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“সেই রাজ্য জমিদার আনয়ে রাজন।
পঞ্চদ্রোণ ভূমি ক্রয় করিল তখন।।

সেই পঞ্চ দ্রোণ ভূমি ব্রাহ্মণকে দিল।
সেই হনে পঞ্চদ্রোণা গ্রাম নাম হৈল।।
ধ্বজঘাট সমীপেতে পঞ্চদ্রোণ গ্রাম।
বিজয়মাণিক্য রাজা পুণ্যতর ধাম।।”

বিজয়মাণিক্য খণ্ড — ২৫ পৃঃ।

এতৎসম্বন্ধে স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

“মহারাজ বিজয়মাণিক্য ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে পঞ্চদ্রোণ ভূমি দান করিয়াছিলেন, তদনুসারে সেই স্থান অদ্যাপি ‘পাঁচদোণা’ নামে পরিচিত হইয়াছে।।”

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ৪ অধঃ, ৫৮ পৃঃ।

এই ‘পাঁচদোণা’ নাম অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। অতি অল্প পরিমাণ ভূমিদানের নিমিত্ত মহারাজ বিজয় যেরূপ স্মরণীয় হইয়াছেন, বিরাট যজ্ঞ বা দান করিয়াও অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই।

পদ্মা ঃ— (৫২ পৃঃ — ১০ পংক্তি)। ইহা নদীর নাম। এই নদী পাবনা ও ফরিদপুর জেলার সীমারূপে প্রবাহিতা হইয়া ঢাকা জেলার পশ্চিম পার্শ্বে যমুনার সহিত সঙ্গতা হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থান গোয়ালন্দের সন্নিহিত এবং “বাইশ কোদালিযার মোহনা” নামে অভিহিত। এখান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিতা হইয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া, বঙ্গোপসাগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। দেবী ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে এই নদীর নাম পাওয়া যায়। ইহার বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অংশ “কীর্ত্তিনাশা” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংসের দ্বারা এই নাম লাভ করিয়াছে। সলরজঙ্গ্ মহারাজ রাজবল্লভ সেন রায় রাইয়ার প্রসিদ্ধ কীর্ত্তিকলাপ এবং আরও অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রাচীন কীর্ত্তি কীর্ত্তিনাশার উদরসাৎ হইয়াছে।

পাটিকারা ঃ— (১৩ পৃঃ — ২ পংক্তি)। বর্ত্তমানকালে ইহা কুমিল্লা সহরের পশ্চিমদিকস্থ ময়নামতী পাহাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত একটী পরগণা বিশেষ। এই প্রদেশ অনেক বংশের হাত ঘুরিয়া নানাবিধ অবস্থা পরিবর্তনের পর, ভূ-কৈলাসের রাজবংশের হস্তগত হইয়াছে।

প্রাচীনকালে পাটিকারা একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল; মেহেরকুলও এই রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথের তাম্রশাসনদ্বারা উক্ত প্রদেশে তাঁহার আধিপত্য স্থাপনের বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে। লোকনাথের প্রভুত্ব কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং পাটিকারা প্রভৃতি জনপদ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল কি না, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইনি শূরবংশীয়

রাজাগণের সামন্ত নরপতি ছিলেন, এই কথারও নির্ভরযোগ্য প্রমাণও নাই। উল্লিখিত তাম্রলিপির সময় নির্ণয় সম্বন্ধেও মতবৈষম্য দেখা যায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, এম্. এ. মহাশয় এই লিপির পাঠোদ্ধার উপলক্ষে নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর উৎকীর্ণ। * ডাক্তার বুলার এই লিপি দশম শতাব্দীর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে সময়েরই সম্পাদিত হউক, লোকনাথ যে বর্ত্তমান ত্রিপুরার কিয়দংশে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, আলোচ্য তাম্রফলকদ্বারা তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

অতঃপর এতদঞ্চলে খড়্গ রাজগণের আধিপত্য স্থাপনের নিদর্শন পাওয়া যায়। রায়পুর থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রামে প্রাপ্ত দেব খড়্গের তাম্রলিপি হইতে এই বংশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্. এ. মহাশয় নির্দ্দেশ করেন, ইঁহারা সমতটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, এবং কুমিল্লা নগরীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত বড় কামতা বা করমন্ত নগরে ইঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। † তাঁহার মতে সমতট রাজ্যের অবস্থান মেঘনা নদের পূর্ব্ব তীরে। এ বিষয়ে মতবিরোধ থাকিলেও অন্য এক অকাট্য প্রমাণদ্বারা নলিনীবাবুর মত সুদৃঢ় বলিয়া মনে হইতেছে। খড়্গ বংশোদ্ভব সমতটের অধীশ্বর খড়্গোদ্যমের মহিষী রাণী প্রভাবতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণমণ্ডিত অষ্টভূজা মূর্ত্তিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ‡ এই মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপির মর্ম চাঁদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদান করা হইল। § উক্ত মূর্ত্তি অপহৃত হওয়ায়, তাহা দেখিবার কিম্বা পাদ-লিপি সংগ্রহ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। পাদলিপিতে খড়্গোদ্যম, জাত খড়্গ, দেব খড়্গ, খড়্গরাজ এবং রাণী প্রভাবতীর নাম পাওয়া যাইতেছে। আসরফপুরের তাম্রশাসনে যথাক্রমে খড়্গোদ্যম, জাত খড়্গ, দেব খড়্গ ও রাজ রাজভট্টের নামের সহিত মহাদেবী প্রভাবতীর উল্লেখ আছে। সুতরাং উভয় লিপিতে অঙ্কিতনামা ব্যক্তিবর্গ যে অভিন্ন, তাহা নিতান্ত সহজবোধ্য।

---

* সাহিত্য — জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ সন।

† Journal of the Asiatic Society of Bengal — March, 1914 এবং প্রতিভা — চৈত্র, ১৩২০ সন।

‡ এই মূর্ত্তি ত্রিপুরা জেলার বগাসারি পরগণার অন্তর্গত দৌলবাড়ী (দেউল বাড়ী) নিবাসী বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে ছিল। চাঁদপুর গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহা চণ্ডীমুড়াস্থিত প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অল্পকাল পরে তাহা অপহৃত হইয়াছে। শুনা যায়, ইহার প্রতিকৃতি ঢাকার চিত্রশালায় আছে।

§ পাদলিপি ;— "স্বস্তি খড়্গোদ্যমো নামক এক নরপতি ছিলেন, জাত খড়্গ নামক তাহার পুত্র ধরাধামে ছিলেন, তাহার পুত্র দাতাশ্রেষ্ঠ এবং প্রতাপশালী শ্রীদেব খড়্গ ছিলেন। তৎপুত্র ভূপতি শ্রেষ্ঠ শত্রুবিজয়ী খড়্গরাজ। তাহার অভিষিক্তা মহিষী প্রভাবতী, তিনি প্রীতি এবং ভক্তির সহিত সর্ব্বাণী দেবীকে সুবর্ণ ভূষিতা করিয়াছিলেন।"

পালবংশীয় রাজগণের এতদঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের প্রমাণ বৰ্ত্তমান কালেও দুষ্প্রাপ্য নহে। রাজা মহীপাল সর্ব্বজনবিদিত নরপতি ছিলেন। * তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বাঘাউড়ায় প্রাপ্ত বিষ্ণুমূৰ্ত্তি এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। † এই বিগ্রহের পাদপীঠে উৎকীর্ণ হইয়াছে ;—

"ওঁ সম্বত্ ৩ মাঘ দিনে ২৭ (?) শ্রীমহীপাল দেব রাজ্যে
কীৰ্ত্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাখ্য সমতটে বিলকিন্ন
কীয় পরম বৈষ্ণবস্য বণিকলোক দত্তস্য বসুদত্ত সুত
স্য মাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্য যশো অভিবৃদ্ধয়ে।।" ‡

এতদ্দ্বারা রাজা মহীপাল সমতটে রাজত্ব করা প্রমাণিত হইতেছে। এবং তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত হওয়ায়, তদঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য বিস্তারের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ইহার পর চন্দ্র-রাজাগণের আবির্ভাব কাল। ইঁহারা পালবংশের সামন্ত রাজা ছিলেন, § পরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের প্রমাণ পাওয়া যায় ; কিন্তু কোন সময়ে কি সূত্রে ইঁহারা পাল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। মহীপাল দেবের সাম্রাজ্য কালে চন্দ্রদ্বীপের সামন্ত রাজা শ্রীচন্দ্র দেব, পূর্ব্ববঙ্গে স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন, কোন কোন ঐতিহাসিক এরূপ অনুমান করেন। ইঁহার রাজধানী বিক্রমপুরে সংস্থাপিত ছিল।

ইদিলপুর ও রামপালের তাম্রশাসনদ্বয়ে বৌদ্ধ ধৰ্ম্মাবলম্বী বঙ্গাধীপ শ্রীচন্দ্র দেবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এই সকল তাম্রপট্টের আলোচনা অল্প কথায় হইবার নহে। তৎসাহায্যে যে বংশ তালিকা পাওয়া গিয়াছে, প্রয়োজনীয় বোধে এ স্থলে কেবল তাহারই

---

* পালবংশের এবং রাজা মহীপালের বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইবে ;—

গৌর লেখমালা — ৯৫ অঃ, ১০০ পৃঃ। Mass Pal Kings of Bengal — By R. D. Banerjee. প্রবাসী — কার্ত্তিক, ১৩২১।

† শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ বি. এ. মহাশয় এই মূর্ত্তির প্রথম সন্ধানকারী। তিনি, শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের সাহায্যে এই মূর্ত্তির পাদপীঠ লিপি উদ্ধার করেন। শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ও এই মূৰ্ত্তি দর্শন এবং বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। বৰ্ত্তমানকালে মূৰ্ত্তিটী ত্রিপুরার বড়ঠাকুর শ্রীলশ্রীযুত সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববৰ্ম্মণ বাহাদুরের অধিকারে আছে।

‡ Dacca Review — May, 1914.

§ "শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনের যে রাজমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পাল রাজাগণের রাজমুদ্রা। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চন্দ্র রাজগণ পাল রাজগণের সামন্ত রাজা ছিলেন।"

ঢাকার ইতিহাস — ২য় খণ্ড, ৮ম অধঃ, ২৩২ পৃঃ।

আলোচনা করা যাইতেছে।

(রামপাল-লিপি অনুসারে)।	(ইদিলপুর-লিপি অনুসারে)।
|	|
পূর্ণচন্দ্র।	*
|	|
সুবর্ণচন্দ্র।	সুবর্ণচন্দ্র
|	|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র।	ত্রৈলোক্যচন্দ্র।
|	|
শ্রীচন্দ্র দেব।	শ্রীচন্দ্র দেব।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় রামপাল লিপির পাঠোদ্ধার উপলক্ষে বলিয়াছেন, — "বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্য যুগের বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া প্রতিভাত।"

এই সকল তাম্রশাসনের যথাযথ বিবরণ এবং কোন সময়ে কি সূত্রে শ্রীচন্দ্র দেব পূর্ব্ববঙ্গে আধিপত্য স্থাপন এবং বিক্রমপুরে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই বিস্তৃত বিবরণ এ স্থলে প্রদান করা অসম্ভব। মিঃ জে, টি, রেঙ্কিন্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিবরণ, * মিঃ গ্রীয়ারসন্ সাহেবের লিখিত বিবরণ, † এবং 'সাহিত্য' সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ‡ আলোচনা করিলে এতদ্বিষয়ক অনেক কথা জানা যাইবে। ঢাকার ইতিহাসেও বিষয়টী আলোচিত হইয়াছে। § এই চন্দ্র-রাজবংশের আধিপত্য কেবল বিক্রমপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। তন্মধ্যে গৌড়ের (রঙ্গপুর অঞ্চলের) নাম উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য স্থানের কথা ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

বঙ্গের চন্দ্ররাজগণের সঙ্গে মেহেরকুলের চন্দ্ররাজগণের বংশানুক্রমিক সম্বন্ধ ছিল, এ স্থলে তাহা প্রদর্শন করাই প্রধান উদ্দেশ্য। দুর্ল্লভ মল্লিকের রচিত 'গোবিন্দ চন্দ্রের গান' হইতে এ বিষয়ের সূত্র পাওয়া যাইতেছে। উক্ত গাথায় লিখিত আছে ;—

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজ ধারিচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা।।"

তাম্রফলকের সাহায্যে পূর্ব্বে যে বংশতালিকা প্রদান করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা জানা যায়, শ্রীচন্দ্র দেবের পিতামহের নাম সুবর্ণচন্দ্র। পূর্ব্বোক্ত তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ সুবর্ণচন্দ্র ও দুর্ল্লভ মল্লিকের গাথায় লিখিত সুবর্ণচন্দ্র অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া প্রায় সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার

---

* Dacca Review — Oct., 1922.

† Journal of Asiatic Society of Bengal — 1878, Part I, Page 181.

‡ সাহিত্য (মাসিক পত্র) — শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩২০।

§ ঢাকার ইতিহাস — ২য় খণ্ড, ৮ম অধ্যায়।

করিয়াছেন; পশ্চাদুক্ত বিবরণ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হইবে।

ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত কবি ভবানী দাসের 'ময়নামতীর গান' * এবং পূর্ব্বকথিত দুর্ল্লভ মল্লিক কৃত 'গোবিন্দচন্দ্রের গান' একই বিষয় লইয়া রচিত হইয়াছে। ময়নামতীর গানে পাওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত সুবর্ণচন্দ্রের বংশধর মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র পাটিকারা এবং মেহেরকুলে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বীয় দুহিতা অদুনা ও পদুনাকে গোবিন্দচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া এই বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। উক্ত পুস্তিকাদ্বারা, বিক্রমপুর, মেহেরকুল (পাটিকারা সহ) এবং সাভারের সহিত চন্দ্ররাজগণের অচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকা জানা যাইতেছে। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল;—

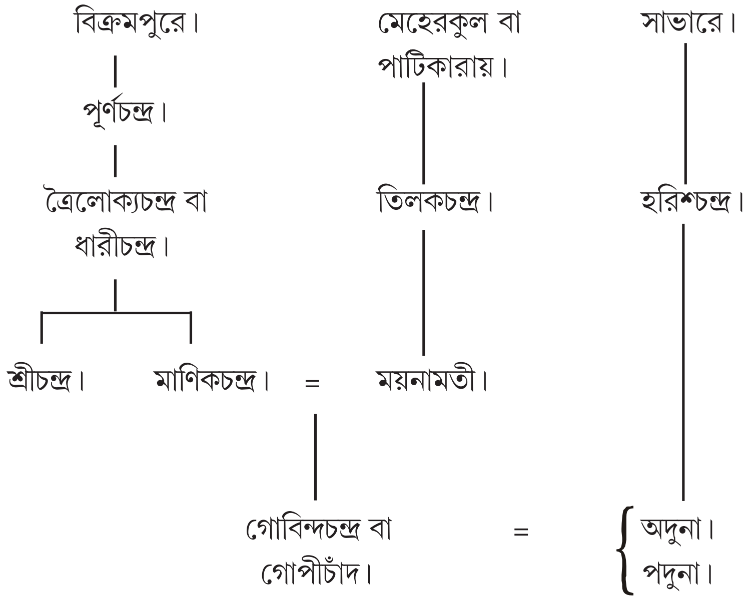

পাটিকারার অধিপতি তিলকচন্দ্রের একমাত্র কন্যা ময়নামতী ব্যতীত অন্য সন্তান থাকিবার প্রমাণ নাই। এই কন্যাকে বঙ্গেশ্বর সুবর্ণচন্দ্রের পৌত্র (শ্রীচন্দ্র দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) মাণিকচন্দ্র বিবাহ করেন। এই সূত্রে তিনি পৈতৃক রাজ্য বিক্রমপুর এবং শ্বশুরের রাজ্য মেহেরকুল বা পাটিকারায় আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। এবং সাভাররাজ হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র শ্বশুরের অধিকৃত সাভারসহ পূর্ব্বোক্ত পৈতৃক রাজ্যদ্বয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই সময়ও পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত গৌড়ের অধিকার একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। রঙ্গপুরের 'ময়নামতীরকোট' ইত্যাদি প্রাচীন কীর্ত্তিদ্বারা ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণের সূচনাকালে আপেক্ষের সহিত বলিয়াছিলেন,

* এই পুস্তিকা শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্-এ, মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে।

— "বাপের মিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়র সহর।" এতদ্দ্বারাও গৌড়ের সহিত সম্বন্ধসূচিত হইতেছে। গোবিন্দচন্দ্রের উক্তিতে পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য স্থানের সহিত সম্বন্ধ থাকাও জানা যাইতেছে ;—

"বাপের বিরাশ এড়ি যাইমু গৌড়ের সহর।
দাদার মিরাশ এড়ি যাবেক কমলাক নগড় *।।
তুহ্মি মায়ের যত বাড়ী পাটিকানগর †।
আহ্মি বাড়ী বান্দিয়াছি মেহেরকুল সহর ।।" ইত্যাদি।।

উক্ত পুথির অন্য স্থানে পাওয়া যায়, —

"আদ্য মাটী আছে কিন্তু মেহেরকুল নগড়।
নিজ মাটী আছে কিছু বিক্রমপুর সহর।।
আর আছে আইধ্য মাটী তরপের দেশ।
চাটীগ্রাম পূর্ব্ব মাটী জানিবা বিশেষ।।"

উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা গৌড়, পাটিকারা বা মেহেরকুল, বিক্রমপুর, তরপ ‡ ও চট্টগ্রামে গোবিন্দচন্দ্রের আধিপত্য থাকা প্রমাণিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ময়নামতী তিলকচন্দ্রের কন্যা ও মাণিকচন্দ্রের মহিষী ছিলেন। এবং মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র সাভারের রাজকন্যা দ্বয়ের (অদুনা ও পদুনা) পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ময়নামতীর গানেও ঠিক এই সকল কথাই পাওয়া যাইতেছে ;—

১) ময়নামতী স্বীয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন ;—

"তোর বাপে বলিলেক, তিলকচাঁদের ঝি।
তোর জ্ঞান লইলে আহ্মার হবে কি।।"

এই বাক্য দ্বারা ময়নামতীকে তিলকচন্দ্রের কন্যা বলিয়া জানা যাইতেছে।

(২) "মাণিকচন্দ্র রাজা ছিলেন ধর্ম্মী বড় রাজা।
ময়নাকে বিভা করিল তার নওবুড়ি ভারিয়া।।"

ময়নামতী যে মাণিকচন্দ্রের ভার্য্যা, উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা তাহা প্রমামিত হইতেছে।

(৩) গোবিন্দচন্দ্র স্বীয় মাতাকে বলিয়াছিলেন ;—

"এক বিভা করাইলা অদুনা পদুনা।
সে সব সুন্দরী জানে আমার বেদনা।।"

---

* কমলাক বা কমলাঙ্ক, কুমিল্লার প্রাচীন নাম।

† পাটিকা — পাটিকারা।

‡ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলিয়াছেন ;— "তরপের দেশ বোধ হয় রঙ্গপুর।" শ্রীহট্টে 'তরপ' নামক এক খণ্ডরাজ্য ছিল। তথায় চন্দ্র-রাজগণের আধিপত্য বিস্তারের কোনও প্রমাণ নাই। ময়নামতী গানে সন্নিবিষ্ট তরপের অবস্থান নির্ণয় করা বর্ত্তমান কালে দুঃসাধ্য।

অন্যত্র পাওয়া যায়, গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাসী হইবে শুনিয়া, পদুনা বলিকেছেন ;—

“তুহ্মি সাত আমি পাঁচ এমন কালের বিয়া।
হীরা-মঞ্জমাণিক্য মুক্তা লৈক্ষ দান দিয়া।
মোর বৈন অদুনারে পাইলা বেভার। *
ধন রত্ন মোর বাপের আছিল অপার।।”

এই সকল বাক্যে গোবিন্দচন্দ্র সাভারের রাজকুমারীদ্বয়কে বিবাহ করিবার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

সমগ্র অবস্থা আলোচনায় জানা যাইতেছে, বিক্রমপুরের অধীশ্বর শ্রীচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাণিকচন্দ্র, পাটিকারার অধিপতি তিলকচন্দ্রের একমাত্র কন্যা ময়নামতীকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদ মাতামহের রাজ্য লাভ করিয়া, পাটিকারা এবং মেহেরকুলে রাজত্ব করিতেছিলেন। এতদ্দ্বারা আরও জানা যাইতেছে, গৌড়ে এবং বিক্রমপুরে চন্দ্র-রাজগণের যে শাখা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, পাটিকারার রাজা মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র সেই শাখায়ই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্র ব্যতীত ময়নামতীর একটী কন্যা থাকিবার প্রবাদ প্রচলিত আছে। † কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের গীত আলোচনায় জানা যায়, ময়নামতী স্বয় পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন ;---

“সেই হৈতে তোর পিতা না আইসে মোর পাশে।
মোর বাপে কয়্যা রাজা গেল নিজ দেশে।।
তোর পিতা মোর তরে করয়ে তরাস।
মোর ভয় করি রাজা বঞ্চে গৃহবাস।।
তখন আমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
সেই গর্ভে গোবিন্দচন্দ্র তোমার প্রকাশ।।”

দুর্ল্লভ মল্লিক — ৬৪ পৃঃ।

---

* বিবাহ কালে, কন্যার সঙ্গে তাহার কনিষ্ঠা ভগ্নী কিম্বা সমবয়স্কা কতিপয় সখী বরকে যৌতুক স্বরূপ প্রদান করা হইত, তাহাদিগকে পাত্র, স্ত্রীভাবে গ্রহণ করিতেন। এ স্থলে গোবিন্দচন্দ্র পদুনাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার ভগ্নী অদুনাকে যৌতুক পাইয়াছিলেন। এই প্রথা অনেককাল প্রচলিত ছিল। প্রভু নিত্যানন্দ সূর্য্যদাস নন্দিনী বসুধা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া, যৌতুক স্বরূপ জাহ্নবা দেবীকে লাভ করিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; যথা —

“বসুধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা।
যৌতুক ছলে জাহ্নবাকে আত্মসাত কৈলা।।”

অদ্বৈত প্রকাশ — ২০শ অধ্যায়।

† প্রবাদ অনুসারে গোপীচাঁদ নামে জনৈক নরপতি এই পর্ব্বতে বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ময়নামতী এবং কন্যার নাম লালময়ী ছিল। তদনুসারে এই পর্ব্বত লালময়ী-ময়নামতী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ৪র্থ ভাগ, ২য় অঃ, ৪২০ পৃঃ।

এই বাক্য আলোচনা করিলে, গোবিন্দচন্দ্রের জন্মের পর ময়নামতী পতিসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তবে, গোবিন্দচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার ভগ্নী জন্মগ্রহণ করা অসম্ভব নহে। কুমিল্লার পশ্চিমদিকস্থ ৬ মাইল দূরবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় ইঁহাদের রাজধানী ছিল। এই পর্ব্বতের উত্তরভাগ 'ময়নামতী' এবং দক্ষিণ ভাগ 'লালমাই' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং লালমতী বা লালময়ী নামে ময়নামতীর কন্যা থাকিবার কথা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতমালার পূর্ব্ব পার্শ্বস্থিত ভূ-ভাগ বর্ত্তমানকালে 'মেহেরকুল' ও পশ্চিম পার্শ্বের ভূ-ভাগ 'পাটিকারা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র অবস্থা আলোচনায় বুঝা যায়, পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ জনপদ লইয়া কমলাঙ্ক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পর্ব্বতোপরি রাজধানী স্থাপন করিয়া উভয় পার্শ্বস্থ প্রদেশ শাসন করা হইত। ময়নামতী পাহাড়ের সন্নিহিত নিশ্চিপুর গ্রামে বর্ত্তমানকালেও ইষ্টকস্তূপ দেখা যায়। উক্ত স্থানে মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজধানী ছিল বলিয়া কাল-পরম্পরা কিম্বদন্তী চলিয়া আসিতেছে। এখানে যে কখনও বিশিষ্ট ব্যক্তির বাসভবন ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। উক্ত ইষ্টকস্তূপের উপর বর্ত্তমানকালে নিগমানন্দ স্বামীর আশ্রম প্রস্তুত হইয়াছে। পাহড়ের উত্তরাংশে (যে স্থানে ত্রিপুরেশ্বরের বিরাম-ভবন প্রতিষ্ঠিত আছে) ময়নামতীর ভজনালয় ছিল। বর্ত্তমান ত্রিপুরাধিপতি পঞ্চ শ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই স্থানের কিয়দংশ খনন করাইয়াছিলেন, তখন মৃত্তিকাগর্ব্ভে কতিপয় মন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর খনন কার্য্য স্থগিত রাখায়, এই স্থানের প্রকৃত তথ্য উদ্ধারের সুবিধা ঘটে নাই। আমাদের বিশ্বাস, স্থানটী সম্পূর্ণ খনন করা হইলে কোনও অভিনব ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। ময়নামতী পাহাড়ে আরও কয়েকটী প্রাচীনকীর্ত্তির নিদর্শন বিদ্যমান আছে, তাহা ত্রিপুর রাজ্যের সম্পাদিত। সেই সকল কীর্ত্তির বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশ করা হইবে।

চন্দ্র-রাজগণের বঙ্গদেশে আধিপত্য লাভের কালনির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, খৃঃ দ্বাদশ শতকের প্রথমভাগে রাজা শ্রীচন্দ্র বঙ্গের শাসন দণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। এই কথার নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ নাই। যাহা হউক, পাটিকারার রাজা গোবিন্দচন্দ্রের কাল নির্ণয় করাই এ স্থলে আবশ্যক। এ বিষয় আলাচনা করিতে গেলে সুবিজ্ঞ গ্রীয়ারসন্ সাহেবের কথা সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। তাঁহার মতে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্র খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। * শ্রদ্ধেয় সুহৃদ শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, গোবিন্দচন্দ্র খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর

* Journal, Asiatic Society of Bengal — 1878, Part I, No. 3, P. 181.

শেষ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন।* গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদের পরে পাটিকারা ও মেহেরকুলের আধিপত্য কি সূত্রে কাহার হাতে গিয়াছিল, জানিবার উপায় নাই। কবি ভবানী দাস বলিয়াছেন — "গোপীচাঁদের বংশ নাই ভুবন জুড়িয়া।" এই উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদই চন্দ্র রাজবংশের শেষ রাজা। ইহার পর সম্ভবতঃ এতদঞ্চলের প্রভুত্ব বর্ম্মরাজগণের হাত ঘুরিয়া সেন বংশের হস্তগত হইয়াছিল। তৎপর (১২৪০ খৃষ্টাব্দে) এই প্রদেশ ত্রিপুর রাজ্যের কুক্ষিগত হয়। † তদবধি পাটিকারা ত্রিপুরার সামন্ত শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিল। কোন সময় কি সূত্রে এই রাজ্যের বিলোপ ঘটিয়াছিল তাহা ইতিহাসের অগোচর। সেন বংশীয় রাজত্বের শেষ ভাগে 'চৌধুরী' উপাধিধারী হীরাবন্ত নামক এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এতদঞ্চল শাসিত হওয়া রাজমালা আলোচনায় জানা যাইতেছে।

পাটিকারা সংশ্লিষ্ট আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মদেশের ইতিহাস 'মহারাজোয়াং' গ্রন্থে লিখিত আছে, ৯৭৯ শকে (১০৫৭ খৃঃ) ব্রহ্মরাজ 'খ্যানশিস' এর রাজত্বকালে পাটিকারার এক রাজকুমার উক্ত রাজ্যে গমন করেন। ব্রহ্মরাজ, এই কুমারের হস্তে স্বীয় একমাত্র দুহিতাকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করায়, অমাত্যবর্গ দেখিলেন, অপুত্রক রাজার দৌহিত্রই ব্রহ্মরাজ্যের অধীশ্বর হইবে ; সুতরাং বিদেশী রাজকুমারের সহিত নৃপ-দুহিতার বিবাহ হইলে, রাজ্য বিদেশীয় রাজার হস্তগত হইবে। এ জন্য তাঁহারা এই বিবাহে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ইতিমধ্যে প্রচারিত হইল, পাটিকারার রাজকুমারের সহযোগে রাজকুমারী গর্ব্ভবতী হইয়াছেন। ইহার অল্পকাল পরেই কোনও অজ্ঞাত কারণে রাজকুমার আত্মহত্যা করেন। কালক্রমে রাজকুমারীর গর্ব্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন, তাঁহার নাম রাখা হইল — আলঙ শিশু। মাতামহের মৃত্যুর পর ইনিই ব্রহ্মরাজ্যের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাজ্য প্রাপ্তির পর, পিতৃ ভূমি দর্শনাভিলাষে পাটিকারায় আসিয়াছিলেন। এবং আরাকাণের সহিত পিতৃকুলের সদ্ভাব রক্ষা করিতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন।

পূর্ব্বকুল ঃ— (২০ পৃঃ — ১৫ পংক্তি)। ইহা কুকি প্রদেশের অন্তর্ভূত স্থান। পূর্ব্বকুলের অবস্থান বিষয়ে কৃষ্ণমালায় পাওয়া যায় ;—

"রুফনী নামেতে নদী তাহার দক্ষিণ।
তথাতেই বসতি করয়ে কুকিগণ।।

---

* "তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, মহারাজ রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল ১০৬৩ হইতে ১১১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন ; গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক এবং মাণিকচন্দ্র তৎপূর্ব্বে রাজত্ব করেন।"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — ৪র্থ অধ্যায়, ৬৯ পৃষ্ঠা।

† রাজমালা — প্রথম লহর, ১৭৫—১৮৪ পৃষ্ঠা।

সে নদীর প্রভাব আছয়ে অতিশয়।
তথা বহুলোকে পূজা তাহান করয়।।।
মনোগত কার্য্যসিদ্ধি সে নদী করয়।
তাহার দক্ষিণ স্থল সুন্দর আছয়।।
কাঙ্গলাই নামে এক পর্ব্বতের শৃঙ্গ।
তাহার দক্ষিণে নদী নামেতে চাথেঙ্গ।।
ই সব স্থানেতে বৈসে যত কুকিচয়।
পূর্ব্ব কুলিয়া বলি তা সবারে কয়।।"

পূর্ব্বকূল সম্বন্ধে আনুসাঙ্গিকভাবে ইতিপূর্ব্বেও আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থলে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

ফলমতী তীর্থ ঃ— (৩৩ পৃঃ — ১৫ পংক্তি)। ইঁহার অন্য নাম 'দুরাশা'। কোন কোন স্থলে 'ফলমতীশ্বর' নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃত রাজমালায় এই তীর্থকে 'ক্রমদীশ্বর' বলা হইয়াছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের তীর্থপর্যটন বর্ণনোপলক্ষে রাজমালায় লিখিত হইয়াছে ;—

"ফলমতীশ্বর তীর্থ দক্ষিণে আধিক্য।।
ফলমতীশ্বর তীর্থে জরব মারিয়া।
চাটিগ্রাম আমল করে মোহর নির্ম্মাইয়া।।"

সংস্কৃত রাজমালায় ধন্যমাণিক্য প্রসঙ্গে পাওয়া যায় ;—

"নানাতীর্থং ততোগত্বা দদর্শ ক্রমদীশ্বরং।।"

পূর্ব্বোক্ত ফলমতীশ্বর ও ক্রমদীশ্বর প্রভৃতি চন্দ্রশেখর বা সীতাকুণ্ড তীর্থের নামান্তর। চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য আলোচনা করিলে এ বিষয় স্পষ্টতররূপে প্রমাণিত হইবে। উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে ;—

"ততঃপশ্যোৎ মহাদেবং জ্যোতির্লিঙ্গ মনোহরম্।
অষ্টমূর্ত্তি-সমাযুক্তং সৌন্দর্য্যালিঙ্গিতং মহৎ।।
অশ্বমেধ সহস্রস্য বাজপেয় শতস্য চ।
ক্রমদীশ মুখং দৃষ্ট্বা ফলমাপ্নোতি মানবঃ।।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত ধনধান্য সুতান্বিতঃ।
শিবত্বং লভতে মর্ত্ত্যঃ পুনর্জ্জন্ম বিবর্জ্জিতঃ।।"

বারাহীতন্ত্র, ৬ষ্ঠ পটল — (চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্যধৃত)।

মর্ম্ম ঃ— "তাহার পর মহাদেবের মনোহর জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ দর্শন করিবে। সেই জ্যোতির্লিঙ্গ অষ্টমূর্ত্তি সংযুক্ত সৌন্দর্য্যময় অতি উৎকৃষ্ট। সেই জ্যোতির্লিঙ্গরূপী ক্রমদীশ্বরের মুখ দর্শন করিলে মানব সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকে। মানব তাঁহাকে দর্শন

করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধনধান্য স্ত্রী পুত্রাদি ঐশ্বর্য্য সুখ ভোগাবসানে শিবত্ব লাভ করতঃ আর জন্মগ্রহণ করে না।"

সীতাকুণ্ড তীর্থ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, সুতরাং এই তীর্থের সহিত ত্রিপুর রাজ্যের সম্বন্ধ বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। মহারাজ ধন্যমাণিক্য শম্ভুনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এবং সনন্দদ্বারা ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রনাথের প্রাচীন মন্দির মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের নির্ম্মিত। তাহা বিনষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। অধুনাও এই তীর্থের উন্নতিকল্পে ত্রিপুর রাজপরিবারের বিশেষ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের মহিষী স্বর্গীয়া মহারাণী তুলসীবতী মহাদেবীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে ব্যাসকুণ্ডে কে বিরাম ছত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম "তুলসীবতী বিরাম ছত্র।" স্বর্গীয় মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য স্বীয় জননীর নামে উক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্যের প্রধানা মহিষী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী রত্নমঞ্জরী মহাদেবী সীতাকুণ্ড তীর্থের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য কর্ত্তৃক এক সুশোভন মন্দির নির্ম্মিত ও তাহাতে অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। স্বর্গীয় কুমার নবীনকিশোর দেববর্ম্মা মহোদয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তদীয় জননী ও সহধর্ম্মিনী এক যোগে কালভৈরবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ রাজপরিবারের সহিত এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কোন কালেই বিচ্ছিন্ন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বগাসারি ঃ— (১৩ পৃঃ — ৩ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্গত একটী পরগণা। পূর্ব্বে এই স্থান রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, মুসলমানের শাসনকালে ত্রিপুরার শাসন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় মহারাজ ধন্যমাণিক্য পুনর্ব্বার তাহা হস্তগত করিয়াছিলেন। পরিণামে উক্ত স্থান জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে। এই স্থান কুমিল্লা নগরীর দক্ষিণ দিকে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কুমিল্লা হইতে চট্টগ্রামাভিমুখীন প্রসারিত রাজবর্ত্ম এই পরগণার বক্ষের উপর দিয়া গিয়াছে।

বঙ্গদেশ ঃ— (১২ পৃঃ — ২৭ পংক্তি)। বাঙ্গালা দেশ। বঙ্গদেশের সীমা সম্বন্ধে শাস্ত্র বাক্যে পাওয়া যায় ;—

"রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ।।"

শক্তিসঙ্গম তন্ত্র — ৭ম পটল।

এতদ্দ্বারা সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগকে বঙ্গদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বঙ্গদেশ নামটী বহু প্রাচীন। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ বলির পুত্র বঙ্গকর্ত্তৃক শাসিত প্রদেশ 'বঙ্গ' নামে অভিহিত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ, জ্যোতিস্তত্ত্ব, বৃহৎ সংহিতা, যোগবিশিষ্ট রামায়ণ প্রভৃতি বহু পুরাণ ও কোন কোন তন্ত্রগ্রন্থে এই নামের উল্লেখ পাওয়া

যায়। রঘুবংশে বঙ্গদেশের নাম আছে। (৪র্থ সর্গ — ৩৫-৩৮ শ্লোক)। মহারাজ বল্লাল সেন তাঁহার রাজ্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিবার কালেও এক ভাগ বঙ্গ নামে অভিহিত ছিল। * মুসলমান রাজত্বকালে এতদ্দেশ 'বাঙ্গালা' নাম লাভ করে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, পূর্ব্বকালের রাজগণ জলপ্লাবন নিবারণার্থ দশ হস্ত পরিমিত উচ্চ এবং বিশ হস্ত প্রশস্ত এক একটী আল বাঁধিয়াছিলেন। এই কারণে 'বঙ্গ-আল' শব্দদ্বয়ের যোগে 'বাঙ্গাল' এবং বাঙ্গাল হইতে 'বাঙ্গালা' নাম হইয়াছে।

হিন্দু এবং মুসলমান শাসনকালে বঙ্গদেশে রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। বিদ্যা এবং জ্ঞানের নিমিত্ত বঙ্গদেশ চিরপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন বঙ্গের সমৃদ্ধির উয়ত্তা ছিল না। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য দ্বারা বঙ্গদেশ যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা অতুলনীয়। সেই সকল বিবরণ অল্প কথায় প্রদান করা সম্ভবপর নহে।

বরদাখাত ঃ— (১৩ পৃঃ — ৫ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরা জেলার একটী সুবৃহৎ পরগণা। পূর্ব্বে ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। মোগল রাজত্বকালে ইহা নেজামত (সামরিক) বিভাগ ভুক্ত হয়। বরদাখাত ও সরালি পরগণার জমিদারগণ সামরিক বিভাগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কোষ নৌকা প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত উভয় পরগণার সম্যক আয় সমরতরী বিভাগে ব্যয় হইত, এজন্য ইহা 'নাওরা মহাল' নামে অভিহিত হইত।

মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে বরদাখাত পরগণা ঈশা খাঁ মসনদ আলীর শাসনাধীন ছিল, তখন ইহার নাম ছিল বলদাখাল। দ্বিতীয় আলমগীরের (ঔরঙ্গজেব) শাসনকালে (৪৪ জলুসে — ১৭০০ খৃঃ) বাঙ্গালার নবাব আজিম ওসমানের এক খণ্ড পরওয়ানাদ্বারা জানা গিয়াছে, তৎকালে এই পরগণা ঈশা খাঁ-এর উত্তর পুরুষ দেওয়ান হয়বৎ আহম্মদ খাঁ-এর হস্তে ছিল। † ইহার পর নানা ব্যক্তির হাত ঘুরিয়া মির্জ্জা মহম্মদ ইব্রাহিমের হস্তগত হয়। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহার তিন কন্যার মধ্যে সম্পত্তি তুল্যাংশে বিভক্ত হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার স্বামী মির্জ্জা হোশন আলী কালীর উপাসক ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্যামা-সঙ্গীত বর্ত্তমানকালেও সচরাচর গীত হইয়া থাকে।

অতঃপর খরিদসূত্রে অনেকেই এই পরগণার অংশবিশেষের অধিকারী হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্যামগ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মণ জাতীয় মহেশনারায়ণ রায়, ঢাকা নিবাসী আমিরদ্দীন দারোগা এবং ঢাকার নবাববংশের পূর্ব্বপুরুষ খাজে আলী মিঞার নাম উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানকালে উক্ত নবাব পরিবারই এই পরগণার অধিকাংশের অধিকারী।

ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে এই পরগণা গৌড়েশ্বরের হস্ত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। বরদাখাতের তদানীন্তন জমিদার প্রতাপ রায় গৌড়েশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার করেন। ইহার অল্পকাল পরেই এই স্থান পুনর্ব্বার মুসলমান শাসনের

* Vide Buchanon Hamilton's Hindusthan — Vol. I, P. 114.

† J. A. S. B. — Vol. XLIII, Part I, P. 214.

কুক্ষিগত এবং পূর্ব্বোক্তরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শ্যামগ্রামের 'বরদেশ্বরী' বিগ্রহ বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং জাগ্রত দেবতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

বাম বাজু ঃ— (৪৩ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। উদয়পুর রাজধানীর দক্ষিণ (ডাইন) দিকস্থ প্রদেশ — শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান দক্ষিণ-বাজু এবং বাম দিকস্থ চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থান বাম বাজু নামে অভিহিত ছিল। মহারাজ বিজয়মাণিক্য এই সকল প্রদেশ জয় করিয়া রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

বারাণসী ঃ— (২ পৃঃ — ৫ পংক্তি)। ইহা কাশীধামের নামান্তর। কাশীক্ষেত্রের বিবরণ প্রথম লহরের ২৪৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

বালিশিরা ঃ— (৫৯ পৃঃ — ২ পংক্তি)। ইহা শ্রীহট্ট জেলার একটী পরগণা। ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ রামগঙ্গামামিক্য, স্বীয় অনুগত ভৃত্য রামহরি বিশ্বাস হইতে তপে বিষগাঁওস্থিত জমিদারীর স্বত্ব লাভ করিয়া, তথায় বাস করিবার সময় সাতগাঁও ও বালিশিরার জমিদারীর অংশ ক্রয় করেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"গোলাম আলী জমিদার ঢাকা অবস্থিত।
আলালক্ষ্মী নামে সরিক তথায় বসিত।।
সাতগাঁও বালিশিরা সাড়ে নয় আনি।
জমিদারী হিসা বিক্রী করিল আপনি।।
বত্রিশ হাজার টাকা তার মূল্য হয়।
বার শ পঁচিশ সনে নৃপ করে ক্রয়।।"

রাজমালা — রামগঙ্গামাণিক্য খণ্ড।

মহারাজ রামগঙ্গা অনুরক্ত ভক্ত রামহরি বিশ্বাসের দান গ্রহণের কথা রাজমালায় উল্লেখ করা হয় নাই। স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"রামগঙ্গা স্বদেশ পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর বোধে সপরিবারে বিশগাঁও গমন করেন। তিনি তাঁহার জন্য একটি জমিদারী ক্রয় করিতে রামহরিকে আদেশ করেন। তখন অসাধারণ প্রভুভক্তিপরায়ণ রামহরি মহারাজ রামগঙ্গাকে সেই বিশগাঁও প্রদান করিয়া বলিলেন, — "মহারাজের কৃপাই আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি, আমি ইহা মহারাজের জন্যই ক্রয় করিয়াছি, মহারাজ তাহা গ্রহণ করুন।" মহারাজ রামগঙ্গা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার প্রিয় সহচরের দান গ্রহণ করিলেন।।"

কৈলাসবাবুর রাজমালা — ২য় ভাগ, ১৩ অঃ, ১৪৯ পৃঃ।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত প্রণেতাও এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। *

---

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ।

এই সাতগাঁও ও বালিশিরা বর্ত্তমানকালেও ত্রিপুরেশ্বরের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত আছে।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয়কালে এই স্থানে যাইয়া বিজয়পুর নামে এক গ্রাম স্থাপন করিবার নিদর্শন রাজমালায় পাওয়া যায়।

বিক্রমপুর ঃ— (৫৬ পৃঃ — ১২ পংক্তি)। ইহা একটী সুবৃহৎ পরগণা। বর্ত্তমানকালে ঢাকা জেলার অনেকাংশ এবং ফরিদপুর জেলার কিয়দংশ এই পরগণার অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ইহার উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, পূর্ব সীমায় মেঘনা, পশ্চিমে পদ্মানদী এবং চন্দ্রপ্রতাপের অল্পাংশ, দক্ষিণে ইদিলপুর প্রভৃতি পরগণা।

পদ্মানদীদ্বারা বিক্রমপুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিচ্ছিন্ন উত্তরাংশের নাম উত্তর বিক্রমপুর এবং দক্ষিণাংশ দক্ষিণ বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইতেছে। খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রদেশ 'সমতট' আখ্যায় পরিচিত থাকিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুবিজ্ঞ কানিংহাম, ফার্গুসন ও ওয়াটর্স প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ সমতটের অবস্থান সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, ঢাকার ইতিহাস প্রণেতার মতে তন্মধ্যে ওয়াটর্সের উক্তিই সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়। * তাঁহার মতে ঢাকার দক্ষিণ এবং ফরিদপুরের পূর্ব্বদিকস্থ ভূ-ভাগ সমতট নামে আখ্যাত ছিল। মতান্তরে, মেঘনা নদের পূর্ব্ব-তীরবর্তী ভূ-ভাগ সমতট নামে আখ্যাত ছিল। শেষোক্ত মতই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে এই প্রদেশ বিক্রমপুর আখ্যা লাভ করিবার প্রবাদ আছে। দিগ্বিজয় প্রকাশ গ্রন্থে পাওয়া যায়, — "বিক্রম ভূপ বাসত্বাৎ বিক্রমপুর মতোবিদুঃ"। ইহা পূর্ব্বোক্ত প্রবাদমূলক উক্তি বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিক্রমপুরে আগমনের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না।

বিপ্রকল্পলতিকা গ্রন্থের মতে সেন বংশীয় বিক্রম সেন 'বিক্রমপুর' নামের প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে ;—

"তদ্বংশে বিক্রম সেনো জাতঃ পরম ধার্ম্মিকঃ।
কৃতবান বিক্রমপুরীং স্বনাম্নাভিহিতাং সুধীঃ।।"

বিপ্রকল্পলতিকা।

গৌড়ের রাজন্যবর্গের মধ্যে বিক্রম সেনের নাম পাওয়া যায়। তন্ত্রবিভূতি, বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিণী এবং কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার নামোল্লেখ আছে। বিক্রমপুরে সেন রাজগণের আধিপত্য দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং বিক্রম সেনের নামানুসারে 'বিক্রমপুর' নামকরণ হইবার সম্ভাবনাই অধিক।

পাল বংশের শাসনকালে বিক্রমপুরের নানাস্থানে বৌদ্ধ-বিহার ও চৈত্য স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সকল স্থানের মধ্যে ব্রজযোগিনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

* ঢাকার ইতিহাস — ১ম খণ্ড, উপক্রমণিকা ১৬-১৭ পৃষ্ঠা।

বর্ত্তমানকালে যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, পাল-রাজত্বকালে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল।

বিক্রমপুরের ভাগ্যে বঙ্গের রাজধানীজনিত গৌরব সুদীর্ঘকাল ঘটিয়াছে। সেই সৌভাগ্যের দিনে, সাগ্নিক ব্রাহ্মণের আগমন এবং তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি পুণ্য কার্য্যদ্বারা রামপাল তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। * এই প্রদেশ বঙ্গীয়-বীর চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের লীলাক্ষেত্র। † সলরজঙ্গ্ মহারাজ রাজবল্লভ সেন রায়রাইয়া অতুলনীয় অট্টালিকাদি দ্বারা বিক্রমপুরের বক্ষঃ ভূষিত করিয়াছিলেন। ‡ বিক্রমপুরের সেই শোভা ও সৌভাগ্য অনেক কাল পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের শেষ চিহ্ন রাজাবাড়ীর মঠ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কীর্ত্তিগ্রাসিনী কীর্ত্তিনাশার উদরসাৎ হইয়াছে।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিক্রমপুরে গিয়াছিলেন। রাজমালায় পাওয়া যায়, — "বিক্রমপুরেতে যাইয়া আসিল ফিরিয়া।" এই উক্তিদ্বারা বুঝা যায়, মহারাজ বিক্রমপুরে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন নাই, অথচ বাধাপ্রাপ্ত হইবারও কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। তবে, গৌড়েশ্বরের গুপ্তচর তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল, ইহা রাজমালায় পাওয়া যায়। তৎকালে মোগল ও পাঠানের পরস্পর বিবাদে মুসলমান শক্তি দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছিল, সুতরাং বিজয়মাণিক্যের গতিরোধ করিবার অবসর লাভ করা তাহাদের পক্ষে ঘটিয়া উঠে নাই বলিয়াই মনে হয়।

বিজয় নদী ঃ— (৫৭ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। ইহা একটী অল্প পরিসরবিশিষ্ট পার্ব্বত্য নদী। সদর বিভাগস্থিত বিশালগড় থানার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান দিয়া পশ্চিমাভিমুখীন প্রবাহিত হইয়া তিতাস নদীতে মিশিয়াছে। এই নদীর গতি অতিশয় বক্র ; মহারাজ বিজয়মাণিক্য ইহার কতিপয় বাক কাটাইয়া গতি সরল করিয়া দেওয়ায় 'বিজয় নদী' নাম হইয়াছে। পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে অনেকে এই নদীকে 'বিজয় নন্দী' বলে। রাজমালাকার ইহার 'বিজয় নন্দিনী' নাম লিখিয়াছেন।

বিজয়পুর ঃ— (৫৯ পৃঃ — ৩ পংক্তি)। শ্রীহট্ট জেলাস্থিত বালিশিরা পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম। মহারাজ বিজয়মাণিক্য এই গ্রামের স্থাপয়িতা।

বিশালগড় ঃ— (২৫ পৃঃ — ৯ পংক্তি)। ইহা আগরতলার দক্ষিণ দিকস্থ ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি সমৃদ্ধ জনপদ। এই স্থানে ত্রিপুরেশ্বরের একটী সেনানিবাস থাকায় 'বিশালগড়' নাম হইয়াছে। এই স্থানের বিবরণ প্রথম লহরের ২৬২ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

---

* গৌড়ে ব্রাহ্মণ।

† Akbarnama — (By Beveridge's), Part III.

‡ মহারাজ রাজবল্লভের জীবনী।

বিষ্ণাজুড়ি ঃ— (১৩ পৃঃ — ৫ পংক্তি)। ইহাকে বিষ্ণাউড়ি নামেও অভিহিত করা হয়। এই স্থান শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত। মহারাজ বিজয়মাণিক্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই সকল স্থানও অধিকার করিয়াছিলেন।

বেজুরা ঃ— (১৩ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। ইহার প্রকৃত নাম "বেযোড়া"। এই নামোৎপত্তির একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। সৈয়দ মিকায়েল উক্ত প্রদেশের স্বত্বাধিকারী থাকাকালে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আব্বাছ দিল্লীশ্বরের প্রসাদে প্রতিপত্তিসম্পন্ন হইয়া, তথাকার জনৈক ওমরাহের কন্যা বিবাহ করেন। এবং সম্রাটের কৃপায় শ্রীহট্টে বিস্তর ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া সস্ত্রীক দেশে প্রত্যাগমনকালে, তাঁহার ঈর্ষাপরবশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাজির খাঁ কর্ত্তৃক পথিমধ্যে নিহত হইলেন। এই দুর্ঘটনায় ওমরাহ-দুহিতা আর স্বামী ভবনে গমন না করিয়া, সেই স্থান হইতেই দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই স্থানে স্বামী হইতে স্ত্রী চিরকালের তরে বিযুক্ত হওয়ায়, স্থানের নাম 'বেযোড়া' হইয়াছে।

বেযোড়া, শ্রীহট্ট জেলার একটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। এই স্থান ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইবার পর, মহারাজ বিজয়মাণিক্য পুনর্ব্বার তথায় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠপুর ঃ— (৬৪ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। উদয়পুরে রাজপরিবারের শ্মশানক্ষেত্রের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত স্থান বৈকুণ্ঠপুর নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমানকালেও সেই স্থানে অনেকগুলি সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে।

ব্রহ্মপুত্র ঃ— (৫৪ পৃঃ — ১৮ পংক্তি)। ইহা স্বনামখ্যাত নদবিশেষ। ব্রহ্মপুত্রের উদ্ভব এবং নামোৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিবরণ কালিকাপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, এবং কূর্ম্মপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যাইবে ; বিস্তর ভয়ে এ স্থলে উল্লেখক করা হইল না।

ব্রহ্মপুত্র হিমালয় পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া মিসমী জাতীয়গণের আবাস পর্ব্বতের মধ্য দিয়ে পরশুরাম কুণ্ডে পতিত হইয়াছে। তৎপর নওগাঁও, সাদিয়া, ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া ও ধুবড়ী প্রভৃতি আসাম প্রদেশস্থ জনপদসমূহ অতিক্রম করিয়া, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া মেঘনায় পতিত হইয়াছে। ইহার এক স্রোত সুবর্ণগ্রামের বক্ষঃ ভেদ করিয়া শীতললক্ষ্যার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের অন্য নাম লোহিত্য।

ব্রহ্মপুত্র পুণ্যপ্রদ নদ, তিথিবিশেষে এই নদের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে পাওয়া যায় ;—

"মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্।
পিবেদশোক কলিকাঃ স্নায়াৎ লোহিত্য বারিণি।।
পুনর্ব্বসৌ বৃযে লগ্নে চৈত্রেমাসি সিতাষ্টমীম্।
লৌহিত্য বিরজে স্নায়াৎ সর্ব্বপাপৈঃ বিমুচ্যতে।।"

স্কন্দপুরাণ।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গবিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমেই সুবর্ণগ্রাম অধিকার এবং এই তীর্থে স্নান দানাদি করিয়াছিলেন।

ভানুগাছ ঃ— (১৩ পৃঃ — ৪ পংক্তি)। ইহা বর্ত্তমান শ্রীহট্ট জেলার একটী পরগণা। এই প্রদেশ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। পরে ত্রিপুরার শাসনপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করায়, মহারাজ ধন্যমাণিক্য পুনর্ব্বার তাহা স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

ভুলুয়া ঃ— (৩৩ পৃঃ — ১৪ পংক্তি)। ইহা বর্ত্তমান নোয়াখালীর প্রাচীন নাম। এখন 'ভুলুয়া' নোয়াখালী জেলাস্থ একটী পরগণার নামে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

ভুলুয়া ত্রিপুরার অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য ছিল। প্রবাদ এই যে, গৌড়ের খ্যাতনামা ভূপতি আদিশূরের বংশধর বিশ্বম্ভরশূর এই রাজ্যের স্থাপয়িতা। তিনি চন্দ্রশেখর তীর্থদর্শন মানসে জলপথে যাত্রা করিয়া, নাবিকগণের দিক্ভ্রমবশতঃ অনেক দিন ভ্রমণের পর একটী দ্বীপে উপনীত হইলেন। তথায় আসিয়া বুঝিলেন, তাঁহারা পথ ভুলিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন — "ভুল হুয়া"। এই 'ভুল হুয়া' শব্দ হইতেই স্থানের নাম 'ভুলুয়া' হইয়াছে। স্থানের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে অন্যরূপ প্রবাদেরও অসদ্ভাব নাই ; তন্মধ্যে কোন্টী সত্য, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

বিশ্বম্ভর বারাহী দেবীর উপাসক ছিলেন। কথিত আছে, তিনি দেবীর প্রত্যাদেশানুসারে সেই স্থানে নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা এবং প্রস্তরময়ী বারাহী মূর্ত্তি স্থাপন করেন ; ইহা ৬১০ বঙ্গাব্দের ঘটনা। ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব এতৎসম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"The exact date of this fiction is given as the 10th of Magh, 610 Bengali year or A. D. 1203, the same year in which the first Muhammadan invasion of Bengal under Bakhtyar Khilji took place.

J. A. S. B.— Vol. XLIII, Part I., P. 203.

হাণ্টার সাহেব এতৎসম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া আপত্তি হওয়ায় এ স্থলে প্রদান করা হইল না। * ডাক্তার ওয়াইজ সাহেবও কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ইহা বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত কোন কথা বলিবার উপায় নাই। রাজা বিশ্বম্ভরের প্রতিষ্ঠিত বারাহী মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন।

রাজা বিশ্বম্ভরকে কেহ ক্ষত্রিয় এবং কেহ বা কায়স্থ জাতীয় বলিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে তিনি ক্ষত্রীয় হইলেও ভুলুয়ায় আসিয়া কায়স্থ সমাজে মিশিয়াছিলেন। বিশ্বম্ভরের আদি পুরুষ প্রখ্যাতনামা আদিশূরের জাতি নির্ণয় লইয়া অদ্যাপি বাক্-বিতণ্ডার শেষ হইল না, এরূপ

* Stastical Account of Bengal,— Vol. VI, P. 247.

ক্ষেত্রে বিশ্বম্ভরের জাতি-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া নিরর্থক বলিয়া মনে হয়। তিনি যে জাতীয়ই হউন, ভুলুয়ায় আসিয়া যে কায়স্থ সমাজে মিশিয়াছিলেন, এ কথা সত্য।

রাজমালার সংগ্রাহক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় রাজা বিশ্বম্ভরের যে বংশতালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। * কিন্তু এই বংশাবলী বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। রাজমালায় পাওয়া যায়, ভুলুয়াপতি দুর্ল্লভ রায়ের সহিত ত্রিপুরেশ্বর অমরমাণিক্যের যুদ্ধ হইয়াছিল। কৈলাসবাবুর প্রদত্ত বংশ তালিকায় দুর্ল্লভ রায়ের নাম পাওয়া যাইতেছে না। আমরা বিশুদ্ধ বংশ-তালিকা সংগ্রহ করিতেছি, তৃতীয় লহরে তাহা প্রদান করা হইবে।

রাজা বিশ্বম্ভর রায়
↓
রাজা গণপতি রায়
↓
রাজা সুরানন্দ খাঁ
↓
রাজা দেবানন্দ খাঁ
↓
রাজা কবিচন্দ্র খাঁ
↓
রাজা রাজবল্লভ রায়
↓

↓	↓	↓	↓	↓
উদয়মাণিক্য	রাজমাণিক্য	লক্ষ্মণমাণিক্য	গোবিন্দমাণিক্য	নরসিংহমাণিক্য
		↓		
		বলরাম রায়।		

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভুলুয়া ত্রিপুরার অধীনস্থ সামন্ত রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজগণ প্রধান সামন্ত মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ত্রিপুরেশ্বরগণের রাজ্যাভিষেক কালে ইঁহারা তাঁহাদের ললাটে রাজটিকা প্রদান করিতেন, এবং সামন্ত রাজগণের মধ্যে সকলের অগ্রে নজর প্রদান করিতেন। প্রতি বৎসর পুণ্যাহের সময় রাজাকে নজর প্রদান করা ইঁহাদের কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে ভুলুয়ারাজ দুর্ল্লভ রায় ত্রিপুরার বশ্যতা স্বীকার করিতে অসম্মত হওয়ায় সেই সূত্রে এক যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, রাজমালা আলোচনায় ইহা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে মতবৈষম্য আছে। রাজমালার তৃতীয় লহরে বিষয়টী বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভুলুয়ার রাজগণ মধ্যে দুই ব্যক্তি মুসলমানগণের অনুকরণে 'খাঁ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। পরে ত্রিপুরেশ্বরগণের উপাধি অনুসরণে 'মাণিক্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। এতদ্দ্বারা বুঝা

* কৈলাসবাবুর রাজমালা — ৪র্থ ভাগ, ১ম অঃ, ৩৯৪ পৃঃ।

যায়, ইঁহারা নিতান্ত অনুকরণপ্রিয় ছিলেন।

রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য অসাধারণ বীর এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি রাজকার্য্যের সহিত সাহিত্য চর্চ্চাও করিতেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় 'বিখ্যাত বিজয়' নামক একখানা নাটক রচনা করেন। ইহা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণ বধের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রারম্ভ ভাগের কতিপয় পংক্তি নিম্নে প্রদান করা যাইতেছে ;—

"প্রেক্ষাবৎ পরিতোষ নিস্তুল মহামাণিক্য রত্নাকরঃ
প্রাক্ সৎপুরুষ পৌরুষোৎকর কথা স্রোতস্বতী ভূধরঃ।
দৃপ্যাচ্চারণ চাতুরী মধুকরী প্রাগল্‌ভা পুষ্পাকরঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণ ভূপতে রভিনবস্তাদৃক্ প্রবন্ধোত্তরঃ।।
আশ্রয়ো যস্য রাজানস্তস্য বীররসস্য চেৎ।
প্রবন্ধো ভুভুজা বদ্ধস্তস্মিন্নৌপয়িক শ্রমঃ।।"
বিখ্যাত বিজয়।

ইঁহার রচিত 'কৌতুক রত্নাকর' নামক আর একখানা গ্রন্থ আগরতলায় রাজ-গ্রন্থাগারে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থশালায়ও ইহার একখণ্ড রক্ষিত হইতেছে।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পনারায়ণ রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সমসাময়িক। ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। এ বিষয় এবং ভুলুয়া রাজ্যের অন্যান্য বিবরণ তৃতীয় লহরে আলোচিত হইবে।

মধ্যযুগে ভুলুয়া ত্রিপুরার বশ্যতা অমান্য করায়, ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ দেবমাণিক্য উক্ত রাজ্য জয় করিয়া সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তৎকালে মহারাজ চট্টগ্রামে এক সেনানিবাস (থানা) স্থাপন করিয়া চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনান্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

ভূষণা ঃ--- (৪১ পৃঃ --- ২৩ পংক্তি)। ইহা মধ্যবঙ্গের একটী সমৃদ্ধ নগর ছিল। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় মহাশয় প্রাচীন ভূষণার সীমা নিম্নলিখিতভাবে প্রদান করিয়াছেন, --- "উত্তরে পদ্মা ও বেতরিয়ার ক্ষুদ্রাংশ এবং কুবারসাহী ; পশ্চিমে মহম্মদসাহী, নলডাঙ্গা ও যশোহর ; দক্ষিণে ঢাকার অন্তর্গত বাখরগঞ্জের অংশবিশেষ।" * অধুনা ভূষণার কিয়দংশ খুলনা ও যশোহর এবং কতকাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে।

ভূষণা বঙ্গীয় বীর সীতারাম রায়ের বাল্য-লীলাক্ষেত্র। এখানে তিনি পিতৃ-সকাশে অবস্থান করিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সীতারাম জমিদারী লাভ করিবার পর ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের সহিত সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই বিবাদমূলে ফৌজদার আবুতোরাপ

---

* ফরিদপুরের ইতিহাস — ১ম খণ্ড, ৮২ পৃঃ।

বারাসিয়া নদীর তীরে সীতারামের হস্তে নিহত এবং ভূষণা দুর্গ সীতারামের হস্তগত হইয়াছিল। *

আবুতোরাপের মৃত্যুর পর বঙ্গাধীপ মুর্শিদকুলি খাঁ বক্সআলী খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে ভূষণার লস্কর পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর মোগল বাহিনীর সহিত ভীষণ সংগ্রামে সীতারাম আহত অবস্থায় ধৃত ও মুর্শিদাবাদে নীত হইয়াছিলেন। তথায় সীতারাম পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে, মুসলমান ইতিহাস রেয়াজুস্-সলাতিনের মতে সীতারামকে শূলে চড়াইয়া, তাঁহার পরিবারবর্গকে কারারুদ্ধাবস্থায় রাখা হইয়াছিল। "তারিখে বাঙ্গালা" গ্রন্থের মতও তদনুরূপ। † স্টুয়ার্ট সাহেব, এই সকল ইতিহাসেরই অনুসরণ করিয়াছেন, অধিকন্তু সীতারামের স্ত্রী পুত্রদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার কথাও বলিয়াছেন, এ কথা তিনি কোথায় পাইলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"Buksh Alay seized Sittaram, his women, children, and accomplices and sent them in irons to Moorshidabad, where Sittaram and the robbers were impaled alive and the women and children sold as slaves."

Stewart's History of Bengal–P. 434.

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "সীতারাম " পাঠে এতদ্বিষয়ক অনেক বিবরণ পাওয়া যাইবে। সীতারামের মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হইয়াছিল সত্য, কিন্তু মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অদ্যাপি নিঃসংদিগ্ধভাবে কেহই বলিতে পারেন নাই। তাঁহার পরিবারবর্গকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত কিম্বা বিক্রয় করিবার কথা যে মিথ্যা, এ কথা অনেকে বলিয়াছেন।

ভূষণার সমৃদ্ধি এক সময়ে বহু বিখ্যাতি হইয়াছিল। শিল্প নৈপুণ্যের জন্যও এই স্থানের বিস্তর খ্যাতি ছিল। ভূষণার অন্তর্গত সাতৈরের শীতলপাটী প্রসিদ্ধ শিল্পজাত বস্তু।

ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে পাঠান ও মোগলের মধ্যে ভীষণ সঙ্ঘর্ষণের ফলে মুসলমান শাসন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সুযোগে মহারাজ বিজয়, পূর্ব্ব ও মধ্য বঙ্গের অধিকাংশ স্থান হস্তগত করেন। তিনি তৎকালে মাধব নামক ব্যক্তিকে ভূষণার লস্কর পদে নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় শ্বশুর ও সেনাপতি দৈত্যনারায়ণকে বধ করাইয়াছিলেন। ‡ তৎপর কোন্ কালে কি সূত্রে এই সকল প্রদেশ ত্রিপুরার হস্তচ্যুত হইয়াছিল, জানা যায় না। মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহারা উক্ত প্রদেশের

* Stewart's History of Bengal — P. 433.

† বাঙ্গালার ইতিহাস — (নবাবী আমল), ৮০ পৃষ্ঠা।

‡ মাধবের সহিত মহারাজ বিজয় সত্যপাশে আবদ্ধ হইবার কথা প্রাচীন রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"ই কথা শুনিয়া রাজা সত্য নির্ব্বন্ধিল।
ভূষণা রাজ্যে যে তোমা লস্কর করিল।।"

প্রাচীন রাজমালা — দুর্য্যয় খণ্ড।

প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং ত্রিপুরার আধিপত্য অধিককাল স্থিরতর ছিল না, ইহা বুঝা যাইতেছে।

মনু নদী ঃ— (৩১ পৃঃ — ৩০ পংক্তি)। এই নদী ত্রিপুর রাজ্যস্থিত সংখলং পর্ব্বতের খোইশিব নামক শৃঙ্গের সন্নিহিত স্থান হইতে নির্গত ও উত্তর পশ্চিমাভিমুখীন প্রবাহিত হইয়া, মনুমুখ নামক স্থানে কুশিয়ারা (বরবক্রের অংশবিশেষ) নদীতে পতিত হইয়াছে। কৈলাসহর, ঊনকোটি তীর্থ প্রভৃতি এই নদীর তীরে অবস্থিত। যোগিনী তন্ত্র, ঊনকোটি তীর্থ মাহাত্ম্য, এবং বায়ুপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে মনুনদীকে পুণ্য-নদী বলা হইয়াছে ; একটী মাত্র প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

“সমুদ্রস্যোত্তর দেশে ততো মনুনদী স্মৃতঃ।
যংগত্বাপি মহারাজন্ পিত্বা পানীয়মুত্তমং।।
মনুনদ্যাং মহারাজ বরবক্রেন সঙ্গমং।
তত্র স্নাত্বা নরোযাতি চন্দ্রলোকং মনুত্তমং।।”

বায়ুপুরাণ।

মাছি ছড়া ঃ— (২৬ পৃঃ — ৫ পংক্তি)। গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী ছনগাঙ্গের কয়েক বাঁক উজানে অবস্থিত। ত্রিপুরা আক্রমণকারী পাঠান সেনাপতি হৈতন খাঁ এই স্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সঙ্গীয় ভাস্করগণ গোমতী নদীর তীরবর্ত্তী প্রস্তরময় পর্ব্বত গাত্রে অনেকগুলি দেব-দেবীর মূর্ত্তি খোদাই করিয়াছিল, তাহার অধিকাংশ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, কতক ধ্বসিয়া গিয়াছে। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“ছনগাঙ্গ তৈকতান দেবদ্বার নাম।
তার কত বাঁক উজান মাছি ছড়া ধাম।।
তৈতন খাঁ সঙ্গে ছিল যত শিল্পকর।
নির্ম্মাইছে গড় পরে দেব বহুতর।।”

ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

ইহারা মাছি ছা (দেবতামুড়া) নামক স্থানের মূর্ত্তিসমূহের অনুকরণে এই সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিল, রাজমালার উক্তি আলোচনায় ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। রাজমালায় হৈতন খাঁ-এর সৈন্যগণের কথা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করা গেল ;—

“আর দেখে নদী তীরে পাষাণ প্রতিমা
হিন্দু সবে পূজা করে জানিয়া মহিমা।।
সেই স্থানে নাম ছিল মাছি ছা বিখ্যাত।
পুনর্জ্জন্ম নাহি বলে ত্রিপুরা সাক্ষাত।।”

ধন্যমাণিক্য খণ্ড।

মাছি ছা ঃ— (২৭ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। ত্রিপুরা ভাষায় এই স্থানকে 'মার্চ্ছিল' বলে। প্রাচীনকালে এতদঞ্চলে রিয়াং জাতির বসতি ছিল। এই স্থানের অধিবাসীবৃন্দ ত্রিপুরার বশ্যতা অমান্য করায় মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে সেনাপতি রায় কাচাগ পুনর্ব্বার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। * বাঙ্গালী সমাজে এই স্থান 'দেবতামুড়া' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থান উদয়পুর এবং অমরপুরের সীমান্তবর্ত্তী। এখানে গোমতীর বামতীরস্থ উচ্চতম মহিষাসুর-মর্দ্দিনী দশভুজা মূর্ত্তির কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল অঙ্কিত মূর্ত্তির নিমিত্তই স্থানের নাম 'দেবতামুড়া' হইয়াছে। এই সমস্ত মূর্ত্তিবিষয়ক রাজমালার বাক্য 'মাছি ছড়া'র বিবরণে প্রদান করা হইয়াছে।

দেবতামুড়ার মূর্ত্তিসহ ত্রিপুরেশ্বরগণের প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন। কোন সময়ে কি উদ্দেশ্যে নদীগর্ত্ত হইতে উত্থিত প্রস্তরময় উত্তুঙ্গ পর্ব্বত গাত্রে এই সকল দেব-দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। যে কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণ ত্রিপুর রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ হিন্দুদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন, এবং রাজ্যমধ্যে হস্ত প্রসারণেরও চেষ্টা হইতেছিল, সেই সময় সাধারণকে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মপ্রাণ ত্রিপুরেশ্বরগণ পর্ব্বতের শিলাময় গাত্রে এই সকল মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই অনুমতি হয়। হিন্দু রাজন্যবর্গের এবম্বিধ চেষ্টার ফলেই বৌদ্ধদিগের মধ্যে তান্ত্রিক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। হিন্দুগণের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে এই সম্প্রদায়ের গঠন হইয়া থাকিবে, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন।

খোদিত মূর্ত্তিসমূহের কারুকার্য্য প্রশংসনীয়। সেকালে ত্রিপুর রাজ্যে ভাস্কর-শিল্পীর অভাব ছিল না, এবং এতজ্জাতীয় শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, প্রতিকৃতিসমূহ দর্শনে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ঊনকোটী তীর্থে খোদিত মূর্ত্তিসমূহের সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায় এই সকল মূর্ত্তি তদপেক্ষা পরবর্ত্তীকালের এবং সেকালে ভাস্কর-শিল্পের অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

মাধবতলা ঃ— (৪০ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুরের সন্নিহিত। রাজমালায় পাওয়া যায়, এখানে একটী হাট ছিল। কাল প্রভাবে স্থানের নাম পরিবর্ত্তিত হওয়ায়, বর্ত্তমান সময়ে মাধবতলার অবস্থান নির্ণয়ের সুবিধা নাই।

মেহেরকুল ঃ— (১৩ পৃঃ — ২ পংক্তি)। এই স্থানের স্থূল বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৬৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

যমুনা ঃ— (৫৫ পৃঃ — ১১ পংক্তি)। নদীবিশেষ। এই নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। রাজমালাকার এই যমুনাকে লক্ষ্য

---

* এই লহরের ২০ পৃষ্ঠা, ১৬ পংক্তি দ্রষ্টব্য।

করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম প্রবাহও যমুনা নামে বিখ্যাত। এই নদী ময়মনসিংহ ও পাবনা জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমারূপে প্রবাহিত হইয়া গোয়ালন্দের অল্প উপরে পদ্মা নদীতে পতিত হইয়াছে। রাজমালা রচয়িতা এই নদীর কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

যশপুর ঃ— (২৫ পৃঃ — ২২ পংক্তি)। উদয়পুরের উত্তর দিকে অবস্থিত একটী গ্রাম। এই স্থানের উপর দিয়া উদয়পুরে গমনের রাস্তা ছিল।

যাত্রাপুর ঃ— (৫২ পৃঃ — ১০ পংক্তি)। এই স্থান ঢাকা হইতে পশ্চিম দিকে ১৫ পনর ক্রোশ দূরবর্ত্তী ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে জলপথে আঁকা বাঁকা ইছামতী নদী ঘুরিয়া ঢাকায় পৌঁছিতে সময় বেশী লাগে। পরিব্রাজক টেভারনিয়াম স্বরচিত ভ্রমণ বৃত্তান্তে একটী সোজা পথের কথা বলিয়াছেন। * নবাব সাইস্তা খাঁ এই স্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। ইঁহার শাসন কালে যাত্রাপুর অঞ্চলে মঘের উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায়, নবাব সেই অত্যাচার নিবারণোদ্দেশ্যে রুকুনউদ্দিন নামক সৈন্যাধক্ষের অধিনায়কত্বে এক দল নৌ-সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। মঘেরা পলায়নপর হওয়ায় সে যাত্রায় উপদ্রব নিবারিত হইয়াছিল।

ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য, পাঠান সেনাপতি মমারক খাঁকে চট্টগ্রামের যুদ্ধে ধৃত ও কারারুদ্ধ করায়, গৌড়েশ্বর সুতলান সুলেমান মহারাজকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, অবরুদ্ধ সেনাপতি মমারক খাঁকে ছাড়িয়া দিলে, যাত্রাপুর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। এই পত্র পাইবার পূর্ব্বেই সেনাপতিকে চতুর্দ্দশ দেবতা সমক্ষে বলি প্রদান করা হইয়াছিল, সুতরাং গৌড়েশ্বরের অনুরোধ রক্ষা করিবার সুবিধা ঘটে নাই। ইহার কিয়ৎকাল পরে মহারাজ বিজয় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যাত্রাপুর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। এই অধিকার স্থায়ী হইবার কোনও প্রমাণ নাই। কিন্তু তিনি মধ্যবঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান লুণ্ঠনদ্বারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

রত্নপুর ঃ— (৫০ পৃঃ — ২৫ পংক্তি)। ইহা উদয়পুর সহরের অংশবিশেষ। এই স্থানে চতুর্দ্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির এবং মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান আছে।

এখানে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ পীঠদেবীর ভৈরব। প্রবাদ আছে, এই শিবলিঙ্গটী আগরতলায় উঠাইয়া নেওয়ার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। এমনকি, হস্তীদ্বারা পর্য্যন্ত টানা হইয়াছে, তথাপি মৃত্তিকা গর্ত্তে প্রোথিত অংশ তোলা যাইতে পারে নাই। এই টানাটানির দরুণ বিগ্রহটি উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়া রহিয়াছেন।

---

* Tavernier's Travels in India — Book I.

মহারাজ বিজয়মাণিক্যের শাসনকালে খনিত বিজয়সাগর রত্নপুর মৌজায় অবস্থিত। মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য, স্বীয় পিতার স্মৃতিরক্ষা কল্পে এই স্থানের 'রাধাকিশোরপুর' নাম দিয়াছেন।

রসাঙ্গঃ— (২৪ পৃঃ — ১৭ পংক্তি)। ইহা আরাকানের নামান্তর। 'রসাঙ্গ' মুসলমানগণের প্রদত্ত নাম। পারস্য ভাষায় আরাকানকে 'আরাখঙ্গ' 'রোখাম' ও 'রোশাং' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রাচীন ঘটককারিকা এবং আওয়ালের পদ্মাবতী গ্রন্থে রোশাং নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রসাঙ্গ বা আরাকান প্রাচীন কাল হইতেই একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। আরাকানের ইতিহাস 'রাজোয়াং' গ্রন্থের মতে এই রাজ্যের দৈর্ঘ্য মেঘনার তীর হইতে পেগু রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইলেরও অধিক ছিল।

রাজোয়াং গ্রন্থে পাওয়া যায়, সুপ্রাচীন কালে কাশীর রাজবংশের কোনও ব্যক্তি আসিয়া এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পরলোকগমনের পর তৎপুত্র কোমি সিংহ এই রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। বর্ত্তমান চাঁদা সহরের সমীপস্থ রামাবতী বা রামরী নামক স্থানে তিনি রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বংশীয় পরবর্ত্তী কোনও রাজার দশজন পুত্রের হস্তে রাজ্যভার পতিত হওয়ায়, তাঁহারা নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করেন। প্রজাগণ ইঁহাদের দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া কয়েকজনকে বধ, এবং অবশিষ্ট ভ্রাতাদিগকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল। অতঃপর তাঁহাদের এক ভগ্নী সিংহাসন লাভ করিলেন। তিনি রামাবতী হইতে রাজপাট উঠাইয়া আরাকানে নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন।

এই স্থানে মৌরিয় বংশীয়গণ এবং চন্দ্র সূর্য্য নামক রাজার অধস্তন বংশ্য কতিপয় ব্যক্তি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন। ইঁহাদের পর শান বংশের অভ্যুদয় কাল। শানগণের পর পুগান দেশীয় অনুরথ নামক জনৈক রাজা এই প্রদেশ অধিকার করেন।

অনুরথ চন্দ্রবংশীয় জনৈক ব্যক্তিকে করদ রাজারূপে আরাকানে স্থাপন করিয়া, স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। এই চন্দ্রবংশীয় রাজা পিংসা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত করদ রাজ্যের শেষ রাজা মেঙবিলু, স্বীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিহত এবং তদ্দ্বারা রাজ্য অধিকৃত হওয়ায়, রাজা মেঙ্‌বিলুর উত্তরাধিকারী মেওরেবয়রা পুগান সম্রাটের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র লেট্যামেঙ্‌ পুগান রাজ্যের সাহায্যে পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী পীরণ নগরে স্থাপিত হয়।

ইহার পর আরাকানরাজ, হিন্দু, পর্ত্তুগীজ এবং ব্রহ্মরাজের সহিত অনেকবার আহবে লিপ্ত হইয়াছেন। সেই সকল বিস্তৃত কাহিনী এ স্থলে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে।

আরাকানের মঘগণ কিছুকাল দস্যুবৃত্তি দ্বারা বঙ্গদেশের নানা স্থানে গুরুতর অশান্তির উৎপাদন করিয়াছিল। লুণ্ঠন, নরহত্যা এবং মনুষ্য চুরি ইত্যাদি অত্যাচারে বঙ্গের অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া পড়ে, এ স্থলে সুন্দরবনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পর্ত্তুগীত জলদস্যুগণ সময় সময় ইহাদের সঙ্গে যোগদান করিয়া অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিত।

ত্রিপুরেশ্বর ধন্যমাণিক্য চট্টগ্রামের সমরক্ষেত্রে বঙ্গেশ্বর হোসেন সাহকে পরাজিত করিয়া রসাঙ্গ আক্রমণ করেন। এ যাত্রায় তিনি রাম্বু, ছত্রশিক প্রভৃতি থানা অধিকার করিয়া, রসাঙ্গের (আরাকানের) কিয়দংশ হস্তগত করেন। সেই স্থানে ত্রিপুরেশ্বরের একটী সেনানিবাস স্থাপিত ও পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে নিয়োজিত ত্রিপুর সেনাপতি "রসাঙ্গমর্দ্দন নারায়ণ" উপাধি লাভ করেন।

রাঙ্গ রঙ্গ ঃ— (২০ পৃঃ — ১৪ পংক্তি)। ইহা লুসাই পর্ব্বতের অন্তর্গত কুকি জাতির বসতি স্থান। এই স্থানের কুকিগণ ত্রিপুরার বৈশ্যতা অস্বীকার করায় মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালে, সেনাপতি রায়কাচাগ এই প্রদেশ পুনর্ব্বার বশবর্ত্তী করিয়াছিলেন।

রাঙ্গামাটী ঃ— (৩ পৃঃ — ১৫ পংক্তি)। রাজমালা প্রথম লহরের ২৬৭ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

রাম্বু ঃ— (২৪ পৃঃ — ১৬ পংক্তি)। ইহা কক্সবাজারের প্রাচীন নাম। বর্ত্তমানকালে কক্সবাজারের কিয়দংশ 'রাম্বু' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এখানে একটী থানা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গোপসাগরের বক্ষে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ ; আদিনাথ হইতে রেঙ্গুন যাইবার পথপার্শ্বে অবস্থিত।

রামুতে রামসীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায়, স্থানটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। শাস্ত্র-গ্রন্থসমূহে এই স্থান 'রামক্ষেত্র' নামে পরিচিত। সাধু সন্ন্যাসীগণ 'রামটেক' বা 'রামকোট' বলিয়া থাকেন। এই 'রামক্ষেত্র' কিরাত দেশের সীমান্ত বলিয়া শাস্ত্র বাক্যে পাওয়া যায়, যথা ঃ—

> "তপ্ত কুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তকং শিবে।
> কিরাত দেশো দেবেশি বিন্ধ্যশৈলেহবতিষ্ঠতে।।"
>
> শক্তিসঙ্গম তন্ত্র।

মঘ রাজত্ব সময়ে রাম্বু (রামু) চট্টগ্রামের Subsidiary headquarter ছিল। মহারাজ ধন্যমাণিক্য আরাকান অভিযান কালে এই স্থান হস্তগত করিয়াছিলেন।

লক্ষা ঃ— (৫৫ পৃঃ — ১৫ পংক্তি)। ইহা একটী নদী। এই নদী লক্ষ্যা বা শীতললক্ষ্যা নামে পরিচিত। ইহার উত্তরাংশ বানার নাম লাভ করিয়াছে। এই নদী ব্রহ্মপুত্রের শাখাবিশেষ। লাখপুর হইতে দক্ষিণাভিমুখীন প্রবাহিত হইয়া পলাস, মুড়াপাড়া, হাজিগঞ্জ, নবীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের উপর দিয়া নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জের দক্ষিণ দিকে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গাভিযান কালে এই নদীপথে গমন করিয়াছিলেন এবং এই নদীতে স্নান করিয়া 'লাক্ষা স্নায়ি' উল্লেখে মুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উক্ত মুদ্রাদ্বারা জানা যায়, ইহা ১৪৮০ শকের (১৫৫৮ খৃঃ) ঘটনা।

লক্ষ্মীপুর ঃ— (৪৩ পৃঃ — ১২ পংক্তি)। এই স্থান উদয়পুর শহরের সন্নিহিত গোমতী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। এই স্থান পরবর্ত্তী কালে তিনটী নামে বিভক্ত হইয়াছে, (১) লক্ষ্মীপতি (গোমতীর উত্তর পাড়ে), (২) হীরাপুর ও (৩) মহারাণী (গোমতীর দক্ষিণ পাড়ে)। এই স্থানে অনেক দীঘি পুষ্করিণী এবং মহারাজ বিজয়মাণিক্যের সমাধি মন্দির বিদ্যমান আছে।

মহারাজ বিজয়, এই স্থানে রাজ মহিষী লক্ষ্মী মহাদেবীকে বনবাস দণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, তদবধি স্থানের নাম লক্ষ্মীপুর হইয়াছিল, উদয়মাণিক্যের রাণী সেই নামের পরিবর্ত্তে 'হীরাপুর' নাম করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"হীরাপুর নাম পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুর ছিল।
উদয়মাণিক্য রাণী হীরাপুর কৈল।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে, উদয়মাণিক্যের মহিষীর নাম হীরাবতী, তিনি নিজ নামানুসারে লক্ষ্মীপুরের নাম হীরাপুর করেন।

লঙ্গ্লা ঃ— (১৩ পৃঃ — ৫ পংক্তি)। ইহা শ্রীহট্ট জেলার একটী পরগণা। লংলাই সম্প্রদায়ের কুকিগণের বাসভূমি বলিয়া স্থানের নাম লংলা বা লঙ্গ্লা হইয়াছে। মহারাজ আদিধর্ম্ম ফা-এর যজ্ঞকালে উক্ত স্থান যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পঞ্চককে দান করায়, কুকিগণ এই স্থান ত্যাগ করিয়া পর্ব্বতাভ্যন্তরে চলিয়া যায়। তদবধি লঙ্গ্লা ব্রাহ্মণের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছিল।

কালক্রমে উক্ত স্থান ত্রিপুরার হস্তচ্যুত এবং মুসলমান শাসনের কুক্ষিগত হয়, এই সময় পারসিক রাজ পরিবারস্থ জনৈক ব্যক্তি সংসারত্যাগী অবস্থায় দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি দিল্লী নগরীতে উপনীত হইলে, তদানীন্তন লোদিবংশীয় সম্রাট তাঁহার পরিচয় ও অবস্থাদি অবগত হইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। সম্রাটের অকাট্য অনুরোধে পরিব্রাজক, বিস্তীর্ণ ভূভাগ জায়গীর গ্রহণ করিয়া লঙ্গ্লা পরগণার অন্তর্গত পৃথিমপাশা গ্রামে স্বীয় বাসস্থান নির্ব্বাচন করেন। তিনি হিন্দুর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই স্ত্রীর গর্ত্তজাত সন্তান হইতে পৃথিমপাশার বর্ত্তমান জমিদার বংশ চলিয়া আসিতেছে। এই বংশের স্বনামধন্য জমিদার পরলোকগত মৌলবী আলী আমজাদ খাঁ সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানকালে উক্ত খাঁ সাহেবের পুত্র শ্রীযুক্ত মৌলবী আলী হায়দার খাঁ ও শ্রীযুক্ত মৌলবী আলী আসগর খাঁ লঙ্গ্লা জমিদারীর অধিকারী হইয়াছেন।

লঙ্গ্লা প্রদেশ মুসলমানগণের হস্তগত হইবার পর ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্য তাহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন ; কিন্তু কালের কুটিল আবর্ত্তনে তাহা পুনর্ব্বার মুসলমানের এবং পরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

লৌহিত্য ঃ— (৫৪ পৃঃ — ২০ পংক্তি)। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদের নামান্তর। মহারাজ বিজয়মাণিক্য বঙ্গাভিযানকালে এখানে স্নানদানাদি পুণ্য কার্য্য করিয়াছিলেন।

শ্রীহট্ট ঃ— (৪৩ পৃঃ — ২৬ পংক্তি)। শ্রীহট্ট নাম বহু প্রাচীন। এই নামোৎপত্তির প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। দেবীপুরাণে ‘শ্রীহট্টে হট্ট বাসিনী’র উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্ত্র গ্রন্থে শিবের নামের মধ্যে “শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ” নামের উল্লেখ আছে। ভাটেরার তাম্রশাসনে “শ্রীহট্ট নাথ” নাম উৎকীর্ণ হইয়াছে। এতদ্দ্বারা শ্রীহট্ট নামের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। সুহৃদ্বর শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে, দেব-দেবীর নামানুসারে শ্রীহট্ট নগরীর নাম হওয়া সম্ভবপর, পরবর্ত্তী কালে সমগ্র জেলা সেই নামে আখ্যাত হইয়াছে। * শস্য শ্যামলা শ্রীহট্ট প্রদেশ লক্ষ্মীর হাট, এই অর্থে স্থানের নাম হওয়াও বিচিত্র নহে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিয়েন্‌সাঙ্‌ “শিলিচটল” নামের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি বলেন, এই নামদ্বারা শ্রীহট্টকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা চট্টগ্রামের নামান্তর। এই মতবৈষম্যের সমাধান করা কঠিন ব্যাপার।

এই প্রদেশ পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। এই ভূভাগ (১) গৌড় বা শ্রীহট্ট, (২) লাউর, (৩) জয়ন্তিয়া এই তিনটী রাজ্যে বিভক্ত ছিল, এই সকল রাজ্যের অধিপতিগণ ত্রিপুরার সামন্তরাজ মধ্যে গণ্য ছিলেন। মুসলমান শাসনকালে এই প্রদেশ কখনও মুসলমানগণের এবং কখনও ত্রিপুরার হস্তহত হইতে থাকে। মহারাজ বিজয়মাণিক্য এতদঞ্চল হস্তগত করিয়া শ্রীহট্টে এক সেনানিবাস (থানা) সংস্থাপন করিয়াছিলেন ; সেনাপতি কালানাজিরকে এই থানার অধিনায়কত্ব প্রদান করা হয়।

সরাইল ঃ— (২৫ পৃঃ — ৮ পংক্তি)। বর্ত্তমানকালে এই স্থান ত্রিপুরা জেলার একটী পরগণায় পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। হোসেন শাহের সৈন্যদল সরাইলের পথ ধরিয়া ত্রিপুরা আক্রমণের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিল। ইহা মহারাজ ধন্যমাণিক্যের শাসনকালের কথা। মহারাজ অমরমাণিক্যের শাসনকালে, তাঁহার পুত্র রাজধর দেব দ্বারা এই স্থান প্রথম আবাদ হয়। অতঃপর ত্রিপুরার সামন্ত ঈশা খাঁ মসনদ্ আলী এই প্রদেশ শাসনের অধিকার লাভ করেন। সম্রাট আকবরের শাসনকালে সরাইলের কিয়দংশ “সতর খণ্ডল” নামকরণে সরকার শ্রীহট্টের অন্তর্গত হইয়াছিল, অবশিষ্টাংশ ত্রিপুরার শাসনাধীন থাকিয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে তাহার সমগ্র ভাগ ক্রমশঃ

---

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — উত্তরাংশ, তৃতীয় ভাগ, প্রথম খণ্ড।

মোগল শাসনের কুক্ষিগত হইয়াছে। তৎকালেও ঈশা খাঁ মসনদ আলীর বংশধরগণ এই অঞ্চলের জমিদার ছিলেন।

প্রথমে সরাইল পরগণা শ্রীহট্ট চাকলার অধীন থাকিলেও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসন সময়ে বাঙ্গালার নবাব সাইস্তা খাঁ কর্ত্তৃক এই অঞ্চল ঢাকা নেজামতের অধীন এবং নাওরা মহালভুক্ত হয়। * তিতাস নদীর পূর্ব্ব দিকস্থ ভূখণ্ড তখনও ত্রিপুরেশ্বরের হস্তগত ছিল, এই স্থান মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য (২য়), দেওয়ান নুরমহামুদের পুত্র দেওয়ান নাছিরমহামুদকে দান করেন। এই দান উপলক্ষে ত্রিপুরেশ্বরের যে অলৌকিক ঔদার্য্য প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী লহরে বিবৃত হইবে।

অতঃপর এই পরগণা উত্তরোত্তর নানা ব্যক্তির হাত ঘুরিয়া, বর্ত্তমানকালে তাহার অধিকাংশ স্বর্গীয় আশুতোষনাথ রায় মহাশয়ের বংশধরগণের হস্তে পতিত হইয়াছে।

সাম্বুল ঃ— (২০ পৃঃ — ১২ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৫৩ পৃষ্ঠায় প্রদান করা হইয়াছে।

সুবড়াইখুঙ্গ ঃ— (৪৩ পৃঃ — ২ পংক্তি)। ইহা ঊনকোটী তীর্থের নামান্তর। মহারাজ সুবড়াই (ত্রিলোচন) কর্ত্তৃক এই স্থানে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম ‘সুবড়াইখুঙ্গ’ হইয়াছে। রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

“তার পুত্র কুমার পরেতে রাজা হয়।।
কিরাত আলয়ে আছে ছাম্বুল নগর।
সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিবভক্তি তর।।
সুবড়াইখুঙ্গ নামে মহাদেব স্থান।
করিল প্রণতি ভক্তি সেই ভাগ্যবান।।”

রাজমালা — ১ম লহর, ৪২-৪৩ পৃঃ।

সংস্কৃত রাজমালায়ও এই স্থানের উল্লেখ আছে ;—

“কিরাত রাজ্যে স নৃপশ্ছাম্বুল নগরান্তরে।
শিবলিঙ্গং সমাদ্রাক্ষীৎ সুবড়াই কৃতে মঠে।।” ইত্যাদি।

সুবর্ণগ্রাম ঃ— (৪৪ পৃঃ — ১৭ পংক্তি)। নামান্তর সোণারগাঁও। বর্ত্তমান সময়ে এই স্থান পানাম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রবাদ অনুসারে, কোনও ত্রিপুরেশ্বর এই স্থানে বিস্তর স্বর্ণ দান (সুবর্ণ বৃষ্টি) করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানের নাম সুবর্ণগ্রাম হইয়াছে। স্থানটী ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত হইতে এক ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

---

* নাওরা মহাল — দ্বিতীয় আলমগীর সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে মঘ ও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত বঙ্গের শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁ খিজিরপুরে (নারায়ণগঞ্জের উত্তরাংশে) ‘নাওরা’ বিভাগ সংস্থাপন করেন। এই সমরতরী বিভাগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ১১২টি মহালের রাজস্ব “উমলে নাওরা” নামে নির্দ্ধারিত হয়। তৎকালে সরাইলের জমিদার ৪০ খানা কোষ নৌকা সংগ্রামকালে প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন।

এখানে প্রথমতঃ হিন্দুরাজগণের, পরে পাঠানদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই নগরীকে তৎকালে নানা উপায়ে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল।

সুবর্ণগ্রাম এককালে সর্ব্ববিষয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। এখানে বিস্তর ধনবান, সাধু, বিদ্বান, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর প্রসিদ্ধ লোকের বাস ছিল। শিল্প এবং বাণিজ্যের নিমিত্ত সেকালে সুবর্ণগ্রাম বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আফ্রিকা দেশীয় পরিব্রাজক ইবন বতুতা এখানকার বন্দরে যাবাদ্বীপের বাণিজ্যতরী দেখিয়াছিলেন। * এতদ্দ্বারা এই স্থানের বাণিজ্য-বিভবের পরিচয় পাওয়া যায়। সুবর্ণগ্রামের উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্রের বিষয় প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক রালফ্‌ফিচ্‌ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। নবাব জাফর আলী খাঁ সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে যে-সকল উৎকৃষ্ট বস্ত্র বার্ষিক উপঢৌকন প্রদান করিতেন, তন্মধ্যে সাদা মসলিন ১০০ খানা ও সাদা সরবন্দ ২০ খানা সোণার গাঁও আরং হইতে প্রতি বৎসর সরবরাহ করা হইত। ইহার প্রত্যেকখানা মসলিনের মূল্য ২০০ টাকা ও সরবন্দ প্রতিখানার মূল্য ৮০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল। † কৃষি সম্পদেও সুবর্ণগ্রাম বিশেষ সম্পন্ন ছিল। এখানকার ধান্য ও চাউল ভারতের বাহিরে নানা স্থানে রপ্তানী হইত।

এই স্থান ত্রিপুরার হস্তচ্যুত এবং মুসলমানগণের করগত হইবার পর মহারাজ বিজয়মাণিক্য সেই ক্ষতি উদ্ধার করিয়াছিলেন। তৎপর মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের শাসনকালে, সমসের গাজি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য (নামান্তর লবঙ্গ ঠাকুর) রাজ্যভ্রষ্ট ও বিতাড়িত হইয়া সুবর্ণগ্রামে যাইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার অধ্যুসিত ভূমি অদ্যাপি রাজবাড়ী নামে পরিচিত হইতেছে।

সোণামুড়া ঃ— (২৩ পৃঃ — ৫ পংক্তি)। এই স্থান কুমিল্লা নগরীর পূর্ব্বদিকে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গোমতী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এখানে ত্রিপুরেশ্বরের একটী সেনানিবাস স্থাপিত ছিল। এই সেনানিবাসের নাম ছিল সাভারমুড়াগড়। ‡ এই স্থান উদয়পুর রাজধানীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। বর্ত্তমানকালে এখানে ত্রিপুর রাজ্যের বিভাগীয় কার্য্যালয়, জেইল, ডাক্তারখানা, উচ্চ ইংরেজী স্কুল ইত্যাদি স্থাপিত আছে। সোণামুড়া নগরীর পশ্চিম পার্শ্বে একটি উচ্চ ও সুদীর্ঘ মৃত্তিকার আইল ও তাহার বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ পরিখা বিদ্যমান আছে, তাহার নাম 'গাজির

---

* Ibn Batuta, — Translation, P. P. 194-195.

† ঢাকার ইতিহাস — ১ম খণ্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা।

‡ মহারাজ নরেন্দ্রমাণিক্য মুসলমানগণের আক্রমণের আশঙ্কায় চিন্হিত হওয়ায়, মন্ত্রীগণ তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে পরামর্শ দিয়াছিলেন ;—

"সংরাইসের গড় ধরিবা সাবধানে।
রাজনগর সাভাড় মুড়া রাখিবা যতনে।।"
চম্পক বিজয়।

সোণামুড়ার বনকর ঘাট অদ্যাপি 'সাভারমুড়া ঘাট' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কোট'। শত্রুর গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মহারাজ ধন্যমাণিক্য সোণামুড়ার সন্নিহিত গোমতী নদীতে বাঁধ দিয়া ক্রমান্বয়ে দুইবার পাঠান বাহিনীকে জলে ডুবাইয়া মারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ক বিবরণ পূর্ব্বে প্রদান করা হইয়াছে।

হীরাপুর ঃ— (৩৯ পৃঃ — ২ পংক্তি)। এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৭৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

মহারাজ বিজয়মাণিক্য রাজ্যলাভের পূর্ব্বে সেনাপতিগণ তাঁহাকে এই স্থানে অবরুদ্ধাবস্থায় রাখিয়াছিল। বিজয়মাণিক্য রাজা হইয়া, স্বীয় মহিষী লক্ষ্মী মহাদেবীকে এই স্থানে বনবাসে রাখিয়াছিলেন। এই স্থান উদয়পুরের পূর্ব্ব দিকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

হেড়ম্ব ঃ— (১৭ পৃঃ — ১১ পংক্তি)। এই স্থানের বিবরণ রাজমালা প্রথম লহরের ২৭৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

হোমনাবাদ ঃ— (৩৯ পৃঃ — ১০ পংক্তি)। ইহা ত্রিপুরা জেলার একটী পরগণা। বর্ত্তমানকালে এই পরগণার কিয়দংশ নোয়াখালী জেলার অন্তর্ভূত হইয়াছে। এতদঞ্চল ত্রিপুর রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট থাকা কালে, মহারাজ বিজয়মাণিক্যের মহিষী মহারাণী পুণ্যবতী হোমনাবাদের বিস্তর ভূমি ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। এতৎসম্বন্ধে রাজমালায় পাওয়া যায় ;—

"বিজয়মাণিক্য নাম হৈল নরপতি।
তাহান মহাদেবী নাম ছিল পুণ্যবতী।।

* * * *

হোমনাবাদে দ্বিজে দিল বহুতর গ্রাম।
তিযিনাতে দিল গ্রাম ব্রাহ্মণ অনুপাম।।"

বিজয়মাণিক্য খণ্ড।

হোমনাবাদ ত্রিপুরার সামন্ত রাজ্যমধ্যে পরিগণিত ছিল। তৎকালে কায়স্থ জাতীয় দে বংশীয়গণ এই পরগণার অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা "রাজা" উপাধি গ্রহণ করিতেন। এই প্রদেশ দে বংশের দৌহিত্রসূত্রে দাস বংশীয়গণের হস্তগত হয়।

মুসলমান শাসনকালে দাস বংশীয়গণের স্থলে এখানে মুসলমান পরিবারের আধিপত্য স্থাপিত হয়। মোগল সম্রাট শাহ আলমের (বাহাদুর শাহ) সময়ে এই পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইয়াছে। তৎকালে কররাণি বংশীয় আমির মির্জ্জা আব্রু খাঁ এই পরগণার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন। পরবর্ত্তী অধিকারীগণের মধ্যে নবাব সাহেবা ফয়জন্নেছা চৌধুরাণী, নবাব ইউছফ আলী চৌধুরী, ছৈয়দ বসরত আলী চৌধুরী, চৌহান ক্ষত্রিয় বংশীয় তিলকচন্দ্র সিংহ ও সাহা জাতীয় ভজকৃষ্ণ রায় চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই স্থান এখনও তাঁহাদের উত্তরাধিকারীগমের হস্তে আছে।

অনুক্রমণিকা

● অ

অক্রুর সংবাদ — ১৫৪
অগ্নিপুরাণ — ৫৪, ২১৯
অঙ্গিরা — ২০৩, ২১২
অচ্যুতচরণ চৌধুরী — ৩১৫
অজিনী জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৬
অঞ্জন জাতীয় হস্তী — ২২০, ২২১, ২৩৭
অদুনা — ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫
অদ্বৈত প্রকাশ — ২৯৫
অধীর জাতীয় হস্তী — ২২২, ২২৩
অনন্ত — ৬১, ৬২, ২৫০
অনন্তমাণিক্য — ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ১০২, ১১৯, ১৩২, ১৪৯, ১৬৮, ১৭০, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৪, ২০৩, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৬০, ২৭৮
অনুমৃতা — ২০৫
অনুরথ — ৩১২
অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় — ২০৮
অন্নপূর্ণা — ৩৪
অন্নপূর্ণা বিগ্রহ — ২৯৯
অব্যক্ত দূত — ৫৫
অভিচার — ২৩, ১০৩, ১৪৩
অভিযান — ১২৪, ১২৭, ১৩৬, ১৫১, ১৬০, ৩১৪, ৩১৫
অমঙ্গলসূচক চিহ্ন — ৭০, ১৩১
অমরকোট — ২৫১
অমরদুর্ল্লভনারায়ণ — ১২১
অমরপুর — ২৭৭, ২৭৯, ৩১০
অমরমাণিক্য — ১, ৩৩, ৬৯, ৭৩, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ৯০, ৯১, ৯৯, ১০৩, ১০৭, ১২১, ১৬৭, ১৭০, ১৮৩, ২৫০, ২৫৪, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৭২, ২৭৯, ৩০৬, ৩১৫
অমরসাগর — ৮৩
অমরাবতী মহাদেবী — ১২১
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ — ১১৩
অরিভীম নারায়ণ — ৬৮, ৬৯, ৭২, ১২১, ১৩৩, ২৫১, ২৫৩
অর্জ্জুন — ৫৩, ১৬১
অশ্বারোহী — ৪৭, ১০৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩৬
অষ্টদিগ্‌গজ — ২২০, ২৩৭
অষ্টমঙ্গল হস্তী — ২২২, ২২৩
অষ্টাঙ্গ মৈথুন — ২০৫
অহোম জাতি — ১৬১, ২৬৭, ২৬৯
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় — ৩০৮

● আ

আইন — ১৫৮
আইন-ই-আকবরী — ১১৭, ১২১, ১৮০, ২৪৯, ৩০০
আইন-ই-তিরহুত — ২৮৫
আইন ব্যবসায়ী — ১৫৮
আকবর নামা — ৩০৩
আকবর বাদশাহ — ৫৩, ১১৭, ১২১, ১৩২, ১৮০, ২০৮, ২৪৯, ২৫১, ২৫৫, ২৬০, ২৮৬, ৩০০ ৩১৫
আকাসাদেক — ২৭৭
আগরতলা — ১৮৪, ২৭১, ২৭৯, ৩০৩, ৩১১,
আগুয়ান নারায়ণ — ৬৯, ১২১, ১৩৩, ২৫১
আগ্নেয়াস্ত্র — ১২৩, ১২৪
আচকনারায়ণ — ২৮৩, ২৮৪
আজিম ওসমান — ৩০০
আঠারমুড়া পর্ব্বত — ১১৫, ২৭৭
আড়িমাও — ২৬৮
আতরের ব্যবহার — ১৬৯
আতল্‌ছি খোজা — ২৪৯
আত্মারাম — ৪৩, ২৬৭
আদালত — ১৫৮
আদিধর্ম্ম পা — ২৮৮, ৩১৪

আদিনাথ তীর্থ — ৩১৩
আদিশূর — ১৮৯, ২৭৩, ৩০৫
আনন্দনাথ রায় — ৩০৭
আনন্দনারায়ণ রায় — ২৭০
আফ্রিকা — ৩১৭
আবিদুবই — ২০৭
আবুতোরাপ — ৩০৮
আবুলফজল — ১১৭, ১২১, ১৮০, ২৪৯
আব্রু খাঁ — ৩১৮
আমিরদ্দীন দারোগা — ৩০০
আমীর — ১২১
আয়ানী — ২৪০, ২৪১
আরাকান — ১১২, ১২৬, ১২৭, ১৩১, ২৬৩, ২৮০, ২৯৭, ৩১২
আলঙ্ শিশু — ২৯৭
আলমগীর (২য়) — ৩০০, ৩১৬
আলালক্ষ্মী — ৩০১
আলী আমজাদ খাঁ — ৩১৪
আলীআসগর খাঁ — ৩১৪
আলীহায়দর খাঁ — ৩১৪
আশুতোষ রায় — ৩১৬
আসরকপুর — ২৯০
আসরকপুরের তাম্রশান — ১৮৮, ১৯০
আসাম — ২৪, ১০৮, ১১৪, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৮৭, ৩০৪
আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে — ২৬৯

● ই

ইংরেজ বণিক — ২৬৯
ইউরোপ — ২০৭
ইউসক আলী চৌধুরী — ৩১৮
ইক্রাম মোজমাবাদ — ১২৮
ইঙ্গিত — ৭৪, ৯১, ১৪৩, ১৭০, ২৬৩
ইছামতী — ৫২, ৫৫, ১৩১, ২৬৯, ৩১১
ইটা — ৫৭, ৮৪, ১০৭, ২৬১, ২৭০, ২৭১
ইদিলপুর — ১৯০, ২৯১, ৩০২
ইদিলপুর লিপি — ২৯২
ইন্দানগর — ২৭০
ইন্দেশ্বর — ২৭০
ইন্দ্র — ২৩৭
ইন্দ্রমাণিক্য — ৩৭, ৩৮, ৮৭, ৮৯, ১১৯, ১৪১, ১৪৯, ১৫২, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৪, ২৫১, ২৫৬, ২৬০, ২৬৪, ২৭৫
ইবন বতুতা — ৩১৭
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী — ১৬৯, ২৭৭
ইক্ষু নদী — ২৬৯

● ঈ

ঈশা খাঁ — ২৭১, ৩০০, ৩১৫, ৩১৬
ঈশান দেবের তাম্রশাসন — ১৯১

● উ

উইলসন্ — ২০৭
উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক — ২০৮
উজীর — ৪৫, ৪৬, ১৪৩, ১৫৭, ১৬৬, ১৮৪, ২৫৮, ২৫৯
উজ্জয়িনী — ৩০২
উৎকল — ৩৯, ১৯১, ২৭১
উৎকল খণ্ড (পাঁচালী) ২৯, ৯১, ২৫৭
উৎকৃষ্ট হস্তীর সংজ্ঞা — ২২২
উড়িয়া রাজ্য — ২৬১
উড়িয়ানারায়ণ — ৬৯, ৭১, ১২১, ১২৩, ১৩৩, ২৫০, ২৬০
উড়িষ্যা — ৪৬, ৬১, ৬২, ১২৯, ২৫৫, ২৫৬, ২৬০
উদয়পুর — ৬৮, ৯২, ৯৫, ১০১, ১০২, ১০৬, ১০৭, ১২২, ১২৭, ১৩৫, ১৪৯, ১৫১, ১৭০, ১৯১, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৮, ২৬৩, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৭, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ৩০১, ৩১০, ৩১১, ৩১৪, ৩১৭
উদয়মাণিক্য — ৪৩, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৮৮, ৯০, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১১৮, ১১৯, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৪৩, ১৪৯, ১৫১, ১৭০, ১৭৯, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ২০২, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৬০, ২৬৩, ২৬৫, ২৭১, ২৭৮, ২৮৮, ৩১৪
উদয়মাণিক্য (ভুলুয়া) — ৩০৬
উদ্দান্ত হস্তী — ২২০

উপনিষদ — ১০৮
উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ — ২৯১
উবাফেরু — ২১
উমলে নাওরা — ৩১৬
উমাকান্ত দাস — ২০৯
উল্কাপাত — ৭০, ১৩৩

● ঊ

ঊনকোটি ছড়া — ১১৪
ঊনকোটি তীর্থ — ৫৯, ৮৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১২, ১১৩, ১১৪, ২৭২, ২৭৪, ৩০৯, ৩১৬
ঊনকোটী তীর্থ মাহাত্ম্য — ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ২৭৪, ৩০৯
ঊনকোটী পৰ্ব্বত — ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১২
ঊনকোটীশ্বর শিব — ৫৯, ১১১, ১১২

● ঋ

ঋগ্বেদ — ১৫৪

● এ

এওলাতলী — ২৭০
একাব্বর — ৫৬, ২৫১
একাব্বরী মোহর — ৫৩
এল্‌ফিন্ স্টোন্ — ২০৭

● ঐ

ঐরাবত হস্তী — ২২০, ২৩৭, ২৩৮

● ও

ওঝাই — ১৬৩
ওথার নৌকা — ১১৮
ওডরিক সাহেব — ২৭০
ওমরাহ — ১২১
ওয়াইজ সাহেব — ২০৬, ৩০৫
ওয়াটর্স্‌ সাহেব — ৩০২
ওয়াথ্‌লং — ১৭২
ওলন্দাজ — ১৩৭, ২৭৯

● ঔ

ঔরঙ্গজেব — ২৬৯, ৩০০, ৩১৬, ৩১৭

● ক

কচুয়া ছড়া — ৭৫, ২৭২
কঞ্জগিরি — ২৬৭
কড়িমুদ্রা — ৫০, ১৬৫
কণ্বমুনি — ৭৮
কথাসরিৎসার — ৩০২
কদ্‌বা — ১৭১, ১৭২
কনকরচিত পত্র — ৫২
কনোগিজ — ২৭৩
কন্দর্পনারায়ণ — ৩০৭
কন্যাপণ — ১৭১
কন্যা-যৌতুক প্রথা — ২৯৫
কক্সবাজার — ৩১৩
কপিল (মহর্ষি) — ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৫
কপিল তীর্থ — ১০৮, ১০৯
কপিল-লিঙ্গ শিব — ১১৪
কপিলাশ্রম — ১০৮, ১০৯, ১১৪
কপিলি নদী — ২৬৮
কবরা উপাধি — ২৫৮
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম — ৮৬
কবি কল্পলতিকা — ২১৯
কবি চন্দ্র খাঁ — ৩০৬
কমলপুর — ২৮০
কমলাক নগর — ২৯৪
কমলা — ৯, ৩৪
কমলা কুণ্ড — ১১৫, ১১৬
কমলাঙ্ক রাজ্য — ২৯৬
কমলা মহাদেবী — ৮, ৯, ১৭, ২৯, ৩৩, ৮৬, ৮৭, ৯১, ১০১, ২০৩, ২৫২, ২৭৫
কমলালেবু — ২৭৭
কমলাসাগর — ৯, ১০১, ২৫২, ২৭৫
কমিং সাহেব — ৮৩, ১৩২, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৩
কয়লার খনি — ১৫৫, ২৭৪
করতোয়া — ২৬৭, ২৬৮
করমন্তনগর — ২৯০
করলীয়া টিলা — ২৩৯

করা খাঁ — ২৪, ২৮, ১২৭, ১৩৬, ১৩৭, ২৫২, ২৬৬
কর্ণাল — ৬৪
কৰ্দ্দম মুনি — ১০৮
কলমীগড় — ৭৩, ২৭৩
কলাকোপা — ১৩১, ১৪৪
কলাহাওর — ২৭৪
কলিমা — ৫১
কলিন্দবৰ্ম্মা — ২৬৮
কলিনিপক্ষ — ২৭৩
কল্যাণমাণিক্য — ৮২, ১০০, ১০১, ২৭১
কল্পতরু — ৫৯, ১০২, ২০৪
কসবা — ৯, ৯২, ১০১, ১২৭, ১২৮, ২৫২, ২৭৫
কাংস্য বণিক — ১৫৩
কাকচাঁদ — ১৫২, ২৭৪
কাক জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৬
কাঙ্গলাই পৰ্ব্বত — ২৭৫
কাঁচলি — ১৫৩, ১৫৪
কাছাড় — ৯৮, ১০৯, ১৬১, ১৮০, ২৬৮
কাছুয়া কুণ্ড — ১১৫, ১১৬
কাঠিছোঁয়া — ১৬, ১৪৬
কাতাল — ১৫২
কানিংহাম সাহেব — ৩০২
কান্যকুব্জ (কনোজ) — ৩, ৯২, ২৫২, ২৭২, ২৭৩
কাফির — ৫১
কাফুরী খোজা — ২৪৯
কামতারপুর — ২৬৬, ২৬৯
কামরূপ — ১২৬, ২৬২, ২৬৭
কামরূপবুরুঞ্জী — ২৬৮
কামাখ্যা — ৩৪, ২৬৭
কামাখ্যা দেবীর মন্দির — ২৬৮
কামান — ১২৩, ১২৪
কামাল খাঁ — ২৭১
কামেশ্বর ঝাঁ — ২৮৬
কারাদণ্ড — ১৫৮
কাৰ্ত্তবীৰ্য্যাৰ্জ্জুন — ২৬১
কার্পাস — ১৫৩, ২৭৪
কালভৈরব — ১১১
কালভৈরবের মন্দির — ২৯৯
কালা খাঁ — ৪, ১৫৬, ১৫৭, ২৫২
কালানাজির — ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ১২৯, ১৩০, ২৫২, ২৫৩
কালাপাহাড় — ১১২
কালিকা — ২৯, ৩০, ৭৬, ১০৫
কালিকাপুর — ২৩৯, ২৪১
কালিকা পুরাণ — ১০৩, ১০৪, ২১৯, ৩০৪
কালিয়াজুড়ি — ২৫২
কালী — ৩৪
কালী নদী — ২৭২
কালীবিলাস তন্ত্র — ৩৪
কালুয়া ছড়া — ৭৭, ২৭২
কাশী খণ্ড — ২৪৮
কাশীরাম দাস — ৮৬
কিংলাক সাহেব — ১৬৯
কিন্নর — ৩৬
কিরাত — ২০, ৩২, ১৫৫, ১৬২
কিরাত দেশ — ১১৩
কিরাতভুবন — ২০, ৩১
কিশোরী ভজন — ২৪০
কীৰ্ত্তিনাশা — ১৩১, ২৬৯
কীৰ্ত্তিপুর — ১৬১
কুকি — ১৭, ২০, ২১, ৩১, ৩২, ১১৫, ১১৮, ১২৫, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৫, ২১৫, ২৪৮, ২৭৪
কুন্‌কী হস্তী — ২১৮
কুন্তি — ২০৩
কুমার — ১০৭
কুমিল্লা — ৫, ৯২, ১২৬, ১৮৯, ২৪২, ২৫২, ২৫৭, ২৫৯, ২৭১, ২৭৭, ২৮৩, ২৮৯, ২৯০, ২৯৬, ২৯৯, ৩১৭
কুমুদ জাতীয় হস্তী — ২২০, ২২১, ২৩৭
কুরুক্ষেত্র — ২৬৮
কূৰ্ম্ম পুরাণ — ৩০৪
কুলচুরি বংশ — ২৭৩
কুশ — ২৭৩

কুশনাভ — ২৭৩
কুশপুত্তল — ১০৫
কুশিয়ারা নদী — ৩০৯
কূটনীতি — ১৫৯, ১৬০
কৃতি (রাজা) — ২৮৫
কৃত্তিবাস — ১৫৪
কৃত্তিবাসী রামায়ণ — ১৫৪
কৃষ্ণকর্ণামৃত — ৮৬
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী — ৮৬
কৃষ্ণমণি যুবরাজ — ২৪৩, ২৭৫
কৃষ্ণমাণিক্য — ১৬৯, ২১৭, ২৪৩, ২৭১, ২৭৫
কৃষ্ণমালা — ১৬৯, ২৭৫
কেওলিনের খনি — ১৫৫
কেদার রায় — ১৩১, ২৮৯, ৩০৩
কেরোসিনের খনি — ১৫৫
কেশরলাল — ১৬৮
কেশব সেন — ১৯২
কেশব সেনের তাম্র-শাসন — ১৯০, ১৯১
কৈলা (কৈলাসহর) — ১৩, ১০৭, ১০৯, ১১৩, ১১৪, ১২৫, ১৫২, ১৫৭, ২৭০, ২৭২, ২৭৪, ২৮০, ৩০৯
কৈলাগড় — ৫, ২৫, ৫৭, ৯২, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ২৭৫
কৈলাসচন্দ্র সিংহ — ৮৩, ৮৪, ৮৫, ১২১, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৩৩, ১৬১, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ২৮৯, ৩০১, ৩০৬
কৈলাসবাবুর রাজমালা — ১২১, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৬১, ১৮২, ২৮৯, ২৯৫, ৩০১
কোচ — ২৪, ২৬৯, ২৭৫
কোচবিহার — ২৬৭
কোন্দা নৌকা — ১১৭
কোমি সিংহ — ৩১২
কোল জাতি — ২৪৮
কোষ নৌকা — ১১৭, ৩০০, ৩১৬
কৌতুক ব্রাহ্মণ — ৩, ৪, ৫, ৯২, ৯৩, ২৫২
কৌতুক রত্নাকর — ৩০৭
ক্রমদীশ্বর — ২৯৮
ক্রীতদাস — ২৪৯

● খ

খওয়াজ খাঁ — ১২৮
খড়্গ — ১২২, ১২৩, ১২৪, ২৬৫
খড়্গারাজ — ২৯০
খড়্গারায় — ২৫, ১২৭, ২৫২
খড়্গ বংশ — ২৯০
খড়্গোদ্যম — ২৯০
খণ্ডল — ১৩, ১৪, ১৫, ৭০, ১২৫, ১৩৩, ১৫০, ১৫৭, ১৫৯, ২৩৮, ২৩৯, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৮, ২৮২
খনিজ পদার্থ — ১৫৫
খরজাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৫
খর্চ্ছুং (খছুং) — ২০, ২৭৫
খসজাতি — ১৬১
'খাঁ' উপাদি — ১২০, ১৫৬, ১৫৭, ৩০৬
খাজুড়িয়া — ২৪১
খাজে আলীমিঞা — ৩০০
খাটি পুষ্করিণী — ৭৫
খাড়াইত — ৫৮, ১২২, ২০০, ২৬৫
খামাচেব — ২০, ২৭৭
খামারাঙ্খল — ২০, ২৭৭, ২৮০
খাস আপীল আদালত — ১৭২
খাসিয়া — ৪৩, ৪৪, ৪৫, ১২৯, ১৫০, ১৬০, ১৬১, ২৬৭, ২৭৭
খানসিস্ — ২৯৭
খিজিরপুর — ৩১৬
খিতং — ৫১
খুচুং কুকি — ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬, ২৭৫, ২৭৬
খুচুং দর্পনারায়ণ — ২৭৬
খুলনা — ১১৭
খোইশিব — ৩০৯
খোজা — ২৩, ২৪৮, ২৪৯
খোদা — ৫১, ৫৪
খোয়াই — ২৮২
খোয়াজ মোল্লা — ২৪১

● গ

গগন খাঁ — ৪, ২৫, ১২৭, ১৫৬,১৫৭, ২৫২, ২৫৩

গঙ্গা — ১৩১, ১৫১, ২৬০, ২৭২, ৩১০
গঙ্গানগর — ২৫, ২৭৫, ২৮৭
গঙ্গামণ্ডল — ১৩, ১২৫, ১৫০, ২৫০, ২৫৬, ২৭৭
গজদন্ত — ২১, ১৬৪, ২১৫, ২১৮
গজদন্তের পাটী — ১৫৩
গজমুক্তা — ২১৯, ২২০, ২২২
গজভীম — ৪৮, ৫৩, ৬৯, ১২১, ১২৩, ১৩৩, ২৫৩
গণ্ডকী নদী — ২৮৫
গদাভীম — ৬৫, ৬৬, ৯০, ১৬৮, ২৫৩, ২৬০
গণপতি বিগ্রহ — ১১১
গণপতি রায় — ৩০৬
গম্ভীরবেদী হস্তী — ২২৩
গরুড়ধ্বজ —৬৮, ৬৯, ১২১, ১২২, ২৫৩
গরুড় পুরাণ — ২১৯, ২৯৯
গবয় — ১৯, ২১, ১৬২
গাজিনামা — ২
গাজির কোট — ৩১৮
গাধি (রাজা) — ২৭৩
গাধিপুর — ২৭৩
গার্গ্য — ২২২, ২২৭
গার্গ্য সংহিতা — ২১৯
গিয়াসউদ্দীন — ২৮৬
গুণ্ডা হস্তী — ২১৫
গুনৈছা — ২০
গুপ্তচর — ৫৫
গুপ্তবংশ — ২৭৩
গেইট সাহেব — ১৬০, ১৬১, ২৪৯
গোধিকা — ১৮, ১৯
গোপীপ্রসাদ নারায়ণ — ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৯, ১০২, ১০৬, ১১৯, ১২১, ১৩২, ১৬৮, ১৭০, ১৮১, ১৮২, ২০২, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৬০, ২৭৮
গোমতী — ২২, ২৩, ২৭, ২৯, ৬১, ১০৫, ১১৫, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩৫, ১৩৬, ২৪২, ২৫৪, ২৭১, ২৭২, ২৭৭, ২৭৯, ২৮০, ২৮৬, ২৮৭, ৩০৯, ৩১০
গোয়ালপাড়া — ৩০৪
গোয়ালন্দ — ২৮৯, ৩১১
গোলন্দাজ — ১১৬, ১৩০
গোলাম আলী জমিদার — ৩০১
গোবর্দ্ধন কবরা — ২৭৬
গোবিন্দচন্দ্র (হেড়ম্বেশ্বর) — ১৫৮
গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচাঁদ রাজা) — ২৬১, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭
গোবিন্দচন্দ্রের গান — ২৯২, ২৯৩
গোবিন্দ দাস — ৮৬
গোবিন্দমাণিক্য — ২৯৯
গোবিন্দমাণিক্য (ভুলুয়া) — ৩০৬
গো-বীজ টিকা — ১৫২
গোহত্যা — ২৮৩
গৌড় — ১৩, ২২, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ৫২, ৬৯, ১০৫, ১২২, ১২৬, ২৭৮, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫
গৌড়গোবিন্দ — ২৮৩
গৌড়মল্লিক — ২২, ২৩, ২৪, ১২৬, ১৩৫, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৪
গৌড়েশ্বর — ১২, ১৩, ১৪, ২২, ২৮, ৪৬, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৬, ৬৯, ৭১, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩২, ১৩৪, ১৩৬, ১৪৫, ১৪৭, ১৫০, ১৮২, ২৪৮, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬৬, ৩০০, ৩০১, ৩০৩, ৩১১
গৌরলেখমালা — ২৯১
গৌরা কামার — ২৩৯, ২৪০, ২৪১
গৌরীচরণ — ১৬৮
গৌরীনাথ সিংহ — ২৬৯
গৌহাটী — ২৬৮, ৩০৪
গ্যাসপারো — ২০৭
গ্রাম্য গীতি — ৩২, ২৭৪
গ্রাম্যছড়া — ২৩৮
গ্রীয়ারসন্ সাহেব — ২৯২, ২৯৬
গ্রীশ — ২০৭

● **ঘ**

ঘটককারিকা — ৩১২
ঘাটলা — ৭০, ২৭৮

ঘৃতাচি অপ্সরী — ২৭৩
ঘোঙ্গ — ২১
ঘোড়া — ২১

● চ

চক্র — ৩৫, ১০৩
চট্টল — ২২, ৩০, ৪৪, ৭০, ৭১, ১২৬
চট্টলের তাম্রশাসন — ১৯১, ১৯৩
চটেশ্বরী — ৩০
চড়িলাম — ২৭৯
চণ্ডাল বলি — ২৪
চণ্ডিগড় — ২৩, ১২৬, ১৭০, ২৭৮
চণ্ডীকাব্য — ৮৬
চণ্ডীমুড়া — ২৯০
চতুর্দ্দশ দেবতা (চৌদ্দ দেবতা) — ২০, ২৮, ২৯, ৩১, ৪৬, ৫০, ৫১, ৮৭, ১০৫, ১৩০, ১৩৭, ১৪৩, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৬, ২৮৭, ৩১১
চতুর্দ্দোল — ৩৮, ৬৪, ৭৩
চন্তাই — ৩৬, ৫০, ৫১, ৫২, ৬১, ৮৭, ১৭৯, ২৫৬
চন্দ্র — ১, ১১১, ২৫০, ২৫১, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০
চন্দ্রকান্ত বসু — ৯৮
চন্দ্রগোপীনাথ বিগ্রহ — ৬৮, ১০২, ২৭৮
চন্দ্রনাথ মাহাত্ম্য — ২৯৮
চন্দ্রদর্প নারায়ণ — ৬৯, ১৩৩, ২৫৪
চন্দ্রদ্বীপ — ২৯১, ৩০৭
চন্দ্রনাথের মন্দির — ২৯৯
চন্দ্রপুর — ৬৮, ১৭০, ২৫৫, ২৭৮
চন্দ্রপ্রতাপ — ৩০২
চন্দ্ররাজগণ — ২৯১, ২৯২, ২৯৪, ২৯৬
চন্দ্র রাজবংশ — ২৭৩
চন্দ্রশেখর তীর্থ (চন্দ্রনাথ) — ২৯৮, ৩০৫, ৩০৭
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত — ১১৩
চন্দ্রসাগর — ৬৮, ১০২, ২৭৮, ২৭৯
চন্দ্রসিংহনারায়ণ — ৬৯, ১২১, ১৩৩, ২৫৪
চন্দ্রসূর্য্য রাজা — ৩১২
চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ — ৯৮, ১১২
চম্পক রায় — ১৬৮
চম্পক বিজয় — ১৬৯
চম্পারণ্য — ২৮৫
চরখা — ১৮, ১৩৮
চরাল কুন্‌কী — ২১৫
চর্ম্ম (ঢাল) — ১২২, ১২৩, ১২৪, ২৬৫
চব্বিশ পরগণা — ১১৭
চাকলে রোশনাবাদ — ৮৩
চাখমা — ২১৫
চাটি — ২৭৯
চাটিগ্রাম (চট্টগ্রাম) — ২২, ২৪, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৬৯, ৭০, ৭৭, ৯৫, ১১৮, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৮, ১৪৪, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৭৭, ১৮১, ১৯৩, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৮, ২৬০, ২৬১, ২৬৩, ২৬৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৭, ২৯৪, ২৯৯, ৩০১, ৩০৭, ৩১১, ৩১৫
চাথেঙ্‌ নদী — ২৪৫, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৯৮
চাঁদপুর — ২৯০
চাঁদ রায় — ১৩১, ২৮৯, ৩০৩
চাঁদাসহর — ৩১২
চাপলেন্‌ সাহেব — ২০৬
চাপিয়া খাঁ — ১৫৭, ২৫২
চামুণ্ডা তন্ত্র — ৩৪
চিতাগাও — ২৭৯
চীন দেশ — ১৫৪, ১৫৫, ২০৭
চৈতন্য চরিতামৃত — ৮৬
চৈতন্য ভাগবত — ৮৬
চৈতন্য মঙ্গল — ৮৬
চৈত্য — ৩০২
চোরগঙ্গা — ৫৬২
চৌদ্দগ্রাম — ২৩৮, ২৮৩
'চৌধুরী' উপাধি — ২৯৭
চৌয়াল্লিশ — ৫৮, ২৬৫, ২৭০, ২৭৯

● ছ

ছঘরিয়া — ২৫, ১২৭, ১৩৬, ২৫২, ২৫৩, ২৮০
ছকড়িয়া ঘাট — ২৮, ২৭৯

ছত্রশিক — ২৪, ১২২, ২৮০
ছনগাঙ্গ — ২৬, ২৮০, ২৮৬, ২৮৭, ৩০৯
ছয়ঘরিয়া বাড়ী — ২৭৯
ছয়চিরি — ২৭০
ছাইবেম্ — ২০, ২৮০
ছাইমা জাতি — ২৮৬
ছাইমা নদী — ১১৫, ২৭৭
ছাইমার — ২০, ২৮০
ছাকাচেব — ২০, ২৮০
ছাকারাঙ্খল — ২০, ২৮০
ছাগ — ২১
ছাগলনাইয়া — ২৪১
ছাতাচূড়া পর্ব্বত — ২৭৭, ২৮০
ছান্দলী খোজা — ২৪৯
ছামথুম্ খাঁ — ৪, ১৫৬, ২৫৪
ছাম্বুলনগর — ২০, ২১, ১১৩, ১১৪, ১৫৭, ২৭২, ২৭৪, ২৮০, ৩১৬
ছিন্নমস্তা — ৩৪
ছুটি খাঁ — ১২৮
ছুটি খানের মহাভারত — ১২৮
ছুটিয়া জাতি — ২৬৮
ছেংথুম্ ফা — ১৪৫
'ছেকাল্' — ২৪৬
ছেদযোগ — ৬১, ২৫৫, ২৬২
ছৈয়দ নাসিরউদ্দিন — ২৮৩

● জ

'জগদীশ্বরী' উপাধি — ১০০
জগন্নাথ (বিগ্রহ) — ৩৯, ৬২, ১৫১, ১৯১
জগন্নাথ দীঘি — ২৮৪
জটিল জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৬
'জনক' উপাধি — ২৮৫
জনার্দ্দন সেনাপতি — ২৭৬
জবদ্বীপ — ২০৭
জমদগ্নি — ২৬১
জয়চন্দ্র — ২৭৩
জয়ন্ত চন্তাই — ২৪৩
জয়ন্ত্যা (জয়ন্তিয়া) — ৪৪, ৪৫, ১১৯, ১২৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৮০, ২৫৭, ২৮০, ৩১৫
জয়ধ্বজ সিংহ — ২৬৯
জয়মাণিক্য — ১, ৭২, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮১, ৮৮, ৯০, ৯৯, ১০৩, ১১৯, ১৪৩, ১৪৯, ১৫১, ১৬৭, ১৭০, ১৮৩, ১৮৪, ২৫০, ২৫৪, ২৬৩, ২৬৫
জয়া মহাদেবী (জয়াবতী) — ৬৭, ৮৮, ২০৩, ২৫৪
জরপ (মুদ্রা) — ৩১, ৫৫, ১৫৫, ১৬৪, ১৬৫, ৩১৪
জলদস্যু — ৩১৩, ৩১৬
জলপাইগুড়ি — ২৬৭
জলপ্রপাত — ১১৫, ১১৬
জহর ব্রত — ২০৬
জাজিনগর — ১২৮
জাঠা — ১২২, ১২৩, ১২৪
জাত খড্গ — ২৯০
জাফর আলী খাঁ (নবাব) — ৩১৭
জামাল খাঁ — ২৭১
জামাল খাঁ পন্নি — ৭১, ৭২, ১৩৪, ২৫৫, ২৫৮,
জানির খাঁ গড় — ২৫, ১২৭, ১৩৬, ১৫৭, ২৫২, ২৫৩, ২৮০
জায়গীর — ১৭০
জারজ জাতীয় হস্তী — ২১৯
জাহাঙ্গীর — ২৪৯
জাহ্নবা মহাদেবী — ২৯৫
জাহ্নবী — ৫৫, ১৩১, ১৫১, ২৮১
জিনারপুর — ৫৭, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৪
জেনিজারি সৈন্য — ১৪৪
জৈমিনী ভারত — ১৬১
জোঙ্গল বলহু — ২৬৮
জোয়ানসাহী — ২৮৩
জোন্স সাহেব — ২০৮
জ্যোতিস্তত্ত্ব — ২৯৯

● ট

টলেমি — ২৭৩
টেভার্নিয়ার — ১৫৫, ৩১১

● ঠ

'ঠাকুর' উপাধি — ২৫৮

● ড

ডগর — ৪৪, ৪৫, ১১৯, ১৬০
ডরা নাম — ৬৯, ২৮২
ডাইন — ২৬, ২৭, ২৪৬, ২৫৯, ২৬০
ডাঙ্গর ফা — ১৭, ৫৯, ২৫৫, ২৮২
ডিব্রুগড় — ৩০৪
ডুঙ্গু তীর্থ — ৬১, ১০৬, ১১৫, ২৮২
ডুঙ্গর ফা — ৬১, ৬২, ১১৫, ২৫০, ২৫৫, ২৬২
ডুমরি ফল — ১১৫
ডুম্বুর — ৬১, ১০৬, ১১৫, ২৭৭, ২৮২
ডোমঘাটি — ২৫, ১২৭, ১৩৬, ২৮২, ২৮৭

● ঢ

ঢাকা — ৮২, ১০২, ১১৭, ১৬৮, ২৬৯, ২৮৮, ২৮৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৪
ঢাকার ইতিহাস — ২৯১, ২৯২, ৩০২
ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্ — ২৯৩
ঢালী — ৪৬, ১২৪
ঢেমস্ — ৪৫, ১১৯

● ত

তত্ত্বচক্র — ৩৫
তন্ত্রসার — ৩৪
তমকান — ১৫৯, ২৮২
তরপ — ৫৭, ৮৩, ৮৫, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৯৪
তরপের ইতিহাস — ২৮৩
ত্বরিতা — ৩৪
তাপর ধুম — ২৮২
তাম্রপত্র — ৫, ৬, ৩৯, ৫৯, ৬০, ৮১, ৯২, ১৮১, ২৯০, ২৯১
তাম্রশাসন — ৬১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১০২, ১৭৫, ১৮৫, ১৯০, ২৮৯, ২৯১, ২৯২
তাম্রশাসন প্রদানের কথা — ১৮৯
তাম্রশাসন প্রবর্ত্তনের কাল — ১৮৪
তাম্রশাসন সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত — ১৮৭
তাম্রশাসনে রুচির পরিচয় — ১৯১
তাম্রশাসনে শৌর্য্যভাব — ১৯১
তাম্রশাসনের তথ্যানুসন্ধান — ১৮৪
তাম্রশাসনের বিবরণ — ১৮৪
তাম্রের কঙ্কণ — ২১
তারা — ৩৪
তারাপাট — ১৫
তিতাস নদী — ৩০৩, ৩১৬
তিথিতত্ত্ব — ৫
তিপ্রাই কাণি — ৯২
তিলকচন্দ্র ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫
তিলকচন্দ্র সিংহ — ৩১৮
তিষ্ণা — ৩৯, ২৫৮, ২৮৩, ২৮৪
তীরন্দাজ সৈন্য — ৫৪, ১১৬, ১১৭, ১২৩
তীরভুক্তি — ২৮৫
তীর্থ স্থানের বিবরণ — ১০৬
তুঙ্গেশ্বর শিব — ১১২
তুডুক দীঘি — ২৬, ১৩৬
তুরস্ক — ১৪৪
তুলসীবতী মহাদেবী — ২৯৯
তুরসীবতী বিরামছত্র — ২৯৯
তুলা পুরুষ — ৫৯, ৭৩, ১৭৩
তেজপুর — ৩০৪
তৈকতান — ২৬, ২৮৬
তোডরমল্ল — ২৫৫
তোপ — ২৭৮
ত্রিনাথের মেলা — ২৪০
ত্রিপুর — ১, ১৬১, ২৫০, ২৫১, ২৫৬, ২৫৭, ২৬০
ত্রিপুর বংশাবলী — ১০১, ১০৩, ১১৭, ১২৯, ১৩০, ১৭০, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ২৫৮
ত্রিপুরা — ৩, ১৭, ২৪, ২৬, ২৮, ৫২, ৮৫, ১১৭, ১১৮, ১২৮, ১২৯, ১৩২, ১৫৬, ২৪৮, ২৭৫
ত্রিপুরাব্দ — ২৭১
ত্রিপুরার খাল — ৫৭, ২৮২, ২৮৪

ত্রিপুরার জাঙ্গাল — ৫৭, ২৮২, ২৮৪
ত্রিপুরার পুরী — ১৯
ত্রিপুরাসুন্দরী (বিগ্রহ) — ৩০, ৯৫, ১০৩, ১০৫, ২৫৭, ২৭১
ত্রিপুরাসুন্দরী (রাণী) — ১৪৫
ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির — ৩০, ৭৬, ৯৫, ১৭৭, ২৫৭, ২৬৩
ত্রিলোচন — ১০, ৮৮, ১১৩, ১১৪, ১৫৪, ২৫৫
ত্রিহুত — ২৯, ৮৯, ২৫৭, ২৮৫, ২৮৬
ত্রেতাযুগ — ১৮৫
ত্রৈলোক্যচন্দ্র — ২৯২, ২৯৩

● থ

থাংচাঙ্গ — ৩২, ১৫৫
থাঙ্গাচেপ — ১৬২
থানা — ১৭, ১৯, ২০, ২৩, ২৪, ২৮, ৩২, ৩৩, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ১২৯, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৫৫, ১৬৫, ২৬৬
থানাদার — ১৯, ১৪৫
থানাংচি — ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ১২৫, ১৩৫, ১৩৭, ১৫০, ১৬৫, ২২৯, ২৬৪, ২৮৬
থুনাই — ৭৫, ২৮৬
থ্রেশ — ২০৭

● দ

দরঙ্গ — ২৬৯
দরবারের বিশেষ নিয়ম — ১৫৯, ১৬৯
দশ মহাবিদ্যা — ১১২
দশ সেনাপতি — ৪, ৭, ৯, ১২
দক্ষিণ বাজু — ৪৩, ৪৭, ২৮৭, ৩০১
দক্ষিণ শিক — ২৩৮
দাড়রা — ৬৯, ২৭৮, ২৮২
দানকেলী — ১৫৪
দানসাগর গ্রন্থ — ৫৯
দামোদর দেব — ৬০, ১৯৩
দামোদর দেবের তাম্রশাসন — ১৯১
দায়ুদ শাহ — ৫৩, ১৩০, ১৩২, ১৫১, ১৮১, ২৫৫, ২৫৬, ২৬১
দারহুলা কুকি — ২৭৪
দিগ্বিজয় প্রকাশ — ৩০২
দিব্যচক্র — ৩৫
দিব্যভাব — ৩৪
দিল্লী — ৫২, ৫৩, ১৩২, ২৭১
দিক্ষু নদী — ২৬৭
দীঘি নালা — ২৮৭
দীন জাতীয় হস্তী — ২২৪
দীনেশচন্দ্র সেন — ২৯৬
দুধ-পুষ্করিণী — ২৭৩
দুন্দুভি — ৬৪
দুবড়া — ১৫৩
দুরাশা — ৩৩
দুর্গ — ১৪৪, ১৪৫
দুর্গসমূহের নাম — ১৪৪
দুর্গামঙ্গল — ৫৩
দুর্গামাণিক্য — ১০০
দুর্গোৎসব — ১৯, ১৪৮
দুর্গোৎসব তত্ত্ব — ১০৪
দুর্জ্জয় দেব — ১৬৮
দুর্ভিক্ষ — ৭২, ১৫১, ১৫২
দুর্য্যোধন — ২৬৮
দুর্ল্লভ চন্তাই — ৫০, ৬১, ২৫৫, ২৬০
দুর্ল্লভনারায়ণ — ৪০, ১৪১, ২৫৬
দুর্ল্লভ মল্লিক — ২৯২, ২৯৩, ২৯৫
দুর্ল্লভ রায় — ৩০৬
দুলালী গ্রাম — ৮৪, ১০৭
দুষ্ট হস্তী — ২২৪, ২২৮
দুষ্মন্ত — ৭৮
দেওয়ান উপাধি — ২৫৮
দেওয়ান নাছির মাহামুদ — ৩১৬
দেওয়ান নুরমাহামুদ — ৩১৬
দেওড়াই — ৫০, ৫১
দেবখড়্গ — ১৮৮, ১৯০, ২৯০
দেবখড়্গের তাম্রশাসন — ১৯০, ২৯০
দেবদারু — ২১
দেবদ্বার — ২৬, ২৮৬, ২৮৭
দেব প্রতিষ্ঠা তত্ত্ব — ৯৪

দেবমাণিক্য — ২৫, ৩৩, ৬০, ৭৭, ৭৮, ৮৭, ৮৯, ৯১, ১০১, ১০৩, ১০৬, ১২৯, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮৪, ২০৩, ২৫০, ২৫১, ২৫৬, ২৬০, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ৩০৭
দেবশক্তি বংশ — ২৭৩
দেবহুতি — ১০৮
দেবতা প্রতিষ্ঠা — ৯৪, ৯৫, ১০১, ১০২, ১০৩, ২৫৭
দেবতামুড়া — ২৮৭, ৩০৯, ৩১০
দেবানন্দ খাঁ — ৩০৬
দেবী ভাগবত — ২৮৯
দেবী পুরাণ — ৩১৫
দেবী যুদ্ধ — ১৫৪
দেবেশ্বর — ২৬৮
দেরাঙ্গ — ২৬১
দৈত্য — ৮১
দৈত্যনারায়ণ — ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৮৬, ৮৮, ১১৯, ১২১, ১৪১, ১৪৪, ১৫১, ১৫৮, ১৬৬, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ৩০৮
দৈবজ্ঞ — ৬১
দোলা — ৪০
দৌচাপাথর (দোয়াপাথর) — ২৯, ১০৫, ২২৯, ২৩০, ২৮৭
দৌল বাড়ী (দেউল বাড়ী) — ২৯০
দ্বাদশ বাঙ্গালা — ২৫, ৭১, ১৩৬
দ্বাদশ ভৌমিক — ১৩১
দ্বারকানাথ ঠাকুর — ২০৮
দ্বারবঙ্গ — ২৮৬
দ্বিজ বংশীদাস — ৮৬, ১৫৪
দ্বিজ বঙ্গচন্দ্র — ১৭৬
দ্বিজ হরিরাম — ৮৬

● ধ

ধনঞ্জয় ঠাকুর — ১১১, ২৭৪
ধনীরাম পাটারী — ২৪০, ২৪১
ধনুর্ব্বাণ — ১২৩, ১২৪
ধন্যমাণিক্য —৬, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২২, ২৩, ২৪, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৬০, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৪, ৯৯, ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১১৬, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৪, ২০৩, ২৩৮, ২৪৬, ২৪৮, ২৫২, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৬, ২৭৫, ২৮০, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০৫, ৩১৩
ধন্যসাগর — ১৫, ১৬, ৫৮, ১০১, ১২২, ১৪৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬৫, ১৬৭, ২৬৫
ধন্বন্তরীনারায়ণ — ৬৩, ২৫৬, ২৬২
ধর্ম্মনগর — ৫৯, ৯৮, ২৮৮
ধর্ম্মপাল — ২৬৯
ধর্ম্মপুর — ৬২, ২৮৮
ধর্ম্মভীরুতার নিদর্শন — ১৮৯
ধর্ম্মমত — ৯১, ১০৩, ১০৬
ধর্ম্মমাণিক্য — ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮১, ৮২, ৮৬, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৩, ১২৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৯, ১৫২, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৮, ১৮৯, ২৫২, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ৩১৬
ধর্ম্মমাণিক্যের তাম্রশাসন — ১৮৯
ধর্ম্মরাজের গীতি — ১৫৪
ধর্ম্ম ও শৌর্য্য — ১৯০
ধর্ম্মসাগর — ৫, ৯২, ৯৪, ১৮৯, ২৫২, ২৫৭, ২৬০
ধলেশ্বরী নদী — ১৩০, ২৬৯, ৩০২
ধাত্রী — ৭, ১৩৯
ধানুকী — ৪৬, ১২৪
ধারিচন্দ্র — ২৯২, ২৯৩
ধুবড়ী — ৩০৪
ধূমাবতী — ৩৪
ধূম্র জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৬
ধ্বজঘাট — ৫৫, ৬০, ১৫৩, ১৬৫, ২৮৮, ২৮৯
ধ্বজ জাতীয় হস্তী — ২২২, ২২৩
ধ্বজনগর — ৬০, ১৫৩, ২৮৮
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন — ৬৩

ধ্বজমাণিক্য — ১৪৯, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৪, ২৮০
ধ্বজ রোপণ — ৫৪, ২৮৮
ধ্যাপক জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৫

● ন

নওগাঁও — ২৬৮, ৩০৪
নন্দিপুরাণ — ২১৯
নবীগঞ্জ — ৩১৩
নবীনকিশোর দেববর্ম্মা — ২৯৯
নব্যভারত (মাসিক) — ১৬৩
নরক — ৪১
নরকাসুর — ২৬৮
নরবলি — ২৪, ২৯, ৩০, ৫১, ১০৪, ১০৫, ১৩০, ১৩৭, ২২৯, ২৫৬, ২৫৭, ২৬১, ২৮৭, ৩১১
নরসিংহ দেব — ১৯১, ২৮৬
নরসিংহ মাণিক্য (ভুলুয়া) — ৩০৯
নলিনীকান্ত ভট্টশালী — ২৬১, ২৯০, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪
নসিরাবাদ — ১৩১, ১৪৫
নাওরা মহাল — ৩০০, ৩১৬
নাগাঙ্গ — ২৬৮
'নাজির' উপাধি — ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ১২০, ১৫০, ২০২, ২৫৮
নাজির খাঁ — ৩০৪
নান্যদেব — ২৮৫
'নারায়ণ' উপাধি — ৪৫, ৫৩, ৬৩, ১২০, ১২১, ১২২, ১৯৮, ২৫০, ২৫৬
নারায়ণগঞ্জ — ৩১৬
নারায়ণ দেব — ২৬৮
নিগমানন্দ স্বামী — ২৯৬
নিত্যানন্দ প্রভু — ২৯৫
নিধিপতি — ২৭০
নিমি রাজা — ২৮৫
নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী — ২৯০
নির্ভয় নারায়ণ — ৪৫, ১৬০, ১৬১, ১৮০, ২৫৭, ২৭৭
নিশ্চিন্তপুর — ২৯৬
নিঃসত্ত্ব জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৮
নীরাজন — ২৮৮
নীলা — ৩৪
নুর উদ্দীন কাজি — ২৮৩
নৃত্য-গীত শিক্ষা — ২৯
নেজামত বিভাগ — ৩০০
নেপাল রাজা — ২৮৫
নোয়াখালী — ৮৫, ২৩৯, ২৭৬, ২৮২, ৩০৫, ৩১৮
নৌ-বহর — ১১৬, ১১৭, ১২৬, ১৩৫
নৌ-সেনা — ৩১১

● প

পঞ্চখণ্ড — ৫৭, ২৮৮
পঞ্চ গৌড়েশ্বর — ৫৩
পঞ্চদ্রোণা (পাঁচদোণা) — ৫৫, ১০২, ২৮৮, ২৮৯
পঞ্চমুখ শিব — ১১১
পত্র কৌমুদী — ৫২, ৭৫
পদাতিক — ৫৪, ১১৬, ১১৭, ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩৬
পদুনা — ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ — ২৪৯
পদ্মা — ৫২, ৫৫, ১৩০, ১৩১, ১৪৪, ১৫১, ২৮৯, ৩০২, ৩১১
পরশুরাম — ২৬১, ২৮৮
পরশুরাম কুণ্ড — ৩০৪
পরাশর — ২২২
পরাশর সংহিতা — ২১৯, ২২৮, ২৩৭
পরীবস্ত্র — ১৫৩
পর্ত্তুগীজ — ২৭৯, ৩১৩, ৩১৬
পর্ব্বতপুর — ২৭০
পর্ব্বত রায় — ১৬১
পলাশ — ৩১৩
পশুচক্র — ৩৫
পাইক — ৪৯, ৫৮, ৬৭, ৭৬
পাগড়িয়াটিলা — ২৭০
পাঁচালী — ২৯, ৭৪, ৯০, ১৪৩, ১৭০
পাছুড়ি — ১৫৩
পাটারী — ২৩৯

পাটিকারা — ১৩, ১২৫, ১৫০, ২৬১, ২৮৯, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭
পাটিকানগর — ২৯৪
পাঠান — ২৩, ২৫, ২৮, ৩৫, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৫৪, ৭০, ৭১, ১০৩, ১০৫, ১১৭, ১১৮, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৩, ১৫০, ১৫১, ১৫৭, ১৬৬, ২৪৮, ২৫০, ২৫১, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৪, ২৭১, ২৮৬, ২৮৭, ৩০৩
পাঠান সৈন্যের বিপদ — ২৮
পাত্র — ৪
পাদপীঠ লিপি — ২৯০, ২৯১
পান প্রদান — ৬৬, ১৬৮, ১৬৯
পানসী-নৌকা — ১১৭
পাণ্ডু রাজা — ২০৩
পাবনা — ২৮৯
পারিবারিক কথা — ৮৬, ৯১
পার্ব্বতী — ৯
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম — ২৮৩
পালমাই — ২১৫
পালবংশ — ২৭৩, ২৮৯, ২৯১, ৩০২
পাষাণে মূর্ত্তি খোদাই — ২৬
পিকদানী — ২১
পিংসা নগর — ৩১২
পীরোজ খাঁ আন্নি — ৭১, ১৩৪, ২৫৮
পুগান দেশ — ৩১২
পুণ্যবতী — ৩৯, ৮৭, ২৫৮, ৩১৮
পুণ্ডরীক হস্তী — ২২০, ২২১, ২৩৭
পুরশ্চরণ — ৩৪
পুরন্দর সিংহ — ২৬৯
পুরস্কার — ২২
পুরীধাম — ১০২
পুরোহিত — ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩৯, ১৪০
পুষ্পদন্ত হস্তী — ২২০, ২২১, ২৩৭
পুতনা বধ — ১১২
পূর্ণচন্দ্র — ২৯২, ২৯৩
পূর্ব্বকুল — ২০, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৯৭, ২৯৮
পৃথিমপাশা — ৩১৪
পেগু রাজ্য — ৩১২
পোর্টগ্রেণ্ড — ১৩২
প্রকৃতিপুঞ্জের প্রাধান্য — ৪
প্রচণ্ড উজীর — ৪৫, ১১৮, ২৫৮, ২৫৯
প্রচলিত কিম্বদন্তী — ২২৯
প্রতাপনারায়ণ (সেনাপতি) — ৪৫, ২৫৮
প্রতাপনারায়ণ (হেড়ম্বেশ্বর) — ১৬১
প্রতাপমাণিক্য — ৬, ৮৬, ৮৯, ১২৪, ১২৫, ১৩৯, ১৪৯, ১৭৬, ১৮৪, ২৫৭, ২৫৯
প্রতাপ রায় — ১৩, ২৫৮, ৩০০
প্রতাপ সিংহ — ১৬১
প্রত্যঙ্গিরা — ৩৪
প্রত্যাদেশ — ৩০, ৯৫, ২৪০
প্রপারটীয়স্ — ২০৭
প্রভাকরবর্দ্ধন — ২৭৩
প্রভাবতী (রাণী) — ২৯০
প্রমীলা — ১৬১
প্রয়াগ — ৩১০
প্রাক্ জ্যোতিষ — ২৬৭
প্রাকৃতিক উপদ্রব — ১৫১
প্রাচীন রাজমালা — ৮৩, ১৪৭, ১৮০
প্রাচীন সংস্কার — ৪৬
প্রেত চতুর্দ্দশী গান — ৮, ৯, ৯১, ২৬৩

● ফ

ফতে খাঁ — ২৭২
ফরজন্নেসা চৌধুরাণী — ৩১৮
ফরখাবাদ — ২৭২
ফরিদপুর — ১১৭, ২৮৯, ৩০২
ফরিদপুরের ইতিহাস — ৩০৭
ফলমতীশ্বর তীর্থ — ৩১, ৩৩, ১৬৫, ২৯৮
ফার্গুসন সাহেব — ৩০২
ফুরাই — ১৭২
ফুলকুমারী — ১৬
ফেণী মহকুমা — ২৩৯, ২৮২

● ব

বগলা — ৩৪
বগাসারি — ১৩, ১২৫, ১৫০, ১৯০, ২৯৯,
বঙ্গদেশ (বাঙ্গালা) — ১২, ১৩, ২২, ৪৪, ৪৬, ৫৪, ৫৮, ১১৭, ১২৫, ১২৯, ২৬০, ২৬৭, ২৬৯, ২৭১, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১, ২৯৬, ২৯৯ ৩০০
বঙ্গ্‌পাড়া — ২৭৫
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য — ১৫৯
বঙ্গাভিযান — ১১৬, ১১৭, ১২২, ১৩০, ১৫১, ২৬৫, ২৭০
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস — ২৮৮
বঙ্গোপসাগর — ২৮৯, ৩১৩
বড় গোসাঞি — ১৬১, ১৬২
বড় কামতা — ২৯০
বড়ুয়া — ১২, ২১, ৬৩, ১২০, ১৯৮, ২৫৮
বদরপুর — ১০৮
বনবাস দণ্ড — ৪৩, ৮৭, ৮৮, ৯১, ২৫৮, ২৬৫, ৩১৪
বন্দুক — ১১৭, ১২৩, ১২৪
বন্য ঘোটক — ১৫৬, ১৬৪
বন্য হস্তী — ১৫৬
বয়ন শিল্প — ১৫৩, ১৫৪
বয়শেশ্ — ২০৭
বরদাখাত — ১৩, ১০১, ১২৫, ১৫০, ২৫৯, ২৭৭, ৩০০
বরদেশ্বরী বিগ্রহ — ৩০১
বরবক্র (বরাক) নদী — ১০৮, ১১০, ২৭৫, ২৭৭, ২৮৪
বরমচাল — ২৭০
বররুচি — ৫২
বরাহ মিহির — ২২২
বরারোহ জাতীয় হস্তী — ২২৩
বরুয়া পাহাড় — ২৭০
বর্ম্ম — ১২৪
বলদেব — ২৫৫
বলভদ্র — ৩৯
বলরাম রায় — ৩০৬
বলাগমা — ২৬, ২৭, ২৪৬, ২৫৯
বলি — ৮, ৩০, ১০৩, ১০৪
বলিভীম নারায়ণ — ৯৮, ১৬৮, ১৬৯
বলি রাজা — ২৯৯
বল্লাল সেন — ১৮৮, ৩০০
বসন্তরাজ শাকুন — ২১৯
বসরত আলী চৌধুরী — ৩১৮
বসিক — ১৪, ১৫, ১৫৯, ১৬০, ২৭৬
বসুধা দেবী — ২৯৫
বহুবিবাহ — ৪৩, ৬৮, ৮৮, ২৫১, ২৯৪
বাইশ কোদালীয়া — ২৮৯
বাক্‌লান্ড্ সাহেব — ২০৬, ২০৭
বাখরগঞ্জ — ১১৭
বাগ্‌বাদিনা — ৩৪
বাঘাউড়া — ২৯১
বাঘাউড়ার বিষ্ণু মূর্ত্তি — ২৯১
বাঙ্গালী উপনিবেশ — ১৫৩
বাঙ্গালী সৈন্য — ৪৫, ১১৮
বাছার (বাছাল) — ৫৩, ৬২, ২৬৫
বাণা — ৪৪
বাণিজ্য — ১৫৪, ৩১৭
বাণিজ্যতরী — ৩১৭
বাণেশ্বর — ৫, ৮১, ৯২, ২৬০
বাদামী খোজা — ২৪৯
বাংমা — ২৮০
বামবাজু — ৪৩, ৪৭, ২৮৭, ৩০১
বামন হস্তী — ২২০, ২২১, ২৩৭
বায়ুপুরাণ — ১০৯, ১১০, ১১১, ৩০৯
বারণা — ৫১
বারবাঙ্গালা — ২২
বারভূঞা — ১৩৬
বারাণসী — ২, ৩, ৯২, ১৫২, ৩০১
বারাহী বিগ্রহ — ৩০৫
বারাহী তন্ত্র — ১১০, ২৯৮
বালা — ৩৪
বালিশিরা — ৫৯, ২৭০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩
বাল্লাঘাট — ২৮২

বাসলী — ৩৪
বাসব — ১৪৩
বাসুদেব — ১১১
বাসুয়া — ৩৫
বাহাদুর খাঁ — ১৬৮
বিকল জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৫
বিক্রমপুর — ৫৬, ১৩১, ১৮৯, ২৮৯, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪
বিক্রমাদিত্য — ৩০২
বিক্রম সেন — ৩০২
বিখ্যাত বিজয় গ্রন্থ — ৩০৭
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা — ২৫৬
বিচার প্রণালী — ১৫৮
বিজয় — ৩৬, ৩৭
বিজয়কুমার সেন — ২৭৮
বিজয়দুর্ল্লভনারায়ণ — ৬১, ১২১, ২৬০
বিজয় নদী — ৫৭, ১২৮, ৩০৩
বিজয়পুর — ৫৯, ৩০২, ৩০৩
বিজয়মাণিক (জয়ন্তা) — ১৬২, ১৮০
বিজয়মাণিক্য — ৩৯, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭৩, ৭৮, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ১০২, ১০৪, ১০৭, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২২, ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৮, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৪, ১৯১, ২০৩, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৭, ২৭০, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৯, ২৮১, ২৮৪, ২৮৮, ২৮৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩১১, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭
বিজয়মাণিক্যের তাম্রশাসন — ১৯১
বিজয়মাণিক্যের ধাতুশাসন — ১৬২
বিজয় সেন — ১৯০
বিজয়সাগর — ১০২, ৩১১
বিজয়া দশমী — ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯
বিদেহ — ২৮৫
বিদ্যাপতি — ২৮৬
বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিণী — ৩০২
বিনন্দিয়া সৈন্য — ১২১, ১৭২
বিন্ধ্য শৈল — ১০৮
বিপ্রকল্প লতিকা — ৩০২
বিবাদ দর্পণ — ১৫৯
বিমদ জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৫
বিমার — ১০৭
বিরূপ জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৫
বিলনীয়া — ২৩৯, ২৭৬
বিশগাঁও — ১৪৫, ৩০১
বিশালগড় — ২৫, ১২৭, ১৪৫, ১৫৩, ২৮১, ২৮৮, ৩০৩
বিশু — ২
বিশ্বম্ভর সুর — ৩০৫, ৩০৬
বিশ্বাস — ৫২
বিশ্বাস উপাধি — ৫২
বিষম জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৫
বিষলতা — ২৬, ১৩৬, ২৪২, ২৪৩, ২৭৬
বিষ্ণাজুড়ি — ১৩, ১২৫, ২৫০, ৩০৪
বিষ্ণু — ৯, ২০৩, ২১২, ২৬৮
বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর — ২১৯
বিষ্ণুপদ — ১১১
বিহার প্রদেশ — ১৩২
বীরচক্র — ৩৫
বীরচন্দ্রমাণিক্য — ১৭২
বীর জাতীয় হস্তী — ২২২, ২২৩
বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য — ১০৭
বীর ভাব — ৩৫, ১০৩
বীরমর্দ্দননারায়ণ — ৬৬, ২৫৩, ২৬০
বীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য — ২৭২, ২৯৯, ৩১২
বুড়া দীঘি — ৭৩, ২৬৩
বুড়া পর্ব্বতরায় — ১৬১
বুলার সাহেব — ২৯০
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট — ১২৩
বৃটিশ রাজ্য — ২৬৯
বৃন্দাবন দাস — ৮৬

বৃহৎ সংহিতা — ৭০, ২১৯, ২৯৯
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ — ১৮৮
বৃহন্নারদীয় পুরাণ — ২০৪
বৃহন্নীলতন্ত্র — ১০৫
বৃহস্পতি — ১০, ২০৩, ২১২
বৃহস্পতি সংহিতা — ৫০, ২০৩, ২১৯
বেজুরা — ১৩, ১২৫, ১৫০, ৩০৪
বেভিচার — ২১, ৩৭, ৪০, ৬৮, ৮৮
বৈকুণ্ঠচন্দ্র চক্রবর্ত্তী — ২৯০
বৈকুণ্ঠপুর — ৬৪, ৩০৪
বৈদিক কাল — ১৫৪, ২০৩
বৈবাহিক বিবরণ — ৮৬
বৈশ্য জাতীয় হস্তী — ২১৯
বৌদ্ধ তান্ত্রিক — ৩১০
বৌদ্ধ ধর্ম্ম — ২৯১
বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজক — ৩১০
বৌদ্ধ বিহার — ৩০২
বৌদ্ধমত — ১৯০
ব্যাস — ২০৩, ২১২
ব্যাসকুণ্ড — ২৯৯
ব্রজযোগিনী — ৩০২
ব্রহ্মকুণ্ড — ১০৬, ২৬১
ব্রহ্মচর্য্য — ২০৫, ২০৭
ব্রহ্মদেশ — ১২৬, ২২৯, ২৩৭, ২৬৯, ২৯৭
ব্রহ্মপুত্র — ৫৪, ৫৫, ১০২, ১৩০, ১৩১, ১৬৫, ২৬১, ২৬৭, ২৭৭, ২৮৩, ২৮৭, ২৯৯, ৩০৪, ৩১১, ২১৫, ৩১৭
ব্রহ্মপুত্র বংশ — ২৬৮
ব্রহ্মপুরাণ — ১৮৮, ২০৫, ২১৯
ব্রহ্মবধ — ৩৮
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ — ২৮১, ২৮৯
ব্রহ্মা — ৩২
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ — ২৮৯, ৩১৩
ব্রাহ্মণ জাতীয় হস্তী — ২২০

● ভ

ভগদত্ত — ২৬৮
ভগবতী — ৩০
ভজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী — ৩১৮
ভট্ট (ভোট্য) — ৫৫, ৫৬
ভদ্র হস্তী — ২২২
ভব সিংহ — ২৮৫, ২৮৬
ভবানী দাস — ২৬১, ২৯৩, ২৯৭
ভবিষ্য পুরাণ — ১১৪, ২০৪, ২৮৫
ভরত — ৭৮
ভাঙ্গিল ফা — ৭১, ১২১, ১২৩, ২৫০, ২৬১
ভাটী প্রদেশ — ১১৭, ১২১
ভাটেরার তাম্রশাসন — ১৯১, ৩১৫
ভানু গাছ — ১৩, ১২৫, ১৫০, ২৭০, ৩০৫
ভানুনারায়ণ — ৫৭, ২৬১, ২৭০
ভারতবর্ষ — ৭৮, ১৫৪, ২০৮
ভার্গব — ৮, ২৬১
ভালী জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৭
ভাস্কর বর্মা — ২৬৮
ভাস্কর শিল্প — ৩১০
ভিন্ সেজো — ২০৭
ভিল জাতি — ২৪৮
ভীম জাতীয় হস্তী — ২২২, ২২৩
ভীম সেন — ১৬১
ভুবনেশ্বর তীর্থ — ১১২
ভুবনেশ্বরী বিগ্রহ — ২৯, ৩৪, ৯৪, ১০৩
ভুলুয়া — ৩৩, ৮৩, ১২৯, ১৫০, ৩০৫, ৩০৬
ভূ-কৈলাস — ২৮৯
ভূমিকম্প — ৩৯, ১১১, ১৫১
ভূমিদান — ৫, ১৬, ৩৯, ৫৪, ৮৭, ৯২, ৯৩, ১০২, ১৭৫, ১৮১, ১৮৫, ১৯১, ২৫২, ২৫৮, ২৬০, ২৯৯
ভূমি পরিমাপ — ৯২
ভূষণা — ৪১, ১৪১, ১৫৭, ৩০৭, ৩০৮
ভূষণা দুর্গ — ৩০৮
ভৃগুরাম — ৫৪, ২৬১
ভৃগুরাম রায় — ৮২
ভেট — ২০, ২১
ভেস্ত — ৫১
ভৈরব লিঙ্গ — ১০১, ১০৩

ভৈরবী — ৩৪
ভৈরবী চক্র — ৩৫
ভোজবর্ম্মা দেব — ১৮৮
ভোজরাজ — ২২২, ২২৮

● ম

মক্‌না হস্তী — ২১৮
মগদ — ৬৫
মঘ — ৩৫, ৯৫, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৪৭, ১৫০, ১৯৩, ২১৫, ২৪৮, ৩১৬
মঘের উপদ্রব — ৩১২
মজঃফর শাহ — ২৬৬
মৎস্য পুরাণ — ১০, ১১, ৬৯, ৭২, ২৯৯
মণিপুরী — ১৫৩, ১৫৬
মণ্ডল — ২৭৬
মণ্ডলী জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৬
মণ্ডলেশ্বর — ২৭৬
মদনগঞ্জ — ২৬৯, ৩১৩
মনসামঙ্গল — ৮৬
মনুকুল — ২৭০
মনু নদী — ৩১, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৪, ২৭৪, ৩০৯
মনুমুখ — ৩০৯
মন্দ্র হস্তী — ২২২
মন্বন্তর — ৩৩, ৬৪, ১১০
মমারক খাঁ — ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ১০৫, ১২৪, ১২৯, ১৩০, ১৩৭, ১৩৮, ২৫৩, ২৫৬, ২৬০, ৩১১
ময়নামতী — ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬
ময়নামতীর কোট — ২৯৩
ময়নামতীর গান — ১৬৬, ২৬১, ২৯৩, ২৯৪
ময়নামতী পাহাড় — ২৮৯, ২৯৫
ময়মনসিংহ — ৩০৪, ৩১১
ময়ূরধ্বজ — ২৫৩
মরকোষ নৌকা — ১১৮
মল্লবিদ্যা — ১০, ১১, ১২, ৬৫, ৭৬, ৯০, ১৬৮, ২৫৩, ২৬৩
মসলিন — ৩১৭
মহম্মদ খাঁ — ৪৬, ১২৯, ২১৬
মহলদ্বার — ৫০, ৬৩, ৬৭
মহর্ষি মনু — ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৫
মহাচক্র — ৩৫
মহা দুর্গা — ৩৪
মহাপীঠ — ১০৬
মহাবিদ্যা — ১০, ১১, ১২, ৩৪, ৬৫, ৭৬, ৯০, ১৬৮, ২৫৩, ২৬৩
মহাবিষুব — ৫, ৯২
মহাবৃক্ষ ঋষি — ২৭৩
মহাভয় জাতীয় হস্তী — ২২৫, ২২৬
মহাভারত — ১০, ৮৬, ৯০, ১৬১, ২০৩, ২০৪
মহামাণিক্য — ১, ৩, ৫, ৮০, ৯২, ৯৩, ১৩৮, ২৫৭, ২৬২
মহামারী — ৭২, ১৫১, ১৫২
মহামুন্সী — ৬৩
মহারাজোয়াং — ২৯৭
মহারাণী (গ্রাম) — ৩১৪
মহাশিল — ৩৭
মহিলা মাহাত্ম্য — ৮৮, ১৬৯, ২৫৫
মহীপাল — ২৯১
মহীরঙ্গ — ২৬৮
মহেশনারায়ণ রায় — ৩০০
মহেশ্বরদী — ১০২, ২৮৮
মাইবঙ্‌ — ১৬১
মাছিছড়া — ২৬, ২৮৭, ৩০৯, ৩১০
মাছি ছা — ২৭, ২৮৭, ৩০৯, ৩১০
মাঝ গোসাঞি — ১৬১
মাণিক গাঙ্গুলী — ৮৬
মাণিকচন্দ্র — ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭
'মাণিক্য' উপাধি — ৩০৬
মাতঙ্গী — ৩৪
মাদ্রি — ২০৩
মাধব — ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ১৪১, ১৫৭, ১৬৬, ২৫৬, ২৫৮, ২৬২, ২৬৫, ৩০৮
মাধবতলা — ৪০, ৩১০
মাধবাচার্য্য — ৫৩, ৮৬

মার্কোপলো — ২০৭
মার্ব্বিল — ২০, ৩১০
মিত্র — ৪
মিথি রাজা — ২৮৫
মিথিলা — ৩৪, ৩৭, ৮৯, ১০৩, ১১৯, ১৪১, ১৭৯, ২৫১, ২৫৬, ২৬৪, ২৮৫, ২৮৬
মিয়ানা হস্তী — ২১৮
মিয়ানী হস্তী — ২১৮
মির্জা মহম্মদ ইব্রাহিম — ৩০০
মির্জা-হোশন আলী — ৩০০
মিশ্র জাতীয় হস্তী — ২২২
মিসমি জাতি — ৩০৪
মীর জুমলা — ২৬৯
মুকুন্দ (উড়িষ্যা রাজ) — ৬১, ২৬২
মুকুন্দরাম রায় — ৮২
মুক্তিশীলা — ৬৪
মুড়াপাড়া — ৩১৩
মুনায়েম খাঁ — ২৫৫
'মুন্সী' উপাধি — ২৫৮
মুরছুম জাতি — ২৭৯
মুরশিদাবাদ — ৩০৮
মূষলী হস্তী — ২২৪, ২২৭
মৃগ জাতীয় হস্তী — ২২২
মেওরে বয়রা — ৩১২
মেকেঞ্জি সাহেব — ১৪০, ২৬৪
মেঘ্না নদী — ১১৪, ১১৭, ১৩০, ১৩১, ২৮৯, ২৯০, ৩০২, ৩০৪, ৩১২
মেঙ্ বিলু — ৩১২
মেলা — ১১১
মেলাগড় — ১৭০, ২৭৮
মেহেরকুল — ১৩, ২২, ৪৫, ৭১, ৭৩, ১২৫, ১২৬, ১৩৫, ১৪৫, ১৫০, ১৬৬, ২৫৯, ২৬১, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ৩১০
মৈছিলী (মছ্লু) — ১০৪
মৈথিল যোদ্ধা — ৩৭, ১১৯, ১৪১
মোগল — ২২, ৪৭, ৫৪, ১১৭, ১২১, ১২৪, ১২৬, ১৩০, ১৩৩, ১৫১, ২৫৫, ৩০৩, ৩১৫
মোহর (মুদ্রা) — ৩৩, ১২৬, ১৭৭, ১৮১, ১৮৩, ২৮৮
মৌলবীবাজার — ২৮১

● য

যজ্ঞ — ১৮৯, ২৭৪, ২৮৮, ৩১৪
যদুনন্দন দাস — ৮৬
যমুনা — ৫৫, ১৩১, ১৫১, ২৮৯, ৩১০, ৩১১
যশপুর — ২৫, ৫৯, ৩১১
যশোধর শর্ম্মা — ১৮৯
যশোহর — ১১৭
যক্ষ — ৩৬
যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা — ১৮৫
যাত্রাপুর — ৫২, ৫৫, ১৩১, ৩১১
যাত্রারত্নাকর নিধি — ২৯, ৯১
যাদু বৈদ্য — ৬৩, ৬৪, ২৫৬, ২৬২
যাবাদ্বীপ — ৩১৭
যুক্তি কল্পতরু — ২৯১, ২২২
যুঝার ফা — ২৭১
যুঝার সিংহ — ১২১
যুদ্ধ কৌশল — ১৯, ২৭, ৪৮, ১২৬, ১৩৫, ১৩৬, ২৪৮
যুদ্ধযান — ১২৪
যুদ্ধাস্ত্র — ৪৭, ৪৮, ৫৮, ১২৩
যুধিষ্ঠির — ১৬১, ২৫৫
'যুবরাজ' উপাধি — ৯৮, ১৬৮
যোগবাশিষ্ট রামায়ণ — ২৯৯
যোগিনী তন্ত্র — ১০৯, ২৬৭, ৩০৯
যোগিনী হৃদয় — ৩৪
যোধপুর — ২০৮

● র

রঘুনাথ ছোটরা — ২৬২
রঘুবংশ — ২৯৯
রঙ্গপুর — ২৬৭, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ৩০৪
রণচতুর নারায়ণ — ১, ৩৩, ৬৯, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮২, ১২১, ২৬২, ২৬৪
রণতরী — ৫৪, ১১৭, ১৩০

রণাগণনারায়ণ (রঙ্গনারায়ণ) — ৬৯, ৭৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৯০, ৯১, ৯৯, ১০০, ১১৮, ১১৯, ১২১, ১২৩, ১৩৩, ১৪৩, ১৫১, ১৬৭, ২৫০, ২৫১, ২৫৪, ২৬৩, ২৬৫
রত্নপুর — ৩১, ৫০, ৩১১, ৩১২
রত্নমঞ্জরী মহাদেবী — ২৯৯
রত্নমাণিক্য — ১৫৭, ১৬২, ১৬৮, ২৮৩
রমা জাতীয় হস্তী — ২২২, ২২৩
রসাঙ্গ — ২৪, ১২২, ১২৬, ২৬৩, ২৬৬, ৩১৩
রসাঙ্গমর্দ্দননারায়ণ — ২৪, ৩০, ৭৭, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৬, ২৬৩, ২৬৬, ৩১৩
রাইমা নদী — ১১৫, ২৭৭
রাঙ্খল কুকি — ২৭৭
রাঙ্গরঙ্গ — ২০, ৩১৩
রাঙ্গামাটী — ৩, ৬, ২৩, ২৪, ২৫, ৪৬, ৫৯, ৬৮, ১২৭, ১৩১, ১৩৫, ১৪৯, ২৫১, ২৫৪, ২৬২, ২৭১, ২৮৭, ৩১৩
রাজকর — ১৪৯, ১৬৪
রাজকরের বিনিময়ে কার্য্য সম্পাদন — ১৬৪
রাজগণের কাল নির্ণয় — ১৭৪
রাজচক্র — ৩৫
রাজটিকা — ৩০৬
রাজদণ্ড (দণ্ডবিধি) — ১৪, ৩২, ৪৩, ৬৮, ১২৫, ১৫৮, ২৮৩
রাজদুর্ল্লভনারায়ণ (রাজবল্লভ) — ১২১, ২৬৩, ২৬৫
রাজধর দেব — ৮৪, ১০৭, ১২১, ৩১৫
রাজধানীর অবস্থা — ১৪৯
রাজনগর — ২৭০
রাজ নির্ঘণ্ট — ২১৯
রাজনীতি — ১০
রাজপণ্ডিত — ৯২
রাজপুরোহিত — ৯২
রাজবল্লভনারায়ণ — ৭৬, ৭৭, ৯০, ১২১
রাজবল্লব রায় — ৩০৬
রাজবল্লব সেন — ১৩১, ২৮৯, ৩০৩
রাজভক্ত — ১৬৩
রাজভট্ট — ২৯০
রাজমাণিক্য (ভুলুয়া) — ৩০৬
রাজমালা — ৬, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৫, ১০০, ১০৩, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১৩, ১১৪, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১২৮, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৬০, ১৬৬, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮৩, ১৮৫, ২০৩, ২১৫, ২৩৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫৬, ২৫৮, ২৬০, ২৬২, ২৬৯, ২৭৬, ২৮২, ৩০৩
রাজযোগ — ৬১, ৭২
রাজাজ্ঞা — ১৭৩
রাজা নবকৃষ্ণ — ২৭৭
রাজা বধ — ১০, ৩৬, ৩৮, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ১২৫, ১৩৮, ১৪১, ১৫৬, ১৭০, ১৭৯, ২৫৪, ২৫৬, ২৫৯, ২৬০
রাজাবলী — ২, ৩৯
রাজাবাড়ীর মঠ — ১৩১, ৩০৩
রাজা বাবু — ৮২, ৮৩, ৮৪, ১৮০
রাজা রামগতি — ১৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১
রাজার দেউড়ী — ৮২
রাজার যুদ্ধযাত্রা — ২২, ২৪, ৩৩, ৪৫, ৫৪, ১৩৪
রাজেন্দ্র চোল — ২৯৭
রাজ্য বিস্তার — ১৫০
রাজ্যের অবস্থা — ১৪৯
রাজ্যের বিশেষত্ব — ১৫৫
রাণীকুণ্ড — ১১৫, ১১৬
রাধাকান্ত ঠাকুর — ২৩৯, ২৪০
রাধাকিশোরপুর — ২৭২, ৩১২
রাধাকিশোরমাণিক্য — ১০১, ১০৭, ১১১, ২৯৯
রাধাগোবিন্দ বসাক — ২৯০, ২৯১, ২৯২
রাবণ — ১৯০
রাবণ মূর্ত্তি — ১১১
রাম-কবি — ৯, ২৬৩
রামকলা — ২৭৪
রামকোট — ৩১৩
রামগঙ্গামাণিক্য — ৩০১
রামটেক — ৩১৩

রামদাস — ৭৮, ২৫০, ২৬৪
রামপাল — ৩০৩
রামপাল লিপি — ২৯২
রামপুর — ২৯০
রামমাণিক্য — ৯৮, ৯৯, ১০০
রামমোহন রায় — ২০৮
রাম রাবণের যুদ্ধ — ১১২, ১৫৪
রামরী — ৩১২
রাম ও লক্ষ্মণ মূর্ত্তি — ১১১
রামহরি বিশ্বাস — ৩০১
রামক্ষেত্র —৩১৩
রামাবতী — ৩১২
রাময়ণ — ২৬৩, ২৬৮, ২৭২, ২৭৩
রাম্বু — ২৪, ১২২, ১৩১, ১৩২, ২৬১, ২৮০, ৩১৩
'রায়' উপাধি — ১৫৭
রায় কছম — ২২, ২৪, ১২৬, ১৩৭, ১৫৭, ২৬৪
রায়কাচাগ — ১৪, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪৫, ১৫৭, ২৬৪, ২৮০, ৩১০
রায়বার — ২৪
রালফ্ ফিছ্ — ১৩১, ১৩২, ৩১৭
রাষ্ট্রহা জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৭
রাসলীলা — ১৫৪
রাক্ষস মূর্ত্তি — ১১১
রাক্ষিয়াং — ১৩১, ১৩২
রিয়া (কাঁচলি) — ১৫৩, ১৫৪
রিয়াং — ১৫৭, ২৫২, ২৫৪, ২৬৪, ৩১০
রুকুন উদ্দীন — ৩১১
রুদ্র যামল — ৩৫
রুফণী নদী — ২৯৭
রূপরাম (কবি) — ১৫৪
রেঙ্কিণ সাহেব — ২৯২
রেঙ্গুন — ৩১৩
রেনেল সাহেব — ২৬৯
রেশমের কারখানা — ১৫৪, ১৬৪
রোম — ২০৭
রোশনাবাদ — ৭৫, ২৮৩

● ল

লংতরাই পর্ব্বত — ১১৫, ২৭৭
লংলাই কুকি — ৩১৪
লঙ্ সাহেব — ৮৩, ৮৪, ৯৪, ১০৪, ১১৭, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৬, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৮১, ১৮২, ১৮৩
লঙ্কা বিজয় — ১৫৩
লঙ্গ্লা — ১৩, ৫৯, ১২৫, ১৫০, ৩১৪, ৩১৫
লঙ্গাই উপত্যকা — ২৭৭
লছিমা দেবী — ২৮৬
লবণের খনি — ১৫৫
লম্বক দ্বীপ — ২০৭
লস্কর — ১৩, ২১, ৪১, ১২৪, ১৪১, ১৫৭, ১৫৮, ৩০৮
লক্ষ্যা — ৫৫, ১৩০, ১৩১, ২৬৭, ৩০৪, ৩১৩
লক্ষ্মণমাণিক্য (ভুলুয়া) — ৩০৬, ৩০৭
লক্ষ্মণমাণিক্য — ৩১৭
লক্ষ্মণ সেন — ১৮৮, ১৯১, ১৯২
লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসন — ১৮৯
লক্ষ্মীনারায়ণ — ৩৪, ৩৭, ৪০, ৮৯, ১০১, ১০৩, ১০৬, ১১৯, ১৪১, ১৭৯, ২৫১, ২৫৬, ২৬০, ২৬৪
লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র — ১০১, ১০৩
লক্ষ্মনারায়ণের মন্দির — ৩১১
লক্ষ্মীপতি — ৩১৪
লক্ষ্মীপুর — ৪৩, ৮৮, ৩১৪
লক্ষ্মী মহাদেবী (লক্ষ্মীবালা) — ৪২, ৪৩, ৮৭, ৮৮, ২৫৮, ২৬৪, ৩১৪
লক্ষ্মী মূর্ত্তি — ১১১
লাউর — ৩১৫
লাখাই নৌকা — ১১৮
লামপাড়া — ৭৫, ২৮৬
লায়েল সাহেব — ২০৯
লালময়ী (লালমতী) — ২৯৫, ২৯৬
লালমাই পাহাড় — ২৯৬
লিকা — ৫১, ২৭১
লিডন্ — ১৩৭
লুণ্ঠন —১২, ১৫, ১৯, ৪৯, ৫৮, ১৩০, ১৩৪, ১৪৮

লুসাই জাতি — ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ৩১৩
লুসাই পর্ব্বত — ২৭৫, ২৮০
লেট্যামেঙ্ — ৩১২
লোকতর ফা — ৮৮, ১০৩, ২৬৫
লোকনাথ — ২৯০
লোকনাথের তাম্রশাসন — ২৮৯
লোচন দাস — ৮৬
লোহিতা — ৫৪, ৫৫, ১৩১, ১৫১, ৩১৫
লৌহখনি — ১৫৫
লৌহপিঞ্জর — ৪৯, ৫০, ১৩৭

● শ

শকুন্তলা — ৭৮
শক্তিসঙ্গম তন্ত্র — ২৯৯, ৩১৩
শত্রু দমন — ১৬০, ১৬১
শত্রু বলি — ১০৫
শম্ভুনাথের মন্দির — ২৯৯
শ্মশান সাধন — ৩৫, ১০১, ১০৩, ২৬৪
শহরী পরগনা — ২৬৮
শাকদ্বীপ — ২০৭
শান বংশ — ৩১২
শারদীয় পূজা — ১৪৮
শালগ্রাম — ৬৩
শাসন যতন্ত্র — ১৫৭
শাসনপ্রণালী — ১৫৭
শাসনবাক্য — ১৬৩
শাস্ত্রীয় বাক্যের প্রতি বিশ্বাস — ১৮৮
শাহআলম — ৩১৮
শাহজালাল — ২৮৩
শাহজাহান — ১২৪
শিকার — ৫৮, ২৭৯
শিব — ৯, ৩১
শিবলিঙ্গ — ৩১
শিব সিংহ (রাজা) — ২৮৬
শিবা — ৭০, ১৩৩
শিবের বিহার — ২১
শিমরাওন গড় — ২৮৫
শিলাদিত্য — ২৭৩
শিলালিপি — ৩১, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১২৮, ১৭৭, ১৯২, ২৮৫
শিল্প চর্চ্চা — ৮৮, ১৫৩, ১৫৪, ২৮৭, ২৮৮, ৩১৭
শিক্ষা — ৮৯
শীতল পাটী — ৩০৮
শীতলা (বসন্ত রোগ) — ৩, ৬, ৩৩, ৬৩, ১৫২, ১৮০, ২৬০, ২৬২
শুক্র — ১০
শুক্র নীতি — ১০
শুক্রেশ্বর — ৮১, ২৬০
শূদ্র জাতীয় হস্তী — ২১৯
শুদ্ধ হস্তী — ২১৯
শুদ্ধিতত্ত্ব — ২০৪, ২১৯
শুভরায় — ২৪৩
শূর বংশ — ২৮৯
শূর জাতীয় হস্তী — ২১৯, ২২২, ২২৩
শূল — ৩৮, ১২৪, ১৫৮, ১৬৫
শেরশাহ — ২৫১
শৈলবাসিনী — ৩৪
শোভাবাজার — ২৭৭
শ্যামগ্রাম — ৩০০, ৩০১
শ্যামদেশ — ২৩৭
শ্যামল বর্ম্মা — ১৮৮, ১৮৯
শ্যামল বর্ম্মার তাম্রশাসন — ১৮৯
শ্রীকর নন্দী — ১২৮
শ্রীচন্দ্র দেব — ৬১, ৯৩, ১৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬
শ্রীমদ্ভাগবত — ৮, ১০৮
শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা — ১০৮
শ্রীশ্রীযুতের কৈলাসহর ভ্রমণ — ১১২
শ্রীরামচন্দ্র — ১৫৩, ১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০
শ্রীরামচন্দ্রের তাম্রশাসন — ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭
শ্রীহট্ট — ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫৭, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৪৪, ১৫০, ১৬০, ২৪৯, ২৬১, ২৬৫, ২৭০, ২৭১, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৮, ২৯৪, ৩০১, ৩০৪, ৩০৫, ৩১৪, ৩১৫
শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত — ১৬১, ১৬২, ২৮৮, ৩০১

শ্রেণীমালা — ৮৭, ১৭৮, ২৫৮
শ্বিত্রী জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৬
শ্বেত হস্তী — ১৭, ১২৫, ২১৫, ২২৯, ২৩০, ২৩৭, ২৩৮, ২৮৮
শ্বেতাশ্বতর — ১০৮

● ষ

ষোড়শ দান — ১৬
ষোড়শী — ৩৪
ষ্টুয়ার্ট সাহেব — ৩০৮

● স

সংখলং পর্ব্বত — ৩০৯
সংস্কৃত রাজমালা — ৯২, ১০৯, ১১৩, ৩১৬
সগর — ১৮৫
সগরদ্বীপ — ১০৮
সগর বংশ — ১০৮
সঙ্গীত চর্চ্চা — ৮৯, ৯০, ২৫৭
সঞ্চয় জাতীয় হস্তী — ২২২
সতর খণ্ডল — ২৮৩, ৩১৫
সতীদাহ (সহমরণ) — ৩৩, ৩৬, ৬৪, ৬৭, ৯১, ১০৬, ১৬৯, ২০৩, ২০৬, ২০৭, ২০৮
সতীর লক্ষণ — ২০৪
সত্য নিবন্ধ — ৭, ২০, ২১, ৪১, ৪৯, ৬৩, ১০৬, ১৩৯, ১৬২
সমতট — ২৯০, ২৯১, ৩০২
সমরজিৎ নারায়ণ — ৭৫, ১২১, ২৬৫
সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মণ — ২৯১
সমসের গাজি — ২৮২, ৩১৭
সমাজ তত্ত্ব — ১৬৫
সমুদ্র — ৩৩, ১২৯, ১৫০
সরঙ্গা নৌকা — ১১৮
সরদার — ১২, ১৬, ১২০, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৯৭
সরবন্দ — ৩১৭
সরস্বতী নদী — ৫৫, ১৩১, ১৫১
সরাইল — ২৫, ১২৭, ২৮৩, ৩০০, ৩১৫, ৩১৬
সর্পের ফণা — ২
সর্ব্বতোভদ্র হস্তী — ২২২
সহমরণ পদ্ধতি — ২০৫
সাইস্তা খাঁ — ৩১১, ৩১৬
সাখাচেপ — ১৬২
সাঙ্কেতিক চিহ্ন — ৪২, ১৭০, ১৭১
সাঙ্খ্য দর্শন — ১০৮
সাগরসঙ্গম — ১০৮
সাতইর — ৩০৮
সাতগাঁও — ১৩১, ২৭০, ৩০১, ৩০২
সাতডম্বুর — ১১৬
সাততালা — ১১৬
সাদিয়া — ৩০৪
সাভার — ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫
সাভারমুড়া গড় — ৩১৭
সামরিকবল ও সমর — ১১৬
সার্ব্বভৌম জাতীয় হস্তী — ২২০, ২২১, ২৩৭
সাহসনারায়ণ — ৭৬, ১২৩, ২৬৫
সাহিত্য চর্চ্চা — ৮৯
সাহিত্য পত্রিকা (মাসিক) — ৯৩
সাহিত্য সেবা — ৯০
সাহেবগঞ্জ — ২৬৯
সিংহাসন — ১, ৪, ৮, ১৪, ২২, ৩৯, ৮১, ৮৩, ১২৪, ১২৫, ১৩০, ১৩২, ১৩৮, ১৪৩, ১৫১, ১৫৯, ১৭০, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮৩, ২৫৫, ২৬৪, ২৬৫, ২৮০
সিণ্টেঙ্ — ১৬১
সিদ্ধিবিদ্যা — ৩৪
সিদ্ধেশ্বর শিব — ১০৮, ১১৪
সিসিরো — ২০৭
সীতা — ১৫৩
সীতাকুণ্ড — ২৯৮, ২৯৯
সীতারাম রায় — ৩০৭, ৩০৮
সীবনশিল্প — ১৫৪
সুন্দর জাতীয় হস্তী — ২২২
সুন্দরবন — ৩১৩
সুপ্রতিক জাতীয় হস্তী — ২২০, ২২২, ২৩৭
সুবরাই — ১১৩, ১১৪, ৩১৬
সুবড়াই খুঙ্গ — ২০, ৩১৬
সুবর্ণ কুষ্মাণ্ড — ৪৯, ৫০, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭

সুবর্ণ খনি — ২৫, ১২৭, ৩০০, ৩১৫, ৩১৬
সুবর্ণচন্দ্র — ২৯২, ২৯৩
সুবর্ণগ্রাম (সোণারগাঁও) — ৪৪, ৫৬, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৫১, ২৮৮, ৩০৪, ৩০৫, ৩১৬, ৩১৭
সুবর্ণদ্বার — ৫০
সুবা — ২৫৮
সুবিদ নারায়ণ — ২৭০
সুভদ্রা — ৩৯
সুমিত্রা জগদীশ্বরী — ১০০
সুরা কাণা — ২৩৯
সুরার প্রভাব — ১৭, ১৮, ১৯, ৩২, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৪৯, ৭৪, ১৪৯, ১৫৫, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ২৬৬
সুরার মূল্য — ১৬৭
সুর্ম্মা নদী — ২৭৭
সুলতান সুলেমান — ৪৬, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৫০, ২৫৫, ৩১১
সুসঙ্গ — ১৪৫
সূতা কাটা — ১৫৪
সূর্য্যখাড়াইত — ৫৮, ২৬৫
সূর্য্যদাস — ২৯৫
সূর্য্য মূর্ত্তি — ১১১
সেক শুভোদয় — ১৮৯
সেণ্ডিস্ সাহেব — ৮৩, ৮৪, ১৩২, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৮১, ১৮২, ১৮৩
সেন বংশীয় রাজা — ২৯৭
‘সেনা’ উপাধি — ১৯৪
সেনাপতি — ১৯৫
সেনাপতির উচ্ছৃঙ্খলতা — ১৩৮, ১৫৬
সেনাপতির দণ্ড — ৪৭, ১৩০, ১৩৭
সেনাপতির পুরস্কার — ১৩৭
সেনাপতিগণের প্রাধান্য — ৪, ৬, ৭, ১০, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৬৫, ৬৭, ৭৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৩
সেনাপতি বধ — ১২, ৩৫, ৪২, ৫১, ৭৫, ৮৯, ১০৬, ১৩০, ১৪০, ১৪৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৬, ২৫৬
সোণাই নদী — ৫৯
সোণার ভাটা — ১৬৬
সোণামুড়া — ২৩, ১৭০, ২৭৩, ২৭৭, ২৭৮, ৩১৭
সৈনিকদল গঠন — ১১৬
সৈনিকের উপাধি — ১৯৪
সৈনিকের দণ্ড — ১৮, ৪৭, ১৩৭
সৈনিকের ভোজ — ১৬, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৮
সৈয়দ আব্বাছ — ৩০৪
সৈয়দ মিকায়েল্ — ৩০৪
স্যার হ্যালিডে — ২০৬, ২০৭
স্কন্দ পুরাণ — ১৮৫, ৩০৪
স্ত্রীবধ — ৩৮
স্ত্রীশিক্ষা — ৭৩, ৯০, ১৪৩, ১৭০
স্থির জাতীয় হস্তী — ২২২
স্নানঘাট — ২৮৪
স্বধর্ম্ম পা — ২৭০

● হ

হজরৎ মহম্মদ — ২৬৬
হতাবর্ত্ত জাতীয় হস্তী — ২২৪, ২২৬
হনুমান মূর্ত্তি — ১১১
হয়বৎ মহম্মদ খাঁ — ৩০০
হরগৌরী — ৫৯, ১১১, ২১৯
হরিদ্বার — ১০৮
হরিবংশ — ৬৩, ৭৩
হরিবর্ম্ম দেব — ১৮৮
হরিমণি যুবরাজ — ১৬৯
হরিরায় — ২৫৫
হরিশ্চন্দ্র — ২৯৩
হর্ষবর্দ্ধন — ২৭৩
হলায়ুধ মিশ্র — ১৮৯
হসম — ৯, ১৪৭
হসম ভোজন — ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯
হস্তী — ৪৪, ১৫৬, ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৬৮, ২১৫
হস্তী খেদা — ১২৩, ১৫৬, ১৬৪, ২৭৪
হস্তীর পরমায়ু — ২২৮
হস্তী বিজ্ঞান — ২১৫, ২৩৭
হস্তীর শ্রেণীবিভাগ — ২১৯

হাকুথুম্ — ১৪৮
হাজরা — ৭৭, ৭৮, ১২০, ২৫৮, ২৬৫, ২৬৬
হাজারী — ১২, ১২০, ১৯৮
হাজি খাঁ — ২৭১
হাজিগঞ্জ — ৩১৩
হাণ্টার সাহেব — ৩০৫
হাড়ি সৈন্য — ৪৪, ৪৫, ১১৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ২৫৭
হারীত — ২০৩, ২১২
হালাম — ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৬২, ২৮০
হালিয়াকান্দি — ৯৯
হিউয়েন্ সিয়াং (হিয়েন সাঙ্) — ২৬৮, ২৭৩, ৩১৫
হিঙ্গলা ছড়া — ২৭৭, ২৮০
হিমতি — ২৭১
হিমালয় — ৩০৪
হিরা গোপীনাথ বিগ্রহ — ৬০, ১০২, ১৮১
হিরাপুর — ৩৭, ৪৩, ৬০, ৭৬, ৮৭, ৮৮, ১০২, ১৪১, ৩১৮
হিলাল গাজি — ২৪১, ২৪২
হীরাবতী — ৮৮
হীরাবন্ত — ২৯৭
হুগলী — ২০৬
হুগলী নদী — ১১৭
হুমায়ূন — ২৪৯
হেড়ম্ব — ১৭, ৪৫, ২৫৭, ৩১৮
হেড়ম্ব রাজ্য — ১৫৮, ১৬০, ২৭৬
হেড়ম্বের দণ্ডবিধি — ১৫৮
হেড়ম্বেশ্বর — ১৬০, ১৬২, ২৭৭
হেমকুমার চৌধুরী — ১০৭
হেমচন্দ্র — ২২২
হেরোদোডস্ — ২০৭
হৈতন খাঁ — ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ১২৭, ১৩৬, ১৩৭, ২৪২, ২৪৬, ২৫২, ২৫৩, ২৫৯, ২৬৬, ২৭৫, ২৮৬, ২৮৭, ৩০৯, ৩১৩, ৩১৫
হেলিম উদ্দীন — ২৮৩
হোপাকলাউ — ৩১, ৩২, ১৫৫, ১৬৫, ২৬৬
হোসেন শাহ — ২২, ২৪, ২৭, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৩৬, ১৫০, ২৪৮, ২৫২, ২৫৪, ২৫৭, ২৬৬, ২৭৫

● ক্ষ

ক্ষত্রিয় জাতীয় হস্তী — ২১৯
ক্ষীণ জাতীয় হস্তী — ২২৪

রাজমালা প্রথম লহর সম্বন্ধীয় কতিপয় অভিমত

আনন্দবাজার পত্রিকা

২৪শে শ্রাবণ — ১৩৩৫

শ্রীরাজমালা — (ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত) প্রথম লহর, পণ্ডিতপ্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর বিরচিত। শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

প্রথমেই গ্রন্থের প্রচ্ছদপট, কাগজ, ছাপা, বাঁধাইয়ের প্রশংসা করিতে হয়। এমন সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই বই বাঙ্গালা ভাষায় খুব কমই আছে। ত্রিপুরার রাজ-সরকারের ব্যয়ে রাজবাটী হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ যেমন সুদৃশ্য ও সুমুদ্রিত হওয়া উচিত, তেমনই হইয়াছে। কতকগুলি দুর্ল্লভ ও প্রাচীন চিত্র এবং মানচিত্র প্রভৃতিও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সেকালে এ দেশে আধুনিক ধরণে ইতিহাস লিখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। তবু কয়েকটী রাজবংশ হইতে ইতিবৃত্ত রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিণী', মহীশূরের 'রাজাবলী কথা', ত্রিপুরার 'রাজারত্নাকর', 'রাজমালা' প্রভৃতি বিখ্যাত। আলোচ্য গ্রন্থ ত্রিপুরার 'রাজমালা' বাঙ্গালা পদ্যে প্রায় ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। উহাতে ত্রিপুরার রাজগণের ইতিবৃত্ত আছে। ইহা ত্রিপুরার ধারাবাহিক ইতিহাস না হইলেও প্রাচীন ত্রিপুরা তথা প্রাচীন বাঙ্গালার বহু ঐতিহাসিক তথ্য ইহাতে পাওয়া যায়। সুতরাং এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যে খুবই বেশী, তাহা বলাই বাহুল্য। 'রাজমালা' সর্ব্বসুদ্ধ ছয় খণ্ডে বা লহরে বিভক্ত। তন্মধ্যে বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রথম লহর মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে। আশা করি, অন্যান্য লহরও কালীপ্রসন্নবাবুর সম্পাদনে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিবে।

কালীপ্রসন্নবাবু এই গ্রন্থ সম্পাদনে যে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা বহি পড়িলেই বুঝা যায়। ত্রিপুরার রাজা এবং রাজ-কর্ম্মচারিগণও এই গ্রন্থ সম্পাদনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্নবাবু এই গ্রন্থ সম্পাদনে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি গ্রন্থের ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতগণের মতামতের আলোচনা করিয়া নিজ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সমসাময়িক ইতিহাস ও শিলালিপি প্রভৃতি হইতেও তিনি প্রভূত সাহায্য লইয়াছেন। পদ্যে রচিত মূল গ্রন্থের পাদটীকায় প্রাচীন শব্দাদি এবং তাহার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। তারপর "মধ্যমণি" নামে সম্পাদকের বিস্তৃত টীকা। এই টীকায় ত্রিপুরার প্রাচীন ভৌগোলিক,

ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। এই বহুমূল্যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ যে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

FOREWORD

Sunday—Dec. 25, 1927

SHREE RAJAMALA (Vol. l.)—Edited by Sj. Kaliprasanna Sen Vidyabhusan, Published by the "Rajmala Karjyalaya," Agartala. Tripura State. PP, 316.

The illustrious, royal family of Tripura is to be congratulated on the splendid publication under royal auspices which has come to our hands—the first volume of the Rajmala or the chronicle of the princes of Tnpura. Regeneration of our nation would have been much easier if we could call back the old traditions so rudely shattered by foreign despoilers, but without which, all that we build is built on sand. These traditions—the vehicle of our Indian culture—may be rescued only if the history of our country can be restored. It is a great pleasure therefore to see that under the enlightened patronage of the Royal family of Tripura Mr. Kaliprasanna Sen Vidyabhusan has edited the first section of the ancient chronicle which contains the history of this family during the last five centuries. The printing and make-up of the book leaves nothing to be desired. The book is elegantly and artistically bound and profusely illustrated. The author's extent of knowledge is simply astounding ; he has handled the multifarious facts with astonishing adroitness but there is a serious drawback which considerably diminishes the value of his work ; his historical sanity is sorely at a discount. The first and foremost duty of a historian is to keep an open mind. This our author has not been able to do. A superstitious awe of the *Shastras* has overshadowed his commonsense and some of his arguments are extremely fantastic and puerile. He argues that persons mentioned in the Rigveda need not have lived previously to the time of the composition of this work because it is direct revelation and therefore preceded all men and matter. He has implicit faith in the Puranas and does not shrink even from a Kalpantara theory to synchronise the conflicting data in them and most disconcerting of all is his pious indignation at the unbelievers who have the Impudence to question the correctness of the statement of the *Shastras* that people in the Golden Age used to enjoy a deathless life of millions of years. Yet all this deplorable narrowness of vision hardly affects the intrinsic merit of the work. Coming to the historical period our author is master of himself. Here he is seen at his best criticising with critical acumen the absurd theories of Indian and English

writers supplementing the "chronicle of kings" with various data gleaned from multifarious sources which help the reader to visualise a state of real happiness and glory and with rare industry collecting facts and figures to prove or disprove a theory. It may reasonably be hoped that the other volumes too would be on a par with the present one and perhaps without the needless speculations on the Puranas which even though correct can accomplish but little. Lastly we have to say that the language of the chronicle does not justify the age assigned to it by the learned author—the beginning of the fifteenth century. The Bengali language of that time as known to us from other sources is quite different, perhaps a complete resorgmento took place not very long ago.

THE STATESMAN : — Sunday, July 8, 1928.

SHREE RAJAMALA PART I.

Edited by Kali Prasanna Sen Vidyabhusan, and published under the authority of the Tripura State.

This is a history of the kings of Tripura State as originally written by Pundit Baneshwar and Shukreshwar. The present editor has resented the original text by collating five different old Mss. found at Tipperah and he has enhanced the value of the book by giving the modern meaning of many of the obsolete Bengali words found in the text. The most valuable portion of the book, however, is his own foreword. The result of the extensive research there embodied will enable readers to form a complete idea about the Government of an Indian State in ancient times. Several maps and a number of illustrations add to the book's merits ; it is well produced, and is a valuable contribution to the history of ancient India. The original text is an interesting specimen of old Bengali Poetry.

মানসী ও মর্ম্মবাণী

বৈশাখ, ১৩৩৫

শ্রীরাজমালা

(ত্রিপুর-রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত) প্রথম লহর, সটীক ও সচিত্র। পণ্ডিতপ্রবর বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর বিরচিত ও শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ত্রিপুর রাজ্যের রাজধানী আগরতলা হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই, বোধ হয় বিক্রয়ের জন্য নহে। রয়েল সাইজ। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই চমৎকার। সম্পাদকীয় নিবেদন ৬ পৃষ্ঠা, প্রমাণ-পঞ্জী

৪ পৃষ্ঠা, পূর্ব্বাভাষ ৯৪ পৃষ্ঠা, সূচী ও ৬ পৃষ্ঠা, মূল গ্রন্থ ৭১ পৃষ্ঠা। তাহার পরে বিস্তৃত টীকা ২৯৬ পৃষ্ঠা। সর্ব্বশেষে ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী অনুক্রমণিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। বিরাট রাজসিক ব্যাপার।

ত্রিপুর রাজ্য এবং ত্রিপুর-রাজবংশ বাঙ্গালার বড় দরের জিনিষ। বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর, বীরেন্দ্রকিশোরের মত মহৎ প্রাণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস জানিতে বাঙ্গালী মাত্রেরই প্রাণে আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার ইতিহাস জানিতে হইলে অনুসন্ধিৎসুর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় এসিয়াটিক-সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত পাদ্রি লং সাহেব কৃত রাজমালার সার সঙ্কলন এবং পরলোকগত ঐতিহাসিক ঁকৈলাসচন্দ্র সিংহ কৃত তাহারই বিবৃতি "রাজমালা" ছাড়া আর গতি ছিল না। শ্রীযুক্ত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ সঙ্কলিত সম্পূর্ণ রাজমালার যে কয়েক খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার দুই এক খণ্ড ক্বচিৎ কোনও ভাগ্যবানের হস্তে দেখিতে পাওয়া যাইত। বহুবার রাজমালার ভাল একটি সংস্করণ বাহির করিবার চেষ্টা ত্রিপুর রাজসরকার হইতে হইয়াছে ; কিন্তু প্রত্যেক বারই নানা বাধা বিঘ্ন আসিয়া সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে খুব সোরগোল সহকারে শুনা গেল যে, কলিকাতার মস্ত বড় একজন অধ্যাপকের হস্তে রাজমালা সম্পাদনের ভার ন্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না।

কালীপ্রসন্নবাবু রাজমালার প্রথম খণ্ড বড় চমৎকার করিয়া সম্পাদন করিয়াছেন। চন্দ্রবংশীয় ত্রিপুর রাজগণের ইতিবৃত্তের আদিতেই দশাশ্ববাহিত শ্বেত রথে ভগবান চন্দ্রমার অদ্ভুত চিত্র প্রদানের হস্ত হইতে কালীপ্রসন্নবাবু রক্ষা পান নাই। *** কিন্তু ইতিহাসের মর্য্যাদা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তাহার জন্য আগরতলায় বসিয়া যতদূর পারা যায় কালীপ্রসন্ন বাবু তাহার চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। মুসলমান যুগের ইতিহাসের সহিত ত্রিপুরার ইতিহাস যেখানে জড়াইয়া গিয়াছে, সেখানে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া কালীপ্রসন্নবাবুকে পাদক্ষেপ করিতে হইবে, যশোধরের ইতিহাসের অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনার বিবরণ মির্জ্জা নথনের বাহায়-ই-স্তানে আছে, রাজমালায় উহার বিন্দুবিসর্গও নাই। যশোধরের ইতিহাস লিখিবার আগে বাহায়-ই-স্তান বাদ দিলে চলিবে না।

কালীপ্রসন্নবাবু যেটুকু করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু ছয় লহর রাজমালার মোটে এক লহর বাহির হইল। বাকী লহরগুলির জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

দুর্ভাগ্যক্রমে রাজমালার একখানা খাঁটি পুরাতন পুথি পাওয়া যায় নাই। যে পুথি দেখিয়া রাজমালা সম্পাদিত হইয়াছে, ভাষা দেখিয়া তাহাকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া

মনে হয়। ১৫শ শতাব্দীতে রচিত পুস্তকের অন্ততঃ পক্ষে ৩০০ বছরের পুরাণো পুস্তক পাওয়া গেলে মনটা খুসী হইতে পারিত। অবলম্বিত পুথিখানার বিবরণ কালীপ্রসন্নবাবু কোথাও দেন নাই — পুথিখানার বয়স কত, তাহারও উল্লেখ করেন নাই। চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদের মুদ্রিত পাঠই ফিরিয়া অবিকল মুদ্রিত করিতেছেন না তো?

প্রথম দিকের রাজগণের রাজ্যারোহণ বৎসরগুলি তাঁহাদের মুদ্রা হইতে নির্ণীত হইতে পারে, কাজেই তাঁহাদের মুদ্রা যতগুলি কালীপ্রসন্নবাবু হস্তগত করিতে পারেন সবগুলির collotyle ছবি দিতে পারিলে ভাল হয়। রাজমালায় প্রদত্ত রাজ্যারোহণ বৎসর সর্ব্ব স্থানে নির্ভরযোগ্য নহে।

ভারতবর্ষ

চৈত্র, ১৩৩৪ সন

শ্রীরাজমালা। — শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। মূল্যের উল্লেখ নাই। ভারত-বিশ্রুত সুপ্রাচীন ত্রিপুর-রাজবংশের পুরাবৃত্ত এই রাজমালা। কাশ্মীরের 'রাজতরঙ্গিণী', মহীশূরের 'রাজাবলী' আর এই 'রাজমালা' একই পর্য্যায়ভুক্ত। অনেকদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম, 'রাজমালা'র একটি সুমার্জ্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হইবে ; অনেক সুধী পণ্ডিত ব্যক্তি এই সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্তও হইয়াছিলেন ; কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে 'রাজমালা'র এই সংস্করণ দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই। সম্প্রতি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু — শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয় এই রাজমালার প্রথম লহর প্রকাশ করিলেন। এমন সুবৃহৎ রাজমালার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করা এখানে অসম্ভব ; আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, এই পুস্তক সম্পাদনে যত্ন, চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ের কিছুমাত্র ক্রটী হয় নাই। প্রথম লহর সম্পাদনে সম্পাদক মহাশয়কে সংস্কৃত, ইংরেজী, বাঙ্গালা অনেক পুস্তক ও পুথির সহিত তথ্য মিলাইতে হইয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুর-ইতিহাসের উদ্ধারের জন্য বিশেষ প্রয়াসী ছিলেন ; তিনি আজ জীবিত থাকিলে যে কি আনন্দ লাভ করিতেন, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর যে পিতার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা অতীব সুখের বিষয়। যাঁহারা ইতিহাসপাঠ-পিপাসু, তাঁহারা ত এই 'রাজমালা'কে অভিনন্দিত করিবেনই, সাধারণ পাঠকগণও ইহা পাঠ করিয়া অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন। পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ও চিত্রাদি ত্রিপুর-রাজবংশেরই উপযুক্ত হইয়াছে।

চুণ্টা প্রকাশ

ভাদ্র, ১৩৩৮ ত্রিপুরাব্দ

শ্রীরাজমালা প্রথম লহর — শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাস্থ রাজমালা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। এই বিরাট গ্রন্থ সঙ্কলন, সম্পাদন, মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ পট বন্ধন — সর্ব্ব বিষয়েই রাজসিক ভাব সম্পূর্ণ দেদীপ্যমান, শ্রমসঙ্কোচ বা ব্যয়সঙ্কোচ নিবন্ধন কোনও বিষয়ে বিন্দুমাত্রও ত্রুটী ঘটিতে পারে নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় গ্রন্থখানা আমাদিগকে উপহার প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার মত দেশবিশ্রুত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান নিরত পণ্ডিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের সমালোচনার সুযোগ লাভ করা শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। মূল রাজমালা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। রাজরত্নাকর নামে ত্রিপুর রাজবংশের আর একখানা ধারাবাহিক সংস্কৃত ইতিহাস আছে। এই দুই গ্রন্থের সার সংগ্রহ ক্রমে পণ্ডিতপ্রবর শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর শর্ম্মা এবং চন্তাই দুর্ল্লভেন্দ্র নারায়ণ পয়ার ছন্দে বাংলা রাজমালা প্রণয়ন করেন। শ্রীরাজমালায় তাহাই উদ্ধার করা হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঁচখানা পুরাতন পাণ্ডুলিপি মিলাইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজমালার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। যে-সকল স্থলে পাঠান্তর পাইয়াছেন তাহা পাদটীকার সন্নিবেশ-পূর্ব্বক তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রয়োজনীয় বিবরণ মূলের পশ্চাৎবর্ত্তী টীকায় সন্নিবিষ্ট করিয়া গ্রন্থখানাকে প্রকৃতপক্ষে একটী রত্নখনিতে পরিণত করিয়াছেন। রাজরত্নাকর, কৃষ্ণমালা, শ্রেণীমালা, চম্পকবিজয়, গাজিনামা প্রভৃতি বহু হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ, শিলালিপি, তাম্রশাসন ও বিভিন্ন যুগের মুদ্রাদির সাহায্যে পুরাতত্ত্ব সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি কি রকম কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একেই আমাদের প্রাচীন ইতিহাস বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত, তদুপরি শ্রমকুণ্ঠ সৌখীন গবেষণাকারিগণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই এমন বিভিন্ন মত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে তৎসমুদয়ের উপর ভিত্তি স্থাপন করা চলে না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রমাণ ও যুক্তিবলে ঐ সমস্ত বিরুদ্ধ মত খণ্ডন ক্রমে প্রকৃত সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। রাজমালা প্রধান ভাবে ত্রিপুর রাজগণের বিবরণ ; প্রসঙ্গ ক্রমে রাজ্যের ইতিবৃত্তমূলক যে-সকল বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় সমস্তই অতি দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই ইতিবৃত্ত হিসাবেও ইহা অতি মূল্যবান গ্রন্থ হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

বাংলা রাজমালা ৬ বারে রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটীতে এক একটী লহর বলা হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রথম লহর প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আশা

করি পণ্ডিত মহাশয় যথাসম্ভব সত্ত্বর বক্রী পাঁচ লহর প্রকাশ করিয়া বহুদিনের অভাব পূর্ণ করিবেন। এই সম্পাদনের অনুষ্ঠান স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের আমলেই আরম্ভ হইয়াছিল ; কিন্তু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ ঘটে নাই। তৎপর ঁমহারাজা রাধাকিশোরমামিক্য বাহাদুর ও ঁবীরেন্দ্রকিশোরমাণিক্য বাহাদুরের সময়েও এ সম্বন্ধে বহু চেষ্টা-চরিত্র ও অর্থ ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কোনও কোনও কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্ব স্ব তত্ত্বানুসন্ধিৎসার আকাঙ্ক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বর্গীয় মহারাজাদিগকে বিমোহিত করিয়া কেবল রাজকোষের অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এমন নহে, নানাভাবে কার্য্যের বিঘ্নও ঘটাইয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। এই রাজমালা পাওয়ার জন্য বহুকাল যাবৎ দেশবাসী উৎকণ্ঠিত ছিল, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। দেশবাসীর শুভাশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইয়া তাঁহাকে চির যশস্বী করিয়া তুলুক।

এই বিরাট গ্রন্থের কোনও মূল্য লেখা নাই। দানশীল ত্রিপুরাধিপতির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই ; কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে গ্রন্থখানা বিনামূল্যে পাওয়ার কি উপায় আছে সম্পাদক মহাশয়ই বলিতে পারেন। আমরা জানি, শত শত ত্রিপুরাবাসী রাজমালা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে চরিতার্থ হইবে?